রুনু গুহ নিয়োগী
সাদা আমি
কালো আমি
দ্বিতীয় খণ্ড

রুণু গুহ নিয়োগী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

এম. এল. দে. এণ্ড কোং
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
কালাচাঁদ দে
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
২৬ জানুয়ারি, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
তড়িৎ চৌধুরী

লেজার টাইপ সেটিং :
ক্রেস্ট গ্রাফিক্স ২, চার্চ লেন
কলকাতা ৭০০০০১

মুদ্রক :
অফসেট আর্ট প্রিন্টার্স
৭৩, ইলিয়ট রোড কলকাতা-৭০০০১৬

যে সব সহকর্মী আমার
সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
মৃত্যুমুখে লড়াই করেছেন,
তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ
আমার এই উপহার!

আরও ক'টি কথা

জীবনের সায়াহ্নে এসে সত্য বলার যে সাধনায় আমি নিজেকে নিয়োজিত করেছি, তাতে যে পাঠকবর্গের সমস্ত স্তরের সমর্থণ পাব না, তা আমি প্রথম খণ্ড প্রকাশের আগেই জানতাম। কারণ সত্য একসঙ্গে সবাইকে তুষ্ট করতে পারে না। আর সত্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রিয়। তাই প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সমালোচনা ও সমর্থনের শোরগোল হয়েছিল তাতে আমি মোটেই বিচলিত হয়নি। কারণ আমি তো ঠিক করেই নিয়েছি, যত কঠিন বিরোধিতাই হোক না কেন আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যাব না। প্রশংসায় খুশি হয়েছি ঠিকই কিন্তু আপ্লুত হয়ে অতিকথনের বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাবধান থাকার চেষ্টা করেছি।

তবে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি বারবার। তা হল, আমি বইয়ের নাম কেন ‘সাদা আমি কালো আমি' রাখলাম? আসলে এটা প্রতীকী। আমি বিশ্বাস করি, সাধারণ মানুষের ভেতর দু'টো দিক আছে, ‘একটা সাদা, একটা কালো'। আমিও সেই সাধারণ মানুষের একজন। আমার ভেতরও আছে ওই দুই বিপরীত মানুষ। কিন্তু আমার বইয়ের পাঠকগণ সেই প্রতীকী ব্যাপারটার ব্যাখায় না গিয়ে আমার কর্মজীবনের সাদা দিক ও কালো দিক আমার লেখার মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন। বিশেষ করে তথাকথিত আমার কালো দিক। দোষ তাদের নয়, আমাকেই আরও স্পষ্ট করে সেগুলো উল্লেখ করা উচিত ছিল। সেই ঘাটতি আমি এবার বারবার উল্লেখ করে পূরণ করার চেষ্টা করেছি। জানিনা, কতটা সফল হব, কতটা খুশি করতে পারব পাঠকদের। তবে অকপটে বলছি, লেখার ছন্দ নষ্ট না করে সেই চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি।

সন্তুষ্টু সবাই যে হবেন না, তাও জানি। তারা বলবেন, 'এই ঘটনা বা সেই ঘটনার' কথা লিখিনি কেন? তাদের অবগতির জন্য জানাই, আমি পালিয়ে যাওয়ার জন্য আসরে নামিনি। সমস্ত ঘটনার কথা একই পরিসরে বলা সম্ভব নয়। ধৈর্য ধরুন, সবই আস্তে আস্তে জানতে পারবেন। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও কিছু নাম গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছি। যেমন বাধ্য হয়েই কিছু নাম উল্টো লিখেছি। এই খণ্ডেও সময়ের ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর না করে লিখতে লিখতে যে ঘটনা স্বাভাবিক গতিতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা লিখেছি। কোনও ব্যক্তি বিশেষকে আঘাত করার কোনও অভিপ্রায় আগেও ছিল না এবারও নেই। তবু কেউ আঘাত পেলে আমি দ্বিতীয়বার তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এখানে যে রাজনৈতিক ঘটনার কথা বলা আছে তা একটা বিশেষ সময়ের আংশিক বিবরণ মাত্র। আরও ঘটনার কথা আমার আগামি তৃতীয় খণ্ডে থাকবে। আমার এই বিবরণ দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, সেই বিশেষ সময়টা যাতে ওই রূপে আর ফিরে না আসে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যেন আমার বিবরণগুলো কাজে আসে।

এই খণ্ডে অপরাধ জগতের এমন কিছু দিক সম্পর্কে লিখেছি, যা সাধারণ লোক সচরাচর জানতে পারেন না। সেগুলো লেখার কারণ, তাঁদের বিস্তারিতভাবে অবগতির জন্য। যাতে তাঁরা সেই সব অপরাধীদের ব্যাপারে সাবধান থাকেন। আমার সেই প্রয়াস যদি সফল হয় তবেই আমার লেখা সার্থক হবে।

আবেদন

নুক্‌, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

বুঝতে পারছি না ১৯৭০-৭১ সালের ঘটনা প্রথম খন্ডে কি করে পাঁচ-'ছ বছর আগে ১৩৬৬ সনে ছেপে প্রকাশিত হয়, এই খন্ডটিও প্রথম প্রকাশিত ১৩৬৭ সনে, তাই PDF এর পাতাটাও এখানে শেষে জুড়ে দিলাম।

লালবাজার থেকে গাড়িতে একা বেরিয়ে এলাম। রাতের কলকাতা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বারোটাদশ। যাব ময়দানের দিকে। পৃথিবীর ছাদের ওপাশে সরু একফালি চাঁদ ঝুলছে, বোঝা যাচ্ছে, অমাবস্যা এগিয়ে আসছে। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র - চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সারারাত জেগে তারা তাকিয়ে থাকবে, নিশ্চুপ, ধ্যানস্থ। আমাদের সৃষ্টির লগ্নের বহু কোটি বছর আগে থেকেই তারা ঘুমহীন। দেখে যাচ্ছে কোথায় কোন গাছে ফুটছে ফুল, কোথায় ফুল হচ্ছে ফল, কোথায় ঝরে যাচ্ছে কুঁড়ি। এই আবর্তনের মাঝে তারা নিজ কক্ষপথে অবিচলিত, আগুনই যে খাঁটি ও শ্রেষ্ঠ তার বার্তা পৌঁছে দিতে নিজেরা মগ্ন।

আমার গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছে কলকাতার রাতের ব্যস্ততাহীন রাস্তা। দু চারটে অন্য গাড়ি এপাশ ওপাশ দিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

আকাশবাণীর বাড়িটা ডান পাশে রেখে, বাঁ দিকে এগিয়ে মোহনবাগান মাঠ পেরিয়ে ইডেন গার্ডেন্সের রেলিংয়ের ওপর দিয়ে গাছে ঘেরা পার্কটা দেখলাম। হাওয়ায় মৃদুমৃদু দুলছে। তার নিচে সারাদিনের হৃদয়ের লেনদেনের খেলা তখন হয়তো ঘরে ঘরে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে। কোনওখানে বা স্বপ্নের ঢেউ তুলে তোলপাড়।

একটু দূরে গঙ্গার ওপর কোনও জাহাজ থেকে বেজে উঠল সিটি। জানান দিল, তফাত যাও, আমি আসছি। গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, ছোট ছোট বাঁধা নৌকাগুলো জলের ওপর ঢেউয়ের মাথায় টুপুর টাপুর নাচছে, আর সেই নাচের দুলুনিতে নেচে যাচ্ছে ছৌয়ের ভেতর রাখা ছোট্ট কুপি। তার ঘুমপাড়ানী আলো ছিটকে ছিটকে এপাশ ওপাশ মিশে যাচ্ছে গঙ্গার জলে। ঢেউয়ের মাথায় ভেঙে সেই আলো হারিয়ে যাচ্ছে কোথায় কে জানে।

আমার ওসব দেখার সময় নেই। আমি পুলিশ। ওপরতলার নির্দেশে আমি হেস্টিংস থানার দিকে যাচ্ছি। গাড়ির গিয়ারের তালে তালে আমাদের ছোটা। যান্ত্রিক। মা আমার তখন কোচবিহারের ছোট শহরের প্রান্তে তোরসা নদীর দিক থেকে ছুটে আসা হাওয়ায় ভাসানো বাড়ির ঘরে ঘুমিয়ে। জানেও না, তার খোকা তখন গঙ্গার হাওয়া খাওয়া ভুলে চলেছে একটা খবরের জন্য।

হেস্টিংস থানার গলির মুখে আসতেই দেখি, আমাদের রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় মোটর বাইক চড়ে বেরিয়ে আসছে। আমাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে সে প্রশ্ন করল, "এত রাতে স্যার?" ওর কথার উত্তর না দিয়ে ওকে আমি যে নামে ডাকতাম, সেই নাম ধরে বললাম, "রাজ্জা, তুই এখনও বাড়ি যাসনি?" রাজকুমার বলল, "আমার যেতে যেতে রোজই প্রায় এত রাত হয়ে যায়। তার ওপর আজ ময়দানে একটা কেস হয়ে গেছে, সেটা নিয়েই এতক্ষণ ছিলাম।" বললাম, "সেই কেসটার খবর নিতেই এসেছি। কী হয়েছে?"

রাজকুমার তার মোটর বাইক টা পাশে দাঁড় করিয়ে আমাকে ময়দানের ঘটনার কথা বলতে আমার গাড়িতে উঠে বসল। আমিও বসলাম ওর পাশে। ও বলতে শুরু করল, "রাত এগারটা নাগাদ একটি বেশ স্বাস্থ্যবতী যুবতী ওরই বয়সী একটা ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে থানায় এসে হাজির। ওদের ওইভাবে আসতে দেখে আমার ঠিক ভাল লাগল না। আমি জানতে চাইলাম, কী হয়েছে? ছেলেটা বলল, আমাদের কথা ও সিকে বলব। উনি কি আছেন? বললাম, হ্যাঁ। ওরা ওসি'র ঘরে ওইভাবে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে গেল। মিনিট দুয়েক পর ও সি আমাকে ডেকে বললেন, শোন, ওরা কী বলছে। ওসি'র ঘরের আলোয় ভাল করে ওদের দুজনকে দেখলাম। ওরা তখন ওসি'র উল্টোদিকে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছে। মেয়েটা ছেলেটার কাঁধে মাথা দিয়ে রেখেছে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে ছেলেটার কাঁধের কাছটায় ভিজিয়ে দিচ্ছে। ছেলেটা বেশ লম্বা,

ফর্সা, সুন্দর দেখতে, ভাল চেহারার, দেখেই বোঝা যায় ভদ্র পরিবারের। মেয়েটা ছেলেটার মত ফর্সা না হলেও শ্যামলার ওপর দেখতে বেশ ভালই। বললাম, বলুন আপনারা এত রাতে কেন এসেছেন। ওরা তারপর যা বলল তাতে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম।”

আমি রাজকুমারকে প্রশ্ন করলাম, “কী বলল?” রাজকুমার আমার প্রশ্ন শুনে আবার বলতে শুরু করল, “ছেলেটা মেটিয়াব্রুজে থাকে, একটা মিনিবাস আছে, মেয়েটা থাকে খড়দা-সোদপুরে। একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। ওদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, মাসখানেক পর হবে। আজকে ওরা নিউমার্কেটে কিছু জিনিস কিনে আউটরাম ঘাটে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছিল। ওখানে ওরা অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছে। খুচখাচ এটা ওটা খেয়েছে। তার ফলে ওদের রাত হয়ে যায়। ওরা গঙ্গার ধার থেকে ট্যাক্সি, বাস কিছু না পেয়ে কার্জন পার্কের মোড়ের দিকে যাওয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করে। তাই রাস্তা কমাবার জন্য ওরা মাঠ দিয়ে চলতে থাকে। মোহনবাগান মাঠের পেছন দিক দিয়ে আসবার সময় অন্ধকার ফুঁড়ে সাতটা লম্বা চওড়া লোক ওদের পথ আগলে দাঁড়ায়। ছেলেটা ওদের কিছু বলার আগেই ওদের একজন হিন্দিতে বলে ওঠে, এদিক দিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ছেলেটা জানায়। ওরা তখন বলে এদিক দিয়ে রাতে যাওয়া বারণ। ছেলেটা বলে, সবাই যায়, তাই আমরাও যাচ্ছি। খোলা মাঠে পায়ে হাঁটা পথ রয়েছে, বারণ আবার কবে থেকে হলো? ওরা ছেলেটাকে ধমকে বলে উঠল, চোপরাও, চল আমাদের কর্ণেল সাহেবের কাছে, জান না এটা আর্মির জায়গা? ছেলেটা বুঝল ওরা আর্মির লোক। তারপর বলল, ঠিক আছে, চলুন, আপনাদের কর্ণেলের কাছে। সেখানেই বলব। এরপর ওরা সাতজনে ছেলেটা আর মেয়েটাকে ঘিরে নিয়ে মোহনবাগান মাঠের র‍্যামপার্টের পেছনে একটা যে ডোবা মতো আছে, সেদিকে নিয়ে চলল। শুকনো ডোবাতে নামলে দূর থেকে বোঝা যায় না ওখানে কোনও লোক আছে।”

আমি রাজকুমারকে বললাম, “জানি, তারপর?” রাজকুমার শুরু করল, “আর্মির লোকেরা ওদের সেই ডোবাতে নামিয়ে হাঁটিয়ে ডোবার উল্টোদিকে যে গাছগাছড়া আর ঝোপঝাড় আছে তার কাছে নিয়ে এসেই চারজন ছেলেটাকে জাপটে ধরে টানতে টানতে একটা গাছের কাছে নিয়ে গেল, পকেট থেকে দড়ি বের করে ওরা ওকে গাছে বেঁধে দিল। একটা রুমাল দিয়ে মুখ আটকে দিয়েছে। অন্যদিকে বাকি তিনজন ততক্ষণে মেয়েটাকে টেনে হিঁচড়ে সবরকম অন্তর্বাস ছিঁড়ে পুরো উলঙ্গ করে ফেলেছে। তারপর ওরা শাড়িটা বিছিয়ে . . .'

রাজকুমারকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, “সাতজনেই?” রাজকুমার বলল, “হ্যাঁ, সাতজনই পরপর ছেলেটার সামনেই মেয়েটাকে—।”

রাজকুমার চুপ করে গেল। আমিও নির্বাক। ভাবছি, বাঙালি মেয়ে কি করে প্রাণে বেঁচে গেল ওই সাতজন আর্মির লোকের অত্যাচার থেকে? আমার চিন্তাটাই বোধহয় রাজকুমারের মাথায় খেলে গেল। সে বলল, “স্যার, মেয়েটার ভাল স্বাস্থ্য বলে ওই মাতালগুলোর ওইরকম অত্যাচার সহ্য করতে পেরেছে।” আমি জানতে চাইলাম, “তারপর?”

রাজকুমার বলল, “তারপর মেয়েটার সোনার একটা আংটি, দুল, গলার একটা চেন, ছেলেটার ঘড়ি, টাকাপয়সা যা যা ওদের কাছে ছিল সব কেড়ে নিয়ে ওরা ফোর্ট উইলিয়মের দিকে চলে গেল। ওরা চলে যেতে

মেয়েটা কোনমতে উঠে ছেলেটার হাত পায়ের দড়ি খুলে দিল। তখন ওরা হেঁটে মোহনবাগানের মাঠের পূর্বদিকের কোণায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরে থানায় আসে।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “এখন ওরা কোথায়?” রাজকুমার বলল, “লোকচক্ষুর ভয়ে থানায় ওরা ধর্ষণের রিপোর্টও লেখায় নি, ছিনতায়ের রিপোর্ট লিখিয়েছে। মেয়েটার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল, দাঁড়াতে গেলেই তলপেট ধরে বসে যাচ্ছিল। ছেলেটা আমায় বলল, আপনি যে কোনও একটা ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন, যাতে লোকজনের জানাজানি না হয়। মেয়েটাকে দেখে, ছেলেটার কথা শুনে আমি একটা চিঠি লিখে ডাঃ বিমল চক্রবর্তীর কাছে তাঁর

নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের কাছে টাকাও ছিল না, আমি দুশো টাকাও দিয়েছি, আগামীকাল সন্ধেয় ওরা আমার কাছে আসবে বলে গেছে।" রাজকুমার চুপ, আমিও চুপ।"

নীরবতা আমিই, ভাঙলাম। বললাম, "কাল সকালে ডাক্তারকে ফোন করে জেনে নিস, মেয়েটা কেমন আছে। তারপর আমায় একটা ফোন করিস। এখন বাড়ি যা।"

রাজকুমার গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, "ঠিক আছে স্যার।" রাজকুমার ওর মোটর বাইক চালিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তারপর থানায় গিয়ে পুরো রিপোর্ট দেখে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে চালাতে শুরু করলাম। গাড়ি এনে দাঁড় করলাম, আউটরাম ঘাটের কাছে। গাড়ি থেকে নামলাম। রাস্তায় কোনও লোকজন নেই। রাত তখন একটা। হু হু করে কিছু লরি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি সাবধানে রাস্তাটা পার হলাম। তারপর ময়দানে যেখান দিয়ে মোহনবাগান মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পাশে পায়ে হাঁটা রাস্তাটা গেছে সেখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। এখান দিয়েই ওই ছেলে আর মেয়েটা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল সেই সময়। আমি ডানদিকে ফিরে বড় বড় সবুজ গাছগুলোর দিকে তাকালাম। সবুজ এখন অন্ধকার। ওই সবুজ রাতে রূপান্তরিত অন্ধকারের তলায় সাপেরা কামড়ে নেয় জীবন। হা-হা রুক্ষ মরুভূমি করে দেয় সরল কুমারী মেয়ের স্বপ্ন, পৃথিবী। যে মাটিকে আমরা মা বলি তার ওপরই ধর্ষণ করে অন্য অনেক মাকে। কেন তখন সে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে কোলে টেনে নেয় না তাদের? কেন নীরব থাকে মা, কেন?

ডোবাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। শুকনো, নিস্তব্ধ, কোথাও কেউ নেই। কিছুক্ষণ আগে যে এখানে সাতজন হিংস্র নেকড়ে একটা নিষ্পাপ প্রাণকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে তছনছ করে দিয়েছে তার কোনও চিহ্নই নেই। আশ্চর্য লাগল, যাদের হাতে রয়েছে আমাদের দেশরক্ষার ভার, যারা বুক চিতিয়ে রক্ষা করবে মাতৃভূমি, মা-বোনেদের সার্বভৌমত্ব, তারাই কিনা ভক্ষক!

হঠাৎ কোনও এক জাহাজ থেকে ভোঁ ভোঁ শব্দে বেজে উঠল সাইরেন। আমি আস্তে আস্তে মোহনবাগান মাঠের পূর্বদিক দিয়ে উঠে এলাম রাস্তায়। ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। তারপর লালবাজারে।

ভোরবেলায় ডি.সি.ডি.ডি. দেবী রায়কে রাজকুমারের দেওয়া পুরো বিরবণটা টেলিফোনে জানালাম। শুনে তিনি বললেন, 'এ কি কারবার? আর্মির জওয়ানরা যদি এসব শুরু করে, ঝামেলা বাধবে, রাজকুমারদের বলো পাহারা বাড়াতে। আর আমাদের থেকেও একটা দল পাঠানোর ব্যবস্থা কর, রাজকুমারকে ওটা বলে দিও যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। তাদের ধরবার চেষ্টা কর। এ রকম ঘটনা যাতে আর না হয় তার সবরকম ব্যবস্থা কর।" তাঁর কথা শেষ হলে আমি ফোন নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন রাজকুমারের ফোন আসে। রাজকুমার ডাক্তারের কাছ থেকে মেয়েটার অবস্থা জেনে নিয়ে আমাকে জানাবে। .

দশটা নাগাদ রাজকুমারের ফোন এল আমার কোয়ার্টারে। সে জানাল, "ডাক্তারের কাছে মেয়েটা গিয়েছিল। ডাক্তার খুব সহানুভূতির সঙ্গে সব কিছু দেখেছে। ওষুধপত্তর দিয়েছে। ওকে আবার আসতে বলেছে পরীক্ষার জন্য, কারণ মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। রাজকুমার আরও জানাল ছেলেটা তার কাছে বিকেল পাঁচটার সময় আসবে টাকাটা ফেরৎ দিতে। তখন আরও জানা যাবে।"

রাজকুমারকে বললাম, "আর্মির ওই জওয়ানগুলোর লোভ বেড়ে গেছে, আবার আসবে, তোরা তক্কে তক্কে থাক, ধরতে পারবি। আমরাও একটা পেট্রল পার্টি পাঠাচ্ছি, তোদের সাহায্য করার জন্য। ওরা তোর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। আমি পরিকল্পনা করে ওদের জানিয়ে দেব, তুই জেনে নিস।" উত্তরে সে বলল, "ঠিক আছে স্যার, আপনি আমাদের ওসির সঙ্গেও কথা বলে নেবেন, যাতে আজ থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।" আমি ওসির সঙ্গে কথা বলে নিলাম।

বিকেল পাঁচটা। ছেলেটা এল না। ছটা, না তখনও এল না। রাজকুমারের কপালে ভাঁজ

পড়ছে, না টাকার জন্য নয়, ভাবতে লাগল, মেয়েটা কি বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ল? আগের দিন রাতে ওর যা অবস্থা দেখেছে, তাতে মানসিক ও শারীরিক দুটো দিকই ভেঙ্গে পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

সাড়ে ছটা নাগাদ রাজকুমার আর অপেক্ষা না করে থানা থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে থানার থেকে দুজন গাট্টাগোট্টা কনস্টেবলকে নিয়ে। ইতিমধ্যে আমাদের দফতর থেকে ছজনের একটা পেট্রল পার্টি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজকুমার আমাদের গোয়েন্দা দফতরের পুরনো দক্ষ অফিসার। বদলি হয়ে হেস্টিংস থানায় গেছে, কিন্তু আমাদের দফতরের লোকেদের সঙ্গে কাজ করার সব অভিজ্ঞতা তার আছে। সবাইকে সে চেনে। সুতরাং তার সঙ্গে আমাদের পাঠানো পার্টি যখন মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবুর সামনে দেখা করল, সে খুব খুশি হলো। তারপর ওরা মোহনবাগান মাঠের পেছন দিকে না গিয়ে, ফোর্ট উইলিয়মের দিকে ইস্টবেঙ্গল মাঠের শেষ দরজার কাছে যে বিরাট বট গাছ আছে, তার গুড়ির পাশে সন্ধে সাতটা নাগাদ ঘাঁটি গাড়ল। এতে করে ওরা অন্যদের দেখতে পেলেও ওদের কেউ দেখতে পাবার সম্ভাবনা রইল না। গভীর জঙ্গলে গেরিলা বাহিনী যেমন ঘাপটি মেরে বসে, তেমনভাবে সবাই অন্ধকারে মিশে গেল। ওঁদের সুবিধা, ওখানে বসলে মোহনবাগান মাঠের পেছন দিককার বিস্তৃত মাঠ, আর ইস্টবেঙ্গল মাঠের পেছন দিককার র‍্যামপার্ট, তার পেছন দিককার ঝোপঝাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখা যায়। যেখানে ওরা বসল তার পাশে একটা বড় নর্দমা। আর ওই নর্দমার দক্ষিণ দিক থেকেই আর্মির লোকেরা আসবে।

অন্ধকার ভেদ করে চোখ সতর্ক রাখল সবাই। কাউকে তো আলাদা ভাবে চেনা যাবে না। ছায়ামূর্তি হয়েই সবাই উদয় হবে। মাঝেমধ্যে রেড রোডে চলা গাড়িগুলোর হেডলাইট পড়ে আলো আঁধারির খেলা খেলে আরও গহন অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সমস্ত পরিবেশ।

রাজকুমাররা নিঃশব্দে বসে আছে। প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। বড় নর্দমার জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, আর তার মাঝে ব্যাঙ, সরীসৃপ জাতীয় কিছু প্রাণীর খসখসানি, মাথার ওপর গাছের ডালে ডালে অজস্র পাখির মধ্যে দু একজনের ঘুমভাঙ্গা ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ঘড়ি টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যে। সন্ধে থেকে রাতের দিকের অব্যর্থ নিশানায়। সাতটা থেকে আটটা, আটটা থেকে সাড়ে আটটা। কেউ কী আজ আসবে শয়তানী অভিসারে? অনিশ্চয়তার ডানায় ভর করে রাজকুমারদের অভিযান। দস্যুদের হাত থেকে মা বোনের জীবন লুঠ হওয়া বন্ধ করার দৃঢ় মানসিকতা ছাড়া ওদের কাছে ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করার আর কোনও সান্ত্বনা নেই। হ্যাঁ, সঙ্গে অবশ্যই আছে কলকাতা পুলিশের সম্মান বাঁচানোর প্রশ্ন।

আমাদের লোকেরা যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাবার পাত্র নয়। তারা জানত, পুলিশের কাজে ধৈর্য হারানোর কোনও জায়গা নেই। ধৈর্য হারানোর অর্থ পরাজয়কে স্বীকার করে নেওয়া।

ঘড়ি নটার দিকে ছুটছে। হঠাৎ ওরা দেখতে পেল, ইস্টবেঙ্গল মাঠের পেছন দিক দিয়ে আট-নজন লোক আসছে। ছায়ামূর্তি। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকারে। তবে দেখে মনে হলো, প্রত্যেকেই ট্রাউজারস পরা। ওরা ইস্টবেঙ্গল মাঠের র‍্যামপার্টের পেছন দিক দিয়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে ওরা? কি জন্য ওরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে গেল? কেন ওরা আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকারের মাঝে লুকিয়ে পড়লো? কি উদ্দেশ্য? কি করবে রাজকুমাররা? তবে একটা ব্যাপার রাজকুমারের কাছে পরিষ্কার যে ওরা কোনও মহৎ কাজের জন্য ওই সময় আলো ছেড়ে ওই অন্ধকারের আশ্রয় নেয়নি।

এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট, ওদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

রাজকুমার ঠিক করে ফেলল, যা হয় হবে, ওদের আক্রমণ করে ধরবে। তাই সে

ফিসফিস করে ওর সঙ্গী সিপাইদের নির্দেশ দিল, "ওরা দলে আমাদের থেকে ভারী। গায়ে জোরও আমাদের চেয়ে কম নয়, তাই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে ওদের এক একজনকে দু তিনজন মিলে ধরবে, বাকিরা পালালে পালাবে, কিছু করার নেই, তবু কজনকে তো ধরতে পারবো।"

ওর নির্দেশ মত সবাই মিলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাঠের পেছন দিকের নর্দমার পাশ দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল। অন্ধকারে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঝোপের দিকে এগোতে লাগল। তারপর যে ঝোপের আড়ালে ওরা গিয়েছে সেদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে দেখতে পেল সেই দলটাকে, সেখানে ঝুপঝাপ আওয়াজ আর একটা মেয়েলি গোঙানোর শব্দ কানে আসতে লাগল। তারা সবাই এমন কাজে মগ্ন যে, রাজকুমাররা যে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেই পারল না।

চকিতে রাজকুমার আর আটজন সিপাই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝোপঝাড় অগ্রাহ্য করে কজন ছুটে পালাল। রাজকুমাররা তাদের দলের তিনজনকে জাপটে ধরে রাখল। তারা গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে ওদের হাত থেকে পালানোর জন্য ছটফট করতে লাগল। কিন্তু দু-তিনজন মিলে একজনকে ধরাতে, ধৃত তিনজন হার মানতে বাধ্য হল।

ধস্তাধস্তি, লাফ, ছোটাছুটির মধ্যেই রাজকুমার দেখে নিয়েছে একটা মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাটিতে পড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি পাশে পড়ে থাকা কামিজ দিয়ে তাকে ঢাকা দিয়ে দিল। ওড়না দিয়ে বাঁধা মুখটা খুলে দিল। রাজকুমার বুঝল, অঘটন ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তেই তাঁরা এসে হাজির হয়েছে। মেয়েটা চটপট উঠে সালোয়ার কামিজ পরে নিল। রাজকুমার বুঝল, কেন ওই দলটা যখন ঝোপঝাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন অন্ধকারে বুঝতে পারেনি সেই দলে একটা মেয়ে আছে। সালোয়ার-কামিজ, শার্ট আর ট্রাউজার্সের ভিড়ে মিশে আলাদা করে কিছু জানান দেয়নি।

পুরো দলটাকে আলোতে নিয়ে এসে রাজকুমার মেয়েটার কাছে তার পরিচয় জানতে চাইল। মেয়েটা সমস্ত ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যে আকাশভাঙ্গা অকালমৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তার জীবনের রঙ হলুদ হয়ে গিয়েছিল, তা কোন শক্তির বলে মুহূর্তের মধ্যে সবুজে ফিরে এল? সে তাই রাজকুমারের প্রশ্নে ভাষা হারিয়ে কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। রাজকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল।

রাজকুমার তাকে সাহস যোগানোর জন্য বলল, "আর কোনও ভয় নেই। তুমি এখন নিরাপদ। আমি যা জানতে চাইছি তুমি নির্ভয়ে বলো।" রাজকুমারের কথা শুনে মেয়েটা কিছুটা ঘোর কাটিয়ে উঠে আস্তে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যা শোনাল তাতে রাজকুমারদের তখন আশ্চর্য হবার পালা।

মেয়েটা আমাদের কলকাতা পুলিশের এক প্রতাপশালী প্রাক্তন কমিশনারের আপন ভাগ্নী। থাকে কলকাতারই এক নামজাদা মহিলাদের হোস্টেলে। সে তার প্রেমিকের সঙ্গে রেড রোড ধরে গল্প করতে করতে হাঁটছিল, তখনই ওই অত্যাচারী দুষ্কৃতির দলটা তাদের ঘিরে ধরে টানতে টানতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পেছনে নিয়ে আসে। প্রথমে ওরা চিৎকার করলেও, আশেপাশে কোন লোক না থাকায়, তাঁদের সাহায্যে কেউ আসতে পারেনি। দুষ্কৃতির দল তাঁদের ধমকে বলেছে, তারা পুলিশ, এত রাতে ওরা দুজন কী জন্য রেড রোড ধরে হাঁটছে তার কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য অফিসারের কাছে যেতে হবে। ওরা প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু টানতে টানতে রেড রোডের পশ্চিমদিকে মাঠে নিয়ে গিয়ে তাঁদের দুজনের মুখ বেঁধে ফেলায় ওরা আর চিৎকারও করতে পারেনি। গায়ের জোর দিয়ে ওদের হাত ছাড়িয়ে পালাতেও পারেনি।

মোহনবাগান মাঠের গেটের কাছে ইডেন গার্ডেন্সের মূল গেটের উল্টো দিকে একটা ভ্যান রাখা ছিল, একজন সিপাই ছুটে সেই ভ্যান নিয়ে এল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শেষ গেটের কাছে। তার একশ মিটার আগেই আমাদের পুলিশের তাঁবুতে বহু সার্জেন্ট ও অন্য কর্মী ও

আশেপাশের বহু ক্লাবের সদস্যরা প্রতিদিনের মতো সেদিনও ছিল, কিন্তু তারা কিছু জানল না। যদিও রাজকুমাররা সেই তাঁবুর সামনের রাস্তায় ততক্ষণে নিয়ে এসেছে সবাইকে। প্রাক্তন কমিশনারের ভাগ্নী তাঁর ছত্রখান হয়ে ছিঁড়ে যাওয়া ওড়নাটা দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ ধরে সামলাচ্ছে। রাজকুমার ওকে বারবার বলেছে, "কিছু হবে না, কিছু হবে না। আমরা তো আছি।" কিন্তু রাজকুমারের সান্ত্বনা ওকে কিছুটা আশ্বস্ত করলেও শেষ মুহূর্তে বেঁচে যাওয়ার উত্তেজক নাটকের আবেগ ও এতগুলো পুরুষের সামনে নিজের শরীর উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার লজ্জা এবং অন্যদিকে এই ঘটনা প্রচারের আলোয় চলে আসার আশঙ্কা তাকে অস্থির করে তুলেছে। ঝড়ের গতিতে সমস্ত ঘটনার ঘনঘটায় প্রেমিক ছেলেটাও হতভম্ব। সে শুধু মেয়েটার হাত শক্ত করে ধরে ধীর পায়ে হেঁটে ভ্যানের কাছে এসে হাজির। অল্পবয়সী ছেলে, এই রকম পরিস্থিতি বিচারের ক্ষমতা কোথায়?

তাই সে সিপাই ও আসামীদের সঙ্গে ভ্যানে উঠে গেল। রাজকুমার মেয়েটাকে নিয়ে ভ্যানের সামনে ড্রাইভারের পাশে এসে বসতে ভ্যান ছেড়ে দিল থানার উদ্দেশ্যে।

ভ্যান এসে থানায় থামতে সিপাইরা সবাই মিলে থানার বারান্দায় আসামীদের তুলতেই একটা ছেলে আসামীদের দেখে চিৎকার করে বলে উঠল, "এই তো এরা, গতরাতে এরাই আমাদের সর্বনাশ করেছে।"

রাজকুমার দেখল, সেই ছেলেটা। ওর সাথে দেখা করতে এসেছে। সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "কি এরাই ছিল গতরাতে?" ছেলেটা রাগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এরাই, সঙ্গে ছিল আরও চারজন।" তারপর তিনজনের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে বলল, "এই গোঁফ আমি জীবনে ভুলব না।" সেই লোকটার গোঁফ ঠিক হিন্দি ছবির রাবণের মত। বিরাট, পাকানো।

ছেলেটা রাগে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। একজন তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "স্যার, এদের ছাড়বেন না। ছাড়বেন না।"

ও সি সব শুনে প্রাক্তন কমিশনারের ভাগ্নী ও তার প্রেমিক ছেলেটিকে ছেড়ে দিল যাতে ওই নিয়ে আর হইচই না হয়। ও সি ছেলেটির অনুরোধে একটা সিপাইকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসতে ওরা সেই ট্যাক্সিতে চড়ে চলে গেল। চলে যাওয়ার আগে মেয়েটা তাঁর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ওড়নাটা থানার বারান্দার এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওড়নাটা অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে সবার চোখের সামনে পড়ে রইল।

নিয়ম অনুযায়ী ও সি ফোর্ট উইলিয়মে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খবর পাওয়ার মিনিট পনেরোর মধ্যে এক মেজর পদাধিকারী অফিসার দুজন মিলিটারি পুলিশকে সঙ্গে করে জিপ নিয়ে এসে থানায় হাজির। তিনি ওসি'র কাছে ধরা পড়ার কারণ শুনেই তাঁর জিপ থেকে একটা চাবুক এনে ওদের তিনজনকে এক এক করে টেবিলের ওপর উপুড় করে ফেলে সেই চাবুক দিয়ে এমন মারতে শুরু করলেন, যা দেখে সেখানে উপস্থিত আমাদের অফিসাররা ও অন্যান্য কর্মীরা অবাক হয়ে গেল। মারের ওপর মার। আমাদের লোকেরাই মেজরকে থামাল। আসামী তিনজনের অবস্থা তখন খারাপ। ওরা মেঝেতে হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে রইল।

মেজর সাহেব ও সিকে অনুরোধ করলেন যে তিনি ওই তিনজনকে নিয়ে যেতে চান, সেখানেই ওদের বিচারের ব্যবস্থা করবেন। ও সি মেজরের অনুরোধ রাখতে পারলেন না। কারণ থানায় ততক্ষণে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা লেখা হয়ে গেছে। সেই কথা ও সি মেজর সাহেবকে বললেন। তিনি জানালেন, নিয়ম অনুযায়ী হাকিম সাহেবের অনুমতি নিয়ে তিনি তাদের নিয়ে যেতে পারবেন। মেজর সাহেব চলে গেলেন। ও সি আসামী তিনজনকে লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন আমাদের বড়সাহেবদের সঙ্গে তাঁদের ওপরওয়ালাদের আসামীদের সম্পর্কে

কথাবার্তা হল। সেইমতো মেজর সাহেব প্রেসিডেন্সি বিভাগের হাকিম সাহেবের অনুমতি নিয়ে ধৃত তিনজনকে ফৌজি নিয়ম অনুযায়ী কোর্ট মার্শাল করার জন্য, তাঁদের হেফাজতে নিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার মাস দুয়েকের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র সমেত হেস্টিংস থানায় সাক্ষী দেওয়ার জন্য সমন চলে এল। সাক্ষী দেওয়ার জন্য ডাক এল রাজকুমার, দীপক সিকদার ও সার্জেন্ট দীপঙ্করের নামে। তাছাড়া সোদপুরের ধর্ষিতা মেয়েটি ও তার প্রেমিক ছেলেটিকেও ডাকা হল।

যথা দিনে রাজকুমাররা ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে হাজির। সেখানে গিয়ে তারা দেখল, ভেতরে একটা টিলার ওপর অনেকটা জায়গার মাঝে একটা বাড়ি, সেখানেই কোর্ট মার্শাল হয়। সেখানে কোর্ট সম্পর্কিত লোক ছাড়া অন্য কারও যাওয়ার অনুমতি নেই। কিছুটা দূরে একটা তাঁবু খাটানো, সেখানে আসামী তিনজনকে রাখা হয়। কোর্টঘরের অন্যদিকে একটা ঘরে সোদপুরের মেয়েটাকে ও তাঁর প্রেমিক ছেলেটিকে বসতে দেওয়া হলো। সাক্ষীদের অন্যত্র। তারপর বিচার শুরু হলে প্রথমে আসামীদের হাজির করানো হলো।

বিচারকের আসনে রয়েছেন একজন কর্ণেল পদাধিকারী অফিসার। সঙ্গের জুরিগণও মেজর। অভিযোগের পক্ষে এবং বিপক্ষে সওয়াল ও জেরা করার জন্য যাঁরা রয়েছেন তাঁরাও সব মেজর পদাধিকারী।

কোর্ট মার্শালে বিচার শুরু হল। মোট কুড়ি পঁচিশ দিন টানা বিচার হলো। মেয়েটিকে দুপক্ষের থেকেই জেরা করা হলো। প্রতিদিন পুলিশের সাক্ষী হওয়ার পর তাঁদের প্রত্যেককে পদাধিকার অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করা হতো।

বিচারের শেষ দিনে, লাঞ্চের পর, বিচারকরা ইতিমধ্যে সব সাক্ষী মেয়েটির বক্তব্য শুনে কিছু একটা সন্দেহ করে ধর্ষিতা মেয়েটিকে ডেকে কোর্ট ঘরের পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁরা মেয়েটিকে বললেন, “আপনি যা যা অভিযোগ করেছেন নিশ্চয়ই সত্যি, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে শুধুমাত্র ছিনতাই-ই নয়, আপনাকে চরম লাঞ্ছনা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি? আপনি বলুন, আমাদের অনুমান ঠিক না বেঠিক?”

প্রশ্ন শুনে মেয়েটি কোন কথাই বলতে পারল না। সে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ মাথা নিচু করে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তাঁর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না দেখে বিচারকরা নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কিছু কথা বলে নিলেন। মেয়েটিকে আর বিব্রত না করে কোর্ট মার্শালের বিচারকরা তাকে আর প্রশ্ন না করে ছেড়ে দিলেন। বুঝে গেলেন তাঁদের অনুমানই ঠিক। লোকলজ্জার আতঙ্কে সে আসল তথ্যই গোপন করে গেছে।

বিচারকরা এরপর কোর্টে এসে আসামী তিনজনের সাজা ঘোষণা করলেন। প্রত্যেককেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। এবং দুজনকে সাত বছর করে সশ্রম ও একজনকে তিনবছর কারাদণ্ড দিলেন।

দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কুড়ি পঁচিশ দিনে সাক্ষীদের জেরা, সওয়াল, বিচারের রায় হয়ে গেল। সাধারণ বিচার ব্যবস্থার মতো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আইনের মারপ্যাঁচের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে নাভিশ্বাস ওঠার মতো পরিস্থিতি হলো না। বিলম্বিত লয়ে বিচার যে বিচার ব্যবস্থাটাকেই প্রহসনে পরিণত করে, কোর্ট মার্শালের বিচার দেখার পর আরও বেশি করে অনুভব করা যায়। অবশ্য সব সময় সর্বক্ষেত্রে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করলেই যে যথাযথ আইনের প্রতি মর্যাদা দেওয়া যায়, তেমন কোনও মাপকাঠি নেই। মামলার দ্রুত বিচার নির্ভর করে অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী। কিছু মামলা আইনের শাখাপ্রশাখার গণ্ডির গোলকধাঁধায় পড়ে অতলে তলিয়ে যায়। আবার বহু মামলা পত্রপত্রিকার তুমুল হট্টগোলের তালে পড়ে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে গিয়ে সঠিক এবং সূক্ষ্ম বিচারের এবং ন্যায়দণ্ড পাওয়ার আশায় ব্যাঘাত ঘটায়। অযথা দেরি হলে ঘটনা ঘটার

পারিপার্শ্বিকতা পাল্টে গেলে যোগ্য বিচারেরও ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কোর্ট মার্শালে তিনজনের সাজা হলেও বাকি চারজন ধরাও পড়ল না, সাজাও পেল না। আমাদের হাতে আসামীরা থাকলে আর তাদের ঠিকমত "সেবা" করতে পারলে জানতে পারা যেত বাকি চারজনের নাম। মানবাধিকার কমিশনের রক্তচক্ষুর আড়ালেই তাদের "সেবাযত্ন" করে গ্রেফতার করে ধর্ষণকারীদের সাজাও দেওয়া যেত।

কোর্ট মার্শাল হওয়ার দিন পনেরো পর আমরা দেখলাম মোহনবাগান মাঠের পেছন দিক থেকে ইস্টবেঙ্গল মাঠের র‍্যামপার্টের পেছন পর্যন্ত সিমেন্টের বড় বড় থাম আর কাঁটাতার দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম পুরো ঘেরা হয়ে গেল। যাতে রাতে যখন তখন সেখান থেকে ফৌজি জওয়ানরা বেরিয়ে আসতে না পারে।

তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। পুলিশের দিন কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায়, ব্যস্ততার অলক্ষ্যে টেরও পাওয়া যায় না। রাজকুমারের কাছে হেস্টিংস থানায় দেখা করতে এল সোদপুরের লাঞ্ছিতা মেয়েটি, সঙ্গে তার প্রেমিক। তারা একটা কার্ড বের করে রাজকুমার কে দিল। তাদের বিয়ে। অবশ্যই, যেন রাজকুমাররা উপস্থিত থাকে সেই দিন। লাজুক মুখে মেয়েটি অনুরোধ করল।

রাজকুমার গিয়েছিল। শুভবাসরে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল দম্পতিকে। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার মেয়ের বিয়ের সন্ধ্যায় উজ্জ্বল মুখটা দেখে রাজকুমারের খুবই ভাল লেগেছিল।

কিন্তু আর এক কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার অন্ধকার মুখ দেখে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। মিঃ চক্রবর্তী সদ্য অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার, প্রচণ্ড বিপদে পড়ে আমার এক পরিচিত | ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি লালবাজারে একদিন সকালবেলায় এসেছিলেন। আমি তখন গোয়েন্দা দফতরের গুণ্ডা দমন শাখার অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার।

তিনি বললেন, "বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।" বললাম, "বলুন, আপনার কি কাজে আসতে পারি?" রাশভারি ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত হয়ে মাথা নিচু করে ফেললেন!

বুঝলাম, তিনি আমার কাছে সমস্যার সমাধান খুঁজতে এসেও সমস্যার কারণটা বলতে ইতস্তত করছেন।

আমি অপেক্ষা করলাম, তাকে সময় দিলাম, যাতে তিনি নিজেকে সামলে একটু গুছিয়ে নিতে পারেন। কফি আনালাম। তিনি চুমুক দিয়ে বললেন, "আমার একটাই মেয়ে। পাঞ্চালী এম. এস সি পাশ করে বাড়িতে বসেছিল। একটা ছেলের সঙ্গে বিয়েও সব ঠিকঠাক। ওরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ করে। ছেলেটা ভাল। আমরাও আর আপত্তি করিনি। মাস পাঁচেক আগে ছেলেটাকে তার কোম্পানি এক বছরের জন্য হঠাৎ মাদ্রাজে বদলি করে। তখন ঠিক হয় সে আবার কলকাতায় বছর খানেক পর ফিরে এলে তাদের বিয়ে হবে। ছেলেটা মাদ্রাজ থেকে প্রতি সপ্তাহে আমার মেয়েকে চিঠি দিত। আমার মেয়েও ঠিকমত উত্তর দিত। এভাবে ভালই চলছিল। কিন্তু আমার মেয়ের বাড়িতে বসে বসে আর সময় কাটছিল না। ঠিক করল, একটা চাকরি করবে। সেই অনুযায়ী সে বিভিন্ন পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে নিজেই দরখাস্ত করত। মাস তিনেক আগে বড়বাজার এলাকার এক গুজরাটি মালিকের কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়ে মালিকের পার্সোনাল সেক্রেটারির চাকরি নিল। দশটা পাঁচটা ডিউটি। সন্ধে সাতটার মধ্যে পাঞ্চালী আমাদের লেকটাউনের বাড়িতে ফিরে যেত।"

মিঃ চক্রবর্তী একটানা বলে চুপ করে কফিটা শেষ করলেন। আমিও চুপ করে অপেক্ষা করছি তাঁর সমস্যার কথাটা শোনার। আমার পরিচিত যে ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি এসেছেন তিনিই নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, "এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল, তারপরেই ঝামেলা।"

অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, "কিসের ঝামেলা?" তিনি বললেন, "মাস দেড়েক আগে হঠাৎ একদিন রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরল না।" "ফিরল না?" আমার উদগ্রীব প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "না। পরদিন সকালবেলা মালিক নিজের গাড়িতে আমার মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এলেন। মেয়ে বলল, অফিসের কাজে আটকে দেরি হয়েছিল বলে আসতে পারেনি। ওর কথা শুনে আমার একটা খটকা লাগলেও, ওকে দেখে আমাদের সারারাতের অসম্ভব দুশ্চিন্তা কাটতে, তা নিয়ে আর ওকে প্রশ্ন করলাম না। সেদিন আর অফিস যায়নি। শুয়ে বসে একা একা কাটিয়ে দেয়। তার পরদিন থেকে আবার অবশ্য অফিসে যেতে শুরু করে। কিন্তু চেহারাটা কেমন যেন হয়ে যায়, কিছুটা মনমরা। উদভ্রান্ত। ওর মা কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, কই কিছু হয়নি তো।" জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু সমস্যাটা কোথায়?"

তিনি বললেন, "সমস্যা হচ্ছে, তারপর থেকে সেই ছেলেটার চিঠি এলে সেটা পড়ে, কিন্তু তার কোনও উত্তর পাঠায় না মাদ্রাজে। আর হঠাৎ বলতে শুরু করেছে, আমি ওই ছেলেকে বিয়ে করব না। আমি কোম্পানির মালিককে বিয়ে করব। তাই সে ছেলেটার চিঠির আর উত্তর দিচ্ছে না। ব্যাপারটা আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। কি এমন ঘটনা ঘটল মাস দেড়েকের মধ্যে যে এতদিনের সম্পর্ক যে ছেলের সঙ্গে তাকে .হটিয়ে দিয়ে ওই গুজরাটি ছেলেটাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।"

এক নিঃশ্বাসে ভদ্রলোক তাঁর সমস্যার কথা বলে চুপ করে গেলেন। আমি তাঁর ব্যাকুল,

দিশাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, "আমার কাছে আপনি কি ধরনের সাহায্য চান? এটা তো কোনও মামলা নয়, আর আপনার মেয়েও নাবালিকা নয়।"

তিনি বললেন, "না কোনওটাই নয়, কিন্তু এভাবে তো ছেড়েও দেওয়া যায় না। রহস্যটাও বুঝতে পারছি না। যখনই প্রশ্ন করি কেন তোর পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করবি না, তখনই জেদী গলায় উত্তর দেয়, না তা আর সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, তার কোনও ব্যাখ্যা করে না। আর এখানটাই কেমন আশ্চর্য লাগে। কী হলো ব্যাপারটা, সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা। একটা কিছু উপায় বার করুন। আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।"

মনে মনে ভাবলাম, অর্থাৎ তিনি কালো রুণুকে জেগে উঠতে বলছেন। বললাম, "ঠিক আছে, আপনি যা বললেন তা লিখে দিন, হাতে একটা কিছু কাগজ থাকুক।"

তিনি আমার থেকে কাগজ নিয়ে আমার অফিসে বসেই লিখে দিলেন। গুজরাটি কোম্পানির নাম, ঠিকানা, মালিকের নাম সব লেখার পর আমি কাগজটা হাতে নিয়ে বললাম, "দিন চারেক পর আমার সঙ্গে দেখা করুন। দেখি কী করতে পারি।"

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর আমি ভাল করে নাম, ঠিকানাগুলি দেখে নিলাম। কলকাতার গুজরাটি সমাজে আমার প্রচুর যোগাযোগ। বড়বাজার অঞ্চলে যাঁরা ওঁদের মধ্যে প্রভাবশালী, তাঁদের ক'জনের বাড়িতে পরপর ফোন করে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললাম।

সন্ধেবেলায় একজন একজন করে আমার গুজরাটি বন্ধুরা এসে হাজির। প্রথম জনের কাছ থেকে জানতে চাইলাম, সেই গুজরাটি কোম্পানির মালিক পরেশ পারেখকে সে চেনে কিনা? বন্ধুটি বলল, খুব ভালভাবেই চেনে এবং সে একটা ফার্স্টক্লাস চিটিংবাজ। সুন্দর করে অফিস সাজিয়ে বসেছে, লোকের থেকে অফিস দেখিয়ে টাকা নেয় কিন্তু ফেরৎ দেয় না। বিভিন্ন জিনিস বাজার থেকে কেনে কিন্তু সাপ্লায়ারকে দাম মেটায় না। এটাই ওর ব্যবসা। তাছাড়া সে একটা নারীলোভী শয়তান, যদিও বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক।

আমার দ্বিতীয় গুজরাটি বন্ধুটিও প্রথম জনের মতই ওর চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলল, "সে আমাদের কলকাতার গুজরাটি সমাজের কুলাঙ্গার, ওই ঘাটিয়া লোকটার কোনও দোস্ত নেই আমাদের মধ্যে।"

আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গিয়েছিল ওই দুজনের কথা শুনে। তবু আরও বিস্তারিত জানার জন্য পরদিন ব্যাপকভাবে পরেশ পারেখ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলাম। তাতে আমি জানতে পারলাম, সে কোথায় কোথায় যায়, কার সাথে মেশে, বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক, অফিসে কখন আসে, কখন যায়, ব্যবসাতে সে কাকে কাকে ঠকিয়েছে ইত্যাদি। ইদানীং যে পার্সোনাল সেক্রেটারির সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছে সেই খবরও পেয়ে গেলাম।

সব খবর পাওয়ার পর আমি স্থির সিদ্ধান্তে এলাম যে ছেলেটা মেয়েটাকে বোকা বানাচ্ছে। আর মেয়েটিও ওর পাল্লায় পড়ে নিজের জীবনটা নষ্ট করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না। কালো রুণু জেগে উঠেছে। তাই পরদিনই আমি তার ক্লাইভ রো-র অফিসে হানা দিলাম। অফিস থেকে পারেখ ও পাঞ্চালীকে তুলে নিয়ে এলাম লালবাজারে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়েটি বেশ সুন্দরী, স্মার্ট। গুজরাটি ছেলেটার চল্লিশের ওপর বয়স, ধূর্ত চোখমুখ, দামি ফেডেড জিনসের প্যান্ট, দামি জামা, উড়ু উড়ু ভঙ্গি, পরিষ্কার দাড়ি শেভ করা, উদাসীন ভাবে সুসজ্জিত। কথাবার্তা নরমভাবে নরমসুরে বলে।

তাদের নিয়ে এসে আমার ঘরে বসিয়ে পাঞ্চালীকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কি এই ছেলেটাকে বিয়ে করতে চাও?" সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ।" বললাম, "কিন্তু, কেন?" তার স্পষ্ট জবাব, "সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আপনাকে বলতে যাব কেন?" বললাম, "ও বিবাহিত, তা কি জানো?" "জানি।" পাঞ্চালী একইভাবে উত্তর দিল। "হিন্দু বিবাহ আইন অনুয়ায়ী এক স্ত্রী জীবিত অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে বেআইনী তা নিশ্চয়ই জানা আছে?" আমার

একটু কঠিন গলার উত্তরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, সেটাও সে জানে। এবার একটু মানসিকভাবে নাড়া দেওয়ার জন্য বললাম, "তা হলে সারাজীবন ওর রাখেইল হিসাবে থাকতে চাও?' পাঞ্চালী একটু থমকে গিয়ে কণ্ঠস্বরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর এনে বলল, "প্রয়োজনে তাই-ই থাকব।"

তবে কী, তবে কী? . . . বহু দূর থেকে ঢং ঢং ঢং করে শব্দ ভেসে এল। আমার বুকের ভেতর বেজে উঠল রহস্য উদ্ধারের দিক-নির্দেশিকার ঘণ্টা। আমি পাঞ্চালীর চোখে চোখ রেখে গলায় একটু নরম আবেশ এনে বললাম, "তুমি একে খুব ভালবাস, তাইতো? মাদ্রাজের ছেলেটার থেকেও?"

পাঞ্চালী আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এই প্রথম আচমকা একবার মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড কাটিয়ে মাথা তুলে বলল, "হ্যাঁ।" গলার ঝাঁঝ আর আগের মতো নেই। সময় না দিয়ে আমি আবার কঠিন গলায় বললাম, "তার মানে তুমি একেই বিয়ে করবে, এইটাই তোমার সিদ্ধান্ত? বাবা-মা কারও দিকে না তাকিয়ে এটাই শেষ কথা?"

"হ্যাঁ, বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে এটাই আমার শেষ কথা।" পাঞ্চালীর জবাব শুনে আমি একই গলায় বললাম, "কিন্তু, ও আগে জেল থেকে ছাড়া পাক, তবে তো বিয়ে। ক'বছরে আমার হাত থেকে পার পাবে কোনও ঠিক নেই।"

পারেখ পাঞ্চালীর পাশের চেয়ারে বসে এতক্ষণ শুনছিল। কোনও কথা বলেনি। আমি ইচ্ছে করেই ওকে তার পাশে বসিয়ে রেখেছি যাতে পাঞ্চালীর উত্তরের সময় ওর প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য রাখতে পারি। কিন্তু চিটিংবাজরা যে কোনও পরিস্থিতিতে এত নির্বিকার থাকতে পারে যে ভাবা যায় না। কঠিন অবস্থাও ওরা সহজেই সামাল দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এবার আমার কথা শুনে অত্যন্ত বিনয়ের ভঙ্গিতে আস্তে করে যেন জানতে চাইল, "কিন্তু আমার দোষ কী?" ভাঙ্গা বাংলায় ওর প্রশ্ন শুনে রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠলাম। একটা বিবাহিত লোক নিজের প্রায় অর্ধেক বয়সের একটা ভাল মেয়েকে ফাঁসাতে চাইছে, তারপর আবার জিজ্ঞেস করছে, আমার কসুর কী?

আমি আমার মনের ভেতরের ঘৃণাটা চাপতে পারলাম না। বললাম, "সে মাল তুমি দেখতেই পাবে।" "ওইভাবে বলছেন কেন?" পাঞ্চালী হঠাৎ বলে বসল। রাগ তখন আমার চোখে চলে এসেছে, জোর গলায় বললাম, "চিটিংবাজকে আবার কি ভাবে বলব?" তারপর পারেখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তোমার সব খবর আমি রাখি। কোন কোন কোম্পানিতে মাল নিয়ে টাকা দাওনি তাও জানি।" তারপর সেই সব কোম্পানির নাম ও কত টাকা পারেখ আত্মসাৎ করেছে পরপর বলে গেলাম। পারেখ শুনে একটু চমকে গেলেও মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না।

এসব বলে আমি দ্বৈত চাল চাললাম। একদিকে পাঞ্চালীর মনে পারেখ সম্পর্কে বিরূপ ভাব আনবার চেষ্টা, অন্যদিকে পারেখকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমি আমার রাগ ও ঘৃণাকে আড়াল করলাম না। পাঞ্চালীকে বললাম, "তুমি এখন বাড়ি যেতে পার।" সে পারেখকে দেখিয়ে জানতে চাইল, "ওকে ছাড়বেন না?"

"না, কাল কোর্টে একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। তবে কোনও চান্স নেই। কবে ছাড়ব তারই ঠিক নেই।" আমার কথার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মেয়েটার মুখের ভাষা পড়ে উঠবার আগেই সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পারেখকে বলল, "আমি যাচ্ছি।"

পাঞ্চালী লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের চারতলার গুণ্ডাদমন শাখার বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সিঁড়ির ধাপ থেকে নামতে নামতে নিচে নেমে বেরিয়ে যেতে আমি পারেখকে গোদা বাংলায় বললাম, "তুই কী এই মেয়েটাকে ছাড়বি না?" সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, "হামি কী করেছি স্যার? ওই-তো আমাকে ছাড়ছে না। একটা হেল্পলেস মেয়ে, সহায় চাইছে, কৌন দিকে যাব?"

হেল্পলেস মেয়ে! আশ্রয় চাইছে! পারেখ আমাকেও চিটিংবাজি কথাবার্তা বলে ভুল বোঝাতে চাইছে। ভাব দেখাচ্ছে, কিছু জানি না, বুঝি না, তুলসীপাতা সেজে আমার কাছ থেকে পালাতে চাইছে! তারপর একবার পালাতে পারলে ওই মেয়েটাকে একটা বিয়ে বিয়ে খেলা সাজিয়ে সারাজীবন তাকে রক্ষিতা করে রেখে দেবে।

একটা সংস্কৃতিবান, ভদ্র, অভিজাত, শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের সুন্দরী মেয়েকে এই ছেলেটা কি ভাবে ফাঁসাল তা বুঝতে পারছি না। বিশেষ করে যে মেয়ে নিজেই একটা ভাল ছেলের সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেম করেছে। বিয়েও পাকা। অর্থের ঝনঝনানি দিয়ে তো চট করে অবিবাহিত বাঙালি মেয়েদের ভোলানো যায় না। কী এমন তুক করল যে মেয়েটা প্রেম করা পাকা বিয়ে নস্যাৎ করে এর কাছে রক্ষিতা হিসাবেও থাকতে রাজি? .

আমার সামনে সুবোধ বালকের মত বসে আছে পারেখ। কোনও কথারই সঠিক উত্তর দিচ্ছে না। বুঝে গেছি রহস্যের কথা সোজাসুজি বলবে না। আর টাটকা একটা মেয়েকে ভোগ করার ইচ্ছাও ছাড়বে না। হঠাৎ মেয়েটার বাবার কাতর মুখটা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক কনস্টেবলের নাম ধরে হাঁক পাড়লাম। সে মুহূর্তের মধ্যে হাজির। বললাম, "দরজাটা ভেজিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক।

আমি একে বেবুন বানাব।" কনস্টেবল আমার কথাটার অর্থ বুঝে চেম্বারের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তখন "বেবুন" কথাটা খুব চালু ছিল আমাদের মধ্যে। "বেবুন বানানোর" অর্থ পশ্চাদ্দেশে ডাণ্ডা দিয়ে মেরে বেবুনের মতো পেছনটা লাল করে দেওয়া।

কনস্টেবল' দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর আমি একটা রুল নিয়ে টেবিলের উল্টো দিকে এসে গুজরাটি ছেলেটার চুল ধরে টেনে দাঁড় করাতেই, সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি দেরি না করে চুল টেনে ওকে টেবিলের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে ওর পাছায় রুলের বাড়ি মারতে শুরু করতে সে চিৎকার করতে লাগল। গোটা দশেক ঘা খেয়েই বলল, "স্যার বলছি, বলছি, সব বলছি, আর মারবেন না।" আমি থেমে গিয়ে বললাম, "সত্যি কথা বলবি তো, নাকি, পুরো বেবুন বানাব।"

আমার কথা শুনে ছেলেটা আঁৎকে উঠে বলল, "না স্যার, একটাও ঝুট বলব না। তবে দয়া করে আমায় মাফ করে দিন।" ধমকে উঠে বললাম, "আগে বল, তারপর মাফের কথা বলবি।"

টেবিল থেকে নেমে ছেলেটা বলতে লাগল, "স্যার, তিন মাহিনা আগে ও আমার কাছে চাকরি করতে আসে। আচ্ছা লেড়কি। ভালো মেয়ে। কাজও ভালো করত। দেড় মাস আগে আমি পার্ক স্ট্রিটের পার্ক হোটেলে ব্যবসাকে লিয়ে একটা স্যুইট বুক করে পার্টি দিলাম। সেখানে ওকে জিন দিলাম। ও কিন্তু খেতে চাইল না। আমি বললাম, পার্টিতে খেতে হয়। নয়ত সবাই গাঁওয়ালি ভাববে। তখন ও আর বিরোধ করল না। আমার সাথে জিন খেল।" বললাম, "তারপর?"

পারেখ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। ধমকে বললাম, "কি হলো চুপ করে আছিস কেন?" উত্তরে সে আমায় মিনমিনে গলায় প্রশ্ন করল, "হামাকে আর ধোলাই দেবেন না তো?" "হ্যাঁ" বললে ছেলেটা এখন মিথ্যা শুরু করে দেবে। তাই মুখে বললাম, "না, সত্যি বললে কিছু বলব না, ধোলাইও দেবো না।"

"ওর জিনের মধ্যে আমি নিদ কা ট্যাবলেট দিয়ে দিয়েছিলাম, তাই দু পেগ খেয়েই ও একটা চেয়ারে বসে যেতে আমি তাড়াতাড়ি পার্টি শেষ করে দিলাম। সবাই চলে যেতে পাঞ্চালীকে আরও এক পেগ জিন ট্যাবলেটের সঙ্গে দিয়ে বললাম, এটা খাও। ঠিক হয়ে যাবে। দাওয়াই দিয়ে দিয়েছি। ও খেতে চাইল না। আমি জোর করতে খেল। তখন ওকে বিছতারে মে শুইয়ে দিলাম।" মাথা নিচু রেখেই পারেখ বলল। যেন কত লজ্জা পাচ্ছে! প্রশ্ন করলাম, "তার আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলি?" মাথা নেড়ে স্বীকার করতে আমি

বললাম, "তারপর?"

"সারারাত ও ওখানেই ছিল" পারেখ বলল। "একা একা?" আমার প্রশ্নের উত্তরে কোনও কথাই বলছে না দেখে আমি চিৎকার করে উঠে বললাম, "কি রে, চুপ করে আছিস কেন? একা একা ছিল?" আমার প্রচণ্ড চিৎকারে পারেখ উঠে বলে ফেলল, "নহি, হামি ছিলাম।" "অন্য কাউকে নিয়ে যাসনি?" সাধু সাধু মুখ করে সে উত্তর দিল, "বিশ্বাস কিজিয়ে আর কাউকে লিয়ে যাইনি।"

যেন কত ভাল কাজ করেছে অন্য কাউকে নিয়ে না গিয়ে। বললাম, "নিজেই সারারাত মেয়েটার উপর অত্যাচার চালালি?" উত্তর দিল না। আমি গর্জন করে উঠতেই থতমত খেয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ।" হাত আমার আবার নিশপিশ করতে লাগল। মুঠি আলগা করে ক্রোধ সামাল দিয়ে বললাম, "বলে যা।"

"সকালে নিদসে সে ওঠার পর অবাক হয়ে হামার তরফ দেখতে হামি বললাম, জো হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন বাড়ি চল, হামি পৌঁছে দিচ্ছি। গাড়িতে ও রোতে রোতে গেল। হামি বলে দিলাম, বাড়িতে বলবে, অফিসের কামে ফেঁসে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে ও চলে গেল। সেদিন আর অফিসে এল না। ভাবলাম, আর আসবে না। কিন্তু তারপর দিন এসে বলল, হামাকে তোমার শাদি করতে হবে। হামি আর কি করি, বলে দিলাম, ঠিক আছে।" চুপ করে গেল পারেখ।

'তোর কি অশেষ দয়া রে! তারপর থেকে চালিয়ে গেলি যা খুশি তাই।" রেগে গিয়ে বলে উঠলাম। "না, স্যার, আর কিছু করিনি। বিশোয়াস করুন।"

"বিশ্বাস তো তোকেই করতে হয়!" রুলটা নিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছে এসে ওকে টেনে তুলে আবার মারলাম ওর পশ্চাদ্দেশে। তারপর ওকে পাঠিয়ে দিলাম লালবাজারের লক আপে।

পরদিন একটা চুরির মামলায় ওর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন একটা অন্য মামলায় ওকে আসামী করে আদালত থেকে সাতদিনের জন্য আমাদের হেফাজতে রাখবার আদেশ নিয়ে এলাম।

মামলা করে আদালত থেকে তো আর ওকে সাজা দেওয়া যাবে না। কারণ ওর বিরুদ্ধে তো কোনও ধর্ষণের মামলা হয় নি। আবার পাঞ্চালী কোনও অভিযোগই করেনি সম্মান ও লোকলজ্জার ভয়ে। কিন্তু সুযোগ নিয়ে ছেলেটা একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে, ওকে বিনা সাজাতেই ছেড়ে দিলে আরও কত মেয়ের এই ভাবে সর্বনাশ করবে, কে জানে। যদিও ঘটনা জানার পর আমরাও নিজেদের তরফ থেকে ছেলেটার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা শুরু করতে পারতাম। তাতে একদিকে মেয়েটার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, যা সে করবে কিনা জানি না। অন্যদিকে, এ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে, পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়ে গেলে কেচ্ছা কেলেঙ্কারি জানার জন্য উন্মুখ জনতা এই ঘটনা গিলে ফেললে, তাকে কচলিয়ে কচলিয়ে তেতো করে লতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে, চরিত্রে কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে মিথ্যাকে সত্যে পর্যবসিত করলে মেয়েটার বাকি জীবনে একটা অন্ধকার নেমে আসার প্রবল সম্ভাবনা আছে। সেদিকে না গিয়ে তাই আমি ঠিক করলাম, অন্য মামলায় জড়িয়ে যতদিন আমাদের লক আপে রাখা যায় সেই চেষ্টাই করব। এমনভাবে ওকে শায়েস্তা করতে হবে যাতে সারাজীবন মনে রাখে।

নির্দিষ্ট দিনে পাঞ্চালীর বাবা এলে আমি তাঁকে আসল রহস্য সম্বন্ধে কোনও কথাই 'বললাম না। পারেখ যে আমার হেফাজতে তাও বললাম না। শুধু বললাম, পরদিন তাঁর মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসতে।

তিনি মেয়েকে নিয়ে এলেন। তাকে বললাম, "আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।" তিনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে তাকে প্রশ্ন করলাম, "কি, মনের কোনও পরিবর্তন হয়েছে?" পাঞ্চালী দৃঢ় স্বরেই বলল, "পরিবর্তন কিসের? আমি কি শিশু?" বললাম,

"না, না, শিশু হবে কেন,' আমি কি তাই বলেছি? বলছি, যদি এর মধ্যে নিজের ভুল কিছু বুঝতে পারো, আর তার জন্য যদি মনের পরিবর্তন হয়ে থাকে।" সে প্রশ্ন করল, "ভুল কিসের?" আমি হেসে বললাম, "ভুল হচ্ছে, তুমি ভেবেছো হোটেলে সেদিন পারেখ তোমার সব লুট করেছে।" কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই আমি ওর মুখের দিকে পলকহীন ভাবে তাকিয়ে আছি।

আমার কথাটা শুনেই ওর ভ্রূ কুঁচকে গেল। ও কিছু বলার আগেই নিচুস্বরে আমি বললাম, "আমি সব জানি। তোমার সর্বনাশ করতেই চেয়েছিল, কিন্তু ও নিজেই এত মদ খেয়ে ফেলেছিল যে কিছু করার আগেই বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

আস্তে কেটে কেটে পাঞ্চালী বলল, "আমি একটা মেয়ে, আমি জানব না? আপনার কথা বিশ্বাস করা কঠিন।" "তাই-ই যদি না হতো তবে আমি জানবো কি করে?" আমিও ওর দিকে ঝুঁকে চাপা স্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম। "ও সেদিন পারেনি বলে এখনও আফশোষ করছে। একটা শয়তান, মাতাল, বিশ্বাসঘাতককে তুমি বিয়ে করতে চাও?"

"আমি অপবিত্র হইনি? কিন্তু, কিন্তু, আমি তো সেদিন পুরোপুরি ঘুমিয়েও পড়িনি, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। অথচ বলছেন খারাপ কিছু হয়নি।" ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে বসল। "না-না। হয়নি।" আমি দৃঢ়স্বরে বললাম। একটা ঘোর লাগা মুখ করে মেয়েটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম, "কি হলো?" "না, ভেবে দেখি। এখন চলি।" মাথা নিচু করে পাঞ্চালী আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর মনে যে আমি ধন্দ লাগিয়ে দিতে পেরেছি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এই ধন্দটা লাগাতে পেরেছি বলে ও একবারও গুজরাটি ছেলেটার কথা জিজ্ঞেস করল না। সেদিন হোটেলে মেয়েটা ধর্ষিত হবার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং ঘুম থেকে উঠে বুঝেই গিয়েছিল যে সে "অপবিত্র" হয়ে গেছে। একটা মেয়ে ধর্ষিতা হলে সে তো শারীরিক ভাবে বুঝবেই যে সে ধর্ষিতা হয়েছে, বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা তো বুঝবেই। সেদিক দিয়ে সেদিন তার ঘুম ভাঙ্গার পর নিজের শারীরিক অবস্থা থেকে যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গিয়েছিল। আর তখন থেকেই সে মানসিকভাবে নিজেকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তার যা হবার হবে, কিন্তু সে তার প্রেমিককে ধোঁকা দিতে পারবে না।

ওর চিন্তার মধ্যে একটা 'কিন্তু' যে ঢুকিয়ে আমি নাড়া দিতে পেরেছি, এতেই আমি ওর বিপর্যয়ের থেকে মুক্তির পথের রেখা দেখতে পারছি। আর একটা ব্যাপার আমার কাছে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে মেয়েটা তার প্রেমিককে এখনও প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে। আর সেই ভালবাসা থেকেই জন্ম নিয়েছে তার কঠিন সিদ্ধান্ত যে "অপবিত্র" শরীরটা নিয়ে সে আর তার প্রেমিককে বিয়ে করবে না। বরং তার শরীর "অপবিত্র" করার জন্য যে দায়ী তাকেই সে বিয়ে করবে। পাঞ্চালীর এই একগুঁয়ে সিদ্ধান্ত চিটিংবাজ পারেখকে তার ছলকলা করতে সুবিধা করে দিয়েছিল।

পাঞ্চালী বেরিয়ে যেতেই আমি তার বাবাকে ডেকে পাঠালাম। তিনি আসতেই তাকে বললাম, "মাদ্রাজের ছেলেটার সঙ্গে যোগাযোগ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কলকাতায় আসতে বলুন। এটা যেন আপনার মেয়ে না জানে। আর ছেলেটা এলেই তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে।" তারপর প্রশ্ন করলেন, "উপায় বার হয়েছে কি?" হেসে বললাম, "বার তো একটা করতেই হবে।" "কিন্তু ওই মালিকটা?" তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, "জীবনে যেন আপনার মেয়ের মুখের দিকে না তাকায় তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু—" "কিন্তু কি?" তাঁর ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে বললাম, "আপনাকে যা বলেছি সেটা করুন, আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি চলে গেলেন।

তিন দিন চলে গেল। চারদিনের দিন মিঃ চক্রবর্তী একটা ঝকমকে চেহারার ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির। এ কদিন আমি রুটিন করে পারেখকে আমার ঘরে নিয়ে এসে কয়েকটা করে ডাণ্ডার বাড়ি মেরেছি। কারণ আমি জানি ওকে তো ফালতু মামলায় জড়িয়ে বেশিদিন

আমাদের হেফাজতে রাখতে পারব না। কিন্তু একটা সরল ভাল মেয়েকে যে সে ষড়যন্ত্র করে সারারাত ধরে ধর্ষণ করল তার জন্য যে সাজাটা তার প্রাপ্য সেটার কি হবে? তাই ওকে রুটিন করে মার। রুটিন মারের মধ্যে একটা জিনিস নিশ্চিত করতে চাইলাম, বাইরে বেরিয়ে এবার কোনও মেয়ের দিকে তাকানোর আগে সে নিজে একবার তার পশ্চাদ্দেশে হাত বুলিয়ে নেবে।

অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস ভদ্রলোক ঝকমকে ছেলেটাকে নিয়ে আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদ্রাজ থেকে আজই কলকাতায় এসেছে। পাঞ্চালী এখনও জানে না সে এখন কলকাতায়। ছেলেটাকে দেখেই আমার ভাল লেগে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে ছেলেটা খুবই নম্রভাবে প্রশ্ন করল, "আমায় ডেকেছেন স্যার?" ওর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য বললাম, "কোনও স্যার-ট্যার নয়, শুধু দাদা, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো, তাই তোমাকে আমি তুমি বলে সম্বোধন করে ফেললাম, কিছু মনে করো না।" ছেলেটা সপ্রতিভভাবে বলল, "মনে করব? একশবার বলবেন। আমার নাম সিদ্ধার্থ, ওই নামেই ডাকবেন।" হেসে বললাম, "ঠিক আছে।" তারপর আমি সিদ্ধার্থকে দেখিয়ে মিঃ চক্রবর্তীকে বললাম, "ওর সাথে আমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে।" ভদ্রলোক আমার ইশারা বুঝতেই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বেরিয়ে যেতে আমি সিদ্ধার্থকে বললাম, "আমি কী প্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই তা কী তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ?" সে বলল, "পেরেছি, তাছাড়া শুনেছি কিছুটা।" বললাম, "শুনেছ যখন ভালই হয়েছে।" তারপর মেয়েটার নাম করে বললাম, "ও তোমার সঙ্গে মাস দেড়েক যোগাযোগ রাখছে না, চিঠির উত্তর দিচ্ছে না কেন তা কী তুমি জানো?" "না।"

ওর জবাবের উপরই বললাম, "ও আসলে একটা বিপদে পড়েছে, আর সেই বিপদ থেকে তুমিই ওকে উদ্ধার করতে পারো। ও তোমাকে ভীষণ ভালবাসে, তাই তোমাকে তার বিপদের কথা বলতে পারেনি বলে তোমার সঙ্গেও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল, এখন তুমি কী ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে না?"

"নিশ্চয়ই করব। এমন কোন বিপদ আমাকে বলুন।" ছেলেটা দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল। ওর এই উত্তরটাই আমি চেয়েছিলাম। যে কোনও তরুণ প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বিপদের থেকে উদ্ধার করতেই চায়। এই ছেলেটাও তার ব্যতিক্রম নয়। ওর মনের ঠিক জায়গাটা আঘাত করে সেন্টিমেন্টের দরজাটা খুলে দিয়ে ওকে আমি ওর প্রেমিকা ওকে চিঠির উত্তর দেওয়া কেন বন্ধ করে দিয়েছে তার পুরো ঘটনাটা বললাম।

শুধু মেয়েটা যে সারারাত ধরে হোটেলের ঘরে নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্ষিতা হয়েছে তা বললাম না। সব শুনে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, "তারপর?" আমি খুব মোলায়েম করে বললাম, "তখন থেকে মেয়েটা ভেবে যাচ্ছে যে সে 'অপবিত্র', সুতরাং তোমায় বিয়ে করবে না। তোমার প্রতি ওর প্রচণ্ড ভালবাসা থেকেই ওর এই মনোভাব, তা তুমি বুঝতেই পারছ নিশ্চয়। আর যদি ও চরম লাঞ্ছিতও হতো তবে কী তুমি ওকে বিয়ে করতে না?" সে দৃপ্তস্বরে বলল, "নিশ্চয়ই করতাম। ওর তো কোনও দোষ নেই। আমার ভালবাসা এত ঠুনকো নয়। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।" "সে জন্যই তো তোমায় ডেকে এনেছি। আর শোন, আমাদের মধ্যে যা কথা হলো এটা যেন কেউ না জানতে পারে। এখন তুমি মিঃ চক্রবর্তীকে ডাকো।" সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে মিঃ চক্রবর্তীকে ডেকে নিয়ে এল।

তাঁকে বললাম, "আগামীকাল মেয়েকে নিয়ে এখানে আসবেন। আর আজ যে আপনারা এসেছিলেন তা ওকে বলবেন না।" তারপর সিদ্ধার্থকে বললাম, "তুমি ওরা আসার ঠিক আধ ঘণ্টা পর আসবে।" দুজনেই আমার কথা শুনে চলে গেল।

নির্দিষ্ট সময়ে বাপ-মেয়ে হাজির। আমি বাবাকে বাইরে বসিয়ে মেয়েকে আমার সামনের

চেয়ারে বসালাম। মেয়েটার চেহারা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ওর মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। হাল্কা প্রসাধন করে এসেছে তাই চোখ মুখের উদ্বেগের দাগগুলি ঢাকা পড়েনি।

প্রশ্ন করলাম, ভাবলে?" পাঞ্চালী উদভ্রান্তের মতো বলে উঠল,

"বুঝতে পারছি না। কী করব?" ধন্ধ ওর এখনও পুরোপুরি কাটেনি, কাটাটা ওর পক্ষে সত্যিই কঠিন, তাই চিন্তার একটা দিক বন্ধ করে দিতে শক্ত কণ্ঠে বললাম, "দেখ, আমি যা ব্যবস্থা করেছি তাতে পারেখ কবে ছাড়া পাবে ঠিক নেই, তাছাড়া, ছাড়া পেলেও সে কোনদিনও তোমার মুখের দিকে তাকাবে না। সুতরাং ওর কথা তুমি ভুলে যাও। তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, একটা নচ্ছার লোককে বিয়ে করার কথা ভাবো কী করে?" "কিন্তু আমি ভুলব কী করে? আমি যে।" মেয়েটা বিড়বিড় করে বলতেই আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তোমার কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। ওই রাতের কথা মন থেকে মুছে ফেলো, তুমি আগেও যা ছিলে, এখনও তাই আছ।" মেয়েটা ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল, "আপনি সত্যি বলছেন?" "মিথ্যে বলে আমার লাভ?" ওকে পাল্টা প্রশ্ন করতে সে চুপ করে গেল। '

পাঞ্চালীকে একটু একা থাকার সুযোগ দিতে, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতেই দেখি সিদ্ধার্থ বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলছে। 'আমাকে দেখে হাসল। বললাম, "এসে গেছ? ভেতরে এস।"

ওকে নিয়ে আমি ঘরে আসতে পাঞ্চালী মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে দেখতেই সিদ্ধার্থকে দেখে চমকে উঠে অবাক। ঝিলিক দিয়ে মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যা আমার চোখ এড়াল না। অবাক চোখে তাকিয়ে তাকে বলল, "তুমি, এখানে?" সিদ্ধার্থ হেসে উত্তর দিল, "কেন আসতে পারি না? তুমি বিপদে আর আমি আসব না?" মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি বিপদে পড়েছি তোমায় কে বলল?"

আমি বললাম, "আমি।"

তারপর ওদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে নিভৃতে পুরনো প্রেমের টানটা সজীব করে তোলার জন্য বললাম, "আমি একটু আসছি, তোমরা বসো।" ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মেয়েটির চিন্তান্বিত বাবাকে বললাম, "ঘাবড়াবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে আশা করি।"

আমি সময় কাটানোর জন্য আমাদের বিভাগে এদিক ওদিক মিনিট পনেরো-কুড়ি ঘুরে ফিরে এলাম আমার ঘরে। আমি ঢুকতেই সিদ্ধার্থ বলে উঠল, "আমাদের কথা হয়ে গেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়েটা সেরে ফেলব।" পাঞ্চালী মাথা নিচু করে আছে। সিদ্ধার্থের ঠোঁটে অল্প হাসি ঝুলছে।

ওদের দেখে আমার খুব ভাল লাগল, মনে মনে খুব খুশি হলাম। আমি হেসে সিদ্ধার্থর সিদ্ধান্তের উত্তরে বললাম, "ভেরি গুড। এই তো চাই। দাঁড়াও আমি তোমাদের বাবাকে ডাকছি, ভাল খবরটা ওঁকে শোনাই।" আমি ঘুরে বারান্দায় গিয়ে ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এসে ছেলেটাকে বললাম, "খবরটা শোনাও।" সিদ্ধার্থকে এই প্রথম লাজুক হতে দেখলাম।

তখন আমিই ওর উদ্ধারকর্তা হিসাবে ওর হবু শ্বশুরমশাইকে বললাম,

"ওরা বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করুন।" ভদ্রলোক ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেলেন। তারপর আবেগতাড়িত হয়ে দুহাত দিয়ে আমার ডানহাতটা চেপে ধরে বলে উঠলেন, "আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেবো, ভেবে পাচ্ছি না।"

বললাম, "না, না। এতে ধন্যবাদের কী আছে? আপনি ওদের নিয়ে বাড়ি যান। তাড়াতাড়ি বিয়ের দিনটা ঠিক করুন।" মেয়েটা আমার মুখের দিকে একবার তাকাল, হঠাৎ মনে হলো, ওর চোখের কোণায় হীরের দুটো বিন্দু। ওরা তিনজন চলে গেল।

দিন পনেরো পর পারেখকে আদালত থেকে জামিনের আদেশ নিতে বলে সেই অনুযায়ী তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ছাড়ার আগে লালবাজারে ডেকে আনালাম পারেখের স্ত্রী ও শ্বশুরমশাইকে। স্ত্রী ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ছোট, বাবার কীর্তি

সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই হয়নি। ওরা আসার পর পারেখকে ডেকে আমার চেম্বারে নিয়ে এলাম। তারপর স্ত্রী ও শ্বশুরমশাইয়ের সামনেও ওকে ধমকালাম। স্ত্রীকে বললাম, "এবারের মতো ওকে ছেড়ে দিলাম, সাবধানে রাখবেন, আর যেন কোনও খারাপ কাজ না করে, তখন কিন্তু ছাড়ব না।" পারেখের স্ত্রী কেঁদে ফেলে বলল, "হুজুর এটা ওকেই বলুন।" বললাম, "ঠিক আছে, তোমরা একটু বাইরে যাও, পারেখ যাচ্ছে।" স্ত্রী ছেলে ও বাবাকে নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলে আমি পারেখকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী আর কোনও দিন কোনও মেয়ের সর্বনাশ করবি?" সে তার পশ্চাদ্দেশে একবার হাত বুলিয়ে নিল দেখলাম। তারপর মাথা নিচু করে কেঁদে ফেলে বলল, "কভি নেহি। কোই মেয়ের সঙ্গে কথা করব না।" ওর পশ্চাদ্দেশে হাত বোলানো দেখে হাসি এসে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা ওর সামনে প্রকাশ না করে গম্ভীরস্বরে বললাম, "ঠিক আছে, যা। আর যেন আমার কাছে না আসতে হয়, তেমনভাবে চলবি।" পারেখ যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেল। "ঠিক হ্যায় স্যার, ঠিক হ্যায়" বলতে বলতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

কদিন পর মেয়ের বাবা খুশি মুখ নিয়ে আবার আমার কাছে এলেন। একেবারে মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে। আমি গিয়েছিলাম। ছেলে আর মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছি। পরে শুনেছি ওরা খুবই সুখে আছে, নতুন এক ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে!

সুখ! ছোট্ট একটা শব্দ। অথচ কি বিরাট ব্যাপ্তি। আলেয়া। যে আলেয়ার পেছনে সবাই ছুটছি। মানুষের কীসে যে সুখ | হয় কিসে যে হয় না তার পরিমাপ করার কোনও যন্ত্র নেই। থাকলে অন্তত বোঝা যেত কে কতটা সুখী, কে নয়। কার আরও কতটা দরকার, কার আর নয়। হায়রে মানুষ, সুখের সন্ধানে তুই খুন করিস, জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি, প্রকৃতির হৃদয়, নিজের আপনজন, এমন কি নিজেকেও।

কাশীপুর রোডের ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির স্টাফ কোয়ার্টারের অনেকগুলো বাড়ি। তেমনই এক বাড়ির দোতলায় একটা একঘর বিশিষ্ট ফ্ল্যাটে থাকতো সমর দত্ত। ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজা। দরজার উল্টোদিকে রান্নাঘর, রান্নাঘরে যাওয়ার ছোট ফালিটার বাঁদিকে শোওয়ার ঘর, ওই ঘরের বাইরের দিকটায় একটা ঝুল বারান্দা আর শোওয়ার ঘরের উল্টো দিকে বাথরুম।

সমর দত্ত ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কর্মচারী ছিল না। তাঁর বাগবাজার অঞ্চলে একটা পৈতৃক রেশন দোকান ছিল, সেটা সে চালাতো। পৈতৃক বাড়িও বাগবাজারে, সেখানকারই পাশের পাড়া কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিটের মেয়ে ঝর্ণার সঙ্গে তার প্রেম হয়। তাকেই কলকাতার জ্যোতি সিনেমার পাশে এক বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিসে বাড়ির কারও অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে মাস আটেক আগে ওই ফ্ল্যাটে দুজনে এসে উঠেছে। ওই ফ্ল্যাটে আসার আগে বিয়ের পরই প্রথমে অল্প ক'দিনের জন্য তারা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাবিলদার এক দাদার ব্যারাকপুরের বাড়িতে বাস করে। তারপর তারা বরাহনগরের একটা বস্তিতে ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির জল পাওয়া যেত না। একটা পাতকূয়া ছিল, যা বস্তির সমস্ত বাসিন্দারাই ব্যবহার করত। সেজন্য সেখানে প্রত্যেক পরিবার আলাদা আলাদা ভাবে পাতকূয়ার থেকে জল তুলবার জন্য বালতি ও দড়ি রাখত। সেই বস্তিতে বাস করতে ঝর্ণার খুব কষ্ট হতো। সে ছিল বেশ ধনী পরিবারের মেয়ে। সমর তাই খোঁজ করছিল অন্য ভাল পরিবেশে ভাল জায়গায় যাওয়ার।

তার সঙ্গে যুগান্তর পত্রিকার কর্মী সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় ছিল। ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ফ্ল্যাটটা ওই সুধীরবাবুরই ছিল। সুধীরবাবু বাগবাজারে পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন। তিনি তাই ফ্ল্যাটটা সমরকে ভাড়া দিয়ে দিলেন। সমর তখন বরাহনগরের বস্তির ঘর ছেড়ে উঠে এল কাশীপুরের ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ফ্ল্যাটে।

বেঁটে, ফর্সা, গাট্টাগোট্টা সমর দত্তের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। তার স্ত্রীর বয়সও ত্রিশের আশেপাশে। সুন্দরী। সমরের সমান উচ্চতার বাঙালি আটপৌরে মেয়ে চুপচাপই থাকে, ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য দু-একজন বৌ মেয়ের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে মেলামেশাও করে না। সে আবার অতি সাবধানী।

ফ্ল্যাটে কেউ এসে সদর দরজা খোলার জন্য কলিংবেল বাজালেও দরজা খোলে না। বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দরজার দিকটা উঁকি মেরে দেখে নেয় কে এসেছে, পরিচিত হলে খোলে, নয়তো নয়। এমন কি সমর যখন বাড়ি ফিরে কলিংবেল বাজিয়ে "আমি এসেছি, দরজা খোল" বলে হাঁক দেয়, তখনও ওর স্ত্রী বারান্দা দিয়ে ওকে দেখে নেয়। এই নিয়ে সমর প্রশ্ন করলে, ঝর্ণা হেসে উত্তর দেয়, "বড় বড় কমেডিয়ানরা যে মিমিক্রি করে, অন্যের গলা নকল করে অভিনয় করে দেখনি? তেমনও তো কেউ তোমার গলা নকল করে বলতে পারে, আমি এসেছি, দরজা খোল। কী দরকার বাবা ফালতু বিপদের, তাই দেখে নিই।" সমর আর কোনও কথা বাড়ায় না।

ওই কোয়ার্টার কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা ক্লাব আছে। তারা গানের একটা জলসার আয়োজন করেছে। দু তিনবার সমরের কাছে সেই জন্য চাঁদা চাইতে গেছে। কিন্তু সমর ওদের প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছিল, ব্যবহারও ভাল করেনি। তাতে সমরের মনটা খচখচ

করছিল। নতুন এলাকায় এসেছে, ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে ওইভাবে ব্যবহার করা ঠিক হয়নি, তার ওপর স্ত্রী একলা থাকে, এই সব ভাবনা সে দুদিন ধরে ভাবতে থাকে।

সন্ধে সাড়ে ছটা থেকে লোডশেডিং। সমর সন্ধ্যে আটটায় সময় বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখে ক্লাবে ছেলেরা বসে আছে। সে গুটিগুটি পায়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। ক্লাবের ছেলেরা তো ওকে দেখে অবাক। কারণ তার ব্যবহারে ওরা ওকে 'ছাট' হিসাবে ধরে নিয়েছে। সমর সেখানে গিয়ে তাদের বলে, "কি ব্যাপার, তোমরা তো আর আমার কাছে চাঁদা নিতে গেলে না?" ওদের একজন একটু আমতা আমতা করে বলে, "হ্যাঁ, যেতাম, কিন্তু... সমর হেসে বলে, "এতে কিন্তুর কি আছে, চলে এস।" তারপর সমর ওদের সাথে জলসা সম্পর্কিত আড্ডায় মেতে যায়। আড্ডা মারতে মারতে মাঝেমাঝেই নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায়, বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা দেখে নেয়। সাড়ে আটটা নাগাদ আলো চলে আসে।

আলো আসার কিছুক্ষণ পর সমর ক্লাবের ছেলেদের থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে যায়। ফ্ল্যাটের সামনে এসে সে আশ্চর্য হয়ে যায় দরজা খোলা। যা কখনও হয় না। সে সিঁড়ির উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দিকে দেখে, ওই ফ্ল্যাটে তার স্ত্রী গিয়েছে কিনা। না, ওই ফ্ল্যাটেরও দরজা বন্ধ। সে আস্তে দরজার কপাট দুটো ঠেলে ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে ফালি মতো জায়গাটার আলো জ্বালাতেই চিৎকার করে ওঠে।

সমর দেখে তার সুন্দরী স্ত্রীর শরীর পড়ে আছে বাথরুমের ভেতরে অর্ধেক, আর বাইরে অর্ধেক। গলায় একটা বেশ বড় নাইলনের মোটা দড়ি জড়ানো, দড়িটা সে চেনে, বরাহনগরে বস্তিতে থাকার সময় পাতকূয়ার থেকে জল তুলবার জন্য কিনেছিল। আর একটা ভোজালি বসানো আছে গলাতেই। রক্তে ভেসে গেছে বাথরুমের মেঝে। নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেছে তার স্ত্রী।

সমরের খুন-খুন-খুন চিৎকারে আশেপাশের ফ্ল্যাটের বহু মানুষই হাজির। হাজির ক্লাবের ছেলেরাও। সমরকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। তার পাগলের মত শোকোচ্ছ্বাস আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ওকে জাপটে ধরে আছে সদ্য বন্ধুত্ব হওয়া ক্লাবের ছেলেরা। তাদের মধ্যে থেকে কে একজন জোরে বলে উঠল, "ধরবেন না, ধরবেন না।" দেখা গেল, সমরের পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা ঝর্ণার আলুথালু হয়ে যাওয়া বেশ ঠিক করতে গিয়েছিলেন। ছেলেটার সাবধানবাণীতে তিনিও পিছিয়ে এলেন।

কাশীপুর থানায় ফোন এসে গিয়েছিল। থানা থেকে দারোগাবাবু সমেত কয়েকজন ঘটনাস্থলে হাজির। তারা ফ্ল্যাট থেকে ভিড় কমিয়ে দিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে কাশীপুর থানা থেকে আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে খবর পৌঁছে গেছে। সেখানে তৎকালীন উত্তর কলকাতার ডিসি সুবিমল দাশগুপ্ত ও ডিসি, ডিডি কমলেশ রায়ের নেতৃত্বে কজনের তদন্তকারী দল ছুটল।

তারা পৌঁছে মৃতদেহের ফটো তুলে, ভোজালী, দড়ির ছাপ নেওয়ার পর সন্তর্পণে তা খুলে, দেহ পাঠিয়ে দিল ময়না তদন্তে। তারা দেখল মৃতদেহের চারপাশে ও ফ্ল্যাটের ভেতরের বারান্দায় খুনি ঝর্ণাকে খুন করার পর কেরোসিন তেল ঢেলে ছড়িয়ে দিয়েছে। যাতে খুনির গতিপথ পুলিশের কুকুর গন্ধ শুঁকে না বার করতে পারে। তাতে বোঝা গেল খুনি ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পনা মাফিক খুন করেছে। ঝর্নার কানের তলায় দুলের প্যাঁচানো অংশটা পাওয়া গেল অর্থাৎ খুনি খুন করার পর টান দিয়ে স্কুল খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। আমাদের দলের অফিসার দীপক রায়, স্বদেশ রায় চৌধুরীরা ওদের শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল, ঘরে আছে একটা খাট, ড্রেসিং টেবিল, একটা চেয়ার আর হাট করে খেলা একটা স্টিলের আলমারি, যার ভেতরের লকারও খোলা। বিছানার ওপর পড়ে আছে খোলা গয়নার বাক্স, যার মধ্যে একটাও গয়না নেই।

সমরকে গয়নার কথা জিজ্ঞেস করাই যাচ্ছে না। সে শুধু চিৎকার করে যাচ্ছে, "গয়না-

ফয়না সব যাক, ওকে আমাকে ফেরত দাও।” অনেক চেষ্টা করার পর জানা গেল বাক্স প্রায় ভর্তিই ছিল, কিন্তু কী কী ছিল সমর জানে না, সে কোনদিন স্ত্রীর কাছ থেকে জানতেও চায়নি। তাছাড়া ওদের কোনও ব্যাঙ্কে লকারও নেই। ওর স্ত্রীর যা গয়না ছিল তা ওই বাক্সেই ছিল। অর্থাৎ খুনি জানতো ওই আলমারির মধ্যে লকারে ঝর্ণা গয়নার বাক্স রাখতো এবং ঝর্ণার বাক্স ভর্তি গযনা আছে। এবং খুনি আরও জানতো যে কোথায় বা কীভাবে সমরের স্ত্রী আলমারির চাবি রাখে। এও হতে পারে সে নিজের আঁচলে চাবি বেঁধে রাখত এবং সেটা নিতে গিয়েই তাকে খুনি খুন করেছে। কিন্তু না, আঁচলের কোণে চাবি রাখলে আঁচলের কাপড়ে যে ভাঁজ পড়ে, তেমন কোন ভাঁজ আমাদের দলের কারও চোখে পড়েনি। তার অর্থ, সে আঁচলে নয়, ঘরের অন্য কোনও জায়গায় চাবি লুকিয়ে রাখতো, যা খুনির জানা। অর্থাৎ খুনি এদের পরিচিত।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখা গেল, দুটো চায়ের কাপ পাশাপাশি সাজানো। পাশে একটা টিপট, তাতে চা পাতা ভেজানো। সামনে একটা কেরোসিন স্টোভ, তাতেই সমরের স্ত্রী রান্নাবান্না করত। দেখা গেল রান্না করার অন্য কোনও ব্যবস্থা রান্নাঘরে নেই। স্টোভের উল্টোদিকে একটা পিঁড়ি, যাতে বসে সে চা বানাচ্ছিল। দু কাপ চা। তার মানে যারা ফ্ল্যাটে এসেছিল তারা তার খুবই পরিচিত এবং তাদের জন্য সে চা বানাচ্ছিল। তারা দুজন হতে পারে, দুকাপ চা বানানো দেখে তাই মনে হলো। আবার একজনও হতে পারে, এক কাপ আগন্তুকের জন্য, অন্য কাপ নিজের জন্য। ,

দীপকদের চোখে পড়ল, রান্নাঘর থেকে বাথরুম পর্যন্ত টানা একটা দাগ। দেখে মনে হলো; রান্নাঘর থেকে বাথরুম পর্যন্ত সমরের স্ত্রীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদেহের মধ্যে কিন্তু ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন ছিল না। তার অর্থ দাঁড়ায়, আততায়ী রান্নাঘরেই প্রথম আঘাত হানে। পরিচিত লোক, তাই সমরের স্ত্রী কোনরকম সন্দেহ করেনি এবং প্রতিরোধের কোনও চিন্তা করার কথা মাথায় আনেনি। সময়ও পাইনি খুব সম্ভবত। নাইলনের দড়ি গলাতে জড়িয়ে যদি প্রথম টেনে থাকে তবে প্রতিরোধের সুযোগও পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

ইতিমধ্যে সমরের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছিল। দুপক্ষের লোকজনই চলে এসেছিল। স্বাভাবিক কান্নাকাটিতে সবাই এত মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে তদন্ত করাই মুস্কিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জানতে তো হবে সমরের বা তার স্ত্রীর কোনও শত্রু ছিল কিনা। সমরের স্ত্রীর কোনও প্রাক্তন বা গুপ্ত প্রেমিক ছিল কিনা বা কাকে কাকে ওরা সন্দেহ করছে ইত্যাদি সূত্র পেতে গেলে ওদের দুই বাড়ির লোকজনকে তো জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে। কেঁদে কেঁদে সমরের এমন অবস্থা যে ওকে কিছু জিজ্ঞাসাই করা যাচ্ছে না।

কান্নার উচ্ছ্বাস কিছুটা কমলে দীপক ঝর্ণার এক দিদিকে ধরল। তার বয়স সমরের স্ত্রীর থেকে দু তিন বছরের বড় হবে, পিঠোপিঠি। গোপন খবর ওর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া দরকার গয়নার সম্পূর্ণ বিবরণ। দীপক সেই দিদির কাছ থেকে পুরো বিবরণ পেয়ে গেল। চিন্তা করে দেখল এক লক্ষ টাকার ওপর দাম হবে গয়নাগুলোর। অর্থাৎ আততায়ীর গয়নাগুলো সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল। দীপক জানল, বেশিরভাগ গয়নাই সমরের স্ত্রী পেয়েছিল তার বাপের বাড়ি থেকে, অল্প কিছু সমরের বাড়ি থেকে। ঝর্ণার বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল। ব্যবসায়ী। সব মেয়েদের বিয়েতে অনেক জিনিসপত্তর দিয়েছে। ঝর্ণা অমতে বিয়ে করলেও বিয়ের পরে তাকে বহু অলংকার দিয়েছিল তারা, যা ওই বাক্সেই ছিল।

সমরের শালী বলল, “মাস তিনেক আগে আমার সঙ্গে গিয়ে এক দোকান থেকে ঝর্ণা ভোজালিটা কেনে।” দীপক জানতে চাইল, “কেন? ও কি কোন ব্যাপারে ভয় পেয়েছিল, নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল? তেমন কোনও কথা কি আপনাকে বলেছে?” দিদি উত্তরে জানাল, “না, তেমন কোনও কথাও বলেনি, তবে মাঝে মধ্যে ওকে কেমন উদাস লাগত। ” “কিসের জন্য পরিবর্তন হয়েছিল বা ওর কোনও গোপন প্রেমিক – ” দীপকের কথা শেষ হবার আগেই দিদি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, “না-না, সমরকে ছাড়া ও কাউকে

ভালবাসতো না। কী যে হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। ভোজালি কেনার দিনও ওকে আমি লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এমন কিছু নজরে পড়েনি, যাতে একেবারে অন্যরকম লাগে। ভোজালিটা এনে ও বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখে।”

শোওয়ার ঘরেই কথা চলছিল। দীপক জানতে চাইলো, “কোন জায়গাটায়?”

দিদি তোশক জাজিম তুলে দেখাল। দীপক দেখল, জাজিমের মধ্যে একটা স্পষ্ট ছাপ পড়ে গেছে। দিদির বর্ণনা পুরোপুরি সত্যি। তার মানে আততায়ী জানত ওখানে একটা ভোজালি রাখা আছে। এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে খুনি সমরের স্ত্রীর শুধু পরিচিতই ছিল না, ঘনিষ্ঠও ছিল। অথচ দিদি বলছে, ওর কোন গুপ্ত প্রেমিক বা শত্রু ছিল না। তবে কে এত ঘনিষ্ঠ ছিল যা ওর দিদিও জানে না? সমর দত্তের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার কাছ থেকে জানা গেল, দু-একজন আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সমরের ফ্ল্যাটে লোকজন প্রায় আসতই না। দিদিও এসেছিল দিন পনেরো আগে। সেইদিন রাতে আমাদের তদন্তকারী দল ফ্ল্যাট সিল করে লালবাজারে ফিরে এল। সমরকে নিয়ে সবাই চলে গেল বাগবাজারে।

পরদিন সকালে এই খুনের রহস্য উন্মোচনের জন্য লালবাজারে আমাদের টিম মিটিং হল। সেসময় যে কোনও খুন বা ওই রকম বড় ধরনের অপরাধ সংঘঠিত হলে, সবাই মিলে আলোচনা করা হতো। তারপর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি কোনও একজন অফিসারকে সেই ঘটনার পূর্ণ দায়িত্ব দিত ও অন্যান্য অফিসাররা সেই তদন্তের প্রয়োজনে তাকে সবরকম সক্রিয় সাহায্য করত। সেদিনের সেই আলোচনায় দেখা গেল, সবাই একটা ব্যাপারে একমত যে আততায়ী ওদের ঘনিষ্ঠ। কারণ তা না হলে অতি সাবধানী সমরের স্ত্রী ফ্ল্যাটের দরজা খুলত না। ঘনিষ্ঠ বলেই সে তার জন্য চা বানাতে গিয়েছিল, তাছাড়া খুনী জানত কোথায় থাকে আলমারির চাবি এবং কোথায় আছে ভোজালি। ঠিক হল, ওদের যারা যারা ঘনিষ্ঠ তাদের ওপর নজর রাখা হবে। খুনি একজন কী দুজন যাই হোক, তাদের হাতে সমরের স্ত্রীর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ভরি সোনা আছে। সেগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রি করে সে বা তারা নগদ টাকা করে নিতে চাইবে।

আমাদের একটা সুবিধা হল। সমরের ও তার স্ত্রীর দুজনের বাড়িই বাগবাজারে। এতে নজর রাখা ও খবর পাওয়াটা তাড়াতাড়ি সম্ভব। খবর এল, সমর ওদের ভাইদের মধ্যে ছোট, রেশন দোকানটা সেই চালায়। অন্যেরা চাকরি করে, কিন্তু ইদানীং রেশন দোকানের টাকা পয়সার গরমিল দেখা যাচ্ছে আর তা নিয়ে সমরের সাথে ওর দাদাদের মনোমালিন্য চলছে শুধু নয়, তাকে আর রেশন দোকানে ঢুকতেই দেওয়া হয় না। দাদারা তাকে একটা ট্যাক্সি কিনে দিয়েছিল, কিন্তু সমর সেটাও চালাতে পারেনি। সেই ট্যাক্সিটা বিক্রি করে দিয়ে বিক্রির টাকাপয়সা কোথায় উড়িয়ে দিয়েছে তা একমাত্র সমরই জানে। এইসব কারণে সমরের দাদা বৌদিরা সমরকে একদম পছন্দ করেন না। সমর বিয়ের আগে বাগবাজারেই থাকত। মা আছেন, মা আর সমব একই ঘরে ঘুমাত। সমরের বিশেষ কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। পাড়াতেও সে বিশেষভাবে কারও সঙ্গে মিশতো না। এমন কি ওর বয়সী ছেলেদের সঙ্গেও সে আলগা ভাবে মেলামেশা করে। .

বাগবাজারে ঝর্ণার পাড়া থেকে খবর পাওয়া গেল, সমর ছাড়া ওর কোনও আলাদা প্রেমিক ছিল না। বাড়িতে খুবই আদরের মেয়ে ছিল। বাড়ির গুরুজনদের সমরের সঙ্গে বিয়েতে মত ছিল না। তবু, ওর মন রাখতেই সবাই পরবর্তীকালে মেনে নেয়।

তিন দিন হয়ে গেল, আততায়ীর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। সমরের শোকোচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই এতদিনে কিছুটা কমেছে, তার সাথে কথা বলার জন্য দীপক ও স্বদেশ ভোরবেলায় একটা গাড়ি নিয়ে ওর বাড়ি গিয়ে হাজির। পুরনো বাড়ি, একতলায় সমরের দাদা বৌদিরা থাকেন, তাঁরা গোয়েন্দাদের সঙ্গে খুবই ভাল. ব্যবহার করলেন। পুলিশ ভোরবেলায় এসেছে, বাড়ির লোকেরা একটু যা তটস্থ হবার তা তো হবেই, এ ব্যাপারে আমরা অভ্যস্ত। দীপকরা

দেখল, বাড়ির সবার সঙ্গে সবার খুব বেশি মিল না থাকলেও ঝগড়াঝাঁটিও নেই। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সংসার নিয়ে একই বাড়িতে থাকেন। সমর কিংবা ওর স্ত্রী সম্পর্কেও ওরা তখন কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি।

দোতলার একটা ঘরে মা থাকেন। সেখানে সমর ছিল। পুলিশ এসেছে শুনে সে নেমে এল। কেঁদে কেঁদে সে চোখ মুখ ফুলিয়ে দিয়েছে। দাদা বৌদিরা বলেছেন, তার স্ত্রী-অন্ত প্রাণ ছিল। শ্মশানে তাকে নাকি ধরে রাখা যাচ্ছিল না, স্ত্রীর চিতায় ঝাঁপ দেওয়ার জন্য ছুটে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। গতকাল সন্ধেবেলা সমর কোথায় চলে গিয়েছিল কেউ জানে না। বাড়ির সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল যে সে আবার স্ত্রীর অকালমৃত্যুর শোকে আত্মহত্যা-টাত্মহত্যা না করে বসে।

দীপক ও স্বদেশ দোতলায় সমরের মার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সমরও সঙ্গে আছে, আর আছে ওই বাড়ির কয়েকটা কুচোকাঁচা বাচ্চা, যারা দীপকরা ওখানে যাওয়ার পর থেকে আর ওদের সঙ্গ ছাড়েনি, 'অবাক চোখে ওদের কার্যকলাপ দেখে যাচ্ছে।

সমরের মা দীপকদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করলেন। তিনিও খুবই ভদ্র, নম্র। আমাদের বাঙালি বাড়ির মায়েরা যেমন হন ঠিক তেমনই। তিনি ছোট বৌয়ের এ রকম একটা মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত, শোকটা কী ভাবে সামলাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

ওই বাড়িতে ঢোকার পর থেকে দীপকরা শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করছে না, নজরও রাখছে চারদিকে। কারণ তারা খুঁজতে এসেছে ঘনিষ্ঠ লোকের সূত্র। আর সূত্র যে কোথা থেকে পাওয়া যাবে তাতো আর আগে থেকে জানা থাকে না। জানা থাকলে তো গোয়েন্দাগিরির কাজ অর্ধেকই সারা হয়ে যেত। মায়ের ঘরে কথা বলতে বলতে দীপক একটা ছোট স্টিলের আলমারি লক্ষ্য করল। দীপক প্রশ্ন করল, "আলমারিটা কার?" সমর উত্তর দিল, "মার।" সমরের গলা ভারি হয়ে আছে, বোধহয় একটু আগে ও কান্নাকাটি করছিল। "না না, এটা তো ঠাম্মার নয়, কাকুর।" কুচোকাঁচাদের ভিড়ের মাঝ থেকে সমরের একটা ভাইপো বলে উঠল।

দীপকের মস্তিষ্কের ভেতর সাইরেন বেজে গেল। "সমর মিথ্যা বলল কেন?" ওদিকে সমর ভারি গলায় কুচোদের ভিড় লক্ষ্য করে বলল, "এ্যাই তোদের এখানে কী চাই, যা এখান থেকে।" সমরের ধমকানিতে ওরা একটু নড়াচড়া করলেও কৌতূহল ছেড়ে কেউ চলে গেল না। দীপক সময় নষ্ট না করে সমরের মাকে বলল, "মাসিমা, আলমারির চাবিটা একটু দিন তো, আমি দেখব।" সমরের মা সমরের দিকে একবার তাকিয়ে দীপককে বললেন, "চাবি তো আমার কাছে নেই বাবা।" দীপক জানতে চাইল, "কার কাছে আছে?" তিনি সমরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "ওর কাছে।"

দীপক সমরকে বলল, "চাবিটা বের কর তো।" সমর তেমনই ভারি গলায় নির্লিপ্তভাবে জানাল, "চাবিটা এখানে নেই, কাশীপুরের বাড়িতে আছে।" ক্ষুধার্ত বাঘ সামনে শিকারের গন্ধ পেলে যেমন হয়, দীপকের তখন সেই অবস্থা। সমরের কথায় অসংলগ্নতার মধ্যে দীপক এই প্রথম কোন সূত্রের গন্ধ পাচ্ছে। প্রথমে সমর বলল আলমারিটা তার নয়, মার। তারপর জানাল, আলমারির চাবিটা কাশীপুরের বাড়িতে আছে। দীপক কঠিন স্বরে বলল, "চাবিটা বের কর, নয়ত আমি আলমারিটা ভাঙ্গব।" সমর একই ভঙ্গিমায় বলল, "আসলে আমি তো এটা ধরতাম না, আমার স্ত্রীই এটাতে মাঝেমধ্যে এসে জিনিস রাখত, তাই চাবিও—ওর কাছেই থাকত।"

দীপক ঝট করে একটা চাল চেলে দিল। বলল, তেমন কোন চাবি আমি ওই ফ্ল্যাটে পাইনি। ঠিক আছে— তারপর পাশে দাঁড়ানো একজন কনস্টেবলকে বলল, "আলমারিটা ভেঙ্গে ফ্যাল।" কনস্টেবল সমরকেই বলল, "একটা হাতুড়ি দিন তো।" "দিচ্ছি" বলে সমর ওই ঘরের এককোণায় গিয়ে একটা জায়গায় হাত দিয়ে একটা চাবি নিয়ে এসে দীপকের হাতে দিয়ে বলল, "এই নিন।"

দীপক একটু হেসে চাবিটা হাতে নিয়ে সেটা স্বদেশকে দিলে স্বদেশ আলমারিটা খুলে ফেলল। দীপক দেখল, বেশিরভাগই সমরের জিনিসপত্তর, ওর জামাপ্যান্ট, এটা ওটা, টুকিটাকি, একটা অব্যবহৃত দামি শাড়ি, একটা কাপড়ের পুঁটলি। দীপক দ্রুত পুঁটলিটা খুলে ফেলল। পুঁটলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে, সেটা সিনেমার কোনও দৃশ্য হলে ইফেক্ট সাউন্ড হিসাবে বেজে উঠত বিদ্যুৎচমকানির মতো করকরাত—করকরাত আওয়াজ। তারা দেখল, পুঁটলির মধ্যে রয়েছে ঝর্ণার হারানো সব অলংকার।

সমর বিস্মিত গলায় বলে উঠল, “ওগুলো এখানে!” দীপক এক সময় ফুটবলার ছিল। সমরের কথা শুনে ওর দিকে তাকিয়ে দীপকের ডান পাটা নিশপিশ করে উঠল খেলার জন্য। কিন্তু মাঠের পরিস্থিতি দেখে সে সামলে নিল। এক কনস্টেবলকে দিয়ে দীপক সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার বাড়িতে খবর পাঠাল ওই বাড়ির লোক ও ঝর্ণার দিদিকে সমরের বাড়িতে আসার জন্য, কারণ গয়নাগুলো যে সমরের স্ত্রীরই তা ওদের দিয়ে প্রমাণ করে নিতে হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় সমরের মা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন।

সমরের শ্বশুরবাড়ি বেশিদূর নয়। দিদি সমেত আরও দু-তিনজন, কনস্টেবলের সঙ্গে উপস্থিত। দীপক দিদিকে দেখাল গয়নাগুলো, তিনি দেখেই চিনতে পেরে কেঁদে ফেললেন। তারপর একটা দুল মৃতদেহের কানের তলায় শুধু নিচের প্যাঁচাল অংশটা পাওয়া গিয়েছিল, তার ওপরের অংশটাও পুঁটলিতে পাওয়া গেল। তিনি সেটা দেখিয়ে বললেন, “ঠিক এরকম আরেক জোড়া আমার আছে, দু জোড়া বানিয়েছিলাম, একজোড়া ওর, একজোড়া আমার।” দীপক জানতে চাইল, “দেখুন তো সব ঠিক আছে কি না।” দিদি সব দেখে বলল, “না, একটা হার কম আছে।”

দীপকরা আর দেরি না করে গয়নাগুলো বাজেয়াপ্ত করে সিজার লিস্ট বানিয়ে সমরের মা, দাদাদের দিয়ে তাতে সইসাবুদ করে সমরকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বেরনোর সময় সবাই শুনতে পেল কে একজন কেঁদে উঠলেন। তারা অনুমান করল, সম্ভবত সমরের মা।

দীপকরা সমরকে নিয়ে লালবাজারে পৌঁছে গেল। লালবাজারে পৌঁছে দীপকের এতক্ষণ ধরে আটকে রাখা আকাঙ্ক্ষাটা কার্যকরী করতে শুরু করল। ফুটবল খেলতে লাগল। ফুটবলের চোটে সমর স্বীকার করল, সে দোষী, কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেন স্ত্রীকে খুন করেছে, খুনের সময় সঙ্গী হিসাবে কে ছিল কিছুই বলল না। ওর স্বীকার করা ছাড়া উপায়ও ছিল না, কারণ ওর আলমারিতেই পাওয়া গেছে ঝর্ণার লুঠ হওয়া অলংকার ও কান থেকে ছিঁড়ে নেওয়া দুলের ওপরের অংশ। আমাদের শত চেষ্টাতেও খুনের উদ্দেশ্য ও অন্য কে সঙ্গী ছিল তা কিন্তু বলল না।

আবার আমাদের টিম মিটিং বসল। আলোচনা করে দেখা গেল, সমরের স্ত্রীকে যেভাবে গলায় নাইলন দড়ির ফাঁস লাগিয়ে রান্নাঘর থেকে বাথরুম পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে, তা একা কোনও মানুষের করাটা কঠিন। অন্য একজনের সাহায্যের প্রয়োজন। এই অন্য একজনটা কে? কেনই বা সে সমরকে তার স্ত্রী-হত্যায় সাহায্য করবে? গয়নাগাঁটিগুলো যখন সমরের হেফাজত থেকে পাওয়া গেল, তখন একটা জিনিস পরিষ্কার, সাহায্যকারী খুনী গয়নার লোভে বা টাকাপয়সার প্রলোভনে সমরকে সাহায্য করেনি। করেছে অন্য কারণে। যে তাকে সাহায্য করেছে, সে নিশ্চয়ই অতি ঘনিষ্ঠ এবং তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। অথচ তদন্ত করে যা জানা গিয়েছিল তাতে সমরের কোনও বিশেষ বন্ধুর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

শুরু হল নতুন করে তেমন লোকের অনুসন্ধান। সমরের বাগবাজার পাড়াতেই ওর বয়সী ছেলেদের জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে করতে একজন বলল, দিন কয়েক আগে সমরকে পাড়াতেই অজিত দত্ত নামে একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। সেই অজিত সমরের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত, আগে বাগবাজারেই থাকত, কিন্তু বছর কয়েক হল সে অন্যখানে চলে গেছে, ঠিকানাটা সে জানাতে পারল না। সে আরও বলল, সেই ছেলেটা

একটু গো-বেচারী ধরনের, হাবাগোবা, যে যা বলে বিশ্বাস করে নেয়। যদিও শরীর স্বাস্থ্য সব ঠিকই, কিন্তু মস্তিষ্ক একটু কাঁচা।

কোথায় পাওয়া যাবে সেই অজিতকে? সমরকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, তেমন কাউকে সে চেনে না। বাগবাজারের সূত্র থেকে জানা গেল, অজিত একটা কো-অপারেটিভে চাকরি করে। স্বদেশ সেই কো-অপারেটিভে খবর নিয়ে জানল সে কো-অপারেটিভের চাকরি ছেড়ে ডাক ও তার বিভাগে চাকরি নিয়েছে। কোন পোস্ট অফিসে অজিত চাকরি করছে, তাও জানা গেল। কিন্তু একটা কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস থেকে সরকারী কর্মীকে গ্রেফতার করার জন্য হাজারও রকমের কৈফিয়ত দেওয়ার চাইতে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করাই ভাল। পোস্ট অফিস থেকে গোপনে তার দমদমের বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। সেই ঠিকানায় একদিন সকালে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেল স্বদেশ ও সরোজ ভট্টাচার্য।

সেই বাড়িতে তারা পেয়ে গেল হাবাগোবা ছেলেটাকে। স্বদেশ অজিতকে প্রশ্ন করল, "তুমি সমর দত্তকে চেনো?" সে প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে বলল, "চিনব না, একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি।" স্বদেশ এবার নরম সুরে সোজাসুজি জানতে চাইল, "ওর কাশীপুরের বাড়িতে তুমি গিয়েছ?" অজিত বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকদিন। সমর প্রথমদিন ওর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আর শেষ গেছি যেদিন ওকে মেরে ফেললাম।" স্বদেশ অজিতের স্পষ্ট জবাব শুনে অবাক 'হয়ে গেল। কিন্তু তা প্রকাশ না করে ঠিক ঢঙে প্রশ্ন করল, "মেরে ফেললে?" স্বদেশের ধূর্ততা ধরবার মতো ওর বুদ্ধির পূর্ণতা আসেনি।

অজিত নিজের মতো বলল, "মারব না! সমর প্রথম দিনই ওর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর আমাকে গোপনে বলল, সমর যখন বাড়ি থাকে না তখন ওর বৌ অন্য লোককে ঘরে ঢোকায়। তাদের সাথে অসভ্যতা করে। সমর বলল, তুই একটু ব্যাপারটা দেখ। তুই আমার পুরনো বন্ধু, তুই চেষ্টা করে দেখ, তোকেও সুযোগ দেবে। তোর সঙ্গে কিছু করলে আমার আপত্তি নেই। তখন থেকে আমি সমরের পেছনে অনেক টাকা খরচ করলাম, ঝর্ণা কিন্তু আমার সঙ্গে কোনও রকম অসভ্যতা করতে রাজি হলো না। আমি কি এমন খারাপ ছেলে বলুন, অন্যের সঙ্গে যা করে আমার সঙ্গে করলে তা দোষের হবে কেন বলুন?"

স্বদেশ বলল, "তাই তো। সমর আর কি বলল?" অজিত বলল, "ঠিক আছে, আমি সব বলব, আমাকে মারবেন না তো?" স্বদেশ বলল, "না না মারব কেন?"

সরোজ ইতিমধ্যে অজিতের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। অজিতকে ভ্যানে তুলে তারা লালবাজারের দিকে ছুটল। অজিত ভ্যানে উঠে বলল, "ঝর্ণা খুব নষ্ট মেয়ে ছিল।" "তাই?" স্বদেশের বিস্ময়সূচক প্রশ্ন। তাকে সমর কি করে খুনে জড়াল সরলভাবে স্বদেশ জেনে নিচ্ছে। "হ্যাঁ।" অজিত বলল, "একদিন সমর আমাকে বলল এই নষ্ট মেয়ে নিয়ে কি ঘর করা যায়? ওকে মেরে ফেলব। দেখ, এদিকে তোকেও কিন্তু কিছু দিল না। তুই আমার বন্ধু, ওকে মারার জন্য সাহায্য করবি না! আমি বললাম, হ্যাঁ করব। আমাকে কিছু দিল না বলে ঝর্ণার ওপর তখন আমারও খুব রাগ। তারপর দুজনে মিলে মেরে ফেললাম।" ছেলেটার সিধাসাপ্টা কথা।

পুলিশী জীবনে কেন, সাধারণ জীবনেও কখনও শোনা যায় না এত সোজা খোলাখুলি স্বীকারোক্তি। কীভাবে মারলে?" স্বদেশের প্রশ্নের জবাবে অজিত জানাল, "কেন, আমাকে সেদিন সমর ওর বাড়িতে যেতে বলল। আমি গেলাম। আমাকে দেখে সমর ওর বৌকে বলল চা বানাতে। ওর বৌ চা বানাতে গেলে সমর ওর ঘরে বসে দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে আমাকে বলল, এটা আমি ওর গলায় পরিয়ে দেব। তখন তুই একদিক ধরে টানবি, আমি একদিক।" "তারপর?" স্বদেশ মাঝখানে বলে উঠল, "তারপরে আমরা ওর বৌয়ের কাছে গেলাম। সমর পেছন থেকে ফাঁসটা লাগিয়ে দিতেই আমি একদিকে আর সমর একদিকে মিলে দড়িটা টানতে লাগলাম। সমরও খুব জোরে টানতে লাগল, আমিও জোরে টানতে লাগলাম।"

"সমরের বৌ কোনও আওয়াজ করল না?" স্বদেশের প্রশ্নের উত্তরে অজিত বলল, "হ্যাঁ,

একবার গ্যাঁ গ্যাঁ করে উঠেছিল, কিন্তু আমরা এত জোরে টেনেছি, আর আওয়াজ করতে পারেনি। সমর আমাকে খালি বলছিল, টান, টান, জোরে টান, আর আমিও খুব জোরে টেনেছি। ঝর্ণা গলা তুলে সমরের দিকে একবার তাকিয়ে ছিল। তারপর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বার হতে হতে নেতিয়ে পড়ল। তখনও আমরা টানা ছাড়িনি।" "কতক্ষণ ধরে টানলে?" স্বদেশ প্রশ্ন করল। "অনেকক্ষণ, পাঁচ দশ মিনিট হবে। তারপর টানতে টানতে সমরের কথা মতো ওকে নিয়ে গেলাম বাথরুমে। অর্ধেকটা ঢুকিয়েই সমর আমাকে বলল, ছেড়ে দে, আমি ছেড়ে দিতেই সমর ছুটে ওর বিছানার তলা থেকে একটা ভোজালি নিয়ে ওর বৌয়ের গলায় মারল এক কোপ। তারপর সমর আলমারি খুলে কি সব করল। কাজ শেষ হলে সমর বলল, চল। আমরা ওদের বাড়ি থেকে চলে এলাম। সমর আমাকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি বাড়ি চলে এলাম।"

স্বদেশের পাশে বসে আছে অজিত। গল্পের ছলে জানতে চাইল সে, "সেদিন তো তখন লোডশেডিং চলছিল?" সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, লোডশেডিংয়ের মধ্যেই তো আমি গেলাম। তারপর আমাদের জন্য সমরের বৌ মোমবাতি জ্বালিয়ে চা করছিল, আর আমরা পেছন থেকে দড়ি নিয়ে টানলাম।" "দড়িটা কি সমর কিনে রেখেছিল?" স্বদেশের নির্লিপ্ত প্রশ্ন। "না-না, ওরা যখন বরাহনগরের বস্তিতে ছিল তখন পাতকুয়ার জল তোলার জন্য কিনেছিল" অজিত জানাল।

লালবাজারে এসে অজিতকে সমরের কাছে নিয়ে গেল স্বদেশ। তাকে দেখে সমর চুপ। অজিত সমরকে বলল, "কি রে তুইও এখানে।" সমর অজিতের কথার কোনও উত্তর দিল না। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একবার দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিভাবে সমর অজিতকে খুনে অংশগ্রহণ করাল তা জানতে পারলেও সমর কিজন্য ওর স্ত্রীকে খুন করল তা জানা যায়নি। না, সমরের স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সে ওর বন্ধুকে যা যা বলেছে তা চরম মিথ্যা। সমরের অনুপস্থিতিতে সে আত্মীয়পরিজন ছাড়া কোনও পুরুষকে ফ্ল্যাটে ঢোকায়নি।

কী উদ্দেশ্যে, কী কারণে, সমর ওর স্ত্রীকে হত্যা করেছে তা জানতে হবে মামলারই প্রয়োজনে। তাছাড়া, অফিসার দীপক রায় ঘটনার পেছনের উদ্দেশ্য জানার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়লেন। কেন একটা লোক তার স্ত্রীকে ওইভাবে খুন করবে? তা জানা অত্যন্ত জরুরি। মামলাই তো শেষ কথা নয়। অন্ধকার সমাজকে জানা দরকার। ধরা পড়ার আগের দিন সন্ধেবেলায় সমর কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, তা জানতে পারলে কি খুনের উদ্দেশ্যটা জানা যাবে? সূত্র খোঁজার জন্য আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী সারা বাগবাজার চত্বরে গোপনে ব্যাপকভাবে কাজ করতে শুরু করল। একদিন যায়, দুদিন যায়, কিন্তু নতুন কোন তথ্য আসে না। সমরের বাড়ির লোকজন সমরের ওপর এতই তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল যে তারা ইদানীং সমরের কোনও খোঁজই রাখত না। ফলে সমর কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে এসব কোনও কিছুর হদিশ দিতে পারল না তারা। ব্যারাকপুরবাসী তার হাবিলদার দাদাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি সোজা বলে দিলেন, "বিয়ের পর আমার এখানে যে ক'দিন ছিল ততদিনই আমি ওকে দেখেছি, তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।" বাড়ির লোকজনের পেছনে আমাদের নজরদারি অব্যাহত রইল কারণ, ভাইকে বাঁচাতে তারা আমাদের ভুলও তো বোঝাতে পারে।

হঠাৎ আমাদের কাছে খবর এল, সমরের যখন ট্যাক্সি ছিল, সে সময় শ্যামবাজার অঞ্চলে ট্যাক্সিরই সূত্রে তার ক'জন বন্ধু জুটেছিল। খবর যখন পাওয়া গেছে, তখন তার শেষ না দেখা অবধি আমাদের শান্তি নেই। খুনের কারণটা খুঁজে বার করতেই হবে। সেই কারণটা কাটা ঘুড়ির মতো আমাদের চোখ এড়িয়ে হাওয়ায় ভাসছে। আমাদের তা ধরে আনতে হবে। এই ধরাটাই আমাদের কাজ, নয়তো কিসের গোয়েন্দা?

শ্যামবাজার অঞ্চলে যে সব কনস্টেবলরা তৃণমূল স্তরে যোগাযোগ রাখে, তাদের কাজে

নামিয়ে দেওয়া হল। ট্যাক্সির মালিক থাকাকালীন সমর ওইখানে কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করত তার খবর নিঃশব্দে জোগাড় করার জন্য। ট্যাক্সির স্ট্যান্ডে ঘুরে ঘুরে তারা দিন দুই পরে চারটে ছেলের নাম ধাম সব খোঁজ পেয়ে গেল। কোথায় কখন তারা আড্ডা দেয় সেই খবরও তারা পেয়ে গেছে। এই ছেলেগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কি আসল খবর পাওয়া যাবে? এরা কি জানে এমন কোনও তথ্য যা অন্যদের অজানা? একটা ছেলে একটা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে প্রথম বছর না ঘুরতে কী কারণে ষড়যন্ত্র করে খুন করে দেবে! তার স্ত্রী তো কোনভাবেই অসৎ ছিল না। অজিতকে প্রলোভন দেখিয়ে তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করতে উত্তেজিত করে স্ত্রীকে অসৎ করতে চেষ্টা করেছিল যেমন, ঠিক তেমনই অজিত তার প্রচেষ্টায় যে সফল হবে না তাও সে জানত। তারপর যে অজিত ঝর্ণাকে না পেয়ে তার ওপর রেগে গিয়ে একটা প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা ভেতরে গড়ে তুলবে, তাও সমর জানত আর সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে অজিতকে তার ষড়যন্ত্রের অস্ত্র করে তুলতে পারবে, সেই ব্যাপারটাতেও সমর নিশ্চিন্ত ছিল।

ঝর্ণা দত্ত খুন হওয়ার কী কারণ তা জানার একটা ক্ষীণ আশা, একটা অন্ধকার গুহার দীর্ঘ, শেষ প্রান্তে সরু আলো দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা জেগে ওঠায়, সেই পথে যেতে আর দেরি করব কেন আমরা? শ্যামবাজারের ছেলেগুলোর খোঁজ যখন পাওয়া গেছে, তাদের জেরা করে দেখতে হবে নতুন কী পাওয়া যায়। সেদিনই সন্ধেবেলায় সাদা পোশাকে স্বদেশ ও সরোজ কনস্টেবল নিয়ে, গাড়ি নিয়ে ছুটল শ্যামবাজার মোড়ের দিকে। সঙ্গে আছে শ্যামবাজার অঞ্চলের দুজন সিপাই। শ্যামবাজার মোড়ে রাস্তার একটা রেলিংয়ের ধারে ওই চারজন সন্ধেবেলায় আড্ডা দেয়। সিপাইরা তাদের সেখানে চিহ্নিত করে এসেছে। শ্যামবাজার মোড়ে এসে দেখল, চারজন নয়, আড্ডা দিচ্ছে দুজন।

আমাদের বাহিনী সোজা ওই দুজনকে নিয়ে লালবাজারে চলে এল। তাঁরা তো অস্বীকার করে বলল, "আমরা সমর দত্ত বলে কাউকে চিনি না।" একথা শোনার পর ওদের দুজনকে আলাদা আলাদা জেরা শুরু হল। দীপক একজনকে বলল, "দেখুন, আপনারা আমাদের সাহায্য করুন, না করলে কিন্তু ঝর্ণা দত্ত খুনের সঙ্গে আপনাদেরও জড়িয়ে দেব। তখন অযথা জেলে পচবেন।" এই ধমকানি শুনে একজন ভেঙ্গে পড়ল। সে বলল, "দেখুন, কেন সমর ওর স্ত্রীকে খুন করেছে তা বলতে পারব না, তবে সমর আমাদের নিয়ে মাঝে মাঝে সোনাগাছিতে মেনকা নামে একটা মেয়ের ঘরে যেত। সমর মেনকাকে বলত, তাকে সে বিয়ে করবে। ওর এইসব কথাবার্তা শুনে আমরা হতবাক হয়ে যেতাম। সোনাগাছির মেয়েকে কেন বিয়ে করবে তা বুঝতে পারতাম না। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই তো ঝর্ণার সঙ্গে প্রেম করিস, অথচ বলছিস মেনকাকে বিয়ে করবি, কি ব্যাপার বল তো? সমর বলেছিল, সে তোরা বুঝবি না, এমন সাধারণ মেয়ের থেকে এরা অনেক পটু। ঝর্ণাকে আমার অন্য ব্যাপারে দরকার। ও বাড়িতে থাকবে।" ছেলেটা এতটুকু বলে চুপ করে গেল। ছেলেটার কথা শুনে মনে হলো, রহস্যের অন্ধকার সরে গেলেও যেতে পারে। অপেক্ষা না করে দীপক ওই ছেলেটাকে নিয়ে চলল সোনাগাছির নিষিদ্ধ পল্লীতে। ছেলেটা মেনকার ঘরটা দেখিয়ে দিল।

মেনকাই ঘরের দরজা খুলল, দীপক দুজন কনস্টেবল নিয়ে মেনকার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বোঝা গেল, ট্যাক্সি বিক্রির টাকা ও রেশন দোকানের হিসাবের গরমিল এখানে এসে মিলেছে।

সেই মহিলা স্বীকার করল, সমর ইদানীং প্রায় প্রতিদিনই তার কাছে আসত। তাকে সমর বিয়ে করতে চেয়েছিল। সে বিয়ের ব্যাপারে সমরকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেও সমর তার জন্য পাগলের মতো করত। একদিন সমরকে সে বলেছিল, "তুমি আমাকে কী দেবে, পয়সা, সোনা, গয়না কী? তোমার থেকে অনেক বেশি দেবে অন্য বাবু। আমি তাদের সঙ্গেই যাব।" সমর বলেছিল, "দেখ না তোমাকে আমি কী দিই, তোমাকে আমি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেব।" সে দেখাল, সমর তাকে একটা গলার হার দিয়েছে। সেই হারটা যে সমরের স্ত্রীর তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না। আরও বলল, সমর যে বিবাহিত তা সে জানত না।

জানলেও কী করত? যে একবার কোনও ব্যাপারে অন্ধ কিংবা পাগল হয় তাকে থামানো মুশকিল। সমরের বন্ধু কিন্তু পাগল ছিল না, তার বোধশক্তি বয়স অনুসারে প্রখর হয়নি, আর সমর কিন্তু বোধবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েও পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাই একটা বারবধূর জন্য, তাকে সোনার গয়না দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়ার জন্য, নিজের গৃহবধূকে খুন করল।

মামলায় প্রথমে সমরের মৃত্যুদণ্ড ও অজিতের যাবজ্জীবন সশ্রম সাজা হয়ে গেল। পরে মাননীয় কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে সমরের ফাঁসির হুকুম মকুব হয়ে তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হল। হায়রে সুখ! তোমার সন্ধানে কত নিরীহ মানুষ বলি হয় পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে!

মানুষ যদি তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করতে পারত, তবে মানুষ আর মানুষ থাকত না। মহামানুষ, সন্ত হয়ে যেত। সুখের সন্ধানে মানুষের বেড়ে যায় লোভ, দিন দিন আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আরও চাই, আরও চাই। কেন চাই, কী চাইয়ের দিশাহারা ছোটায় মানুষ হারিয়ে ফেলে তার ন্যূনতম বোধবুদ্ধি, সাধারণ অভিজ্ঞতা। আর তারই সুযোগ নেয় ঠগী ও তাদের সংগঠন।

সত্তর এবং আশির দশকের প্রথম দিকে এমনই বহু সংগঠন গজিয়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গ ছিল তাদের সবচেয়ে বড় বিচরণভূমি। এই সংগঠনগুলো পরিচিতি পায় এক কথায় চিটফান্ড হিসাবে।

যতদূর জানা যায়, উনিশশো চৌত্রিশ সালে শান্ত ঘোষ নামের একজন কলকাতা নিবাসী ছিল আমাদের দেশে এমন চিটফান্ডের পথিকৃৎ। সে বর্তমান চেন্নাই শহরে প্রথম একটা চিটফান্ডের সংগঠন তৈরি করে।

এদের প্রথম ফাঁদটা কী? তা হলো, বাজার ছাড়া চড়া হারে আমানতকারীদের সুদ দেওয়া। এই সুদের লোভে পা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষ। তাঁরা চিন্তাও করেন না কীভাবে এত বেশি মাত্রায় সুদ দেওয়া সম্ভব? তাঁদের গচ্ছিত টাকা নিয়ে কী এমন ব্যবসা করলে এত টাকা দেওয়া যায়!

আর চিটফান্ড কোম্পানিগুলো ব্যবসাটা করে কী করে? কী করেই বা চড়া হারে সুদ দেয়? এটা খুব সহজভাবে বললে বলা যায়, এক আমানতকারীর টাকা হাতে এলে অন্য আমানতকারীকে টাকা ফেরত দেয়। যেমন ধরা যাক, দিনে কোম্পানির তহবিলে নতুন আমানতকারীর হাজার টাকা জমা হলো, তার থেকে পাঁচশো টাকা কোম্পানি পুরনোদের দিয়ে দিল সুদ ও দালালি। তা হলে কোম্পানির লাভ হলো পাঁচশ।

কোম্পানি তৈরির সময়ই এরা নিয়োগ কবে এজেন্ট বা দালাল। দালালদের দেওয়া হয় ভাল পরিমাণে লভ্যাংশ। এই লভ্যাংশের জন্য দালাল ও তস্য দালালেরা হানা দিতে শুরু করে সাধারণ মানুষের পকেটে। এদের কাজ হচ্ছে লাভের একটা মায়াজাল তৈরি করে মানুষকে ফাঁদে ফেলে আমানত নিয়ে আসা। সবাই কি এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন? না, তবে বহু মানুষই পড়েন। এবং অধিকাংশই মধ্যবিত্তশ্রেণীর, যারা নিজেদের ক্ষমতার চেয়ে উচ্চাভিলাষী হন বেশি।

কোম্পানি গড়ার সময়ই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা জানে, একদিন গণেশ উল্টে তাদের ডিগবাজি খেয়ে পালাতে হবে। কারণ মূল আমানত কোনদিনও সমস্ত আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু সেই টাকা ভেঙেই সুদ ও লভ্যাংশ দিয়ে এসেছে। তাই এরা প্রথম থেকেই প্রস্তুত থাকার চেষ্টা করে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার। আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ও নন-ব্যাঙ্কিং আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলার জন্য তারা এইসব আইন সম্পর্কিত বিশারদ, যে সব চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, অডিটর ও উকিল আছেন তাদের থেকে বাছাই করে কোম্পানির কাজ দেখার জন্য নিয়োগ করে।

তাছাড়া নিজেদের নিরাপদ রাখতেও অবাঞ্ছিত হামলা রুখতে সমস্ত রকম বেআইনী কাজে নিযুক্ত লোকেদের মতো এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকরাও গুণ্ডা পোষে। ভাল অফিস সাজিয়ে, অফিসে তাজা তাজা তরুণ তরুণীকে কর্মচারী হিসাবে রেখে, নিজেদের একটা দুর্ভেদ্য জগতে লুকিয়ে রাখে। যাতে সাধারণ আমানতকারীরা চট করে তাদের কাছে না পৌঁছতে পারেন। কর্মচারীদের এমনভাবে তৈরি করে যে এরা সংগঠনের বাইরের লোকেদের সামনে মুখই খোলে না। নিজেদের মধ্যেও ফিসফিসিয়ে কথা বলে এবং মালিকরা কোথায় কখন আছে তা কাউকে জানায় না।

এইসব চিটফান্ডের মালিকরা অধিকাংশই নারীলোভী। আর তারই আশায় এবং অল্প

প্রচেষ্টায় প্রচারের আলোয় চলে আসার তাগিদে এরা ঢুকে পড়ে ছায়াছবির ব্যবসায়। জনসাধারণকে প্রতারণার মাধ্যমে হঠাৎ করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করার পথ হিসাবে এর চেয়ে ভাল কিছু হাতের কাছে আর নেই।

এমনই এক চিটফান্ডের মালিক ছিল মিঃ এস রায় চৌধুরী। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণে এক বাড়িতে খুলে বসল ছবির পরিবেশনার অফিস। তারপর এক এক করে মুম্বই থেকে অতিরিক্ত টাকা খরচ করে নিয়ে আসতে থাকল হিন্দি ছবি। কিন্তু সব ছবিই বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ল। স্বাভাবিকভাবেই সে দিতে পারল না আমানতকারীদের সুদ এবং আসল টাকা। ফলে, আমানতকারীদের চাপ সহ্য করতে না পেরে ব্যবসা ট্যাবসা ফেলে পালাল। শোনা যায়, সে নাকি এর কিছুদিন পরে আত্মহত্যা করে।

আর একজন এমনই কোম্পানির মালিক মিঃ আর এন বসু টালিগঞ্জের চণ্ডী ঘোষ রোডে খুলে বসল "গোল্ডেন ভয়েস রেকর্ড কোম্পানি" নামে এক রেকর্ড কোম্পানি। কোম্পানি খুলেই সে এত বড় বড় কথা প্রচার করতে শুরু করল যে, ছবির সঙ্গে যুক্ত লোকেরাই তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। সে বলতে লাগল, "আমি এইচ এম ভি-কেও গুটিয়ে দেব।" এসব কথাবার্তায় তাঁরা আশ্চর্য হবেন না তো কী হবেন? তাছাড়া সে টালিগঞ্জের "মুভিটোন স্টুডিও" কিনে নেওয়ার উদ্যোগ করে কিছু টাকা খরচ করল। কিন্তু কোন কিছুতেই শেষ রক্ষা করতে পারল না। কিছুদিনের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে আত্মগোপন করল। অবশ্য সে তার রেকর্ড কোম্পানি খোলা এবং বন্ধ করার মাঝের সময়ের ব্যবধানের জন্য রেকর্ড করল!

আর এক চিটফান্ডের মালিক ধীরেশ চক্রবর্তী ধর্মতলা এলাকায় খুলে বসল ছবি প্রযোজনা ও পরিবেশনার অফিস। সে সত্যজিৎ রায়ের এক বিখ্যাত হিন্দি ছবির পূর্বাঞ্চলের পরিবেশক হয়ে নিজেকে খ্যাতির আলোয় নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় শুরু করল বিজ্ঞাপন। কলকাতার বড় বড় সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে হোর্ডিং ও ব্যানার আর ট্রাম বাসের গায়ে ছবির নামের চেয়েও নিজের নাম বড় করে লিখতে শুরু করল। সে নিজের ব্যবসার জন্য তপন সিনহার পরিচালনায় ছবিও প্রযোজনা করেছিল। এর সবকটা ছবিই যে চলেনি তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞাপনের খরচের ঠেলায় কখনই সে লাভের মুখ দেখতে পায়নি। বিজ্ঞাপনের জন্য কোনও ছবির এত খরচ এর আগে পূর্বাঞ্চলের ছবির পরিবেশকরা দেখেননি। ফল, তাকে বছর দুয়েকের মধ্যেই তল্পিতল্পা সব ফেলে অন্তর্ধান করতে হল। ট্রাম বাসের গায়ে গায়ে ধীরেশ কুমার চক্রবর্তী নামটা অন্য রঙের তুলিতে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল বহু আমানতকারীর পকেটও।

ফেভারিট স্মল ইনভেস্টমেন্টের কর্ণধার চার ফুট দশ ইঞ্চির স্বঘোষিত সাহেব নিরঞ্জন দে আবার একাধারে নায়ক, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। তিনি আবার রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের "অনুগামী"। বিশ্বাস করত, "টাকা মাটি মাটি টাকা"। তাই আমানতকারীদের "মাটি" খরচ করে ছবির পর ছবি বানাতে লাগল। নিজেই রামকৃষ্ণ সেজে সেইসব ছবিতে অভিনয় করত। সে তার চেয়ে লম্বা অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করার সময় নিজের জন্য আলাদা কাঠের পাটাতন বানিয়ে নিজে সেই পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে শুটিং করত। অবশ্য তার এসব একক প্রচেষ্টার ছবিতে সে একাই দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকত তার স্তাবক ও দালাল পরিবেষ্টিত হয়ে। সেজন্য তার বানানো "রামকৃষ্ণ" ছবি প্রদর্শনের জন্য অধিকাংশ সিনেমা হল-মালিকরা হল ভাড়া অগ্রিম নিয়ে নিতেন। দয়ালু দে সাহেব তাতে কিছু মনে করত না। কারণ আমানতকারীর "মাটি" দান করেই তো পুণ্যপ্রাপ্তি এবং তাতেই তার মোক্ষ লাভ। নিরঞ্জন তার পার্ক স্ট্রিটের অফিসে বসে বেশ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসাটা চালিয়ে গেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাকেও আমানতকারীদের অভিযোগের জন্য গরাদের ভেতর ঢুকতে হয়েছে

এই রকম ছোট বড় চিটফান্ড পশ্চিমবঙ্গের চারদিকে তখন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল নিয়ম অনিয়মের সমস্ত ধারাকে তোয়াক্কা না করে। তবে "সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টের" কাছে এই সব চিটফান্ড কোম্পানি কিছুই না। "সঞ্চয়িতা" শুধুমাত্র

পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতবর্ষেই তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির অর্থনীতির ভাঁড়ারে একটা ঝড় তুলে দিয়েছিল।

সত্তরের দশকে "সঞ্চয়িতার" উত্থান। সমাজের কোন অংশের লোক এতে লগ্নি করতে বাদ ছিল? কোনও অংশই না। সিনেমার জগতের লোক থেকে শুরু করে সরকারী কর্মচারী, বিচারপতি, রাজনৈতিক নেতা, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব স্তরের লোকেরাই সামর্থ্য অনুযায়ী লগ্নি করেছিল। তাই শুধুমাত্র কালো টাকাই "সঞ্চয়িতায়" জমা পড়েনি। বহু সাধারণ মানুষেরা তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, এমন কি ব্যাঙ্ক থেকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী আমানত তুলে এখানে রেখেছিল বেশি মাত্রায় সুদের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে। "সঞ্চয়িতা" শতকরা চার টাকা হারে প্রতি মাসে সুদ দিত। দালাল ও তস্য-দালালের এমন জাল বিস্তার করেছিল যে, ঠিক সময় নির্দিষ্ট দিনে তারা আমানতকারীর বাড়ি গিয়ে সুদের টাকা দিয়ে আসত। ফলে "সঞ্চয়িতা" কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। এমন কোনও পরিবার ছিল না যাদের কেউ না কেউ "সঞ্চয়িতায়" টাকা রাখেনি। এর ফলে সঞ্চয়িতার মোট আমানত প্রায় হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এই কোটি কোটি টাকা "সঞ্চয়িতার" হাত ঘুরে সুদ আকারে আবার বাজারে চলে আসার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালি আহ্লাদে নেচে উঠেছিল। ফলে বাজারে সব জিনিসের দাম তখন হঠাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। সুদের টাকাকে আমানতকারীরা অতিরিক্ত আয় হিসাবে দেখার ফলে সেটা হিসাববহির্ভূত হিসাবে খরচ করতে দ্বিধা করত না। সে সময় জিনিসের দাম বাড়ার পেছনে এটাও একটা কারণ ছিল।

"সঞ্চয়িতা" ছিল একটা অংশীদারী কোম্পানি। শম্ভু মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল মুরারকা আর স্বপন গুহ ছিল এই কোম্পানির তিনজন অংশীদার। কে ছিল এই শম্ভু?

শম্ভু ছিল একটা পোলিও রোগে আক্রান্ত, অনাথ, হারিয়ে যাওয়া ছেলে। ভোলানাথ চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোক তাকে কুড়িয়ে পান। ভোলানাথবাবুর স্ত্রী বীণাপাণি দেবীর বেশ কয়েকটি সন্তান জন্মের অল্প কিছুদিন পরই অকালে মারা যায়। শম্ভুকে পাওয়ার পর বীণাপাণি দেবী ভাবলেন, এ আমারই এক সন্তান, যারা অকালে চলে গেছে তাদেরই একজন এমনভাবে আমার কোলে ফিরে এসেছে, হোক তার একটা পা পোলিওতে কমজোরি, হোক সে খোঁড়া, একেই আমি বড় করে তুলব।

তখন থেকে শম্ভু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে তিরিশ নম্বর বৈঠকখানা রোডে ভোলানাথবাবুর বাড়িতে বাস করতে শুরু করল। সেখানে শম্ভু বাস করতে করতে ভোলানাথবাবুর মেয়ে মহামায়ার প্রেমে পড়ে। তারা একই ছাদের তলায় বড় হতে থাকে। কিন্তু শম্ভুর প্রেম সার্থক রূপ পায় না। এন. চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোকের সাথে মহামায়ার বিয়ে হয়ে যায়। শম্ভু তার বুকচাপা ব্যর্থ প্রেম ভুলতে পারে না। সেই প্রেমকে স্মৃতির আকারে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষায় তার উদ্যোগে বৈঠকখানায় প্রতিষ্ঠিত হয় "মহামায়া রেস্টুরেন্ট" নামে এক রেস্তোরাঁ।

তার আগে অবশ্য শম্ভু ম্যাট্রিক পাশ করেছিল এবং ভোলানাথবাবু তার নিজের কর্মস্থল "মুরারকা পেন্টস"'-এ শম্ভুকে চাকরি করে দেন। সেখানে শম্ভুর সঙ্গে বিহারীলাল মুরারকার পরিচয় হয়, যদিও বিহারীলাল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

ভোলানাথবাবু চাকরি করার পাশাপাশি সুদের ব্যবসাও করতেন। শম্ভুও সুদের ব্যবসার স্বাদ পেল। এই সুদের ব্যবসা করতে গিয়েই তার আলাপ হয়, কলকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তপন কুমার গুহের সঙ্গে। তপনও সুদের কারবার করত। বিভিন্ন লোকের থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সেই টাকা তার চেয়েও বেশি হারে সুদে খাটাত। তপন তার বেকার দুই ভাই স্বপন ও তরুণের সঙ্গে বৈঠকখানায় একটা বাড়িতে থাকত। এদেরও বিদ্যার দৌড় তপনের মতো খুব কম।

শম্ভু ও তপনরা মিলে ভ্যানসিয়া রোডে প্রথম "সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্ট" নামে এক অর্থ

লগ্নিকারী কোম্পানির অফিস খুলে বসল। আমানতকারীর টাকাটা নিয়ে লটারি করত। লটারির মাধ্যমে পুরনো আমানতকারীর টাকা ফেরত দিত নতুন আমানতকারীর টাকা দিয়ে। চক্রহারে অর্থ ঘোরানোর এটা একটা কায়দা। এই ব্যবসা কিছুদিন চালানোর পর তারা ফ্যান্সি লেনে নতুন অফিসে উঠে এসে পুরোদমে চিটফান্ডের ব্যবসা শুরু করল। এদের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজাবাবু নামে এক ভদ্রলোক। তিনি আবার ব্যবসায়ী রামপুরিয়ার আত্মীয়, সেই সুবাদে রামপুরিয়ার ফ্যান্সি লেনের বাড়িটা শম্ভুদের পেতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। শম্ভু সরকারী ও আধা সরকারী বহু লোকের সহযোগিতায় দ্রুত ফ্যান্সি লেনের বাড়িটা নতুন ধাঁচে বানিয়ে ফেলল। "সঞ্চয়িতার" আসল রমরমা এখান থেকেই শুরু।

শম্ভু এবার নতুনভাবে, নতুন ছকে ব্যবসা আরম্ভ করল। আমানতকারীকে লগ্নির পরিবর্তে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হত তাতে বাৎসরিক শতকরা বারো টাকা সুদ হিসাবে লেখা থাকত। এটা আইনের গণ্ডিতে আমানতকারীকে বেঁধে রাখা। কিন্তু আসলে তারা সুদ দিত বছরের হিসাবে শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী আমানতকারীকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও বেশি সুদ দিত। দালাল ও তস্য দালালদের দালালীর প্রাপ্য টাকা ছাড়াও তাদের বছরে দুবার তিনবার অতিরিক্ত টাকাও দেওয়া হত উৎসাহ দিতে।

অল্পদিনের মধ্যেই এদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করল। পুরানো লগ্নিকারীরা টাকা ফেরত চাইলে নতুন লগ্নিকারীদের জমা পড়া টাকা থেকে ফেরত দিতে লাগল।

এবার শম্ভুরা নামে, বেনামে প্রচুর সম্পত্তি ও বাড়ি, ফ্ল্যাট কিনতে শুরু করল। বহুক্ষেত্রে সম্পত্তির যা দাম হওয়া উচিত তার থেকে অতিরিক্ত দাম দিয়ে কিনতে লাগল। যেমন একশো তের নম্বর পার্ক স্ট্রিটে বারো হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা বাড়ি কেনার সময় দলিলে লেখা হল, ষাট লক্ষ টাকা দাম, কিন্তু দেওয়া হল দু কোটি ষাট লক্ষ টাকা। বেশির ভাগ সম্পত্তিই তাদের বিশ্বস্ত লোকেদের নামে কেনা হয়েছিল। তপন ও স্বপন ছাড়া, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, এস এন মিত্র, রাজদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোহর আইচ ও তাঁর ছেলে বিষ্ণু আইচের নাম বেশি শোনা যায়।

"সঞ্চয়িতার" এত তাড়াতাড়ি বাড়বাড়ন্ত বোধহয় তার মালিকরাও প্রথমে আন্দাজ করতে পারেনি। উপোসী ছারপোকা রক্তের মুক্ত প্রবাহ পেলে যা হয়, এদেরও সেই অবস্থা হল। দেশি গাড়ি ছেড়ে বিদেশি গাড়ি হল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মালিকেরা এখানে ওখানে যাওয়ার জন্য শুধু তাদের নিত্য নতুন সাফারি স্যুটই পাল্টাত না, গাড়িও পাল্টে ফেলত। হাতে সোনার ব্যান্ডের দামি ঘড়ি, গলায় সোনার চেন, দু আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে বিদেশি সিগারেট। সারা শরীরে এসেছে জেল্লা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর ভাব। হাঁটা চলার থেকে উধাও হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্তের হীনমন্যতার ছায়া। কৃত্রিম ব্যক্তিত্বের লক্ষণ ঠিকরে বার করার কায়দা করায়ত্ব করে ফেলেছে।

ইতিমধ্যে গুহরা তাদের বৈঠকখানার পুরনো বাড়ি ছেড়ে লেক টাউনে বিরাট বাড়ি বানিয়ে সেখানে চলে গেছে। বাড়ির ভেতর বিপুল ঐশ্বর্যের দেমাক। সেই দেমাক যেন বলতে চায়, "বৈঠকখানায় কি মানুষ থাকতে পারে?" বাড়ির সামনে সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে কালো কাঁচে ঘেরা, তিন চারখানা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি। কার কখন দরকার লাগবে, তার তো ঠিক নেই। গাড়িতে উর্দি পরা ড্রাইভার। সাহেব, মেমসাহেবরা বাড়ি থেকে বার হলেই দ্রুত সেলাম ঠুকে পেছনের দরজা খুলে অ্যাটেনশান। সাহেব গাড়িতে বসলে দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে গাড়ির স্টিয়ারিঙে বসে চলা শুরু। ড্রাইভারের কথা বলা বারণ। শুধু আরোহীর নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চালানই তার কাজ।

শম্ভুও বৈঠকখানা ছেড়ে তালতলা লাইব্রেরি রোডের এক বাড়িতে চলে গেল। "সঞ্চয়িতার" মূল অংশীদার ও মস্তিষ্ক শম্ভুই ছিল। যদিও দাপট বেশি ছিল গুহদের। "সাদা আমানত" অর্থাৎ যেগুলো চেকে জমা পড়ত তার সার্টিফিকেট শম্ভুই সই করত। পরবর্তীকালে এজেন্টদের চাপে পড়ে তাদের দাবি মেনে সার্টিফিকেটে তার ছাপানো নামের

সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত ও ক্ষমতা অনুযায়ী এজেন্ট বা কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

গোপাল কেডিয়ার চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানি তাদের সমস্ত হিসাব নিকাশ ও কালোকে সাদা এবং সাদাকে কালো করার দায়িত্বে ছিল। মূল ব্যাঙ্ক ছিল গড়িয়াহাটের সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক। তাছাড়া পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ধর্মতলা ও জাকারিয়া স্ট্রিটের শাখাতেও তারা লেনদেন করত। প্রতিদিন সকালে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ট্রাঙ্কে করে অফিসে প্রশান্তের কাছে জমা পড়ত। ট্রাঙ্কটায় একবারে প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা আনা যেত। প্রশান্ত জমা পড়া টাকা নির্দেশ অনুযায়ী বিলি করত, এই জন্য তারা একটা গোপন টেলিফোন লাইন ব্যবহার করত।

তখন সঞ্চয়িতার এমন অবস্থা যে, অংশীদার, এজেন্টদের হাতে হাতে টাকা উড়ছে। তপন নেমে পড়ল ছায়াছবির ব্যবসায়। না, বাংলা ছবিতে নয়। সে একসঙ্গে শুরু করল হিন্দি ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনা। মুম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকায় কিনে ফেলল একটা বড় মাপের জমি ও আরও বেশ কিছু সম্পত্তি। সেখানে খুলল প্রযোজনার অফিস। কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিটে “লালী ফিল্মস” নামে খুলল পরিবেশনার অফিস। বারাসত ও দমদমে তৈরি করল লালী ও শেলী নামে দু দুটো সিনেমা হল।

হিন্দি ছবি প্রযোজনার পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলে পরিবেশনার জন্য হিন্দি ছবি নিয়ে আসতে লাগল অতিরিক্ত দাম দিয়ে। হিন্দি ছবির এত দাম তার আগে কলকাতার কোনও পরিবেশক দেয়নি। অন্য পরিবেশকরা তপনের দামের কাছে হার মেনে হিন্দি ছবির বাজার থেকে পিছু হটতে লাগল। তপনের কি যায় আসে, তার তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দরকার। ব্যবসার লাভ লোকসান চিন্তা করার মতো সময়ই বা কোথায়? আমানতকারীদের টাকা খরচ করাই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেজন্য সে গুরুসদয় দত্ত রোডের কুসুম অ্যাপার্টমেন্টে রেখেছে বাংলা ছবির এক উঠতি নায়িকাকে। সেখানে সে কলকাতায় থাকাকালীন দিনে রাতে যখন তখন যেত। নায়িকা লাঞ্চে বা ডিনারে নেমন্তন্ন করলে যথাসময়ে হাজিরা দিত। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে মাংস দেখলে সে রেগে যেত। কারণ তার মোটা চর্বিযুক্ত শরীরের জন্য ডাক্তার তাকে মাংস খেতে বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই নায়িকা যখন চোখ নাচিয়ে, ঠোঁটের লিপস্টিক বাঁচিয়ে আদর করে “খাও গো খাও, তুমি না খেলে আমার ভাল লাগে না” বলে আবদার ধরত, তখন নায়িকার অনুরোধ রাখার জন্য সে মাংসের টুকরো একটার পর একটা মুখে ঢুকিয়ে খানিকটা চিবিয়ে ফেলে দিত। যেমনভাবে আমানতকারীদের হাড় মাংস চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিতে তারা ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিল।

তপন হিন্দি ছবি বানাতে গিয়ে ছবির জগতের বড়বড় অভিনেতা ও পরিচালকদের সঙ্গে শুধু ওঠা বসাই করল না, তাদের অনেকেরই টাকা “সঞ্চয়িতাতে” লগ্নি করিয়ে দিল। তপন ছবির শুটিংয়ের জন্য আজ এখানে কাল ওখানে করতে লাগল। একবার এক হিন্দি ছবির শুটিং করতে গেল উত্তর চব্বিশ পরগণার একটা গ্রামে। সেখানে শুটিংয়ের জন্য কয়েকজন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হল। তপন তাদের দেদার হাতে টাকা দান করে গেল, যা তাদের চাষের ফসলের দামের প্রায় দ্বিগুণ, তিনগুণ। কী আছে? টাকা তো দেবে আমানতকারী গৌরী সেনেরা। তারা তো প্রতিদিনই জমা দিচ্ছে। সুতরাং ভাবনা কী? এত ব্যস্ততার মধ্যেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সময়কার পিয়ন তপন লিখে ফেলল দু-তিনটে উপন্যাস! পয়সা থাকলে আমাদের দেশে সহজেই হওয়া যায় ছবির গল্পকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক এমন কি সঙ্গীত-পরিচালক ও গীতিকার। শুধুমাত্র নিরঞ্জন দে-ই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নয়, ছবির জগতে এমন অনেককেই পাওয়া যায়।

তপন শুটিং করতে জাপান, আমেরিকা যেত। একবার সে আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে গেল। সেখান থেকে “রুলি” খেলতে বিমানে চড়ে মন্টিকার্লোতে আসত। আবার লস এঞ্জেলেসে ফিরে যেত। সেখানে তার সঙ্গে বিক্রম সরকার নামে এক বাঙালি যোগব্যায়াম শিক্ষকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। সে ডলার দিয়ে তপনকে সাহায্যও করে।

শুধু তপন নয়, শম্ভুও বাংলা ছবির এক প্রাক্তন নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল। তার বাড়িতে শম্ভু প্রায় দিনই সন্ধের পর হাজিরা দিত, এবং কয়েক ঘণ্টা পর ফিরে আসত তার তালতলার বাড়িতে। শোনা যায়, সেই নায়িকার বহু টাকাও শম্ভু সঞ্চয়িতাতে লগ্নি করাতে সমর্থ হয়েছিল।

তবে শম্ভু ছবির ব্যবসাতে গেল না। সে সম্পত্তি কিনতে লাগল। তারও এক গুরুদেব ছিল। সেই গুরুদেব মহানন্দা স্বামীকে অশোকা অ্যাপার্টমেন্টে একটা ফ্ল্যাট দিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে প্রশান্ত শম্ভুর থেকে জোর করে লিখিয়ে নেয়। শম্ভু বারুইপুরের শিবানীপীঠে একটা কালীমন্দির তৈরি করে। তার সংলগ্ন একটা আশ্রমও গড়ে। সেখানে সে তার পাতানো দিদিমাকে নিয়ে পুজো দিতে যেত।

শম্ভু জানত যে একদিন না একদিন তাদের এই "মানি সার্কুলেশন" ব্যবসা লাটে উঠবে। নতুন আমানতকারীর টাকা দিয়ে পুরনো আমানতকারীর সুদ মেটানোর ছক উল্টে যাবে। তখন সম্পত্তি বেচেও কিছু আমানতকারীর টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। তাই সে সম্পত্তি কেনার দিকে ঝুঁকেছিল। "সঞ্চয়িতার" এজেন্টরা কিছু ভুয়ো কলকারখানা ও ব্যবসার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিল, যাতে আকৃষ্ট হয়ে এবং বিশ্বাসযোগ্য ভেবে "সঞ্চয়িতায়" জনসাধারণ আরও টাকা লগ্নি করে। শম্ভু বেশ কিছু লোককে টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছিল। কিন্তু যারা যারা সেইসব ঋণ নিয়েছিল তারা কেউই তা ফেরত দেয়নি, সবাই আত্মসাৎ করে নিয়েছে। তারা জানত, ফেরত না দিলে শম্ভুরা কিছুই করতে পারবে না। তারা প্রতারণার টাকা প্রতারণা করেই গিলে ফেলল। এছাড়াও বেশ কিছু এজেন্ট বহু কোটি টাকা নয়ছয় করে পকেটস্থ করেছে।

সমাজের সর্বস্তরেই "সঞ্চয়িতার" দালাল বা এজেন্টরা ছিল। আইনজীবী থেকে পুলিশকর্মী, খেলোয়াড় থেকে ব্যাঙ্ককর্মী সর্বত্র শম্ভুদের এজেন্টরা ছিল। তবে কমল ভাণ্ডারী, বি এন উপাধ্যায়, মনোহর আইচ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল প্রথম সারির এজেন্ট। দমদম এয়ারপোর্টের কর্মী বি এন উপাধ্যায় ছিল শম্ভুর খুব ঘনিষ্ঠ। শুধু সে নয়, তার স্ত্রী সরস্বতীদেবীও ছিল শম্ভুর কাছের জন। বি এন উপাধ্যায়ের মাধ্যমে বিমানবন্দরের স্টুয়ার্ড স্বপন রায় এজেন্ট হয়, তাছাড়া আরও স্টুয়ার্ড, স্টুয়ার্ডেস, গ্রাউন্ড স্টাফ, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট "সঞ্চয়িতার" এজেন্টে পরিণত হয়। এদের মাধ্যমে শম্ভুদের জাল মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। পাইলটরাই টাকা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যেত, নিয়ে আসত। দমদম বিমানবন্দরে শম্ভুর এত আধিপত্য হয়ে গিয়েছিল, তার গাড়ি যথাযোগ্য অনুমতি ছাড়াই সোজা রানওয়ের কাছে অপেক্ষমান বা আগত বিমানের সিঁড়ির নিচে পৌঁছে যেত।

শম্ভুর খোদ লোক ছিল সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এস এন মিত্র, যে তার হয়ে অ্যাকাউন্ট দেখভাল করত। তাছাড়া ছিল মনোহর আইচের ছেলে বিশু ও জামাই রাজদুলাল এবং বিষ্ণু ঘোষের আখড়ার বেশ কজন ব্যায়ামবীর। উপাধ্যায়ের মাধ্যমে প্রচুর আমানত আসাতে "গঙ্গা যমুনা" বিল্ডিংয়ে সে ফ্ল্যাট কেনার সময় শম্ভু তাকে সবরকম সাহায্য করে। বি এন উপাধ্যায় হঠাৎ মারা যেতে তার ছেলে প্রেম উপাধ্যায়কে শম্ভু "সঞ্চয়িতার" এজেন্ট করে নেয়। অন্যদিকে পঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের ধর্মতলা শাখার ম্যানেজার এ বি দাস শম্ভুর হয়ে কাজ করত। শম্ভুরা তাকে ভুয়ো চেক দিলে সে সেই চেক ভাঙানোর আগেই তাদের অ্যাকাউন্টে দাখিল হিসাবে দেখিয়ে একদিকে নিজে কৃতিত্ব নিত, অপরদিকে শম্ভুরা আমাতনকারীদের জানাত ওই অ্যাকাউন্টে তাদের টাকা আছে।

আশি সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে যখন মানি সার্কুলেশন অ্যাক্টের অধীনে পঁচিশটা কোম্পানিকে বেআইনী ঘোষণা করা হল, সেই তালিকায় "সঞ্চয়িতার" নাম ছিল না। এটা কিছুটা আশ্চর্যের বিষয়! কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই আশি সালের তেরই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর তৎপরতায় অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করে ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সঞ্চয়িতার অফিসে হানা দিল এবং অফিস থেকে মাত্র লাখ পাঁচেক টাকা পেল। শম্ভুর

তালতলার বাড়ি থেকে পাওয়া গেল আরও তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা, একটা বেআইনী দেশি রিভলবার, একটা লাইসেন্সড পয়েন্ট থ্রি টু স্মিথউইলসন কোম্পানির রিভলবার ও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। গ্রেফতার হল শম্ভু, বিহারীলাল, স্বপন, তপন "সঞ্চয়িতার" অফিসে ঝটপট তাদের লোকেরা নোটিস টাঙিয়ে দিল, যতদিন না ঘোষণা করা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অফিস বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ ব্যবসা বন্ধ, আমানতকারীরা কোনরকম টাকাই পাবেন না।

অফিসের সামনে আমানতকারীদের ভিড় জমে গেল। তাঁরা হা হুতাশ করতে লাগলেন। কেউ কেউ কেঁদে ফেললেন। পাগলের মতো বলতে লাগলেন, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম।" কেউ বলতে লাগলেন, "আমার মেয়ের বিয়ের কী হবে, চাকরির অবসরকালে যা পেয়েছি, সবই তো এদের এখানে রেখেছিলাম।" কিন্তু তাঁদের সেই বিলাপ শোনার তখন কেউ নেই, মালিকরা ধৃত, এজেন্টরা পলাতক।

গ্রেফতারের পরদিন শম্ভু ও বিহারীলাল হাইকোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে গেল, জামিনের সেই আদেশ দেখিয়ে তপন ও স্বপনও নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেল।

এই আঘাতে সঞ্চয়িতার "বদনাম" হয়ে যাওয়াতে শম্ভু টাকা সরাতে লাগল, অন্যদিকে সে নতুন দু-দুটো কোম্পানি খুলে ফেলেছিল। ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শম্ভু তাদের ব্যাঙ্কের টাকাও সরাতে পারল। বিওআই সঞ্চয়িতার বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টটা কাঁচা করে ফেলেছিল এবং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টও বন্ধ করতে পারেনি। শম্ভুরা বস্তা বস্তা টাকা বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে লাগল। শম্ভু ও তার সহকারী এক জমির দালাল গুজরাটি জয়সুখলাল দোশী একবার পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন এক রাষ্ট্রমন্ত্রীর পাল্লায় পড়ল। তিনি তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ফাঁদ পেতেছিলেন। শম্ভুরা তাঁর গাড়িতে দু বস্তা টাকা নিয়ে উঠল। গাড়ি ছুটল। ঘণ্টাখানেক পর মন্ত্রী মহাশয় শম্ভুদের রিভলবার দেখিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বললেন, শম্ভুরা নেমে পড়তে বাধ্য হল। ল্যাংড়া শম্ভু গাড়ি থেকে নামতে নামতে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "টাকাগুলো।"

মন্ত্রী দাঁত খিঁচিয়ে উত্তর দিলেন, "কিসের টাকা, এ্যাঁ, কিসের টাকা? এসব পাবলিক মানি, আমিও শালা পাবলিক, আমি পাবলিকের জন্য খরচ করব, তাই নিয়ে যাচ্ছি, ভাগ এখান থেকে।" শম্ভু কোনও কথা বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। টাকার বস্তা নিয়ে গাড়ি ছুটল তারকেশ্বরের দিকে। শম্ভু বুঝল, একেই বলে চোরের ওপর বাটপাড়ি! মন্ত্রী টাকা নিয়ে পালানোর কিছুদিন পর এক রবিবার সকালে জয়সুখলাল মন্ত্রীর চন্দননগরের বাড়িতে সকালবেলায় হাজির। মন্ত্রীর থেকে যদি শম্ভুর কিছু টাকার ভাগ পাওয়া যায়, এই আশায় সে ধোপদুরস্ত হয়ে পাঁচশ টাকা দামের নতুন সাদা একটা চটি মন্ত্রীর বৈঠকখানার বাইরে রেখে মন্ত্রীকে গদগদ চিত্তে, মাথা একেবারে প্রায় মাটির কাছে নামিয়ে নমস্কার করে বৈঠকখানায় বসল। মন্ত্রী তাকে দেখে একবার হেসে, ইশারায় বসতে বলে তার সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। ঘণ্টাখানেক পর মন্ত্রী মহাশয় জয়সুখলালকে বললেন, "কী খবর দোশী, সাত সকালে এখানে?" জয়সুখলাল নিজের জায়গা থেকে উঠে মন্ত্রীর কাছে গিয়ে নিচুস্বরে বলল, "দাদা, শম্ভুর ওই টাকা থেকে আমায় কিছু দেবেন না?" মন্ত্রী জয়সুখলালের আবদার শুনে বিস্ময়ে তার দিকে মিনিট খানেক বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন। জয়সুখলাল হতচকিত হয়ে তা দেখতে লাগল। মন্ত্রী হাসির দমক কিছুটা কমিয়ে বলে উঠলেন, "টাকা!" তারপর তার পাশের চেলাদের সম্বোধন করে বললেন, "ওরে ও ভোলা, ও ন্যাপলা, এ মাল কলকাতা থেকে গাঁটের পয়সা খরচা করে চন্দননগর এসেছে টাকা নিতে! একে কি বলি বল তো।" ন্যাপলারা দাঁড়িয়ে শুনছে মন্ত্রীর কথা, কেউ কেউ জয়সুখলালের দিকে জন্তু দেখার ভঙ্গিতে দেখছে। জয়সুখের অস্বস্তি চরমে। তবুও সে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মন্ত্রী এবার বলে উঠলেন, "আরে দোশী শোন, আমরা পার্টি করি কেন জানো? গরীব মানুষদের জন্য, যাতে তারা ভাল থাকতে পারে, খেতে পারে। সে জন্য আমাদের অনেক টাকার দরকার, তাদের জন্য। নয়তো আমরা কাজ করব কী করে? টাকাটা হচ্ছে আমাদের টনিক, প্রোটিন। আর

তুমি কিনা এখানে এসেছ টাকা চাইতে? পকেটে কিছু থাকলে বরং ছেড়ে যাও, তোমার পুণ্যি হবে।” মন্ত্রীর কথা শুনে জয়সুখলাল তো পালাতে পারলে বাঁচে, সে কোন মতে বলল, “আচ্ছা দাদা আজ চলি।” মন্ত্রী জোরে হেসে বলে উঠলেন, “হ্যাঁ যাও, পারতো কিছু দিয়ে গেলে ভাল হয়।” জয়সুখলাল আর কথা না বাড়িয়ে প্রায় ছুটে মন্ত্রীর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে সে তার দামি চটিটা খুঁজতে শুরু করল। সেটা নেই। জয়সুখলাল অনেক জুতোর জঙ্গল আর বৈঠকখানার আশপাশ তন্নতন্ন করে দেখতে লাগল। বৈঠকখানা থেকে তখনও শোনা যাচ্ছে হাসির হররা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোলা দোশীকে বলল, “কী খুঁজছেন?” দোশী বলল, “চটি।”

“সেটা কি? আর আছে ছাড়ুন। মাল ছাড়ুন। একটা এনে দিচ্ছি,” ভোলা দোশীকে বলল। দোশী সেটা শুনে দৌড়। খালি পায়ে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে এক জুতোর দোকান থেকে একটা হাওয়াই চটি কিনে সোজা কলকাতার দিকে রওয়ানা দিল।

মুচিপাড়া থানায় থাকতেই, এই মন্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখনও তিনি মন্ত্রী হননি। কোনদিনও যে মন্ত্রী হবেন তাও বোধহয় স্বপ্নে ভাবেননি। তাই যখন তিনি প্রথম মন্ত্রী হলেন তখনও তিনি আমাদের কমিশনার সাহেবকে “স্যার, স্যার” করে সম্বোধন করে কথা বলতেন। একদিন কমিশনার সাহেব তাঁকে বললেন, “স্যার, আপনি এখন মন্ত্রী, আমাকে দয়া করে স্যার স্যার করে সম্বোধন করবেন না।” মন্ত্রী একটু হেসে উত্তর দিলেন, “ওটা আমার পুরনো অভ্যাস, এত তাড়াতাড়ি পাল্টাই কী করে?”

জয়সুখলাল যে মন্ত্রীর বাড়িতে শম্ভুর টাকা চাইতে গিয়ে চটি খুইয়ে পালিয়ে এসেছে, তা আমি জানতাম না। হঠাৎ একদিন সেই মন্ত্রী আমাকে তলব করলেন শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে। তিনি অসুস্থ, সেখানে ভর্তি আছেন, আমাকে তাঁর কোনও কাজে দরকার, তাই তলব। বিকেলবেলা আমি হাসপাতালে যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আচমকা আমার জয়সুখলালের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। আমি তাকে দেখে বললাম, “আরে দোশী! চল, ঘুরে আসি।” সে বলল, “কোথায় দাদা?” বললাম, “মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাব।” জয়সুখলাল মন্ত্রীর নাম শুনেই আঁতকে উঠে বলল, “না দাদা; ওখানে আমি যার না, আপনি যান।” বললাম, “কেন?” সে বলল, “সে অনেক কথা, পরে শুনবেন।” বললাম, “ধুত, গাড়িতে ওঠো তো, যেতে যেতে শুনব।” জয়সুখলাল ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠে বসে বলল, “গাড়িতে যাচ্ছি, কিন্তু ওনার সঙ্গে আমি কিন্তু দেখা করব না।” হেসে বললাম, “ঠিক আছে, এখন বল কী হয়েছিল যে তুমি যেতে চাইছ না।”

জয়সুখলাল তখন যেতে যেতে চন্দননগরের মন্ত্রীর বাড়িতে চটি হারানোর গল্প বলতে লাগল। পরিশেষে বলল, “ও দাদা একটা অদ্ভুত লোক আছে।” আমি তার পুরো কাহিনী শুনে হেসে ফেলতে গিয়ে হাসলাম না। ততক্ষণে আমাদের গাড়িও হাসপাতালে পৌঁছে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে দোশীকে বললাম, “নেমে এস, চল, দেখা করে আসি।” দোশী তো কিছুতেই নামবে না। আমি তখন বললাম, “দোশী, তোমার ভয় নেই, আমি তো আছি।” দোশী আমার কথা শুনে একটু ভরসা পেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সঙ্গে চলল মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

গিয়ে দেখি, মন্ত্রী আধশোয়া হয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে একজন নার্সের সঙ্গে কথা বলছেন। আর তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে একজন গ্রাম্য লোক। তার দিকে তিনি ফিরেও দেখছেন না। নার্সের সঙ্গেই কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনায় মগ্ন। আমরা ঢুকতেই মন্ত্রী আমাকে দেখে বলে উঠলেন, “এসে গেছ, ভাল হয়েছে, সঙ্গে মালদার দোশীও আছে।” দোশী একটু হাসল, কোনও কথা বলল না। দু একটা আলতু ফালতু কথা বলে নার্সকে তিনি বললেন, “তুমি একটু ঘুরে এস, আমি —।” নার্স চলে যেতেই মন্ত্রী আমাকে একটা কাজের কথা বললেন। আমি শুনলাম। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই মনে করে তাঁকে বললাম, “আমি তাহলে এখন যাই।” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, যাও।” তারপর কি মনে করে বলে উঠলেন, “আরে তোমরা শুধু মুখে ফিরে যাবে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওরে তোরা কে আছিস।” তাঁর হুঙ্কারে

দেখলাম, কেবিনের পর্দা ফাঁক করে একটা লোক ভেতরে এল। মন্ত্রী তাকে বললেন, "এদের দুজনকে চা খাওয়াও তো হেবো।" মন্ত্রীর নির্দেশ নিয়ে হেবো নামের লোকটি চলে গেল। আমি আর দোশী দাঁড়িয়ে আছি। দোশীর ঘাম ঝরছে বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় তো নেই, উনি যে মন্ত্রী! মিনিট তিনেকের মধ্যেই দেখলাম হেবো দুটো ছোট্ট ছোট্ট মাটির ভাঁড়ে কালো চা নিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। হেবোর কর্মতৎপরতাকে বাহবা দিতেই হবে। ও যেমন চটজলদি চা এনে দিল, আমরাও ততোধিক কুশলতা দেখিয়ে ওই ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা গলাধঃকরণ করে পাকস্থলীতে চালান করে দিলাম। পাকস্থলীর ভেতরটা নেচে ওঠার আগেই বললাম, "এবার তবে আসি।" মন্ত্রীমশাই বললেন, "হ্যাঁ।" আমরা কেবিনের দরজার দিকে হাঁটা শুরু করতেই তিনি দোশীকে বললেন, "দোশী, শোন।" দোশী মুখ ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "পকেটে কত টাকা আছে?" দোশী কাচুমাচু হয়ে বলল, "টাকা তো সঙ্গে আনিনি।" মন্ত্রী একটু হেসে বললেন, "তুমি মালদার, তোমার কাছে কি টাকা নেই! শোন, আমার জন্য চাইছি না, এই লোকটাকে তিনশ টাকা দাও তো।" তিনি সেই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম্য লোকটার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন। দোশী আর কি করে, পকেট থেকে তিনশ টাকা বার করে সেই লোকটার হাতে দিয়ে দিল।

আমরা আর দাঁড়ালাম না, দোশী তো প্রায় ছুটতে শুরু করেছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে আমায় বলল, "দেখলেন তো, কেন যেতে চাইছিলাম না, এক এক ভাঁড় ঠাণ্ডা চা দেড়শ করে দু ভাঁড়ের জন্য তিনশ টাকা দিতে হল।" দোশীর এবারের কথায় আর না হেসে পারলাম না। আমরা গাড়িতে এসে বসলাম।

তবে বাটপাড়ের ওপর বাটপাড়িতে আরও ওস্তাদি দেখাল গোপাল কেডিয়ার দাদা গণেশ কেডিয়া। সে শম্ভুকে চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্ক লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক কোটি টাকা নিয়ে গেল। গণেশের এই খেলাতে শম্ভুর কোমর একেবারে ভেঙে গিয়েছিল।

যে দুটো কোম্পানি শম্ভু টাকা সরানোর জন্য খুলেছিল, তার একটা রাজধানী ফাইনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। শম্ভু তার এজেন্টদের মাধ্যমে আমানতকারীদের বোঝাতে লাগল, সঞ্চয়িতার সার্টিফিকেটটা রাজধানী ফাইনান্সিয়ালের নামে বদল করে নিতে। এই বদলের জন্য আরও কিছু টাকা চাই। আমানতকারীদের অনেকেই শম্ভুর নতুন চালে পা দিয়ে আরও কিছু টাকা দিয়ে সঞ্চয়িতার সার্টিফিকেট রাজধানীর নামে করিয়ে নিল। শম্ভুর ঘরে নতুন করে টাকা চলে এল। এ ব্যাপারে শম্ভুর অংশীদার ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশু আইচ। আর উপাধ্যায় ও বি মুখোপাধ্যায় ছিল ক্যালকাটা কনস্ট্রাকশনের অংশীদার। সেখানে শম্ভু বহু টাকা মূলধন হিসাবে সরিয়ে রেখেছিল। এই কোম্পানিরও অংশীদারী শেয়ার হিসাবে এবার আমানত তুলতে লাগল।

ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের ঢিলেঢালা তদন্ত ও পদক্ষেপের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনা সঞ্চয়িতার বিরুদ্ধে সমস্ত মামলাই আদালতে খারিজ হতে লাগল, এমনকি সুপ্রিম কোর্টেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদন নাকচ হয়ে গেল। কিন্তু আমানতকারীরা শম্ভুদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা একের পর এক বিভিন্ন আদালতে পেশ করতে লাগল। তাতে শম্ভুদের নাভিশ্বাস উঠে গেল। অন্যদিকে আমানতকারীরা এজেন্ট, সাব এজেন্টদের ওপর লগ্নি ফেরত দেবার জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকায় ওরা অস্থির হয়ে উঠে শম্ভুদের ওপর চাপ বাড়াতে লাগল। তপনরা কায়দা করে সেই চাপ নিতে অস্বীকার করাতে সব চাপ শম্ভুর ঘাড়ে পড়তে লাগল। সঞ্চয়িতার সার্টিফিকেটে শম্ভুর স্বাক্ষর থাকাতে স্বপন-তপনরা নিজেদের দায় শম্ভুর দিকে চালান করার সুবিধা পেয়ে গেল। তারা প্রচার করতে লাগল, যা টাকা আছে সব শম্ভুর কাছে আছে।

এদিকে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সঞ্চয়িতার সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও উদ্ধার করা আমানত নিয়ে লগ্নিকারীদের বিলি ব্যবস্থা করার জন্য একটা কমিশন গঠন করা হল। কমিশন শশীভূষণ দে স্ট্রিটে অফিস খুলে সঞ্চয়িতার নামে ও বেনামে রাখা সব স্থাবর

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে লাগল।

একদিন সকালবেলা শম্ভু মুম্বই যাওয়ার জন্য দমদম বিমানবন্দরে যাচ্ছিল। ভি আই পি রোডে দমদমের কাছে অন্য একটা গাড়িতে চড়ে ছ-সাতজন যুবক এসে তার গাড়ি আটকাল। তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দিল তারা। শম্ভুর ড্রাইভার কলকাতায় ফিরে এসে সেই খবর জানাল।

সে বলল, গাড়ি যখন কৈখালি ছাড়িয়েছে, পেছন থেকে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি দ্রুত ছুটে এসে তাদের গাড়িকে পাশ কাটিয়েই সামনে দাঁড়িয়ে যায়। বাধ্য হয়ে সেও গাড়ি দাঁড় করায়। সাদা গাড়িটা থেকে ছ-সাতজন পঁচিশ তিরিশ বছরের যুবক নেমে এসে তাদের গাড়ি ঘিরে ফেলে। একজন লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয় তার দিকে ও পেছনে বসা শম্ভুর চোখে। সে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। যদিও গুঁড়ো বেশি তার চোখে ঢোকেনি, তবু চোখ জ্বালা করাতে সে চোখ বুজে ফেলে, তবে তাদের জুতোর আওয়াজ ও কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছে, তার 'সাহেবকে' টেনে হিঁচড়ে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়েছে। ছেলেগুলো তার 'সাহেব'কে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছিল। আর সাহেব খালি "চোখ গেল, চোখ গেল" বলে চিৎকার করছিল। তারপর সে আর কিছু জানে না। পাশের বস্তির কটা ছেলে তাকে সুস্থ করাতে বহুক্ষণ বাদে সে আস্তে আস্তে ফিরে আসে। এই কিডন্যাপের খবর আমাদের কাছেও এসে পৌঁছল। কিন্তু আমরা সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করলাম না। কারণ প্রতারক ঘেঁটে ঘেঁটে আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে ঝালিয়ে দেখলাম, প্রতারকরা নিজেরাই অসুবিধায় পড়লে অন্তর্ধান করে। মনে হল, শম্ভু পালিয়েছে। আর এই কিডন্যাপের গল্পটা শম্ভু তার ড্রাইভারকে দিয়ে বানিয়ে কলকাতায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এই কাহিনীর শেষ অঙ্ক দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। দিন দশ পরে শোনা গেল শম্ভু তার তালতলার বাড়িতে ফিরে এসেছে, দারুণ অসুস্থ, হৃদযন্ত্র সর্বক্ষণ দাপাদাপি করছে। তাকে হরণ করার সময় চোখে লঙ্কা গুঁড়ো ছুঁড়ে দেওয়াতে সে এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছে না। বাড়িতে ডাক্তার, নার্স, অক্সিজেন মজুদ।

শম্ভু ফিরে আসার পর আমাকে একদিন তখনকার যুগ্ম কমিশনার সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "শম্ভুকে একবার দরকার, কোথায় কোথায় টাকা রেখেছে জানতে হবে। সরকার থেকে চাপ আসছে।" বললাম, "ওর নামে কি কোনও ওয়ারেন্ট আছে?" তিনি জানালেন, "না, সেজন্যই তো আপনাকে বলছি।" অর্থাৎ ঝুট ঝামেলার কাজ মানেই আমি।

কি করি? গেলাম শম্ভুর তালতলার বাড়িতে। আমার সঙ্গে আছে আমার এক পুরনো পরিচিত লোক মি. বি মুখোপাধ্যায়, যে শম্ভুরও খুব ঘনিষ্ঠ সে আমার সঙ্গে এসেছে শম্ভুকে দেখাতে যে, তার সঙ্গে আমার খুব দহরম মহরম আছে, আর এই খাতিরটা ভাঙিয়ে সে শম্ভুর থেকে আরও কিছু ধান্দা করার ফন্দি এঁটে এসেছে। দেখলাম, শম্ভু শুয়ে আছে, অক্সিজেন লাগানো। বিছানার পাশে একটা টেবিলে রাখা আছে বহুরকম ওষুধপত্তর। উপস্থিত সবার চোখমুখ উদ্বিগ্ন। শম্ভু চোখের ওপর পট্টি লাগানো। দেখতে পাচ্ছে না।

মনে মনে ভাবলাম, দারুণ স্টেজ, আর শম্ভুও পাকা অভিনেতা। অর্থাৎ সবাইকে জানাচ্ছে, এখন আমাকে জ্বালাতন কোরো না। আমি জীবন-মরণের টানাটানির মাঝখানে। আগে বেঁচে উঠি, তারপর তোমাদের আবদার শুনব। আমি যে ফিরে এসেছি, এটাই যথেষ্ট। তোমরা এখন এতেই সন্তুষ্ট থাক। শান্ত থাক।

কাউকে কিছু না বলে আমি ডাক্তারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলাম, "শম্ভুর কী হয়েছে?" তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "হয়েছে তো অনেক কিছু, আপনাকে কোনটা কোনটা বলি বলুন তো?" ডাক্তারের এই রকম অদ্ভুত উত্তরে একটু অবাকই হয়ে বললাম, 'কেন, যা যা হয়েছে তাই বলবেন।" তিনি তখন চিন্তিত মুখ করে বললেন, "হার্টের অবস্থা সুবিধার নয়, প্রেসার হাই, শরীরও দুর্বল। পেটে গ্যাস, নার্ভাস

ব্রেকডাউন, অনেক কিছু।" ডাক্তারের কথা শুনে আমারই নার্ভাস হওয়ার পালা। এত কিছু যে লোকটার হয়েছে তাকে লালবাজারে নিয়ে যাব কি করে? বললাম, "এ তো দেখছি ওর শরীরে একটা হাসপাতাল ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার।" তিনি বললেন, "তা ঠিক।" আমি ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে ঝট করে বলে ফেললাম, "তবে ওকে কোনও ভাল নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না কেন, সেটাই তো সুবিধা হত।"

ডাক্তার আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতে করতে বললেন, "আমিও তাই বলেছিলাম, কিন্তু বাড়ির লোক চাইছে না।" জানতে চাইলাম, "তারা কি চাইছে?" তিনি বললেন, "তাদেরই জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমার সময় নেই, একটু ঘুরে আসতে হবে, চলি।"

হঠাৎ কেন জানি না, মনে হল, ডাক্তার আমার প্রশ্নের জবাব দিতে চাইছেন না, বরং আমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছেন। ডাক্তার চলে গেলে আমি শম্ভুকে নিয়ে যেতে পারব না, কারণ ওর বিরুদ্ধে কোনও গ্রেফতারী পরোয়ানা নেই, তার ওপর অসুস্থ, কিছু হয়ে গেলে আমারই ওপর সব দায়িত্ব বর্তাবে। তাই ঠিক করলাম ডাক্তারকে আটকাতে হবে, ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে। বুঝতে হবে, শম্ভুকে সত্যিই লালবাজারে নিয়ে যেতে পারব কি পারব না। এবার গম্ভীর হয়ে বললাম, "একটু দাঁড়ান।" ডাক্তার আমার কথায় বিরক্ত হয়ে প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "কি ব্যাপার, আমায় জ্বালাচ্ছেন কেন, যা বলার বলেই তো দিয়েছি, আর কি জানার আছে তাড়াতাড়ি বলুন।" খিঁচুনি হজম করতে আমি চিরদিনই কম পারি, তার ওপর শম্ভু এমন কোনও মহান ব্যক্তি নয় যে তার জন্য আমাকে ডাক্তারের দাঁতখিঁচুনি হজম করে লালবাজারে ফিরে যেতে হবে। বুঝলাম, ডাক্তারের কোনও একটা জায়গার মাটি আলগা আছে, যা দিলেই হুড়মুড়িয়ে ধসে যেতে পারে। আমি তাই আমার আস্তিন থেকে কালো রুণুকে বের করে সোজাসুজি বললাম, "দেখুন, আমাকে পরিষ্কার করে সত্যি কথা বলুন, নয়তো আমি অন্য ডাক্তার নিয়ে এসে পরীক্ষা করাব, তখন কিন্তু আপনি ঝামেলায় পড়ে যাবেন, আপনার ডাক্তারি লাইসেন্স নিয়ে টানাটানি হবে। শম্ভু কি অতই অসুস্থ যা আপনি বললেন? আর সত্যিই কি চোখে দেখতে পাচ্ছে না?" ডাক্তার আমার কথা শুনে চুপসে গেলেন, বিরক্ত গলা বদলে গেল। গলা আস্তে করে বললেন, "আহা, সবই তো বোঝেন, আমি টাকা নিই, সেই মতো কাজ করে দিই।" জানতে চাইলাম, "তার মানে আপনি বলছেন, ওর ওসব কিচ্ছু হয়নি, তাইতো?" ডাক্তার গলার স্বর একেবারে নিচু পর্দায় নামিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কিছু হয়নি। সব ঠিক আছে।" আমি ডাক্তারকে বললাম, "ওকে লালবাজারে নিয়ে যেতে এসেছি, আশা করি নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা হবে না।" ডাক্তারবাবু জানালেন, "না।" এবার আমি শম্ভুর ঘরে গিয়ে আবার ঢুকলাম। সঙ্গী বি মুখোপাধ্যায়কে জোরে বললাম, "ওকে বল, আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের জন্য লালবাজারে যেতে। কোনও চিন্তা নেই, আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাব।" শম্ভুর চোখের ওপর পট্টি, দেখতে পাচ্ছে না, তাই আমিই তাকে আমার নামটা বলে বললাম, "আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে, কিছুক্ষণ পর ফিরিয়ে দিয়ে যাব।" পাশে দাঁড়ানো এক নার্সকে বললাম, "ওর নাক থেকে অক্সিজেনের নলটা খুলে নিন।" নার্স কী বলতে যাচ্ছিলেন। আমি তার আগেই সিলিন্ডারের কানেকশনটা হাত বাড়িয়ে খুলে দিতে তিনি শম্ভুর নাক থেকে অক্সিজেনের পাইপ খুলে দিতে বাধ্য হলেন। শম্ভু কি একটা বলল। শোনা গেল না। আমি চোখ থেকে পট্টিটাও খুলে নিলাম। বললাম, "চোখ খুলুন।" সে বুঝে গেছে তার খেলা আমি ধরে ফেলেছি। তখন বাধ্য হয়ে সে চোখ খুলে মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকাতে সে জানাল, "ভয় নেই, তোমাকে গ্রেফতার করবে না, কিছু কথা জেনেই তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে।"

শম্ভুকে বিছানার থেকে টেনে তুললাম। আমি তো ডাক্তারের থেকে জেনেই নিয়েছি যে আমার পর্যবেক্ষণ সঠিক, অর্থাৎ শম্ভুর কিচ্ছু হয়নি। সে অসুস্থতার ভান করে শুয়ে আছে। সুতরাং · ওকে হাত ধরে টেনে তুলতে আমার কোনও দ্বিধাই হল না। বাধ্য হয়ে শম্ভু উঠে বসে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, "কিছুক্ষণ পর বাড়ি পৌঁছে দেব।" শম্ভুকে নিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম।

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে, আমার পাশে পেছনের সিটে শম্ভু। বি মুখোপাধ্যায়কে ওখানে থেকেই বিদায় দিয়েছি। ওই ডাক্তারও চলে গেছে। তার কথাও ভাবছি, পয়সায় ওরা সব পারে। সেই ডাক্তার পরবর্তীকালে আবার কলকাতার শেরিফ হয়েছিল।

তালতলার থেকে লালবাজার আর কতদূর? এটুকু রাস্তার মধ্যে ওকে ধসিয়ে দিতে হবে। একটা ফাটকা খেলে দিলাম। শম্ভুকে আস্তে অথচ দৃঢ় স্বরে বললাম, "আপনার ড্রাইভার সিং সব স্বীকার করেছে যে কেউ আপনাকে কিডন্যাপ করেনি। নিজেই গাড়ি থেকে নেমে ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তা এতদিন কোথায় ছিলেন?"

শম্ভু আমার দিকে তাকিয়ে কি বুঝলো জানি না, নিচু গলায় বলল, 'একদিন ছিলাম তিতুমীর গেস্ট হাউসে, তারপর চলে যাই দার্জিলিং, তারপর কালিম্পঙ, কার্শিয়াং, এখানে ওখানে ঘুরে আবার কলকাতায়। প্রশ্ন করলাম, "এলেন কেন?" "কিছু কাজে।" শম্ভুর নিরুত্তাপ উত্তর। বললাম, "ড্রাইভারটা তো ভেগেছে। ভাল টাকা পেয়েছে নিশ্চয়ই।" শম্ভু মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

লালবাজার এসে গেছে। আমারও কাজ শেষ। তাকে যে কিডন্যাপ করা হয়নি, সে নিজেই একটা গল্প বানিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল তাও জেনে গেছি। যারা প্রতারক তাদের কথা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে।

লালবাজারে আমি শম্ভুকে নিয়ে এসে যুগ্ম কমিশনারের কাছে পৌঁছে দিলাম। ওকে যা জিজ্ঞাসাবাদ করার তাঁরাই করবেন। আমাকে শুধু তাকে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেটা পালন করে আমি আমার ডাকাতি দমন শাখায় চলে গেলাম। বড়সাহেবরা শম্ভুকে ঘণ্টা দুই তিন পর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে বাড়ি চলে যায়।

এই জেরা করার ঘটনার কয়েকদিন পর শম্ভু তার বিরুদ্ধে জমতে থাকা আমানতকারীদের আনা বহু প্রতারণার মামলার আগাম জামিন নিতে হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট জামিন নাকচ করে দেয়। কোর্টের মধ্যে শম্ভু বুঝতে পারে পরিস্থিতি তার অনুকূল নয়। যখন তখন সে গ্রেফতার হতে পারে, এমন কি তার ওপর আক্রমণও হতে পারে। সে তার এক প্রাক্তন এজেন্ট এ্যাডভোকেট মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় হাইকোর্টের বিধানসভার দিকের দরজা দিয়ে লুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেখান থেকে টেম্পল চেম্বার রোডের বাড়ি। বাড়ি থেকে একটা সুটকেস নিয়ে উঠে বসে একটা ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা দেখা করে তার আর এক অনুচর বাদুড়বাগানের দীপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দীপকের সাহায্যে সে এবার পালায় বেনারস।

বেনারস থাকাকালীন শম্ভু দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রতিদিন গঙ্গায় পুজো দিতে যেত। বেনারস থেকে এলাহাবাদ। সেখানে বিশ্বনাথবাবু নামে একজনের বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর লক্ষ্ণৌ। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে দিল্লি। দিল্লিতে ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর আশ্রমে শম্ভু থাকতে লাগল। পুরোপুরি আত্মগোপন করল শম্ভু।

এদিকে কলকাতা, মুম্বই সব জায়গার আমানতকারীদের মধ্যে এমন প্রচার চালাল তপনরা, যে তাদের বিশ্বাস করাতে পারল, সঞ্চয়িতার বাকি টাকা শম্ভু আত্মসাৎ করে পালিয়েছে। এটা করে তপনরা আমানতকারীদের চাপ নিজেদের ওপর থেকে কমিয়ে ফেলল। এই প্রচারে পুলিশের একাংশও বিশ্বাস করতে লাগল যে শম্ভুর কাছে বিরাট অংকের টাকা আছে। তাছাড়া পত্রপত্রিকায় সঞ্চয়িতা ও শম্ভুর নামে প্রচুর লেখালেখিতে বিশ্বাসটা মানুষের মনে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

শম্ভু ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সাহচর্যে থাকতে থাকতে নিজের শরীরের মেদ কিছুটা কমিয়ে ফেলল। তার কাছে টাকাও ফুরিয়ে এল। সে একদিন বিধবার বেশ ধরে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় এল এবং আড়িয়াদহের কাছে তার অতি ঘনিষ্ঠ সুকুমার ভট্টাচার্যের বাড়িতে উঠল। সেখানে বসে সুকুমারের মাধ্যমে এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলতে লাগল, সঞ্চয়িতার পুরনো সার্টিফিকেটগুলোকে আরও কিছু টাকা দিয়ে রাজধানী ফাইনান্স বা

ক্যালকাটা কনস্ট্রাকশনের নামে করিয়ে নিতে। বেশ কিছু আমানতকারীর টাকা নতুন করে পকেটে পুরে শম্ভু আবার বিধবার সাজ নিয়ে দিল্লি চলে গেল। যখনই শম্ভুর টাকার টান পড়ত, সে এভাবে কলকাতায় এসে টাকা তুলে আবার পালাত। বছর দুই শম্ভু গ্রেফতার এড়িয়ে লুকিয়ে রইল।

শম্ভুকে ধরবার জন্য সরকার থেকে কমিশনার সাহেবকে চাপ দিতে লাগল। বিশেষ করে প্রথম বামফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র আমাদের কমিশনার নিরুপম সোম সাহেবকে বলতে থাকলেন, "একটা চিটিংবাজকে আপনারা ধরতে পারেন না, কি করেন?" মন্ত্রীমশাইয়ের বিশ্বাস ছিল, শম্ভুর কাছে বহু কোটি টাকা আছে। সুতরাং ওকে ধরতে পারলে, সেই টাকা উদ্ধার করতে পারলে কমিশনের মাধ্যমে তা আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের যুগ্ম কমিশনার সাহেব একদিন সকালবেলা আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "দেখুনতো শম্ভুকে পাওয়া যায় কিনা।" তিনি আরও জানালেন, তখনকার ডিসি ডিডি (টু) অসীম চট্টোপাধ্যায়কে সব দায়িত্ব দেওয়া আছে, তিনিই গ্রেফতারী পরোয়ানা সব বের করে রাখবেন।

যুগ্ম কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে ফিরে আমি আমার দফতরে এসে বসলাম, কোথা থেকে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। তখন ডাকাত দমন করার জন্য এতই ব্যস্ত ছিলাম যে সঞ্চয়িতা ও শম্ভু সম্পর্কে কার্যকরী কোনও খবর রাখার সময় পাইনি। অবশ্য অন্য অফিসাররা যে তার খোঁজে ব্যস্ত সেটা শুনতে পেতাম। একটা আসামীকে খুঁজতে সবাইকেই বলা যায়, সেই হিসাবে আমাকেও দায়িত্ব দেওয়া হল।

শম্ভুর এক বিশেষ সহচর, সেই জয়সুখলাল দোশী, যে তার হয়ে সম্পত্তি কেনা-বেচার কাজ করত তার ক্যামাক স্ট্রিটের সাজানো অফিসে চলে গেলাম। পাশে ডেকে তাকে বললাম, "দোশী, শম্ভু কোথায় আছে আমায় জানাও, নয়তো ফল ভাল হবে না।" দোশী অসম্ভব চালাক। বড় বড় সম্পত্তির দালালীর ব্যবসা তার, সে শম্ভুর গতিবিধি জানলেও চট করে বলবে না। তবে একটাই ভরসা, দোশী বুঝে গেছে যে শম্ভুর থেকে তার আর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অর্থাৎ দোশীর কাছে শম্ভু মৃত। এইসব 'মৃত' প্রাক্তন খদ্দেরদের দোশীরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে একবিন্দু সময় নেয় না। সুতরাং চট করে না বললেও চটাচটি করলে যে খবর বেরিয়ে আসতে পারে সে সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে।

জানি, জয়সুখলাল দোশীর উপস্থিত বুদ্ধিও অসম্ভব প্রখর। একবার আমি ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে লালবাজারে ফিরছি। দুপুরবেলা। ভাবলাম দোশীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। আমি এ ধরনের যোগাযোগ রাখতাম, কখন কোন খবর পরিচিতজনের কাছে টোকা মারতে মারতে পেয়ে যাব, তার তো আগাম কিছু জানা যায় না। তাই সময় পেলেই ঢুঁ মেরে দেখা আমার পুরনো অভ্যাস। সেই অভ্যাসের বলেই তার অফিসের কাচের দরজা ঠেলে ঢুকেছি কি ঢুকিনি, সঙ্গে সঙ্গে জয়সুখলাল বলে উঠল, "দোশী তো নেই স্যার, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বহুদিন আর অফিসে আসে না।" ওর কথা শুনে চট করে বুঝলাম, কিছু একটা বিশেষ কারণ আছে। দেখলাম, অফিসে তিনজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কোনওদিনও দেখিনি। আমি চুপ করে গেলাম। দোশীকেই বললাম, "তাই? তাহলে চলি।" দোশীর অফিস থেকে আমি বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম, আমার পেছন পেছন দোশীর একজন কর্মচারী। সে এসে আমাকে বলল, "স্যার, কিছু মনে করবেন না, ওরা তিনজন আয়কর দফতর থেকে এসেছে, বুঝতেই তো পারছেন।"

বললাম, "বুঝলাম, ওকে যোগাযোগ করতে বোলো।" এই ঘটনার ক'দিন পর ইডেনে টেস্ট খেলা ছিল, আমার দায়িত্ব ছিল ভি আই পি গেটে। সেখানে দেখি, জয়সুখলাল দোশী খেলা দেখছে আর তার পাশে আয়কর দফতরের সেই অফিসারটি, যার নেতৃত্বে সেদিন দোশীর অফিসে তারা হানা দিয়েছিল। খেলা দেখার ফাঁকে দোশী একসময় উঠে এসে

আমাকে হাসতে হাসতে বলে গেল, “স্যার, ওই শালা ইনকাম ট্যাক্সওয়ালা ম্যানেজ হয়ে গেল। কতদিন আর পাগল বনে থাকব?” আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, “তাই তো, ওরা থাকতে তুমি কেন পাগল হবে?”

ওই দোশীর হরেক রকম গুরুদেব ছিল। কালো বাবা, সাদা বাবা, ল্যাংড়া বাবা ইত্যাদি। এই বাবাদের সে নিয়ে আসত বিভিন্ন জায়গা থেকে নিজের বাড়িতে। নিয়ে আসার আগে সে নিজেই তার হয়ে মহিমা কীর্তন প্রচার করে দিত এবং মাড়োয়ারী, গুজরাটি সমাজের বহু লোককে “বাবা” দর্শনের জন্য তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাত। আসলে এই বাবা আমদানি করে সে ব্যবসায়ী মহলে নিজের আধিপত্য ও যোগাযোগ বাড়িয়ে নিত। বাবাকেও সে তার ব্যবসার উন্নতির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করত। 'বাবার' মুখ দিয়ে বলিয়ে নিত তাকে কোন কাজের বরাতটা দিতে। সে সেই ব্যবসাটা পেয়ে যেত। একবার আমিও কৌতূহল মেটাতে এমনই এক বাবা দর্শনে গিয়ে দেখি সেখানে বিরাট ভিড় আর সেই ভিড়ের মধ্যে রয়েছে বাংলা ছবির কিছু চিত্রতারকা। তাদেরও দোশী আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে নিজের গরিমা দেখানোর জন্য।

মাখন চকচকে সেই বাবাকে দোশীর বাড়িতে দেখে আসার ক'দিন পর একদিন দমদম বিমানবন্দরে আবার দোশীর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, “কি দোশী, কেউ আসবে বুঝি?” দোশী একগাল হেসে বলল, “হ্যাঁ, দিল্লি থেকে কালা বাবা আসবেন, তাকে নিয়ে বাড়ি যাব। কাল সকালে আসুন না, বাবাকে দর্শন করতে।” দোশীর চালাকিটা জানি, ক'দিন আগে এক গুরুদেব এনেছিল, আবার আজ নতুন এক গুরুদেবকে নিয়ে আসছে শুনে মনে মনে রেগে গেলেও মুখে বললাম, “না দোশী, আমার সময় হবে না, তোমার গুরুদেব তোমার মাথায় থাক।”

এহেন ধূর্ত দোশীর থেকে আমায় খবর বার করতে হবে। দোশী আমার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বলল, “না স্যার, শম্ভুর বহুদিন কোনও খোঁজ পাইনি।” দোশীর কথা না শোনার ভান করে জানতে চাইলাম, “শম্ভু কি কলকাতায় আছে?” দোশী জানাল, “আমি কিচ্ছু জানি না স্যার।” দোশীকে একটা টোপ দিয়ে বললাম, “শোন দোশী, শম্ভুর খোঁজ দাও, দু একদিনের মধ্যে আমাকে জানাও। তুমি খবর দিলে, তোমার অন্য কাজে আমি মদত করব।” এদের কোনও বিশেষ লোভ না দেখালে কাজ পাওয়া যায় না। তাই টোপটা ছেড়ে রাখলাম। তাছাড়া ওর অংশীদারের সঙ্গে যে একটা ঝামেলা চলছে সেটা শুনেছিলাম। আমি সেই দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

সেদিন দোশীকে টোকা দিয়ে এলেও আমি অন্যদিকেও খবর নিতে শুরু করলাম। আর দোশীকে খবরের জন্য তাগাদাও মারতে লাগলাম। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির দোশী আমার উৎপাতের চোটে সত্যিই কাজে নেমে গেল। সে খবরও পেলাম।

কদিন পর সন্ধের মুখে দোশী এসে হাজির লালবাজারে। বুঝলাম কোনও খবর পেয়েছে, নয়তো খালি হাতে ও মুখ দেখাতে আমার কাছে আসবে না। প্রশ্ন করলাম, “কি দোশী, খবর পেলে?” দোশী বলল, “আমি নিজে কিছু জানিনা, তবে শেঠিয়া জানতে পারে।” জানতে চাইলাম, “কোন শেঠিয়া, তোমার পার্টনার?” সে বলল, “হ্যাঁ।” আমি প্রশ্ন করলাম, “শেঠিয়া যে জানে তুমি জানলে কি করে?” সে জানাল, “ওকে শম্ভুর পুরনো লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি, কি কাগজপত্র দেওয়া নেওয়া করছিল। ওদের কথায় মনে হল, শেঠিয়াকে শম্ভুর ব্যাপারে কিছু জানিয়েছে।” জানতে চাইলাম, “শেঠিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?” দোশী বলল, "খুব সম্ভবত বাড়িতেই।” আমি আর দেরি করলাম না। দোশীকে বললাম, “তুমি বস, আমি শেঠিয়াকে নিয়ে আসছি।”

দোশীকে লালবাজারে বসিয়ে আমি গাড়ি নিয়ে ছুটলাম শেঠিয়ার বড়বাজারের বাড়িতে। ফেরেনি। কোথায় গেছে শেঠিয়া, বাড়ির কেউ বলতে পারল না। আমি ওর বাড়ির সামনেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেঠিয়া ফিরল, তখন রাত বারটা। আমাকে দেখেই চমকে উঠে

জিজ্ঞেস করল, “কি ব্যাপার রেনুদা, আপনি এখানে?” বেশিরভাগ মাড়োয়ারিই আমাকে রেনুদা নামে ডাকে। আমি নিজের মনের উত্তেজনা দমিয়ে রেখে বললাম, “শেঠিয়া, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে, তুমি বাড়িতে বলে এস, আমার সঙ্গে একবার লালবাজার যাচ্ছ। ফিরতে একটু দেরি হবে।” আমার কথা বলার ভঙ্গিতে এমনভাবে আদেশের স্বর মিশিয়ে দিয়েছিলাম যে, শেঠিয়া সেটা বুঝে তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে এসে আমায় বলল, “চলুন।” আমি শেঠিয়াকে সোজা লালবাজারে আমার ঘরে নিয়ে এসে হাজির। সেখানে তখনও বসে আছে দোশী। শেঠিয়া তো দোশীকে ওখানে দেখতে পাবে ভাবতেই পারেনি। তাই অবাক।

অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমি সরাসরি শেঠিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, “শেঠিয়া, শম্ভুকে কোথায় পাব?” সে বলল, “আমি জানি না, তবে মনে হয় স্বপন রায় জানে।” জানতে চাইলাম, “কোন স্বপন রায়, এয়ারপোর্টের স্টুয়ার্ড?” শেঠিয়া বলল, “হ্যাঁ, সঞ্চয়িতার পুরনো এজেন্ট।” জানতে চাইলাম, “স্বপন যে জানে তুমি কি করে জানলে?” শেঠিয়া বলল, “স্থাপন আজ সকালে আমার কাছে ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার ক’টা ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছিল, সেগুলো দেখিয়ে বলল, এসব সার্টিফিকেট হচ্ছে শম্ভুর, তার কাছে এমন বারো কোটি টাকার সার্টিফিকেট আছে, সেগুলো সে কারও কাছে জমা দিয়ে লাখ পনেরো টাকা দু তিনমাসের জন্য চায়, দু তিনমাসের মধ্যে সেই টাকা ফেরত না পেলে সে সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে টাকা তুলে নিতে পারবে।” বললাম, “সার্টিফিকেটগুলো কই?” শেঠিয়া বলল, “ওগুলো স্বপন নিয়ে গেছে, আমি একটা যাচাই করে দেখেছি, সেটা ঠিকই আছে। আমি স্বপন রায়কে সিগন্যাল দিলে সেগুলো আবার নিয়ে আসবে টাকা নেওয়ার জন্য। তাই আমি আজ সারাদিন তেমন লোক খুঁজেছি, যে সার্টিফিকেট রেখে টাকা দিতে পারবে। ওখান থেকে আমারও কিছু কমিশন হবে, আপনি বুঝেছেন তো?”

শেঠিয়ার কথা শুনে মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে নিয়ে ওর কাছে জানতে চাইলাম, “স্বপন রায়কে এখন নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে পাওয়া যাবে?” শেঠিয়া বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে?”

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের বললাম, “তোমরা বস, আমি আসছি।” আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আমাদের গোয়েন্দা দফতরের বারান্দায় পায়চারি করতে শুরু করলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী আজ রাতেই স্বপনকে ধরতে হবে। কারণ স্বপন রায় যদি জেনে যায় আমি শেঠিয়াকে লালবাজারে নিয়ে এসেছি, তবে সে সতর্ক হয়ে যাবে। শম্ভুকেও সতর্ক করে দিতে পারবে। আর শম্ভু যে কলকাতাতেই আছে, তা শেঠিয়ার কথাতেই আমি নিশ্চিত। নয়তো স্বপন ওই সব সার্টিফিকেট নিয়ে আসত না। শম্ভুর প্রয়োজনেই সে এদিক ওদিক টাকার জন্য ঢু মেরেছে। যখন টাকার জোগাড় হয়ে যাবে, তখন সে শম্ভুর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসে টাকা নিয়ে যাবে। তার মানে শম্ভু কোথায় আছে তা স্বপন জানে।

কিন্তু কাকে নিয়ে স্বপনের বাড়ি যাব? পুরো দফতর ফাঁকা। আছে শুধু আমার ডাকাতি দমন বিভাগের কনস্টেবল অদ্বৈত। সে গাড়ি চালাতে জানে।

আমার ঘরে ফিরে এসে আমি শেঠিয়ার থেকে ভাল করে জেনে নিলাম স্বপনের ফ্ল্যাটটা কোথায়। তারপর ওদের অপেক্ষা করতে বলে আমি অদ্বৈতকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্বপনের বাড়ির উদ্দেশ্যে। স্বপনকে আমি চিনি। স্বপনও আমাকে চেনে। কলকাতায় ভি.ভি.আই.পি. অতিথিদের কলকাতার নিরাপত্তার জন্য তাঁদের দেহরক্ষীর মূল দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার সময় দমদম বিমানবন্দরে আমাকে যেতে হয়। সেই সুবাদে বিমানবন্দরের কর্মী ও অফিসাররা আমাকে সবাই ভালভাবে চেনেন। যতদূর জানি বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়ায় স্বপনের ফ্ল্যাটটাও শম্ভুর দাক্ষিণ্যে হয়েছে। শম্ভুর একান্ত ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে যে স্বপন রায়ও একজন, তা জানা ছিল। তাই শেঠিয়ার কথাকে বিশ্বাস করার কারণ আছে।

লালবাজার থেকে স্বপনের ফ্ল্যাটের সামনে যখন পৌঁছলাম তখন ভোর পাঁচটা। দুবার

কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দরজা খুলল স্বপন নিজেই। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, "কি ব্যাপার রুণুদা, এই সময়ে?" স্বপনের পেছনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওর স্ত্রী। আমি তার দিকে একবার তাকিয়ে স্বপনকে বললাম, "একবার তোমাকে আমার সঙ্গে লালবাজারে যেতে হবে।" স্বপনের স্ত্রী ঝনঝনিয়ে বলে উঠল, "কেন?" যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে স্বপনকে বললাম, "আরে এক ফালতু ' ঝামেলায় পড়েছি, দুটো ছেলে এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে ডাকাতির ব্যাপারে ধরা পড়েছে, এখন বলছে, আমরা ডাকাতি করিনি, আমরা ভাল, আমাদের এয়ারপোর্টের সবাই চেনে। তার ওপর তোমার কথা ওরা বারবার বলছে, লালবাজারে গিয়ে দেখ তো ওদের চেন কিনা।" কথা বলতে বলতে আমি স্বপনের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছি। স্বপন বলল, "সকালে গেলে হয় না?" হেসে বললাম, "সকাল হতে আর কত দেরি? সারারাত জেগে আমারও আর ভাল লাগছে না। তুমি আমার গাড়িতে যাবে, দেখবে, চলে আসবে, আধ ঘণ্টার মামলা। আমিও তারপর ঘুমোতে পারি।" স্বপনের স্ত্রী উদ্ধতভঙ্গিতে বলল, "দেখুন এখন ও যাবে না। আপনাদের কমিশনার আমার আত্মীয়। দরকার হলে আমি ওঁকে ফোন করব।" স্বপনের স্ত্রী কমিশনারের কথা বলে আমাকে ঘাবড়ে দিতে চাইছে। আমি মনে মনে একটু হেসে নিয়ে অন্তরঙ্গ মুখে ফুটিয়ে তাকে বললাম, "ম্যাডাম, আপনি ওইভাবে নিচ্ছেন কেন ব্যাপারটা? স্বপন একটা দায়িত্বশীল অফিসার, আমার বহুদিনের পরিচিত। সেই আবদারেই এসেছি, দুটো ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।" আমার কথার রেশ ধরেই স্বপন ওর স্ত্রীকে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, রুণুদাকে আমি বহুদিন চিনি, এখানে তোমার ফালতু চিন্তার কী আছে, আমি এক্ষুনি আসছি।"

স্বপন মিনিট দুয়েকের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল। আমি স্বপনকে নিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। অদ্বৈত গাড়ি চালাচ্ছে। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া খেতে খেতে আবোলতাবোল আলোচনা করতে করতে লালবাজারের দিকে চললাম। লালবাজারে ঢোকার মুখে স্বপন কিছু একটা আন্দাজ করে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'ছেলে দুটোর নাম তো বললেন না রুণুদা।" গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললাম, "এসেই তো গেছ, একবারে দেখেই বল।"

স্বপনকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকতেই স্বপন অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, "শেঠিয়া!"

আমি গম্ভীর স্বরে এবার স্বপনকে বললাম, "হ্যাঁ, শম্ভুকে আমার চাই।" শেঠিয়াকে আমার ওখানে দেখার জন্যও না, আর তার সূত্র ধরে আমার চাহিদার কথা শোনার জন্যও না, কোনটার জন্যই স্বপন প্রস্তুত ছিল না। তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কিন্তু..." ওই "কিন্তু"তেই বুঝলাম আমি সোজা ছক্কা মেরে দিয়েছি। মুখে বললাম, "কোনও কিন্তু নয়, নিজেকে বাঁচাবার জন্যই শম্ভু কোথায় আছে আমাকে বল।"

শেঠিয়ার মুখোমুখি হওয়াতে স্বপনের আর. পালানোর জায়গা নেই। তার চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে কোন পথে যাবে ভেবে পাচ্ছে না। মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার আগেই তাকে আঘাত দিলাম। বললাম, "স্বপন, তোমার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা, আমি চাই না একটা চিটিংবাজের জন্য আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হোক। শম্ভু কোথায় আছে এক্ষুণি বল।"

স্বপন বুঝে গেছে তার পালানোর পথ বন্ধ। সে তখন বলে উঠল, "কিন্তু শম্ভুবাবু তো আমাকে বেইমান ভাববে।" আমি স্বপনের ভাবনাটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বেশ জোরে হেসে উঠে বললাম, "হাজার হাজার মানুষকে ঠকিয়ে, বেইমানী করে যে লোকটা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে, সে তোমাকে যদি বেইমান ভাবে ভাবুক। অযথা তুমি ওর দায়িত্ব নিয়ে নিজের সম্মান নষ্ট করছ কেন? চল, আমাকে নিয়ে যেখানে শম্ভু আছে।" আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে স্বপনও নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সময় নষ্ট করা যাবে না। স্বপনকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শম্ভুর আস্তানায় যেতে হবে। কারণ, শম্ভুর গোপন ঠেক নিশ্চয়ই স্বপনের স্ত্রী জানে। তার কাছ থেকে যদি শম্ভু জানতে পারে যে স্বপনকে আমি নিয়ে এসেছি, তবে সে সেখান থেকেও পালাবে। শম্ভুর

পরিচিতি কলকাতায় কম নেই, তার বহু এজেন্ট ও তস্য এজেন্ট কলকাতায় ছড়িয়ে আছে। আর একবার স্বপনের সূত্র থেকে বেরিয়ে গেলে সে আর স্বপনের সঙ্গে চট করে যোগাযোগ রাখবে না। তাই স্বপনকে কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না। ভোরের আলো ভাল করে ফুটে ওঠার আগেই আমাকে কাজ শেষ করতে হবে।

শেঠিয়াদের ঘরে বসিয়ে আমি স্বপনকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। স্বপন আমার পেছন পেছন সম্মোহিতের মতো আসতে লাগল। ওকে আমি "না" বলার কোনও সুযোগই দিচ্ছি না। আমাদের দফতর থেকে নিচে নেমে এলাম। অদ্বৈত সঙ্গে আছে। সে গাড়ির চালকের আসনে গিয়ে বসল। আমি স্বপনকে নিয়ে পেছনের সিটে। গাড়ি লালবাজার থেকে বের হতেই স্বপনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন দিকে যাব?" স্বপন রায় বলল, " সাদার্ন অ্যাভিনিউ।"

অদ্বৈত গাড়ি ছুটিয়ে দিল। ভোরের আলো ফুটে গেছে। ঘুম থেকে জেগে উঠছে আমাদের প্রিয় কলকাতা। ঘড়িতে দেখলাম ছ'টা বাজে। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয়েছে প্রাত্যহিক ব্যস্ততা। নিত্যদিনের যাত্রী নিয়ে ছুটছে বিভিন্ন রুটের বাস। ময়দান জুড়ে প্রাতঃভ্রমণকারীদের চলেছে শরীরচর্চা। শুদ্ধ অক্সিজেনের আশায় বয়স্ক মানুষদের থোক থোক মিছিল। আমরা চলেছি দক্ষিণের দিকে। মনের ভেতর ক্লান্তিটা না থাকলেও ভোরের হাওয়ায় শরীরের ক্লান্তিটা টের পাচ্ছি, কিন্তু থেমে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। শম্ভুকে ধরে আনতে হবে। তারপর শান্তি।

স্বপনের কাছ থেকে চলতে চলতে জেনে নিলাম শম্ভুর বর্তমান হালচাল। স্বপন জানাল, শম্ভুর কাছে নগদ কোনও টাকা নেই। দশ বারো কোটি টাকার ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট আছে। তাছাড়া সে বলল, শম্ভুর মধ্যে নাকি ইদানীং আত্মহত্যার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সেই জন্য সে পটাশিয়ম সায়নাইড টাইপের বিষ নিজের সঙ্গে রাখে। এই তথ্য আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। কারণ গ্রেফতার হওয়ার সময় যদি সে পট করে সায়নাইড মুখে দিয়ে দেয়, তবে তার ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। তখন সবাই বলতে শুরু করবে, রুনু গুহনিয়োগী শম্ভু মুখোপাধ্যায়কে খুন করেছে। সুতরাং সতর্ক হয়ে ওকে গ্রেফতার করতে হবে, যাতে শম্ভু কোনও কিছু মুখে দেওয়ার সুযোগ না পায়।

সাদার্ন অ্যাভিনিউর শেষ প্রান্তে এক নির্জন পাড়ায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পুরনো সেক্রেটারি নিশিথ ঘোষের ব্লিৎস হোটেলের সামনে স্বপন গাড়ি দাঁড় করাল। এটা তার গড়িয়াহাটের ব্লিৎস হোটেলের শাখা। স্বপন আমার পাশে বসা, ফিসফিস করে জানাল, "দোতলায় একটা ঘরে আছে।" ওর সঙ্গে কথা বলে ছক করে নিলাম।

ঠিক হল, স্বপন আর অদ্বৈত এক সঙ্গে শম্ভুর ঘরে যাবে, আমি ঘরের বাইরে একতলায় সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করব। শম্ভুর সঙ্গে কথা বলে স্বপন বেরিয়ে আমাকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকলেই আমি একা ওর ঘরে ঢুকে যাব। অদ্বৈতকে স্বপনের সঙ্গে দিলাম যাতে স্বপন শম্ভুকে অন্যকিছু বলতে না পারে এবং সেই কথায় শম্ভু ভয় পেয়ে আত্মহত্যা না করে বসে। স্বপন প্রথমে অদ্বৈতকে ওর নিজের লোক বলে পরিচয় দেবে। শম্ভুকে বলবে, 'পার্টি" সে পেয়েছে। আর স্বপনকে যেহেতু শম্ভু বিশ্বাস করে, তখন শম্ভুও অন্য কিছু ভাববে না। এদিকে স্বপন নির্বিঘ্নে দেখে নেবে শম্ভু কী অবস্থায় আছে। দেখে নিয়ে, আমাকে বলতে পারে, আমি ঘরে যাব কি যাব না।

স্বপন অদ্বৈতকে সঙ্গে নিয়ে শম্ভু যে ঘরে আছে, সেখানে ঢুকে গেল। সিঁড়িতে একটু উঠে লম্বা, ফাঁকা বারান্দায় উঁকি দিয়ে আমি দূর থেকে তা দেখে একটু এগিয়ে গেলাম, যাতে স্বপন বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি শম্ভুর ঘরে ঢুকতে পারি। শম্ভুর একটা পা পোলিও আক্রান্ত হওয়াতে সে দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে না। তাই স্বপন বেরিয়ে আসার সময় সঙ্গে সঙ্গে শম্ভু ঘরের দরজায় আসতে পারবে না। আর সেই সময়ের ফাঁকে আমি ঢুকে যাব।

তখন শম্ভু থাকবে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, অরক্ষিত। কথা অনুযায়ী স্বপন শম্ভুর ঘর থেকে মিনিট তিনেক পর বেরিয়ে এসে আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করল। আমি দেরি না করে দ্রুত পা চালিয়ে শম্ভুর ঘরে ঢুকে গেলাম।

ঢুকেই দেখি, শম্ভু প্রাতরাশ সারবার জন্য টেবিলে বসেছে। ছোট ঘর। শম্ভু আমাকে চেনে। দেখেই, একটু থতমত খেয়ে গেল। আমি তাকে কোনও সুযোগ দিলাম না। প্রায় এক লাফে ওর সামনে পৌঁছে ডানহাতটা চেপে ধরে বললাম, "কী শম্ভুবাবু, ভেবেছিলেন এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে থাকতে পারবেন। পারলেন না তো, এবার চলুন।"

ওর ডানহাতটা চেপে ধরে আছি। যাতে শম্ভু পালানোর চেষ্টা না করে ঠিক তার জন্য নয় অবশ্য। সে নিজেই তো কিছুটা প্রতিবন্ধী, চট করে ঘর থেকে পালাতে পারবে না। আসলে হাতটা ধরে আছি যেহেতু স্বপনের কাছ থেকে শুনেছি শম্ভু পকেটে মারাত্মক বিষ নিয়ে চলাফেরা করে। আমাকে দেখে পকেট থেকে না বিষ বার করতে পারে, সেই জন্য।

অদ্বৈতের হাতে শম্ভুকে সঁপে দিয়ে আমি হোটেলের ঘরটা তল্লাশি করতে শুরু করলাম। একটা সুটকেস ছাড়া অন্য কিছু নেই। আমার চেঁচামেচিতে হোটেলের এক কর্মচারী এসে হাজির। তার সাহায্যে হোটেলের জিনিসপত্র বাদ দিয়ে, শুধু শম্ভুর জিনিস একটা সুটকেসে ঢুকিয়ে শম্ভুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। প্রাতরাশ যেভাবে টেবিলের ওপর পড়েছিল, তেমনভাবেই পড়ে রইল। নিচে নেমে আসতে হোটেলের লোক আমাকে শম্ভুর হোটেলের বিল মেটাতে বলল। স্বপন সেটা দিয়ে দেবে বলাতে তারা আর কিছু বলল না। আমি শম্ভুকে নিয়ে গাড়ির সামনের সিটে বসলাম। অদ্বৈত গাড়ি চালাচ্ছে, মাঝখানে শম্ভু, আমি গাড়ির বাঁদিকে জানালার ধারে। স্বপনকে হোটেলেই ছেড়ে দিয়েছি, ওকে আর আমার প্রয়োজন নেই, ও স্ত্রীর কাছে নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারে। "

সাতটা বাজে। সারারাত ঘুমের পর জেগে উঠে ক্রমশ কলকাতা ব্যস্ত হয়ে উঠছে। আমার আর অদ্বৈতের সারারাত জাগার পর এখন 'ব্যস্ততা কিছুটা কমেছে। যাকে ধরবার জন্য আমাদের রাতভর দৌড়ঝাঁপ, সে এখন আমাদের মাঝখানে বসে আছে। চুপচাপ। ওর চোখেমুখে ক্লান্তির স্পষ্ট ছাপ। হয়তো বেশ ক'বছর দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে গেছে।

গাড়িতে আসতে আসতে আমার দু একটা প্রশ্নের উত্তর ছাড়া শম্ভু নিজের থেকে কোনও কথাই বলল না। আমি জেনে নিয়েছি, আমার কাছে শম্ভুর বেনারস, এলাহাবাদ, দিল্লিতে আত্মগোপন করে থাকবার যে খবর এসেছিল তা ঠিক কি না। শম্ভু স্বীকার করল, "ঠিক।"

একটা জিনিস কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। যার কাছে দশবারো কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে, সে কেন আত্মহত্যার কথা ভাববে? কেন সে বিষ নিয়ে পকেটে ঘুরে বেড়াবে? চিটিংবাজেরা কখনও আত্মহত্যা করে বলে শুনিনি। আসলে চিটিংবাজদের গায়ের চামড়া এত মোটা হয় যে, তারা কখনও মানসম্মানের কথা ভাবে না। যে যা ইচ্ছা বলুক, সব কিছু হেসে হজম করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের থাকে। যাদের মানসম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর, তারাই সম্মানহানি হলে আবেগের বশে আত্মহনন করে বসে।

সাড়ে সাতটার মধ্যে লালবাজার পৌঁছে গেলাম। তখনও আমাদের দফতরে কেউ আসেনি। দোশী আর শেঠিয়াকে সারারাত লালবাজারে বসিয়ে রেখেছি যাতে শম্ভুর খবর তারা কোনখানে ফাঁস না করতে পারে গ্রেফতারের আগে! এবার শেঠিয়াদের বাড়ি চলে যেতে বললাম। শম্ভুকে আমার ঘরে নিয়ে এসে বসালাম। অদ্বৈত আমার নির্দেশ মতো ওকে তল্লাশি করল, না, কোনও বিষ পাওয়া গেল না। কিছুটা নিশ্চিন্ত। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "শম্ভুবাবু, আপনার ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেটগুলো কোথায়?" শম্ভু মাথা নাড়ল। অর্থাৎ জানে না। প্রশ্ন করলাম, "সেগুলো কি স্বপনের কাছে?" এবারও মাথা নাড়ল। এমন ভাবে নাড়ল যাতে মনে হয় "না" কিংবা "হ্যাঁ" দুটোই মনে হতে পারে।

বুঝলাম, শেষ সম্বলটা হাতছাড়া করতে ওর প্রাণ চাইছে না। নগদ টাকা যে ওর কাছে আর নেই তা তো হোটেলেই বুঝেছি। কারণ ওকে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা স্বপনই করে

দিয়েছিল এবং যাবতীয় বিল মেটানোর দায়িত্ব স্বপনই নিয়েছিল। হঠাৎ মনে হল, ওর সুটকেসটা তো ভাল মত দেখা হয়নি। সার্টিফিকেটগুলো ওখানেও তো থাকতে পারে। মনে হতেই পাশে রাখা সুটকেসটা টেবিলের ওপর তুলে নিলাম। অদ্বৈতকে বললাম, "সুটকেসে কি কি আছে দেখ তো।"

অদ্বৈত সুটকেসটা খুলে ফেলে এক এক করে জিনিস বার করতে লাগল। জামা কাপড়, এটা সেটা, টুকিটাকি বার হতে লাগল। আমি উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি সাটিফিকেটগুলো কখন বার হয় তা দেখার জন্য। সব কিছু বার করে অদ্বৈত টেবিলের ওপর রাখল। পরিষ্কার। সুটকেস পরিষ্কার। কিছু নেই। ফাঁকা সুটকেসে সার্টিফিকেটের চিহ্নও নেই। শম্ভু ওদিকে তাকিয়ে আছে। কেন তাকিয়ে আছে? যদি ওর মনে কোনও সন্দেহ না থাকে তবে তাকিয়ে কি দেখছে? আমি অদ্বৈতকে সরিয়ে সুটকেসটা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। স্মাগলাররা সুটকেসের এদিক ওদিক তাদের জিনিস লুকিয়ে রাখে। শম্ভুও কি সেই পদ্ধতি নিয়েছে?

হঠাৎ মনে হল, সুটকেসের ওপরের অংশের ঢাকনার নিচে কাপড়ের ভেতরটা ভারি ভারি। আমি আঙুল দিয়ে টিপে বুঝলাম, কাপড়ের প্যাডিংয়ের মধ্যে কিছু আছে। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ারে রাখা একটা ব্লেড বার করে ঢাকনার কাপড়ের প্যাডিংটা কেটে ফেললাম। হ্যাঁ, আমার অনুমানই সত্যি। ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেটগুলো বেরিয়ে পড়ল। ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার কয়েক কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট। আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠল। আমানতকারীদের কিছু টাকা উদ্ধার করা গেল তাহলে। ভাবলাম, সঞ্চয়িতার আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য শশীভূষণ দে স্ট্রিটে যে কমিশন বসেছে, সেখানে এই টাকাটা যোগ হবে। আর সেই কৃতিত্বের ভাগ আমিও পাব। মনটা আনন্দে নেচে উঠল।

শম্ভুর সামনে ওগুলো দেখিয়ে বললাম, "কি হল, এইতো বলছিলেন, আপনার কাছে নাকি টাকা নেই?" শম্ভু সার্টিফিকেটগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে আমার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে আস্তে কেটে কেটে বলল, "রুনুবাবু, আপনাকে মিথ্যা কথা বলব না, ওগুলো সব ফালতু।" খেঁকিয়ে বলে উঠলাম, "ফালতু মানে?" শম্ভু তেমনি একই ভঙ্গিতে বলল, "ফালতু মানে নকল, জাল।"

শম্ভুর কথা শুনে আমার ভেতরে জেগে ওঠা আনন্দের ফানুস টুক করে ফুটো হয়ে চুপসে গেল। তখন উল্টে আমার হতাশায় কান্না আসার জোগাড়। আমি নিজের চেয়ারে বসে পড়লাম। তবে প্রতারকদের কোনও কথাই একবারে বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো একটা চাল চেলে আমাকে ধোঁকা দিতে চাইছে। তাই প্রশ্ন করলাম, "কে এগুলো নকল করেছে?" শম্ভু নির্লিপ্তভাবে বলল, "আমিই করেছি।" বললাম, "কী ভাবে?" শম্ভু বলল, "সে অনেক কথা, একটু জল পাব?" অদ্বৈত ওকে জল দিলে আমি চা আনতে বললাম। অদ্বৈত চা আনতে নিচে চলে গেল।

শম্ভু শুরু করল, "আমার ভাগ্নের ছেলের নামে আমি ব্র্যাবোর্ন রোডের ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকাতে দুটো দশ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করাই।

সেখানে ঠিকানা লিখেছিলাম তিন নম্বর নিয়োগী পুকুর লেনের। সেই সার্টিফিকেটের নমুনা অনুযায়ী কতগুলো সার্টিফিকেট নিভানা প্রিন্টার্স থেকে অনেক টাকা দিয়ে ছাপিয়ে নিই। তারপর ইচ্ছেমত ওগুলোতে টাকার অংক বসিয়ে নিয়েছি।" শম্ভু চুপ করে গেল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি, ভাবছি এই ল্যাংড়া লোকটা শুধু ফার্স্টক্লাশ প্রতারকই নয়, জালিয়াতও। শম্ভু বলে উঠল, "আমার কাছে এখন একটা টাকাও নেই। রুনুবাবু, আমি কি অত বোকা যে, এত কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট সুটকেসে রেখে, সেগুলো না ভাঙ্গিয়ে আমি ভিক্ষা করে বেড়াব? আর কাদের কাছে? ওই স্বপন রায়দের মতো লোকেদের কাছে, যারা আমার দয়া পাওয়ার জন্য একসময় পেছন পেছন ঘুরত?"

শম্ভু কপর্দকশূন্য, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমিও প্রথমে বিশ্বাস করিনি। জানতে চাইলাম, "আপনার পার্টনার স্বপন গুহ, তপন গুহরা তো দিব্যি আছে, আপনিই পালাতে গেলেন কেন?" শম্ভু বলে উঠল, "ওরা সব বেইমান, আমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সবাই পালাল। যেন সঞ্চয়িতার সব টাকা আমিই নিয়েছি। আর যাদের যাদের টাকা দিয়েছি একজনও ফেরত দেয়নি। ফেরত দিলে এই অবস্থা হয় না। বারবার তাদের কাছে চেয়েছি, কিন্তু কেউ এক পয়সাও দেয়নি, অথচ অনেকেই আমার টাকায় দাঁড়িয়ে গেছে।" ওর কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম, চিটিংয়ের টাকা চিটিং করেই গেছে। যে টাকার কোনও সঠিক মালিকানা দেখাতে পারবে না, সে টাকা কেউ ফেরত দেয় না কি আমাদের দেশে? শম্ভু চুপ করে বসে আছে, হয়তো সে সেইসব মুখগুলো মনে করছে, যারা তার টাকা মেরেছে।

সার্টিফিকেটগুলো নাড়াচাড়া করে দেখলাম, চট করে বোঝা যায় না সেগুলো নকল। প্রায় নিখুঁত ছাপানো, লেখা। আমিও ধরতে পারলাম না। কি করি? সেগুলো হেফাজতে রেখে আমি উঠে পড়লাম। অনেক কাজ আছে।

আমার ঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে শম্ভুকে রেখে তার সামনে বসিয়ে দিলাম অদ্বৈতকে, শম্ভুর সঙ্গে গল্পগুজব করতে। ডিউটিতে দু চারজন কনস্টেবল এসে গেছে। তাদের দুজনকে ঘরের সামনে পাহারায় বসিয়ে দিলাম। বলে দিলাম, ঘরে কে আছে কাউকে না জানাতে। যতক্ষণ না আমি আবার ফিরে আসি কেউ যেন ওই ঘরে না ঢোকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, ওরা যেন জানায় আমি একটা জায়গায় হানা দিতে গেছি।

সকাল সাড়ে ন'টা। ডিসি ডিডি (টু) অসীম চট্টোপাধ্যায় এসে গেছেন অফিসে। আমি তাঁকে গিয়ে বললাম, "স্যার, শম্ভুকে যে গ্রেফতার করতে বলেছেন, গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে তো?" তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্মার্টলি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নয়তো বলব কেন ওকে ধরবার জন্য?" বললাম, "দিন তো, কোর্টের কাগজগুলো।" তিনি আমার কথা শুনে একটা ফাইল বার করে গ্রেফতারী পরোয়ানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এগুলো এখন নিচ্ছেন যে, কোনও খবর আছে নাকি?" বললাম, "দেখছি একটা চান্স নিয়ে।" তিনি বললেন, "যাওয়ার আগে আমাকে জানাবেন, আমিও যাব।" হেসে বললাম, "ঠিক আছে।" আমি শম্ভুর পরোয়ানাটা পকেটে পুরে তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম।

চট্টোপাধ্যায় সাহেব আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না, সেকথা তিনি দীপক রায়কে বলেছিলেন। তিনি ও দীপক একবার একটা খুনের মামলায় তদন্তের কাজে নয়াদিল্লি যাচ্ছিলেন রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে। কথায় কথায় তিনি দীপককে বলেছিলেন, "দীপকবাবু, আর যাই হোক, আপনার বন্ধুকে আমি আর কোনদিন কোনও ব্যাপারে অনুরোধ করব না।" দীপক কিছু না বোঝার ভান করে জানতে চাইলেন, "কার কথা বলছেন স্যার?" তিনি দীপককে বললেন, "আপনি বুঝতে পারছেন না কার কথা বলছি? আপনার বন্ধু কে?" দীপক না বোঝার ভান করে বলল, "বলুন না কার কথা বলছেন।" চট্টোপাধ্যায় সাহেব থম ধরে থেমে বললেন, "না, না, আমি আপনাকে কিছু বলব না, বললে, সে কথাও আপনি আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন। আপনারা তো আবার দুজনে হরিহর আত্মা।" দীপক বলল, "না স্যার, কিছু বলব না, আপনি বলতে পারেন।" তিনি তো কোন কথাই বলতে চাইলেন না। অনেক চেষ্টা করার পর চট্টোপাধ্যায় সাহেব আমার কথা বললেন। দীপক তখন জানতে চাইল, "কেন স্যার, কী হয়েছে?" তিনি বললেন, "আর বলবেন না, আমি যখন ব্যারাকপুরের অ্যাডিশনাল এস পি ছিলাম, তখনকার এক পরিচিত লোক মাস দুয়েক আগে এসে আমায় বলল, তার বাড়ির একটা ছেলেকে রুনুবাবু ডাকাতির মামলায় ধরে এনেছে, তাকে যেন একটু মারধোর কম করে। আমি সেই অনুযায়ী রুনুবাবুকে অনুরোধ করলাম।"

চট্টোপাধ্যায় সাহেব এই বলে চুপ করে যেতে দীপক তাঁর কাছে জানতে চাইল, "তা কী হয়েছে?" তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দীপককে বললেন, "সেকথা বলার ক'দিন পর তার বাড়ির লোক আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাদের কাছে জানতে চাইলাম, কি তোমার ছেলের ওপর আর মারধোর হয়নি তো? সে কী বলল জানেন?" দীপক বলল, "কি

বলল স্যার?” চট্টোপাধ্যায় সাহেব বললেন, “সেই লোকটা তো প্রায় কেঁদে ফেলে আমাকে বলল, আমি যে প্রশ্নটা ওকে করেছি ঠিক সেই প্রশ্ন সে ছেলেকে জেলে দেখা করতে গিয়ে করেছে। ছেলে জানিয়েছে, আমি রুণুবাবুকে অনুরোধ করার আগে উনি ছেলেটার পাছার একটা দিক লাল করে দিয়েছিল, আর আমি বলার পর পুরো পাছাটাই থেঁতলে দিয়েছে। ছেলেটা আরও বলেছে, চট্টোপাধ্যায় স্যার যেন ওর ব্যাপারে রুণুবাবুকে কিছু না বলে, তাহলে আবার নিয়ে গিয়ে--” চট্টোপাধ্যায় সাহেব এই বলে একটু চুপ করে বললেন, “ওই কথা শুনে আমি ঠিক করে নিয়েছি, রুনুবাবুকে আর কোনদিন কোন কথা বলব না।” দীপক জিজ্ঞেস করল, “ছেলেটার কী নাম বলুন তো?” তিনি জানালেন, “ঝন্টু।” দীপক বলল, “সে তো শুনেছি বসিরহাট বারাসাত লাইনে বহু ডাকাতি করেছে।” চট্টোপাধ্যায় সাহেব মুখ গোমড়া করে বললেন, “তা কী করেছে আমি জানি না, তবে আমি যখন অনুরোধ করেছিলাম, সেটা একটু রাখতে পারত।” দীপক বলল, “রুণুটা ওই রকমই। সে যদি বোঝে আসল অপরাধীকে ধরেছে, তবে বাকিদের ধরবার জন্য চেষ্টা চালিয়েই যাবে। তাতে কারও কথা শুনবে না।” চট্টোপাধ্যায় সাহেব দীপকের কথা শুনে আর ওই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলেননি।

লালবাজারে আমার কোয়ার্টারে ফিরে এসেছি, সারারাত জাগা। স্নান-টান করে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আবার দফতরে যেতে হবে। বাড়িতে এসে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, কোনও ফোন এলেই বলে দিতে, আমি নেই।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, কিছুটা প্রাতরাশ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি। সেদিনের খবরের কাগজটা চোখের সামনে ধরে রেখে কিছু পড়ছি, কিছুটা পড়ছি না। মস্তিষ্ক বিশ্রাম চাইছে, তা বুঝতে পারছি। দশটা নাগাদ ফোন বেজে উঠল। আমার স্ত্রী ধরে বলে দিল, আমি নেই। সে ফোন ছেড়ে আমায় জানাল, চট্টোপাধ্যায় সাহেব খোঁজ করছিলেন, কমিশনার সোম সাহেবের নাকি আমাকে প্রয়োজন। ভাবলাম, স্বপনের স্ত্রী তাঁকে কিছু জানিয়েছে নাকি? যা হয় হোক, কিছুক্ষণ পরেই যাব। বিছানা ছেড়ে না উঠে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম এসে যাচ্ছে, কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। অফিসে শম্ভুকে বসিয়ে এসেছি। গ্রেফতারী পরোয়ানা আমার কাছে। ওকে আদালতে পাঠাতে হবে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। সাড়ে দশটা নাগাদ আমার কোয়ার্টারের বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম, প্রচুর পুলিশ লালবাজারের নিচের বিস্তৃত লনে জড়ো হচ্ছে। বহু অফিসারও রয়েছেন, যিনিই তখন ডিউটিতে আসছেন তিনিই নিচে জড়ো হওয়া বাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন। তার মধ্যে রয়েছেন ধ্রুব গুপ্তের মতো অফিসারও, যিনি সারা চাকরি জীবনে অপরাধীদের ধরপাকড় করেননি, কাগজপত্রের আর লেখালেখির কাজ করে গেছেন, তিনিও। বুঝলাম ব্যাপারটা কেন হচ্ছে। সোম সাহেব যখন খোঁজ করেছিলেন, তখনই কিছুটা আন্দাজ করেছি। আর তার পরের রণসজ্জা দেখে নিজে মনে মনে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে দর্শকের ভূমিকায় নিরুদ্বেগে দেখতে লাগলাম, কোথাকার জল কোথায় যায়। দেখলাম লরি লরি বাহিনী এগারটা নাগাদ বেরিয়ে গেল, সবচেয়ে সামনে সোম সহেবের গাড়ি।

আর দেরি করা ঠিক হবে না, আমি তৈরি হয়ে নিলাম। হেড কোয়ার্টারের বারান্দা হয়ে আমার বিল্ডিংয়ের ওয়ারলেস বিভাগের মাঝখান দিয়ে আসছি। এমন সময় ওয়ারলেসের এক জুনিয়র অফিসার আমাকে বলল, “স্যার, সি.পি. আপনাকে ভীষণভাবে খুঁজছেন, কন্ট্রোল রুম থেকে ওয়ারলেসে ওয়ারলেসে চারদিকে খবর পাঠান হয়ে গেছে।” আমি হেসে হাঁটতে হাঁটতে তাকে বললাম, “ঠিক আছে, আমি দফতরে যাচ্ছি।” হন হন করে নিচে নেমে এলাম। আমার বিভাগে আসতে, সেখানেও একই কথা শুনলাম। বললাম, “কন্ট্রোল রুমকে জানিয়ে দাও, আমি এখানে।” আমি যে ঘরে শম্ভুকে রেখে গিয়েছিলাম, সেখানে আস্তে উঁকি মেরে নিলাম। শম্ভু একটা চেয়ারে বসে আছে, উল্টো দিকে অদ্বৈত। শম্ভুকে বললাম, “খেয়েছেন তো?” শম্ভু বলল, “হ্যাঁ।” অদ্বৈতকে আরও একটু বসতে বলে আমি চলে এলাম। কয়েক মিনিট পরই শুনতে পেলাম অনেকগুলো গাড়ির আওয়াজ। বুঝলাম, সবাই ফিরছে।

তার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কন্ট্রোল রুম থেকে আমায় জানান হল, সোম সাহেব আমাকে ডাকছেন। মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে, আমাদের কলকাতা পুলিশ বাহিনীকে একটা নতুন খেলা দেখাতে পেরেছি, এই আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কমিশনার সোম সাহেব তাঁর চেম্বারে বসেছিলেন। সামনে চট্টোপাধ্যায় সাহেব। আমি চেম্বারে ঢুকতেই সোমসাহেব বললেন, “এই যে রুনুবাবু, কোথায় ছিলেন, আপনাকে খুঁজছি কখন থেকে।” বললাম, “কেন স্যার?” তিনি প্রশ্ন করলেন, “শম্ভু মুখার্জিকে কি ধরেছেন?” বললাম, “হ্যাঁ স্যার, শম্ভুকে আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছি।” তিনি আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বললেন, “সেই খবরটা কাউকে এখনও জানাননি?” তারপর আমার উত্তর শোনার আগেই জানতে চাইলেন, “টাকা পয়সা কিছু পেয়েছেন?” বললাম, “না স্যার, কয়েক কোটি টাকার ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার জাল ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট পেয়েছি।” তিনি আঁতকে উঠে বললেন, “সে কি, কোন টাকা পাননি? তা হলে কি হবে?” বললাম, “স্যার, ওর কাছে খাওয়ার পয়সা নেই।” সোমসাহেব বললেন, “এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে?” কী উত্তর দেব, তাই চুপ করে রইলাম। তিনি তখন বললেন, “কীভাবে ওকে পেলেন?” আমি আগের রাতের ঘটনা ছোট করে সোমসাহেবকে বললাম। তিনি সব শুনে অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রকে ফোন করে বললেন, “স্যার আমরা শম্ভু মুখার্জিকে আজ ভোরে গ্রেফতার করেছি।” অন্যদিক দিয়ে মন্ত্রী কি বললেন শুনতে পেলাম না। সোমসাহেব শুধু ক'বার "স্যার, স্যার” করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তারপর কমিশনার সাহেব আমার থেকে বাকিটা শুনে বললেন, "ঠিক আছে, শম্ভুবাবুকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসুন তো। ওকে আগে দেখি।”

আমি তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে আমার ঘরে এসে শম্ভুকে নিয়ে চললাম কমিশনার সাহেবের কাছে। শম্ভু আস্তে আস্তে হাঁটে। ওকে ধরে ধরে নিয়ে গেলাম সোমসাহেবের চেম্বারে।

শম্ভুকে দেখে তিনি মুখ দিয়ে শুধু একবার আওয়াজ করলেন, “হুম।” তারপর একটু থেমে বললেন, “শম্ভুবাবু, টাকাপয়সাগুলো কোথায়?” শম্ভু আস্তে আস্তে তাঁকে বলল, “বিশ্বাস করুন স্যার, আমার কাছে কোনও টাকা নেই। রুনুবাবু তো সব দেখলেন, হোটেলের বিল মেটানোর টাকাও আমার ছিল না।” সোমসাহেব বললেন, “এতদিন পালিয়ে রইলেন কী ভাবে?” শম্ভু নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে বলল, “যা ছিল তাই খরচ করে।”

সোমসাহেব শম্ভুকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমাকে বললেন, “ওকে নিয়ে যান।” আমি শম্ভুকে আমাদের দফতরে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে আবার তলব এল। আমি শম্ভুকে আমার ঘরে বসিয়ে আবার ছুটলাম সোমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। নিচে নামতেই এক অফিসারের সঙ্গে দেখা, যে ঘণ্টাখানেক আগের অভিযান বাহিনীতে ছিল। তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কী ব্যাপার, ঘণ্টা খানেক আগে তোমরা সবাই কোথায় গিয়েছিলে?” সে বলল, “জানি না স্যার, কি হয়েছিল। সি পি আমাদের সবাইকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে দাঁড় করিয়ে একা গঙ্গার দিকে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর শুকনো মুখে ফিরে এসে বললেন, “আপনারা লালবাজারে ফিরে যান।” আমরা চলে এসেছি।

আমি আর দাঁড়ালাম না। এ ব্যাপারটা পরে অনুসন্ধান করব এই স্থির করে কমিশনারের সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা করতে চললাম।

সোমসাহেবের ঘরে তখন অনেক বড় বড় অফিসার। চট্টোপাধ্যায় সাহেব তো আছেনই। তিনি একবার আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন। বুঝলাম, তাঁর আমার ওপর রাগ হয়েছে, কারণ সকালবেলাতেও যখন তাঁর কাছ থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা আনতে যাই, তখনও আমি তাঁকে শম্ভুর বিষয়ে কিছু জানাইনি। সেইজন্যই তাঁর গোসা। সোমসাহেব আমাকে দেখেই বললেন, “রুণুবাবু, আমরা আলোচনা করে দেখলাম,

শম্ভু মুখার্জির কাছে টাকা পাওয়া যায়নি, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না।” বললাম, “তা হলে কী করা যায় স্যার?” তিনি বললেন, “আমরা ঠিক করেছি, ওকে নতুন করে গ্রেফতার করব। আপনারা শম্ভুবাবুকে নিয়ে আবার সেই হোটেলটায় যান, নতুন করে গ্রেফতার করে আনুন।” একটু চুপ করে থেকে বললেন, “ঠিক আছে, আমিও যাব। সেখানে লোকজনকে দেখিয়ে আনতে হবে, ওর কাছ থেকে আমরা কোনও টাকা উদ্ধার করতে পারিনি।”

আমরা সোমসাহেবের নির্দেশমত শম্ভু সমেত বিরাট বাহিনী নিয়ে ছ সাতটা গাড়িতে চড়ে চললাম বালিগঞ্জের সেই ব্লিৎস হোটেলের উদ্দেশে। সোমসাহেবের গাড়ি চলেছে সবার আগে। পেছন পেছন এক লরি ফোর্স। এবার লোক দেখানো গ্রেফতার করব শম্ভুকে। শম্ভু আমার গাড়িতে। পরিকল্পনামাফিক আমরাই প্রথম হোটেলে পৌঁছলাম। সোমসাহেবও পৌঁছে গেছেন। হোটেলে পৌঁছে, অদ্বৈত আর আমি, শম্ভু ও তার সুটকেসটা সঙ্গে করে যে ঘরে শম্ভু ছিল সেই ঘরে পৌঁছে গেলাম। তার আগে লরি ভর্তি করে আনা ফোর্স ঘিরে ফেলেছে পুরো হোটেল। নাটকের মঞ্চ সম্পূর্ণ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমাদের বাহিনীর বাকি সব অফিসার ও নিচুতলার কর্মীরা হাজির। বাইরের বহু লোকজন জোগাড় করা হল। তাদের সামনে শম্ভুকে গ্রেফতার করা হল, তল্লাশি হল।

তল্লাশিতে সেই ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট ছাড়া কোনও টাকাপয়সা পাওয়া গেল না, সেটা সবাই দেখলেন। আমরা শম্ভুকে নিয়ে নিচে অপেক্ষমান গাড়িতে এসে বসলাম। নাটকের ষোলকলা পূর্ণ হলে গাড়ি লালবাজারের দিকে ছুটল।

লালবাজারে এসে জানতে পারলাম, আমাকে সোমসাহেবের এত জরুরি তলবের নেপথ্যের সব ঘটনা।

স্বপনকে ভোরবেলায় যখন ব্লিৎস হোটেলে ছেড়ে আসি, তার হোটেল থেকে বাড়ি ফেরার কথা, কিন্তু সে সেখান থেকে বাড়ি না ফিরে, ভয়ে এক বন্ধুর বাড়ি চলে যায়।

অন্যদিকে উৎকণ্ঠায়, অস্থিরতায় স্বপনের স্ত্রী সোমসাহেবকে সকাল দশটা নাগাদ ফোন করে বসে। ফোনে সোমসাহেবকে সে বলে, স্বপনকে ভোররাতে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে গেছি, তারপর থেকে স্বপন বেপাত্তা। যদিও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্বপনের বাড়ি ফেরার কথা ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে চার পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে, স্বপন ফেরেনি। কমিশনার সোমসাহেব তখন স্বপনের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, “কি বলে নিয়ে গেছে স্বপনকে?” “বলেছিল লালবাজারে নিয়ে যাবে, - কোন ডাকাতকে দেখাতে। ডাকাতরা বলেছে তারা স্বপনকে চেনে।” স্বপনের স্ত্রী উত্তর দেয়। সোমসাহেব বলেন, “কিন্তু গতরাতে তো কোনও ডাকাত ধরা পড়েনি, ঠিক আছে আমি দেখছি, তুমি চিন্তা কোরো না।” স্বপনের স্ত্রী বলে, “আপনি দেখুন, আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না” সোমসাহেব তবু প্রশ্ন করেন, “মনে কর, স্বপন কোন্‌খানে যেতে পারে?” স্বপনের স্ত্রী উত্তরে বলে, 'ও তো এমনিতে আমাকে না বলে কোথাও যায় না, শুধু একবার বলছিল শম্ভুর কাছে কিছু টাকা পাবে, সেখানে যাবে।” শম্ভুর নাম শুনেই সোমসাহেব লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করেন, “কোন শম্ভু? সঞ্চয়িতার শম্ভু মুখার্জি?” স্বপনের স্ত্রী তাঁকে জানায়, “হ্যাঁ।” সোমসাহেব আর কোনও কথা না শুনে তাকে বলেন, "ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে। না, না, তুমিই এস, আমার দেরি হবে, যত তাড়াতাড়ি পার, তুমি গঙ্গার ধারে গে রেস্টুরেন্টের সামনে চলে এস, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।” স্বপনের স্ত্রী কিছু না বুঝেই উত্তর দেয়, “আচ্ছা।” সোমসাহেব টেলিফোন নামিয়ে প্রথমেই আমার খোঁজ করেন। আমার বিভাগ থেকে অদ্বৈতরা জানিয়ে দেয় আমি নেই, কোনও এক জায়গায় গিয়েছি আসামী ধরতে।

তখন তিনি চট্টোপাধ্যায় সাহেবকে ফোন করে জানতে চান, তিনি আমার সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা। চট্টোপাধ্যায় সাহেব উত্তরে বলেন, “না স্যার, কিছু জানি না, তবে আমি সাড়ে নটা নাগাদ অফিসে আসতেই রুনুবাবু আমার কাছ থেকে শম্ভু মুখার্জির গ্রেফতারী পরোয়ানাগুলো চেয়ে নিয়ে গেছে।” সোমসাহেব হতাশ গলায় বলেন, “নিয়ে গেছে?”

চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হ্যাঁ, স্যার।"

এরপর তিনি কন্ট্রোলরুমকে বলেন, "ওয়ারলেসে ওয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে আমার খোঁজ করতে।" তারা আমার খোঁজ করতে শুরু করলে সোমসাহেব তখন রিজার্ভ ফোর্স থেকে দু লরি কনস্টেবল চেয়ে নেন এবং তাদের গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। তারপর তিনি লালবাজারের দক্ষিণপশ্চিম দিককার গেটের সামনে নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন, এবং যত অফিসার তখন ডিউটিতে আসতে থাকেন, সে যে দফতরেরই হোক, তাকেই তিনি দাঁড় করান একটা "বিশেষ অভিযানে" যাওয়ার জন্য। দেখতে দেখতে সিনিয়র-জুনিয়র অফিসার কুড়ি বাইশজন সেখানে জমে যান, তাঁরা তখনও জানেন না, কী এমন বিশেষ অভিযানে কমিশনার সাহেব তাঁদের নিয়ে যাবেন।

সোমসাহেব পুরো বাহিনীকে অপেক্ষা করতে বলে একা তাঁর নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে যান গঙ্গার ধারে গে রেস্টুরেন্টের সামনে। সেখানে তাঁর নতুন "সোর্স" স্বপনের স্ত্রী আগেই পৌঁছে গেছে। গাড়ি থেকে নেমেই সোমসাহেব ছুটে স্বপনের স্ত্রীর কাছে যান, ওকে জিজ্ঞেস করেন, "শম্ভু মুখার্জি কোথায়?" স্বপনের স্ত্রী বলে, "তা আমি জানব কি করে? তবে ওর মুখে শম্ভুর নাম শুনছিলাম, মনে হয় সে কলকাতাতেই আছে, কারণ স্বপন বলছিল, কিছু টাকা শম্ভুর কাছ থেকে দুএকদিনের মধ্যেই পেতে পারে। তাছাড়া কিছু জানি না।" সোমসাহেব তবু প্রশ্ন করেন, "শম্ভু মুখার্জি কোথায় আছে তুমি বলতে পারবে না?" স্বপনের স্ত্রী মাথা নেড়ে বলল, "না।" সোমসাহেব হতাশ গলায় বললেন, "তাহলে আর কী হবে, তুমি এখন তবে বাড়ি যাও।" সোমসাহেব উদাস হয়ে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। স্বপনের স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোমসাহেব গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে পৌঁছে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা সব অফিসারদের নির্দেশ দিলেন, যে যার কাজে চলে যান। অপেক্ষমান দু'লরি কনস্টেবলদেরও খবর পাঠালেন ফিরে যেতে। তার একটু পরেই আমি কোয়ার্টার থেকে নেমে আসি। -আর তখন থেকে কন্ট্রোলরুম থেকে আমাকে খোঁজ করা হচ্ছে।

আসলে সোম সাহেব একটা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে স্বপনের স্ত্রীকে তাঁর "সোর্স" হিসাবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বপনের স্ত্রী তো আর "সোর্স" ছিল না। সে একজন সাধারণ গৃহবধূ। অতশত বুঝবে কেন?

সে সোমসাহেবকে ফোন করেছিল তার স্বামী বাড়িতে ফিরতে দেরি করার উদ্বেগে, আর সেইটাই সোমসাহেব "সোর্সের খবর" হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি যদি পরিষ্কারভাবে ওই ফোনেই স্বপনের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেন শম্ভুর আস্তানা চেনে কিনা, তাহলে কিন্তু স্বপনের স্ত্রী বলে দিত সে জানে না। আর তাহলে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটাপর্যন্ত লালবাজারে এত নাটক হতো না।

তদন্তের ব্যাপারে সোমসাহেব নিজে খুবই উদ্যোগ নিতেন এবং সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি পুলিশের মূল চরিত্র অনুযায়ী কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি নিজে নিজের কাজে এত বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, অমরচাঁদ লাখটিয়া নামে এক চোরাচালানকারীকে বিশ্বাস করে তাকে নিজের "সোর্স" বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেই অমরচাঁদ সম্পর্কে তিনি অন্য কোনও অফিসারের কাছে খোঁজখবরও নিলেন না। কলকাতা পুলিশে যারা দীর্ঘদিন আছে, তারা কিন্তু অমরচাঁদকে খুব ভালভাবেই চিনত। সে তার চোরাচালানের দিনগুলোতে চুল দাড়ি বড় বড় করে সাধু হয়ে যেত, আর যেই তার "কাজ" সম্পূর্ণ হয়ে যেত তারপরই সে আবার সাধু থেকে সাধারণ মানুষের রূপে ফিরে আসত। সে সোমসাহেবের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে তার ব্যক্তিগত শত্রুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর দিয়ে তাদের গ্রেফতার আর হেনস্থা করাতো। বহুদিন পর সোমসাহেব অমরচাঁদের আসল চেহারা চিনতে পেরে তাকে দূর করে দিয়েছিলেন। শুধু অমরচাঁদই নয়, আমাদের মধ্যেও কিছু কর্মবিমুখ অফিসার

সোমসাহেবের কাছে এর কথা ওর কথা বানিয়ে বলে কান ভারি করে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সোমসাহেব তাদের খুব বিশ্বাস করতেন।

সোমসাহেব ছিলেন অসম্ভব ভদ্র এবং আমার দেখা কলকাতা পুলিশের কমিশনারের মধ্যে সত্যিকারের সৎ। কিন্তু তিনি "আমি সৎ, আমি সৎ" বলে কখনও কীর্তন গেয়ে বেড়াননি। তিনি জানতেন, যারা সৎ তাদের নিজ গুণকীর্তন গাইতে হয় না। সেটা অন্যেরাই করে দেয়।

শম্ভুকে গ্রেফতারের পর আমার কাজ শেষ হলেও লক আপে তার কথাবার্তা, আচার-আচরণের সব খবর রাখতাম। শম্ভুকে প্রতারণা, জালিয়াতি দমন শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রণব রায়, অরুণ চক্রবর্তীদের হাতে তুলে দিয়েছি। কারণ সঞ্চয়িতার সমস্ত ব্যাপারটা দেখার জন্য তারাই ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত। শম্ভুর সঙ্গে সেন্ট্রাল লক আপে একই ঘরে ইচ্ছে করে রেখেছি আমার হাতে বন্দি হওয়া এক পুরনো আসামীকে, যে আমাকে বিশেষ বিশেষ সময়ে অনেক খবর দিয়েছে। এবং তাকে বলে দিয়েছি শম্ভুর কাছ থেকে খবর নিতে ও তার ওপর নজর রাখতে। সেই বন্দির কাছ থেকে প্রতিদিনই খবর পেতে থাকলাম শম্ভুর আচার ব্যবহারের। এবং জানতে পারলাম, স্বপন রায়ের সতর্কবাণীটাই ঠিক। শম্ভুর মধ্যে আত্মহননের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। লকআপের ভেতর আমার সেই লোক সেদিকে খেয়াল রাখত এবং আমাকে যথাসময়ে খবর দিত। শম্ভুকে আমি কাগজ পেনসিলও দিয়েছিলাম, তার সব, স্বীকারোক্তি লিখতে। সে লিখেছিল। সেটাও আমি প্রতারণা শাখায় দিয়েছি।

শম্ভুকে গ্রেফতার করার দিন চারেক পর কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট ইন্সটিটিউটের জন্য দার্জিলিংয়ে একটা বাড়ি দেখতে যাই আমি, উমাদাস মৈত্র, নিখিলেশ মুখোপাধ্যায় ও ইন্সটিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা। সেই বাড়িতে একটা হলিডে হোম করার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের। কলকাতা ছাড়ার আগে আমি প্রণব, অরুণ ও চট্টোপাধ্যায়সাহেবকে বারবার সাবধান করে বলে যাই যে, শম্ভুর ভেতর একটা আত্মহত্যার মনোভাব গড়ে উঠেছে, সে দিকে যেন বিশেষ খেয়াল রাখা হয় এবং সবাই সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকে। তাকে যেন কখনও একা থাকতে না দেওয়া হয়।

দার্জিলিং থেকে আমি চলে যাই কোচবিহারে আমার মার সঙ্গে দেখা করতে। কোচবিহারে পৌঁছনোর পরদিন চুরাশি সালের একুশে মার্চ সকালে খবরের কাগজে চোখ রাখতেই আমি বোকা বনে যাই। দেখি, শম্ভু গঙ্গাযমুনা বিল্ডিংয়ের দশ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটা পড়ে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হল। ভাবলাম, এতবার আমি আমার সহকর্মীদের সাবধান করে দিয়ে আসার পরও এ কি পরিণতি হল। গোয়েন্দাগিরির কাজটা তবে কী? আগের থেকে যদি আসামীর মানসিকতা ও গতিবিধির খবর ও সে সম্পর্কে সঠিক আন্দাজ করে সাবধান না হওয়া যায়, তবে গোয়েন্দা হয়ে কোনও লাভ নেই। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আত্মহননেরই সামিল।

গঙ্গাযমুনা বিল্ডিংয়ে অরুণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশের একটা দল শম্ভুকে নিয়ে গিয়েছিল গোপন টাকা উদ্ধারের আশায়। একা যায় বাথরুমে। বাথরুমের একটা জানলায় ছিল না কোন গ্রিল বা লোহার শিক। ফাঁকা কাঁচের খোলা জানালা। খোলা জানালা দেখেই শম্ভুর আত্মহত্যার প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সে কমোডে উঠে খোলা জানালার মাঝখান দিয়ে পলকে ঝাঁপ দেয়। বেশ খানিকটা সময় চলে যাওয়ার পর অরুণের মনে হল, কেন বাথরুম থেকে শম্ভু এখনও বের হচ্ছে না? সে এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, কিন্তু ভেতর থেকে কোনও উত্তর নেই। অন্যদিকে নিচে একটা হইহল্লার আওয়াজ ভেসে আসে। একজন লোক নিচ থেকে খবর দেয়, ওই ফ্ল্যাট থেকে একটা মানুষ নিচে পড়ে গেছে। অরুণরা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে দেখে, গঙ্গাযমুনার প্রশস্ত চাতালে রক্তাক্ত শম্ভু নিষ্প্রাণ দেহে শুয়ে আছে।

কর্তব্যে অবহেলার জন্য অরুণকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল কিন্তু যে সব

ঊর্ধ্বতন অফিসার অরুণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওইভাবে শম্ভুকে নিয়ে গিয়ে তল্লাশি করানোর জন্য, তাঁদের কিন্তু কোন সাজাই হয়নি। অরুণের হয়তো কিছুটা বোকামি হয়েছিল, শম্ভুর কথায় বিশ্বাস করে তাকে একা বাথরুমে যেতে দিয়ে। কিন্তু যেসব পদস্থ অফিসার তাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা কি মূর্খামি করেননি? যেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে শম্ভুর মধ্যে আত্মহত্যার ছটফটানি জেগে উঠেছে, তখন কি করে তাঁরা শম্ভুকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন?

টাকা উদ্ধারের জন্য সরকারি চাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মধ্যে মন্ত্রীদের অতিরিক্ত অযৌক্তিক চাপ সহ্য করে নিজেদের পরিকল্পনামাফিক কাজ করার দক্ষতা ও ক্ষমতা থাকা চাই। মন্ত্রীদের তো একটাই উদ্দেশ্য, ভোটারদের কাছে নিজের সাফল্যের গুণকীর্তন প্রচার করে নিজের ভোটব্যাঙ্ক বজায় রাখা। কিন্তু তাঁর সাফল্যের পেছনে যাদের রাতভর প্রয়াস, তাঁদের অযৌক্তিক নির্দেশ দিলে যে সমস্ত কাজটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে, তার খেয়াল তাঁরা ক'জন রাখেন? তার বদলে তাঁরা স্বজনপোষণ ও নিজেদের পেটোয়া লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রেখে সাফল্য পেতে চান। একটা জিনিস কিছুতেই তাঁদের মাথায় থাকে না, গাধা দিয়ে গাধার কাজই হয়, বাঘ দিয়ে বাঘের কাজ। গাধাকে যতই চাপ দেওয়া যাক না কেন, সে কখনও বাঘের কাজ করতে পারবে না। কাজ পেতে গেলে বাঘের জায়গায় বাঘকে আর গাধার জায়গায় গাধাকে রাখতে হবে, এর কোনও দ্বিতীয় পথ নেই।

শম্ভুর মৃত্যুর পর আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করলাম, সঞ্চয়িতার বিরুদ্ধে যে অভিযানটা চলছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। যেন মনে হয়, শম্ভু পকেটে করে সব আমানতকারীর টাকা নিয়ে চিতায় উঠে শুয়ে পড়েছে। যাদের এ ব্যাপারে দায় ও দায়িত্ব ছিল, তারাও চুপ করে গেল। কাদের নির্দেশে এমন হল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সময়ের গহ্বরে তা আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল, যা প্রতিটা জোচ্চোর, জালিয়াত ও প্রতারক চায়।

প্রতারণা, জালিয়াতি, জোচ্চুরি কবে থেকে শুরু হয়েছে জানি না। তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাজারও রকম ঠগীর, লোক ঠকানোর পথও পরিবর্তন হয়েছে। এক একটা পরিবর্তিত কৌশলের সঙ্গে তার পাল্টা তাল রাখতে গিয়ে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগকেও হিমসিম খেতে হয়েছে শুধু নয়, এমনও বহুবার হয়েছে, আসামীকে নির্দিষ্ট করেও প্রমাণাভাবে তাকে গ্রেফতার করা যায়নি। আবার গ্রেফতার করেও আদালতের নির্দেশে তাদের মুক্তি দিতে হয়েছে।

প্রতারকরা সমাজের সব স্তরেই থাকে। আর সেই স্তর অনুযায়ী প্রতারণার পরিমাপও হয় ভিন্ন ভিন্ন। প্রতারকদের কোনও নির্দিষ্ট পথ নেই। ঝোপ বুঝে তারা কোপ মারে। আর সামাজিক মানসম্মানের দিকে তাকিয়ে তারা কোনও "কাজ" করে না। শিকারের বিশ্বাস অর্জন করে সুযোগ পাওয়া মাত্র তাকে বলি দিয়ে দেয়। কখনও কখনও তারা ফাঁদ পেতে রাখে শিকারের সন্ধানে। তার শিকার ফাঁদে পা দিলেই "মৃত্যু"।

এরকমই ফাঁদ পেতে বসে থাকত মীরা চট্টোপাধ্যায় দু নম্বর গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউর কমার্স হাউসের আটতলার তিন নম্বরের ঘুপচি একটা অফিস ঘরে, নারায়ণ ফাইনান্সিয়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেজে। ছোট্ট ঘরটায় একটা আলমারি, একটা টেবিল আর তিনটে চেয়ার। টেবিল ও আলমারিতে উপছে পড়ছে কাগজপত্র ও গাদা গাদা ফাইল। তিনটে চেয়ারের একটায় বসতো সে আর উল্টোদিকের দুটো চেয়ারে তার শিকার। কী ভাবে সে নিয়ে আসত শিকার?

সে কলকাতার দৈনিক কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন দিত, "ব্যবসার জন্য নামমাত্র সুদে, সরল চুক্তিতে টাকা ঋণ দেওয়া হয়।" মীরার বিজ্ঞাপন দেখে বহু আবেদনপত্র তার অফিসে আসত। সে সেগুলো থেকে বাছাই করে উত্তর দিত। বাছাই করতে করতে সে এত বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল যে, আবেদনপত্র পড়েই সে বুঝতে পারত কাকে কাকে সে শিকার করতে পারবে। আবেদনকারী নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে তার অফিসে দেখা করতে এলে সে ভুলভাল ইংরেজি ও বাংলায় এমন খই ফুটিয়ে তার সঙ্গে কথা বলত যে আবেদনকারী ঘাবড়ে যেত। এই ঘাবড়ে দেওয়াটাও তার একটা কৌশল ছিল। আবেদনকারী ভাবত সে বোধহয় ঋণ পাওয়ার যোগ্য নয়।

সে তখন আরও আকুল স্বরে মীরার কাছে অনুনয় করত যাতে সে ঋণ পায়। যারা তার শিকার হতে আসত তারা সবাই স্বাভাবিকভাবে বেকার যুবক। নিজের কর্মসংস্থানের আশায় বিজ্ঞাপনের উত্তরে তারা আবেদন করত। আর সেইসব যুবকের সামনে কালো, দোহারা চেহারার, মুখে ব্রণর দাগ ধরা সাধারণ মহিলাটি এমনভাবে অভিনয় করত যে আবেদনকারী প্রার্থীদের মনে হত এই মীরা চট্টোপাধ্যায়ই হতে পারে তাদের পরিত্রাতা। বেকারত্বের অকুল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যেন বাঁচার একটা অবলম্বন পেয়েছে। তাই তারা তার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। মীরা তাদের প্রথমে কী বলত? কী জিজ্ঞাসা করত, তাঁরা কী ব্যবসা করতে চায়? ব্যবসার পরিকল্পনা শুনে মীরা তাদের সেই পরিকল্পনার প্রজেক্ট রিপোর্ট ও তার জন্য কত টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন সেই প্রস্তাব জমা দিতে বলত। প্রার্থীরা তার কথা শুনে পড়িমরি করে ছুটত, তারপর তারা কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তাদের প্রস্তাব বানিয়ে নিয়ে এসে মীরার কাছে জমা দিত। মীরা চোখে চশমা লাগিয়ে গম্ভীরভাবে সেই প্রস্তাব দেখে নিত। প্রার্থীর সামনে এমন ভাব দেখাত যেন সে খুবই মনোযোগ সহকারে সেই প্রস্তাব দেখছে। প্রার্থীরা অধীর আগ্রহে তার প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য চাতক পাখির মতো উল্টোদিকের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করত। আর মীরা ততক্ষণে দেখে নিয়েছে তার শিকার কত টাকা ঋণ চায়, কারণ ওই চাওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে মীরার খেলা।

মিনিট পাঁচ সাত মীরা ব্যবসার প্রস্তাব সম্বলিত কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে

গম্ভীরস্বরে প্রার্থীকে বলত, "ঠিক আছে, আমি তো দেখলাম, এটা আমি আমাদের কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনার জন্য রাখব, তারা যদি প্রস্তাবটার পক্ষে রায় দেয় তখন আপনি মাসখানেকের মধ্যে ঋণ পেয়ে যাবেন আর বিপক্ষে রায় দিলে কিন্তু আমার কিছু করার নেই, আপনাকে কিছু দিতে পারব না।"

মীরার কথা শুনে প্রার্থী আরও বিচলিত হয়ে প্রায় তার পায়ে পড়ে গিয়ে বলত, "দিদি, আপনি একটু দয়া করবেন, আমার হয়ে বোর্ড মিটিংয়ে বলবেন, নয়তো আমি মরে যাব।" মীরা ভেতরে ভেতরে মুচকি হাসি চেপে আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বলত, "ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়, আসলে আমাদের ফান্ডে তো খুব একটা বেশি নেই, সবাইকে তো আর দেওয়া যায় না, তাই বেছে বেছে দিতে হয়।" প্রার্থী মীরার কথা করুণ মুখে নিয়ে শোনে। মীরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, এক সপ্তাহ পর ঠিক এই সময়ে এসে জেনে যাবেন আপনার আবেদনের কী কিনারা হল।" মীরার কথা শুনে বেকার যুবকরা চলে যেত, আর সারা সপ্তাহ ধরে ঋণ পাওয়া যাবে কি যাবে না সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে মীরার কাছে যখন আসত তখন বিধ্বস্ত, চিন্তাশূন্য, স্বপ্নাবিষ্ট।

তারা তো জানেও না বোর্ড মিটিং ফিটিংয়ের সব কথাই ফালতু। নামেই সেটা লিমিটেড কোম্পানি, আসলে সেটা ছিল মীরার প্রাইভেট কোম্পানি। মীরা শিকারের চেহারা দেখেই বুঝে যেত ফাঁদে পা দিয়েছে। মীরা তখন তার অব্যর্থ তীরটা ছুঁড়ে দিত। "দেখুন, অনেক কষ্টে বোর্ড মিটিংয়ে আপনার প্রস্তাবটা পাশ করিয়েছি। এখন আপনি ঋণ নিতে চান কি চান না বলুন। নিতে হলে সাত আট দিনের মধ্যে নিতে হবে, নয়তো অন্য প্রার্থীকে টাকাটা দিয়ে দেবে আমাদের কোম্পানির বোর্ড।" মীরার কথা শেষ হবার আগেই প্রার্থী বলত, "না, না, ঋণটা আমার চাই-ই চাই, আমি ব্যবসার অন্য সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।" মীরা নির্লিপ্তভঙ্গিতে জানতে চাইত, "তা আপনি কত যেন ঋণ চেয়েছেন?" প্রার্থী হয়তো বলল, "দু লাখ টাকা।" মীরা বলত, "হুঁ, তাহলে আপনাকে আমাদের কোম্পানিতে আরনেস্ট মানি বা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে শতকরা কুড়ি টাকা অনুযায়ী চল্লিশ হাজার টাকা জমা দিতে হবে।"

প্রার্থীর টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা তা ততদিনে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, আলাপ করে মীরার জানা হয়ে গেছে। চল্লিশ হাজার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিটের কথা শুনে প্রার্থী মীরাকে অনুনয় বিনয় করে বলতে থাকে, "অত টাকা দিতে পারব না দিদি, আপনি কমিয়ে দিন।" মীরার ততক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে মাছ টোপ গিলেছে, এখন শুধু খেলিয়ে পাড়ে তুলতে হবে। খেলাটা এসে ঠেকেছে কতটা ওজনের মাংস মাছের শরীর থেকে পাওয়া যাবে তা নিয়ে।

প্রার্থীর আবদার শুনে মীরা বিরক্তিভাব ফুটিয়ে বলে উঠত, "কেন যে আসেন আমাদের কাছে, না-না, তা কি করে সম্ভব, চল্লিশই দিতে হবে। বোর্ড মিটিংয়ে আমি জোর করে আপনার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলাম, এখন আমাদের নিয়মমত সিকিউরিটি ডিপোজিট না দিলে আমার কি হবে বলুন তো? মুখে চুনকালি ঘষে দিলেন তো?"

প্রার্থী মীরার বিরক্তিভরা মুখের কথা শুনে বলত, "অত টাকা দিতে পারব না, তবে কিছু দিতে পারব।" মীরা তো এটা শুনতেই এতদিন ধরে খেলাচ্ছিল। শিকার ধরার আনন্দটা ভেতরে চেপে রেখে অসম্ভব শান্ত গলায় অন্য একটা ফাইল মুখের সামনে পড়ার ভান করে উদাসীনভাবে প্রশ্ন করত, "কত পারবেন?" প্রার্থী হয়ত বলল, "বিশ হাজার।" সঙ্গে সঙ্গে মীরার গলায় তাচ্ছিল্য, "ধুস, এত কমে হয় নাকি? এত কমে আমি বোর্ড মিটিংয়ে আপনার হয়ে সওয়াল করতে পারব না। ওরা অন্য লোককে ঋণ দিয়ে দেবে, যারা পুরো সিকিউরিটির টাকা দিতে রাজি আছে। আপনি বরং অন্যখানে দেখুন।"

আরেকটা বিশ হাজার মীরার ঘরে এসে গেছে সেটা জেনেও তার "মুরগি প্রার্থীটার" আরও পালক ছড়ানোর জন্য মীরা অব্যর্থ তীর ছুঁড়ে দিত। সে পাকা খেলোয়াড়, জানে, তার

বড়শিতে লটকে গেছে মাছ, তার হাত থেকে আর ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে প্রার্থী তো তখন মীরার উদাসীনতা দেখে ভয় পেয়ে গেছে, সে তো জানে না মীরার সবটাই ভান, সবটাই অভিনয়। সবটাই তার শরীরের মাংস বেশি বেশি করে খুবলে নেওয়ার চক্রান্তের অঙ্গ। সে তখন ভাবছে, যে ঋণের আশায় সে বিভোর ছিল তা আর পাওয়া যাবে না, আর সেটা না পাওয়া গেলে তার ব্যবসাও করা হবে না, অর্থাৎ পুনঃ বেকারত্ব ভব। সে তার স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কায় মীরাকে কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিতে বলে উঠত, "দিদি, তাহলে কমপক্ষে কত দিলে চলবে? যাতে আপনি আমার জন্য ব্যবস্থা করতে পারবেন।" মীরার লক্ষ্যভেদ হয়ে গেছে, তবু মুখে একটা রাগ ভাব এনে বলত, "তিরিশ দিতে পারবেন?"

প্রার্থী মীরার শেষ প্রস্তাব শুনে ইতস্তত করলে, মীরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলত, "এ নিয়ে আর আলোচনা নয়, সময় নষ্ট করবেন না, আমি এর চেয়ে আর কমে আপনার হয়ে লড়তে পারব না।" প্রার্থী নিজের ও মীরার সম্মান বাঁচাতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠত, "ঠিক আছে, তিরিশ হাজারই দেব, আপনি দেখবেন আমি যেন ঋণের টাকাটা পুরো পাই।"

মীরা তার মুখের দিকে ঝট করে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটা ফাইল খুলে পড়তে পড়তে উত্তর দিত, "সেটা দেখা যাক কী হয়, আপনি দুদিনের মধ্যেই টাকাটা দিয়ে দেবেন, যাতে আমাদের কোম্পানির সামনের বোর্ড মিটিংয়েই পাশ করিয়ে নিতে পারি।" বিগলিত চিত্তে প্রার্থী বলত, "আমি দুদিনের মধ্যেই আপনাকে পুরো টাকাটা দিয়ে যাচ্ছি।"

দিন দুই পরে মীরার সেই শিকার ধার দেনা করে নগদ তিরিশ হাজার টাকা মীরার টেবিলে এনে রাখত। মীরার মুখে কিন্তু হাসি দেখা যেত না। এমনভাব দেখাত, যেন মনে হবে তিরিশ হাজার টাকাটা দিয়ে প্রার্থী মীরাকেই ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে, কারণ এরপর প্রার্থীর হয়ে তাকে বোর্ড মিটিংয়ে ঝগড়া করে ঋণ আদায় করতে হবে। মুখেও সেইসব বক্তৃতা শুনিয়ে যেত আর তার করুণার প্রার্থী কৃতজ্ঞ চোখে মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে সেগুলো শুনে যেত।

মীরা টাকা নিয়ে তার "প্রাইভেট লিমিটেড" কোম্পানির একটা লেটার হেডের ওপর লিখে দিত কত টাকা প্রস্তাবিত ঋণের বিনিময়ে কত টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দিচ্ছে, তারপর লিখত, ঋণ যদি অনুমোদিত না হয়, তবে ডিপোজিটের টাকা ছ মাস পর বিনা সুদে ভিন্ন ভিন্ন কিস্তিতে ঋণপ্রার্থী ফেরত পাবে। লেখা সম্পূর্ণ হলে ওই চিঠিরই তলায় একটা রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগিয়ে তার ওপর "ম্যানেজিং ডিরেক্টর" মীরা চট্টোপাধ্যায় খসখস করে সই করে দিত। কাজ শেষ হলে সেই চিঠিটা ঋণপ্রার্থীর হাতে দিয়ে বলত, "দিন পনেরোর মধ্যে আপনার বাড়িতে চিঠি যাবে। কী দাঁড়াল সেটাতেই জানতে পারবেন।" প্রার্থী আরও একবার তার হয়ে লড়ার অনুরোধ করে মীরার দেওয়া কাগজটা বুকে জড়িয়ে মীরার অফিস ত্যাগ করে বাড়ির পথ ধরত।

দুরু দুরু বুকে সেই যুবকটি পনেরো দিন ঋণ পাওয়ার জন্য হাজারও মানত-টানত করে কাটাত। পনেরো দিন গেল, কুড়ি দিন গেল, এক মাস গেল, কোথায় মীরা চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত নারায়ণ ফাইনান্সিয়ার কোম্পানির চিঠি? যার আশায় সে পলকহীন দিন গুনছে। অধৈর্য হয়ে সেই ঋণপ্রার্থী একদিন হয়তো গেল মীরার সেই ঘুপচি অফিসে। অফিসের দরজার সামনে একটা হাত পাঁচেক গলি মতো আছে। সেই গলির মুখে একটা ছোট্ট কাঠের টুলের ওপর বসে থাকতো এক রোগা বয়স্কা মহিলা। সে প্রার্থীকে দেখেই বলে উঠত, "মেমসাহেব তো আজ অফিসে আসবেন না, তাঁর বাবার অসুখ।" প্রার্থী যদি জিজ্ঞেস করত, "কবে আসবে?" তবে তোতাবুলির মতো মহিলা বলত, "কবে আসবে ঠিক নেই, কঠিন অসুখ হয়েছে শুনেছি।" সেই উত্তর শুনে প্রার্থীর তো হৃদকম্প শুরু হয়ে যেত। কিন্তু তার কিছুই করার থাকত না। ওদিকে তার দেওয়া তিরিশ হাজারে মীরার শাড়ি কেনা, বাজার, প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া ও তার পেট্রল, হোটেলে খানা, মস্তান ভাড়া সবই চলছে।

দু তিন মাস হাঁটাহাঁটির পর যদি বা মীরার সঙ্গে দেখা হল, মীরা প্রথমেই প্রচণ্ড ব্যস্ততা দেখিয়ে বলে উঠত, “আপনার ঋণ অনুমোদন হয়নি, মাস দুয়েক পর এসে কিস্তির টাকা নিয়ে যাবেন।” প্রার্থী যদি বলত, “অত দিন?” মীরা ঝঙ্কার দিয়ে বলত, “আমার কথা বলার সময় নেই, যেদিন আসতে বললাম, সেদিন আসবেন।”

সাক্ষাতের জন্য লম্বা লম্বা সময় দিয়ে মীরা কাটিয়ে দিত ছ সাত মাস। ইতিমধ্যে টাকা ফেরত চাইতে আসা যুবকটির চেনা হয়ে গেছে কমার্স হাউসের লিফট, সিঁড়ি, অন্যান্য অফিস। জুতোর তলার সোল ক্ষয়ে গেছে। তবু কষ্টার্জিত টাকার মায়া কি আর ছাড়া যায়! আবার অনেকে বছরের পর বছর মীরার অফিসে ঘুরে ঘুরে একসময় তাগাদা দিতে আসাটাই বন্ধ করে দিত। আর সেটাই ছিল মীরার আসল পদ্ধতি, সম্পূর্ণ জয়। অনেকে আবার নাছোড়বান্দা হয়ে ক্রমাগত আসতেই থাকত। এক সময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে মীরাকে গালাগালি দিত। তাতে অবশ্য মীরার কিছুই যেত আসত না। সব প্রতারকদের গায়ের চামড়া অসম্ভব মোটা হয়, কেউ খিস্তি খেউড় করলে তাদের কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় না। তারা বোধহয় ভাবে যে গালাগালি করছে তা তার মুখেই আছে, আমার গায়ে লাগবে কেন?

মীরার শিকারদের অধিকাংশই হতো মফস্বলের লোক। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মীরার কাছে প্রতারিত হয়ে টাকা ফেরতের জন্য ঘুরে ঘুরে একসময় হাল ছেড়ে দিত। আবার কখনও কখনও তাদের নিয়ে মীরা নতুন খেলাও শুরু করত। তখন সে বলত, “বোর্ড আপনাকে ঋণ দেবে, কিন্তু শুধু মাত্র সিকিউরিটি ডিপোজিটের ওপর নির্ভর করে নয়, আপনাকে আমাদের ঋণের বদলে অন্য কোন সম্পত্তি কোম্পানির কাছে বন্ধক হিসাবে রাখলে তবেই দেবে। আর সম্পত্তির মূল্য আমাদের দেওয়া টাকার অন্তত তিনগুণ হওয়া চাই।” ঋণপ্রার্থী মীরার নতুন চাল হজম করে আবার ছুটল আবদার নিয়ে তার মামা, কাকা বা বাবার কাছে, যাতে তাঁরা মীরার কাছে তাঁর সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে তার ঋণটা বার করতে সাহায্য করেন।

দু একটা ক্ষেত্র ছাড়া কেউই সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাবে সফল হতো না। কিন্তু ততদিনে মীরা সেই প্রার্থীর ছমাস সময় খেয়ে ফেলেছে। যদি তেমন কেউ সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে সেই সম্পত্তির দলিলের নকল মীরার কাছে নিয়ে আসতে সমর্থ হতো, মীরা সেই দলিলের নকলটা হাতে নিয়ে চোখে চশমা লাগিয়ে ঠিক হাকিমি গলায়, হাকিমি চালে বলত, আছে রেখে যান, সম্পত্তির মালিকানা ও মূল্য সব যাচাই করে দেখি, তারপর আসবেন। "

মীরা সেই সম্পত্তির মালিকানা ও মূল্য যাচাইয়ের নাম করে সেই ঋণপ্রার্থীর

জীবনের আরও ছমাস ধূলিসাৎ করে দিল। এবং অবশেষে বলল, “আপনার সম্পত্তির মূল্য আপনি যা বলছেন অত হবে না, আমরা দেখে নিয়েছি, তাই আপনাকে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবটা বাতিল করা হয়েছে।”

মীরার তাচ্ছিল্যভরা কথা শুনে হতাশ ঋণপ্রার্থী তখন বলত, “তাহলে আমার সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিন।” চিটিংবাজিতে অভ্যস্ত মীরা হুঙ্কার দিয়ে বলত, “তিন মাস পর আসবেন, টাকা কি গাছের ফল যে চাইলেই পেড়ে দেব?” মীরার হুঙ্কার শুনে মীরার “দয়ার” ওপর নির্ভর করে ঋণপ্রার্থী চলে যেত। এইভাবে ছ সাত মাস কি বছর বছর ঘুরিয়ে মীরা তার পোষা মস্তান লাগিয়ে দিত সেই তাগাদাদারদের পেছনে। তারা তাকে ধমকিয়ে কিংবা মারধোর করে মীরার অফিসে আসা বন্ধ করে দিত।

অনেক সময় সে আবার তার ভাড়া করা মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক মহিলাকে সেই প্রার্থীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে তাকে গোপন ঘরে নিয়ে ঢুকিয়ে যৌনকর্মে লিপ্ত করিয়ে ফাঁসিয়ে দিত। এরপর সেই তাগাদাদার মীরার কাছে সিকিউরিটি ডিপোজিট ফেরত চাইতে এলে মীরা বলত, “মনে নেই সেদিন কী করেছেন, সেই কথা আপনার বাড়িতে জানিয়ে দেব। আর ওই কাজ করতে কি পয়সা লাগে না? আপনার সিকিউরিটির টাকা ওইখাতে খরচ হয়ে গেছে।” মীরার এই অস্ত্রে কাৎ হয়ে তাগাদাদার আর মীরার অফিসমুখো হতো না। মীরা, সেই

মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেশ কজন পুলিশ অফিসারেরও আলাপ করিয়ে দিয়ে, তার কাজ আদায় করিয়ে নিয়েছিল। সেই অফিসাররা যাতে মীরার পেছনে না লাগে তার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল।

অনেক সময় কলকাতার শিকাররা মীরার ওই সব চালে মাৎ হতো না। মীরা তাদেরও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একদিন খসখস করে একটা চেক লিখে দিত। আর সেই চেক অবশ্যম্ভাবীভাবে বাউন্স করত। সেই চেক নিয়ে তাগাদাদার মামলা করবে? করুক না। সেটাই তো মীরা বা মীরার মতো সব প্রতারকেরা চায়। একবার মামলা করলে তো আর তাগাদার টাকার জন্য বিরক্ত করতে আসবে না। যা হওয়ার আদালতে হবে। আর প্রতারণার মামলা নিষ্পত্তি হতে আমাদের দেশে যে কত বছর লাগবে, সেটা পৃথিবীর কেউ বলতে পারে না। অন্যদিকে প্রতারণার মামলায় জামিন পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। সুতরাং মামলা হলে কোনও প্রতারকের নিদ্রায় এককোঁটাও ব্যাঘাত ঘটে না। প্রতারকদের একটাই ভয়, আর সেটা হচ্ছে মারের।

কিন্তু মীরা যেহেতু মহিলা ছিল, সেহেতু সে বহু মারের হাত থেকে বেঁচে গেছে।

মীরার বিরুদ্ধে প্রতারণার কত যে মামলা হয়েছে, তা বোধহয় সে নিজেও চিন্তা না করে বলতে পারবে না। তাতে তার কিছু যেত আসত না আদালতে আদালতে তার বাঁধা আইনজীবীরা ছিল, তারাই সে সব সামলাত। কত বার যে তাকে গ্রেফতার করে আমাদের দফতরে নিয়ে আসা হয়েছে, তারও কোন পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। তাতেও মীরার কিছু যেত আসত না। সে ছিল একশভাগ নির্লজ্জ। কোন মহিলা যে কতটা লাজলজ্জাহীন হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মীরা।

আমাদের গোয়েন্দা বিভাগে সরাসরি এসে যদি কেউ মীরার হাতে প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ করত, তখনই একমাত্র আমরা মীরাকে ধমক-ধামক দিয়ে তার থেকে টাকা উদ্ধার করে প্রতারিত হওয়া যুবকদের ফেরত দিতে পেরেছি। কিন্তু সেটা আর সংখ্যায় কজন? আমাদের বিভাগে চট করে কেউ আসতই না। আর এলেই যে চট করে সে সাহায্য পেত, তাও অবশ্য নয়। প্রথমত, তাকে সঠিক অফিসারের কাছে আসতে হতো, যে মীরার প্রলোভনের আয়ত্বের বাইরে ছিল। আর মীরাকে ধমকধামক দিলে একবারেই যে সে টাকা ফেরত দিয়ে দিত, তা নয়, প্রাপককে অনেকবার ঘুরতে হতো। মীরার কৌশলই ছিল ওইরকম। সে ভাবত, এত খেলিয়ে যাকে সে শিকার করেছে, তাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে কেন? তাছাড়া যে টাকা সে শিকারের কাছ থেকে নিয়েছে তা তো খরচ করে ফেলেছে বিভিন্ন খাতে।

তাতে ভাগ বসাত আবার তার দালালেরা, যারা শিকার ধরে মীরার কাছে নিয়ে আসত। যে দালাল যে শিকার নিয়ে আসত, তাকে জালে জড়াতে পারত, তার দেওয়া "সিকিউরিটি ডিপোজিটে"র ভাগ সেই দালালকে মীরার দিতে হতো। তাছাড়া সে নিজের নামে পুরো টাকাই ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে সেই টাকার সুদ বসে বসে ভোগ করত আর যার টাকা তাকে নানা বাহানায় ঘুরিয়েই চলত।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বই দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত মীরা তাঁর ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছে। তারপর একদিকে তার মুখোশ খুলে যেতে, অন্যদিকে কিছুটা আমাদের চাপে তার ব্যবসায় মন্দা দেখা দিল। সে আর আগের মতো ব্যবসা চালাতে পারছে না। কিন্তু প্রতারকরা তো আর লোক ঠকানো ছাড়া চলতে পারে না, তাদের কাজই মানুষকে মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা বুঝিয়ে 'প্রতারিত করা। এদের মিথ্যা কথা বলে বলে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে অপ্রয়োজনে, অকারণে তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এদের

অভিনয় দক্ষতা এবং পলকে পলকে মুখের অভিব্যক্তি পাল্টানোর ক্ষমতা এত উচ্চমার্গের হয় যে, যারা তাদের প্রতারক হিসাবে জানে, চেনে, তারাও তাদের বিশ্বাস করে বসে এবং জেনেবুঝেই তাদের হাতে প্রতারিত হয়। প্রতারিত হয়ে নিজের চুল নিজে ছেঁড়া

ছাড়া কিছুই করার থাকে না।

প্রতারকদের হাতে প্রতারিত হয়ে কতজন আর টাকা আদায় করতে পারে? খুবই নগণ্য! আর ছায়াছবির জগতের মায়াজালের মোহে কতজন যে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তাও কেউ সঠিকভাবে বলতে পারবে না।

আমাদের গোয়েন্দা বিভাগে ডিসি ডিডি হয়ে এলেন এক আই পি এস অফিসার। তিনি ছিলেন সুদর্শন, ভদ্র, মার্জিত, কিন্তু অসম্ভব মাদকাসক্ত আর শিল্প সাহিত্যের খুব অনুরাগী। তিনি নিজেও সাহিত্যসৃষ্টিতে দক্ষ বিশেষ করে উর্দূ রচনা ও শায়েরিতে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

হঠাৎ আমি দেখলাম, আমারই পরিচিত মধ্য কলকাতার এক ব্যবসায়ীর ছেলে ঘনঘন তাঁর কাছে আসতে শুরু করল। কদিন পর দেখলাম, সেই ব্যবসায়ীর ছেলে অরুণ ছাবিয়া যখন তার কাছে আসে সেসময় আরও দু তিনজন অপরিচিত ভদ্রলোক ডিসির অফিসে আসেন। তাঁরা সবাই সন্ধে নাগাদ আসতেন এবং ঘণ্টাখানেক অফিসে গল্পগুজব করে ডিসি সমেত বেরিয়ে যেতেন। অরুণের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটা গাড়ি ছিল। তাঁর গাড়ি আমি বহু জায়গায় বিভিন্ন ভিভিআইপির নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করেছি। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। লালবাজার থেকে বার হওয়ার পর সেই গাড়িকে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে দেখা যেতে লাগল। প্রতি সপ্তাহেই কমপক্ষে চার পাঁচদিন তাঁরা আসতেন

একদিন লালবাজারে অরুণের সঙ্গে আমার দেখা হল। আমি ডিসির সঙ্গে তাঁর বর্তমানে এত কিসের প্রয়োজন, তা জানার জন্য ভেতরে ভেতরে জমে থাকা কৌতূহলটা আর দমন করতে না পেরে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলাম, "অরুণ, কি ব্যাপার, আমাদের ডিসি সাহেবের সঙ্গে তোমার এত কি প্রয়োজন?" অরুশ হেসে বলল, "জানেন না স্যার, আমরা একটা বাংলা ছবি প্রযোজনা করছি।" বললাম, "তাই? তা কবে বার হচ্ছে তোমাদের ছবি?" অরুণ বলল, "এখনও কোন গল্পটাকে নিয়ে ছবি করব সেটা ঠিক হয়নি। সেটা আগে ঠিক হোক, তারপর বলব?" অরুণ এবার খুব গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "গল্প নিয়েই আলোচনা হয়, যেটা সবার পছন্দ হবে, সেটাই করা হবে।" বললাম, "ঠিক আছে, কবে থেকে শ্যুটিং শুরু হবে, আমাকে জানিও।"

অরুণ চলে গেল ডিসি সাহেবের চেম্বারের দিকে। ভাবলাম, ভালই হল, আমার পরিচিত একজন চিত্র প্রযোজক হিসাবে ছবির জগতে ঢুকলেন। আর ডিসি সাহেবের শিল্প সাহিত্যের প্রতি অনুরাগকেও আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতাম, তিনিও নতুন সৃষ্টিতে নিজেকে আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা তাঁর জীবনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে শুধু নয়, পুলিশের মধ্যেও যে শিল্পচেতনাসমৃদ্ধ মানুষেরা আছেন, তাও সাধারণ নাগরিকরা জানতে পারবেন। পুলিশকে তো সাধারণ মানুষেরা বিপদে না পড়লে গুণ্ডা ডাকাত ছাড়া অন্য চোখে দেখেন না। তাঁদের সেই ভাবনাতেও একটা আঘাত দেওয়া হবে।

এরপর অরুণ ও ডিসি সাহেবের আলোচনার মধ্যে বর্তমানে প্রয়াত এক বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকও যোগ দিতে দেখলাম। বছরখানেক তাঁদের আলাপ 'আলোচনার স্থল ছিল গ্র্যান্ড হোটেল, তারপর সেটা চলে গেল পার্ক স্ট্রিটের একটা নামকরা হোটেলের রেস্তোরাঁয়। সেখানে প্রতিদিনই মদ্যপান ও খাওয়া দাওয়ার মধ্যে তাঁদের প্রস্তাবিত ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য নিয়ে "আলোচনা" চলতে থাকল। সে সময় যখন অরুণের সঙ্গে দেখা হতো, সে জানাত তাঁদের চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা চলছে। এইভাবে দুবছর চলে যাওয়ার পর একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "অরুণ, এখনও কি তোমাদের চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা চলছে?" অরুণ আর আগের মতো হাসিখুশি নেই, সে আমার প্রশ্নের জবাবে একটু উদাসভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ স্যার, এখনও চিত্রনাট্য ফাইনাল হয়নি।" আমি ছবি বানানো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, জানিনা একটা চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ করতে কত দিন সময় লাগতে পারে। সেই অজ্ঞতা থেকেই জানতে চাইলাম, "একটা চিত্রনাট্য ফাইনাল করতে এতদিন লেগে যায়?" অরুণ আমার প্রশ্ন শুনে একটু দমে গেল, তারপর খুব নিচু স্বরে বলল, "আমিও জানি না স্যার, আমি তো এই প্রথম

ছবি বানাতে যাচ্ছি, তবে দেখছি, একবার একটা লেখা হচ্ছে তো সেটা পরক্ষণেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ, অন্যজনের সেটা পছন্দ হচ্ছে না।"

অরুণদের ছবি বানানোর পরিকল্পনায় চিত্রনাট্য ঠিক করতে করতে তিনটে বছর পার হয়ে গেল। ততদিন তাঁরা পার্ক স্ট্রিটের বড় হোটেলের রেস্তোরাঁ ছেড়ে আলোচনাস্থল নিয়ে গেছেন ওই অঞ্চলেরই বিভিন্ন শুঁড়িখানায়। ইতিমধ্যে ডিসি সাহেবও আমাদের গোয়েন্দা দফতর থেকে অন্য দফতরে বদলি হয়ে গেছেন। তাই লালবাজারে অরুণের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতও কমে গেছে। তবে তাঁদের পরিকল্পনা যে যথারীতি চলছে, তার খবর পাই।

অরুণদের পরিকল্পনা চতুর্থ বছরে পদার্পণ করার পর একদিন অরুনদের সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা। তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "কি অরুণ, কবে তোমার ছবি মুক্তি পাচ্ছে? আমি দেখতে যাব তো?" অরুণ উদাসীনভাবে বলল, "না স্যার, এখনও চিত্রনাট্যই ঠিক হল না, শ্যুটিং হল না, রিলিজের কথা কী বলছেন?" তার কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম, এ তো দেখছি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এতদিন লাগে! বললাম, "তাই? শেষ হলে খবর দিও।"

সত্যি সত্যি অরুণদের ছবি তৈরির পরিকল্পনা পঞ্চম বর্ষে পা রাখল। তাঁরা এখন পার্ক স্ট্রিটের শুঁড়িখানা ছেড়ে ময়দানে আমাদের পুলিশ তাঁবুতে এসে সান্ধ্য আলোচনাস্থল জমিয়েছে, কারণ পুলিশ তাঁবুতে মদ্যপানের খরচ কলকাতার অন্য বারের চেয়ে কম।

একদিন আমিও তাঁবুতে সন্ধেবেলায় গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দেখি তাঁবুর সামনে রাস্তায় অরুণের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম, অরুণ ভেতরেই আছে। তাঁবুর অন্দরে পৌঁছেই দেখি, ঠিকই অরুণ আছে, সঙ্গে আরও দুজন অচেনা লোক। শুনলাম, তাঁরা টালিগঞ্জের ছবির জগতের টেকনিসিয়ান। দেখলাম, একটা গোল পাথরের টেবিল ঘিরে তাঁরা সবাই গভীর আলোচনায় মগ্ন। প্রত্যেকের সামনেই রঙিন পানীয় ও প্লেটে প্লেটে ক্যান্টিন থেকে আনা টুকটাক খাদ্য। অরুণ আমাকে দেখে হাত দিয়ে ইশারা করে জানিয়েছে, একটু পরেই আমার কাছে আসছে। আমি তাঁদের থেকে দূরে অন্য একটা টেবিলে বসেছি। আর অরুণের জন্য অপেক্ষা করছি।

আধঘণ্টা পর অরুণ আমার কাছে এল। চোখ মুখ বেশ উজ্জ্বল লাগছে। বললাম, "কি, চিত্রনাট্য শেষ হয়েছে?" অরুণ সপ্রতিভ হয়ে জানাল, "হ্যাঁ, চিত্রনাট্য শেষ, এখন শ্যুটিংয়ের বাজেট তৈরি হচ্ছে।" অরুণের কথা শুনে বললাম, "যাক, তবে একটা পর্ব শেষ হয়েছে। তা কবে থেকে শ্যুটিং শুরু করছ?" অরুণ বলল, "দিন তারিখ এখনও ঠিক হয়নি, বাজেটটা তৈরি হোক, তারপর শিল্পীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁদের ডেট অনুযায়ী শ্যুটিং শুরু হবে। তার আগে গান লেখাতে হবে, রেকর্ডিং করতে হবে, অনেক কাজ।" জানতে চাইলাম, "ডি সি সাহেবকে তো দেখছি না?" অরুণ বলল, "তিনি এখন কম আসেন, বলেছেন, বাজেট ঠিক হলে তাঁকে খবর দিতে।" অরুণ আমাকে তাদের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে, ব্যস্ত হয়ে টেকনিসিয়ানদের কাছে চলে গেল।

ছবি বানানোর ধাপের পর ধাপ সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই, সুতরাং অরুণের কথাটাই সঠিক ভেবে চুপ করে গেলাম। পাঁচ বছরে পা দিয়ে চিত্রনাট্য যে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে পার্ক স্ট্রিটের ছোট বড় সব রকম শুঁড়িখানা ঘুরে গড়ের মাঠের পুলিশ তাঁবুতে এসে শেষ হয়েছে, এটাই অনেক! এবার বাজেট পর্ব। সেটা আবার কবে শেষ হবে কে জানে? এই ক'বছরে কতরকম লোকজনের সঙ্গে তাঁদের আলাপ করতে দেখলাম, সেই সংখ্যাটা অরুণরাও বলতে পারবে না। অবশ্য অরুণের নিজেরও চারিত্রিক দোষ ছিল। যতদূর জানি, মহিলাসঙ্গে সে কত টাকা এদিক ওদিক উড়িয়ে দিয়েছে, সে নিজেই জানেনা না। ছবি করার অন্যতম আকর্ষণ সেই প্রলোভন, তার থেকেও আসতে পারে। সেই লাট্টুর ঘূর্ণিতে যে মজেছে, সে মরেছে। একের পর এক লাট্টু তাদের চাই, যে কোনও মূল্যে। আর তাই অরুণ ছাবিয়ার আইনী, বেআইনী রোজগার, মদের ফোয়ারার সঙ্গে অন্য গলিতেও উবে

গেছে কর্পূরের মতো

পুলিশ তাঁবুতে অরুণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ছমাস কেটে গেছে। অরুণকে আর দেখতে পাইনি। ভাবলাম, কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক বাজেট করতেই যেখানে চার-ছমাস সময় লাগে, সেখানে একটা বাংলা ছবির বাজেট করতে কত দিন আর লাগবে, বড় জোর আট দশ দিন। আর এই বাজেট তো আর সরকারী বাজেটের মতো গণ্ডিবদ্ধ মানের মধ্যে হবে না, এটা হবে একটা আনুপাতিক বাজেট, কারণ ছবি তৈরির ব্যাপারটা অনেকটাই অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। তাই খরচের দিকটা হবে একেবারেই নমনীয়, তার বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। সুতরাং এতদিনে তারা হয়তো শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই তাদের দেখা যাচ্ছে না।

এই বিশ্বাস যখন আমার মনে দৃঢ়ভাবে বসে গেছে, তখন হঠাৎই একদিন লালবাজার চত্বরে অরুণকে দেখি। অরুণকে দেখে আমার নিজেরই ধন্দ লাগল, ঠিক দেখছি তো, এ কি সেই অরুণ যে তেলেজলে আদরে বড় হয়েছে, যার চেহারার মধ্যে একটা আলাদা জেল্লা ছিল? এখন তো ঠিক যেন মড়কলাগা মুরগির মতো চেহারা হয়েছে।

অরুণ সামনে এলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "অরুণ, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছিল?" অরুণ ম্লান হেসে জবাব দিল, "না স্যার, শরীর খারাপ হয়নি।" প্রশ্ন করলাম, "তবে কি শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ততার জন্য তোমার চেহারা খারাপ হয়েছে?" সে বলল, "না, না, শ্যুটিং কোথায়? এখন ওরা ডাকলেও আর যাচ্ছি না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।" অরুণের তরাস লাগা গলার স্বরে তাকে দিশাহারা মনে হল। তাই না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, "কেন কি হয়েছে?" অরুণ একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বলল, "সে স্যার অনেক কথা, চার বছর লাগল চিত্রনাট্য শেষ করতে, তারপর বাজেট করতে আরও ছমাস, এদিকে শুধু খাওয়া দাওয়া করতে করতেই আমার পাঁচ লাখ বেরিয়ে গেছে। বাবা রোজ আমাকে গালাগালি দিচ্ছে। আমি তাই ঠিক করেছি, যা গেছে গেছে, আর খরচও করব না, ছবিও করব না। কিন্তু ওরা প্রতিদিন ডেকে পাঠায়, আমি যাচ্ছি না। এখন ভাবছি, ডিসি সাহেব এতবার ডেকে পাঠালে কতদিন আর না গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারব?" একটানা পুরো ঘটনা বলে অরুণ চুপ করে গেল। তার অসহায়, ভয়ার্ত মুখটা দেখে আমার কষ্ট লাগল, ভাবলাম, এও তো একধরনের প্রতারণা। কাজের কাজ নেই, অথচ কাজের নামে একজনের পকেট মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খালি করা! "খুড়োর কল" সামনে রেখে বলি দেওয়া। গম্ভীর হয়ে বললাম, "অরুণ, তুমি ঠিক আর ছবি করবে না তো?" অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "না স্যার, আর ওই লাইন মাড়াব না।" বললাম, "তবে এক কাজ করো, এবার ওদের কেউ এলে সোজা বলে দেবে, 'আমি আর আপনাদের সঙ্গে ছবি তৈরি করব না, রুনুবাবুর সঙ্গে করব।' একথা শোনার পর দেখবে আর তোমাকে ওরা বিরক্ত করবে না, দরকার হলে একথা তুমি ডিসি সাহেবকেও বলে আসতে পার।" অরুণ আমার কথা শুনে মাথা নেড়ে চলে গেল। আমি জানি, অরুণ নিজে বাঁচতে আমার কথাগুলো ওদের বলবে আর মামলা যেহেতু অরুণের হাত থেকে আমার হাতে চলে এসেছে, তাই তারা আর 'কালো রুনু' ঘাঁটাতে আসবে না। সান্ধ্য মজলিসের খাওয়া দাওয়ার খরচের জন্য অন্য কোন অরুণকে বধ করে একটা একটা করে পালক খসিয়ে তাদের খেতে হবে।

অরুণ ছবি তৈরির পরিকল্পনাকারদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নেমে গেল রাজনীতি করতে। নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল মধ্য কলকাতার এক আসন থেকে বিধানসভা নির্বাচনে, সেখানেও কিছু উস্কানিদাতা তার পকেট খালি করল, নির্বাচনে তার জন্য যা অনিবার্য ছিল তাই হল। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর সে কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থী হল। না, সেখানেও সে অকৃতকার্য। কিন্তু সে তার উদ্যম ছাড়েনি। কিছু একটা "বিশেষ কাজ" তাকে করতেই হবে, এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে সে এখনও দৌড়চ্ছে।

আর মানুষের এই দুর্বল ইচ্ছাকেই কাজে লাগিয়ে প্রতারকরা ঠকিয়ে চলে সাধারণ

মানুষকে। তারা ওঁত পেতে থাকে মানুষের দুর্বলতাটা জানার জন্য, যেখানে তারা ঘা দিয়ে ছুঁচ হয়ে ঢুকে পকেট খালি করে ফাল হয়ে বেরিয়ে যায়।

মানুষের দুর্বলতা, অসতর্কতা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, লোভ, ধর্মান্ধতা ও অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়েও প্রতারকরা প্রতারণা করে যায়। স্থান, কাল পাত্র ভেদে প্রতারণারও প্রকারভেদ হয়। এবং ডাকাতি, খুনের মতো অন্য বড় অপরাধসংক্রান্ত প্রতারণারও বহু ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা হয়। আর এইসব ষড়যন্ত্র করতে তাদের অর্থও বিনিয়োগ করতে হয়।

পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে কলকাতা ও ওড়িশার এক ছোট জায়গার এক রাজপরিবারের অন্দরমহলে একটা বড় প্রতারণার ষড়যন্ত্র নিভৃতে হতে থাকল। আর সেই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী কর্মকাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক অনন্ত সিংহ। আর তার সঙ্গে ছিল এক প্রাক্তন নেভি অফিসার মিঃ রায়। ফর্সা, লম্বা, ছিপছিপে গড়নের, খুবই সুদর্শন এই প্রাক্তন নেভি অফিসার ভারতীয় ও বিদেশি মিলিয়ে মোট চোদ্দটা ভাষা জানত। শুধু জানতই না, ভরাট গলায় সেই সব ভাষায় যখন অনর্গল কথা বলত, মনে হতো সেই ভাষাটাই তার মাতৃভাষা। চাকরি সূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সেইসব জায়গার মানুষের সঙ্গে মিশে সে শুধু তাদের ভাষাই শেখেনি, অনেক আদব কায়দাও শিখেছিল। তার কথা বলার ভঙ্গিমায় ও ভাষার ওজনে যে কোনও লোক আকৃষ্ট তো হতোই, এমন কি বিশ্বাসে তার অনুগামীও হয়ে যেত। অনন্ত সিংহ ও মিঃ রায়ের সঙ্গে তাদের দলে ছিল পরবর্তী কালের মুম্বই ছায়াছবির জগতের এক পার্শ্বঅভিনেতা মিঃ গুপ্ত এবং ছিল এক মিঃ সেন, এছাড়াও আরও কয়েকজন।

ওড়িশার সেই রাজপরিবারে বিয়ে হয়েছিল কলকাতারই এক অপরূপ সুন্দরী বাঙালি কন্যার। সেই রাজবধূর সঙ্গে অনন্তবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ রায় ও অন্যান্যদের। মিঃ রায় প্রায়ই ওড়িশার সেই রাজবাড়িতে যাতায়াত শুরু করল। এবং নিজের মনমাতানো কথা বলার দক্ষতায় সেই রাজবধূকে একেবারে আপনজন করে ফেলল।

তাদের বন্ধুত্ব একটা নৈতিক স্তরে দৃঢ়তা পাওয়ার পর, মিঃ রায় রাজবধূকে বলল, "দেখুন, আমরা একটা গোপন বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করেছি, কারণ আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে তা মেকি স্বাধীনতা, সেখানে সাধারণ মানুষের কোনও লাভই হয়নি। সাধারণ মানুষ আগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা শোষিত হতো, আর এখন সেখানে হচ্ছে ভারতবর্ষের অন্য শোষক শ্রেণীর দ্বারা, যারা অন্যদিকে আবার শুধু ব্রিটিশ নয়, পৃথিবীর সব সাম্রাজ্যবাদীরই দালাল। আর ভারতবর্ষের যে কমিউনিস্ট পার্টি আছে তারা কোনওদিন বিপ্লব করবে না, সেটা বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই একেবারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা তাই বিপ্লব করার জন্য গোপন, জঙ্গি সংগঠন গড়েছি।" মিঃ রায় যখন এসব কথা সেই রাজবধূকে বলত, তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা গিলতেন।

সেই সময় পৃথিবীর চারদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের জয়জয়কার। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত বাহিনীর অর্ধেক ইউরোপ দখল ও সেইসব দেশে কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে এশিয়ার বুকে চিনে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা কমিউনিস্ট পার্টির করায়ত্ব ও উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনাম জুড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের উত্তাল গর্জন। সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে একটা শোষণবিহীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন গেঁথে বসেছিল।

চিনের থেকেও দুবছর আগে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন বারবার নিজেদের ব্যর্থতায় মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লেও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আশা নিরাশার দোলার আচ্ছন্নতা ছিল। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব নিজেদের ব্যর্থতার দায় এমনভাবে অন্যের ঘাড়ে চালান করে দিত যে সাধারণ মানুষ তাদের সেই চালাকি বুঝতেও পারত না। মার্কসবাদ বোঝার ক্ষমতা কতজনেরই বা আছে? তাই নেতৃত্ব যা বোঝাত, চিরকালীন পদ্ধতি অনুযায়ী সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করত। তাছাড়া সাধারণ মানুষ অতশত তত্ত্ব নিয়ে ওঠাবসা করে না, তারা চায় ফল। মোদ্দা কথায়, কী দাঁড়াল?

পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতা ও গান্ধী, নেহেরু তত্ত্বের অসারত্বটা অনেকটাই বুঝে গেছে।

অপরদিকে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অক্ষমতাও জেনে গেছে। এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ চাইছে নতুন এক নেতৃত্ব, নতুন এক দিশা। তখনও সাধারণ মানুষ নিজ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশের চিন্তা করতেন। তখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেনি। তখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে মুখে এক, কাজে অন্য, এই দ্বৈতচরিত্রের ব্যাধি বাসা বাঁধেনি। দেশপ্রেমের আড়ালে রাজনীতি ও আখের গোছানোর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে সমাজ আক্রান্ত হয়নি। বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে হয়নি। টাকার চোখ দিয়ে অপরকে দেখা ও সেই ভিত্তিতে কাজ করার মনোভাব গড়ে ওঠেনি। আন্তরিকতার পেছনে ছুরি নিয়ে শান দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়নি। বর্ণবিদ্বেষের কুটিলতা বুকে বুকে হানাহানি করেনি। সোজা কথায় সমাজ ও মানুষ তখনও অনেক সহজ, সরল ও সুস্থ ছিল। মানুষ একে অপরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত। প্রত্যেকের মধ্যেই দেশের জন্য কিছু করার তাগিদ ছিল।

আর এই আবেগের মেরুদণ্ডেই মিঃ রায় সেই রাজবধূকে ঘা দিল। দেশের মুক্তির পথ একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথ, তা তাকে বোঝাতে লাগল। মিঃ রায় রাজবধূকে বলল, "কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য দরকার অনেক অস্ত্র, আর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও বিরাট সংগঠন। আর সেইজন্য চাই প্রচুর টাকা।" রাজবধূ প্রশ্ন করলেন, "কীভাবে আসবে সেই টাকা?" মিঃ রায় তার ভরাট গলায় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস মিশিয়ে বলল, "তা আনতে হবে গোপন সূত্রে।" রাজবধূ বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে জানতে চাইলেন, "কী সেই সূত্র?" মিঃ রায় একইভাবে বলল, "গোপন সূত্র অনেক হতে পারে, যেমন কোনও বিশাল বড়লোক কোটিপতি আমাদের চাঁদা দিতে পারেন, কিন্তু তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ কেউ তার উচ্ছেদের বন্দোবস্ত করার জন্য কোনও বিপ্লবী সংগঠনকে সাহায্য করবে না। তাছাড়া হতে পারে ডাকাতি, কিন্তু সেটাতেও ঝুঁকি আছে। প্রথমত, ডাকাতি করতে গেলে প্রথমেই আমাদের দলের কেউ মারা যেতে পারে, অথবা ডাকাতি করে ধরা পড়ে গেলে সংগঠন প্রাথমিক অবস্থাতেই দুর্বল হয়ে যাবে। তাই এমনভাবে টাকা জোগাড় করতে হবে যাতে সাপও না ভাঙে লাঠিও না ভাঙে। অর্থাৎ টাকাও পাওয়া যাবে, কিন্তু কেউ ধরাও পড়বে না।" রাজপরিবারের সেই সুন্দরী বাঙালি বধূ মিঃ রায়ের দৃঢ়প্রত্যয়ী বক্তব্য শুনে অভিভূত হয়ে জানতে চাইলেন, "কী সেই পথ যাতে টাকা আসবে, অথচ টাকা আসার গুপ্ত পথ কেউ জানতে পারবে না?" মিঃ রায় বিপ্লবী কায়দায় বলল, "সেই গোপন কথাটাই আপনাকে বলব।

কিন্তু তার আগে আমাদের কথা দিতে হবে, আপনি আমাদের সহায়তা করবেন।"

রাজবধূর মনে ততদিনে ওড়িশার ছোট অঞ্চলের সেই রাজপ্রাসাদে গিয়ে গিয়ে মিঃ রায়েরা দেশপ্রেমের শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাই মিঃ রায় যখন তাকে সাহায্যের জন্য বলল, তিনি কিছু না ভেবেই জানতে চাইলেন, "কী ধরনের সহায়তা আমার কাছে আপনারা চাইছেন?" মিঃ রায় রাজবধূর ডাগর চোখের প্রশ্নসূচক চাহনির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আপনি আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক দক্ষতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করলেই হবে।" রাজবধূ মিঃ রায়ের কথা শুনে বললেন, "আমার দ্বারা যদি দেশের উপকার হয় তবে নিশ্চয়ই করব। কিন্তু কী করে করব তাই-ই তো জানি না।"

মিঃ রায় এবার তাদের পরিকল্পনার কথা রাজবধূকে বলল। রাজবধূ মিঃ রায়ের পরিকল্পনার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমাকে দু চারদিন সময় দিতে হবে, তারপর বলব আমার দ্বারা ওই কাজটা করা সম্ভব হবে কি না। আসলে আপনি যা বললেন, তাতে আমাদের পরিবারও জড়িয়ে যেতে পারে মনে হচ্ছে, তাই একটু চিন্তা করতে হবে।" মিঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না, না, আমাদের পরিকল্পনা মতো চললে কোনওভাবেই আপনাদের পরিবার আমাদের কাজে জড়াবে না।" রাজবধূ উত্তরে বললেন, "আপনি হয়ত বলছেন, কিন্তু আমি না ভেবে কী করে প্রথমেই হ্যাঁ করে দেবো? তাছাড়া আপনাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে যে কাজের ভার দিলেন তাতে আমাকে আমার স্বামীর কাছে থেকেও অনুমতি নিতে হতে পারে। তিনি যদি না বলেন তবে আমার কিছু করার নেই। ঠিক

আছে, আমি পরে জানাব কী করব না করব।” মিঃ রায় দিন দুই রাজপ্রাসাদেই কাটাল। রাজবধূ তাকে তিনদিনের মাথায় বললেন, “ঠিক আছে, পরিবার যদি না জড়ায়, তবে আমি আছি।” মিঃ রায় রাজবধূর আশ্বাস পেয়ে বলল, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনভাবেই আপনার পরিবার আমাদের পরিকল্পনায় জড়াবে না। জড়ালে তো আমরাই ডুবব।”

আলোচনা পাকা হয়ে যাওয়ার কদিন পর কলকাতার ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের এক শাখায় রাজবধূ টেলিফোন করলেন। সেই শাখায় তাঁর রাজপরিবারের অ্যাকাউন্ট আছে। রাজবধূ সেই অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজবধূ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে টেলিফোন মারফৎ জানালেন, “আমি দশ লাখ টাকা তুলব আগামী শুক্রবার। আপনারা টাকাটা তৈরি রাখবেন। আর টাকাগুলো আমি নতুন কারেন্সিতে নেব।”

পঞ্চাশের দশকে দশ লক্ষ টাকা একটা বিরাট পরিমাণ। ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের মতো ব্যাঙ্ককেও আগের থেকে জানিয়ে দিতে হতো। ওই রাজপরিবারের সঙ্গে ওই শাখার বহু দিনের সম্পর্ক। ওই পরিবারের মোটা অঙ্ক ওই শাখায় গচ্ছিত। সুতরাং সেই পরিবারের গৃহবধূ নিজে ফোনে নির্দেশ দিয়েছেন, তা যেন কার্যকরী হয় সে ব্যাপারে শাখার ম্যানেজার নিজে উদ্যোগী হলেন।

একইভাবে একটা টেলিফোন এল বৌবাজারের সবচেয়ে বড় স্বর্ণব্যবসায়ী এম.বি. সরকারের দোকানে। টেলিফোনে রাজবধূ জানালেন, তিনি ওড়িশার কোন রাজপরিবারের বধূ। তারপর বললেন, “আগামী শনিবার আমি আপনাদের দোকানে যাব, পছন্দ হলে নগদে আট দশ লাখ টাকার বিভিন্ন ধরনের গয়নাগাঁটি কিনব, একসঙ্গে পাওয়া যাবে তো?” দোকানে টেলিফোন যিনি ধরেছিলেন তিনি একটু হেসে বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই পাবেন, আসুন, পছন্দ করুন, বহু রকম ডিজাইন আমাদের আছে।”

টেলিফোনে উত্তর শুনে রাজবধূ পুলকিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা, আপনাদের দোকান সকালে ক'টার সময় খোলে?” এম বি সরকারের তরফ থেকে উত্তর ভেসে এল, “ঠিক সকাল দশটায়।” রাজবধূ একটু ব্যস্ত গলায় বললেন, “আর একটু আগে খোলা যায় না? আমার ওই সময়টায় একটা অন্য কাজ আছে।” দোকানদার জানতে চাইলেন, “ক'টার সময় হলে আপনার সুবিধা হয়?” উত্তরে রাজবধূ জানালেন, “এই সকাল ন'টা সোয়া ন'টা হলে ভাল হয়।” দোকানদার বললেন, “এক মিনিট ফোনটা ধরুন, আমি জানাচ্ছি।” রাজবধূ ফোন ধরে রইলেন, দোকানদার কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করে ফোনে জানালেন, “ঠিক আছে, আগামী শনিবার আপনার জন্য সকাল ন'টায় দোকান খুলে দেবো।” রাজবধূ বললেন, “ধন্যবাদ, আমি সময়মতো এসে যাব।”

শুক্রবার। ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের সেই শাখায় দুপুর একটা নাগাদ একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। সেলাম ঠুকে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল ড্রাইভার, গাড়ি থেকে নামলেন এক দারুণ সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলা। চল্লিশের আশেপাশে বয়স, কিন্তু তার রূপের ছটায় ও অভিজাত চলনে কাত হবে না কোন বয়সী পুরুষ, তা গবেষকদের বিষয় হতে পারে। মহিলার পরণে প্রচণ্ড দামি শাড়ি, তাঁর মাথায় ঘোমটা, কপালের সিঁদুরের টিপের তলায় তাঁর ভ্রূ ভঙ্গিমা ও চোখের দ্যুতিতে ঝরে ঝরে পড়ছে এমন এক নম্র অহংকার যার অন্তর্নিহিত বার্তার একটাই অর্থ হয়, তা হল, “একে দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না, এর নির্দেশ পালন করা যায় কিন্তু একে নির্দেশ দেওয়া যায় না। এর রূপের মাধুর্যে যতই আবিষ্ট হও, তাকে ধরতে এস না, তফাতে থেকো।”

ইনিই সেই রাজবধূ। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সোজা ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকে গেলেন। ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক, তিনি গাড়ি থেকে নেমে তাঁর পেছন পেছন গেলেন। সম্ভবত রাজবধূর দেহরক্ষী। তাঁর হাতে একটা বড় ‘চামড়ার ব্যাগ।

ব্যাঙ্কে ঢুকে রাজবধূ ও তাঁর সঙ্গী সোজা চলে গেলেন ম্যানেজারের চেম্বারে। রাজবধূ ম্যানেজারের পূর্ব পরিচিত। দু-একটা কুশল বিনিময়ের পর রাজবধূ তাঁর হাতব্যাগ খুলে বার

করলেন সেই ব্যাঙ্কের একটা চেকবই। তারপর ম্যানেজারের টেবিলে বসে তাঁর সামনেই দশ লক্ষ টাকার একটা চেক লিখে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

ম্যানেজার পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুতই ছিলেন, তিনি টাকাটা ক্যাশ কাউন্টার থেকে আনিয়ে রাজবধূর হাতে দিলেন। রাজবধূ ম্যানেজারকে অনুরোধ করলেন, সমস্ত টাকার নাম্বারের তালিকা বানিয়ে একটা ব্যাঙ্কে ও আর একটা তাঁকে দিতে। ম্যানেজার তাঁর এক সহকর্মীকে দিয়ে সেই দশ লক্ষ নতুন টাকার নাম্বারের দুটো তালিকা প্রস্তুত করে একটা ব্যাঙ্কে রাখলেন ও অন্যটা রাজবধূর হাতে তুলে দিলেন। রাজবধূ এরপর টাকাটা তাঁর সঙ্গীর ব্যাগে ঢুকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

পরদিন শনিবার। বৌবাজারের এম বি সরকারের দোকান সকাল নটার মধ্যে খুলে গেল। দোকানে ধূপধুনো দিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে মালিক ও কর্মচারীরা হাসি হাসি মুখে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। আজ সকালেই এক বড় খদ্দের আসবে, তাই প্রত্যেকের মনেই সেই আনন্দের ছোঁয়া।

ন'টার সময় দোকান খুললেও রাজবধূর দেখা নেই। সোয়া ন'টা। না, এলেন না। অথচ তিনি ফোনে জানিয়েছিলেন ন'টা সোয়া ন'টার মধ্যে এসে যাবেন, তারপর তাঁর অন্য কাজ আছে। অধীর আগ্রহে দোকানের লোকেরা বারবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, আর ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিয়ে ভাবছে, এই বুঝি এসে গেল।

সাড়ে নটা। এম.বি. সরকারের দোকানে এসে ঢুকলেন ধোপদুরস্ত সুদর্শন স্মার্ট একজন ভদ্রলোক। হাতে তাঁর চামড়ার একটা অ্যাটাচি কেস। তিনি দোকানের এক কর্মচারীকে বললেন, "আমি কিছু সোনার গয়না কিনব, দেখান।" কর্মচারিটা প্রশ্ন করলেন, "কী ধরনের গয়না দেখাব?" তিনি বললেন, "নেকলেস, হার, বালা, বাউটি, চুড়ি দেখান।"

কর্মচারীরা তাঁকে একে একে তাঁর কথা মতো গয়না দেখাতে লাগলেন। তিনি একটা একটা করে অলংকার দেখে সেগুলো ওজন করতে বলতে লাগলেন। তাঁরাও তাঁর নির্দেশ মতো ওজন করে দাম বলতে লাগলেন ও আলাদা করে রাখতে শুরু করলেন। তিনি সবই খাঁটি সোনার জিনিস বাছছিলেন, গহনার মধ্যে এটা ওটা বসানো তাঁর পছন্দ নয়। মালিকও অবাক, সকালে কার জন্য দোকান খুলে বসে আছেন, আর কে একজন অন্য খদ্দের এসে কেনাকাটা শুরু করেছে!

তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, কার মুখ দেখে তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। তিনি ভাবলেন, একেই বলে "ভাগ্য"। ভাগ্যিস সকালে দোকান খুলেছিলেন, নয়তো এতবড় খদ্দের অন্য দোকানে চলে যেত। এত ভাল বউনিও হতো না। তিনি খদ্দের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবেন?" ভদ্রলোক বললেন, "কিছু খাব না।" তবু মালিক কফি আনালেন, ভদ্রলোক কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তাঁর পছন্দের গয়নাগুলোর দাম ফেলে মোট কত হল তা জানাতে।

মালিক হিসাব কষে জানালেন, "ন'লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা।" ভদ্রলোক তাঁর অ্যাটাচি কেস খুলে কড়কড়ে নোটের বান্ডিল বার করে পুরো টাকাটা দিয়ে বললেন, "দেখে নিন।" মালিক বললেন, "যা দেখার আমার দেখা হয়ে গেছে, এখনও তো ব্যাঙ্কের সিল খোলা হয়নি।" ভদ্রলোক একটু হাসলেন, তারপর তাঁর কেনা গয়নার বাক্সগুলো গুছিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি এসেছিলেন নিঃশব্দে, আর আধঘণ্টার মধ্যে ন'লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার সোনার গয়না ঝড়ের গতিতে কিনে নিঃশব্দেই চলে গেলেন। তাঁর যাওয়ার পথের দিকে এম বি সরকারের দোকানে উপস্থিত সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। কারণ এত সকালে এক অচেনা খদ্দেরকে এসে এত টাকার গয়না কিনতে তাঁরা কোনওদিন দেখেননি।

ভদ্রলোক পৌনে দশটা নাগাদ বেরিয়ে যেতে এম বি সরকারের দোকানের লোকেরা এবার রাজবধূর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঠিক দশটায় রাজবধূর গাড়ি থামল দোকানের সামনে। রাজবধূ দোকানে ঢুকতে আপনা-আপনিই সবাই বুঝতে পারলেন তাঁদের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। তাঁর রূপের ও স্মিত হাসির টুকরো ঝিলিকে সবাই যেন কেমন সম্মোহিত হয়ে গেলেন। পরিচয়ের প্রয়োজন হয়নি। তিনি যখন সুরেলা গলায় মিষ্টি করে বললেন, "একটু দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না, আসলে পরের কাজটা আগে করে এলাম," তখন সবাই তাঁর কথাগুলো অপলক চোখে যেন আস্বাদন করলেন।

তাঁর কথা বলার ধ্বনিতে মালিক মোহিত হয়ে বলে উঠলেন, "না, না, তাতে কি, আপনি বসুন। বলুন আমরা কী দেখাব। আমাদের এটাই তো কাজ।"

এরপর রাজবধূর নির্দেশে দোকানের সমস্ত কর্মচারী ও মানিক মিলে তাঁকে একে একে গয়না বার করে করে দেখাতে লাগলেন। রাজবধূ ঠোঁটের কোণায় এক পশলা হাসি ঝুলিয়ে সেগুলো দেখতে লাগলেন। যেগুলো পছন্দ করলেন, তা গুছিয়ে রাখতে বললেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা পালন করতে লাগলেন সবাই। রাজবধূর সঙ্গে তাঁরা এত আন্তরিক হয়ে পড়লেন যে ইতিমধ্যে দোকানে দু একজন অন্য লোক বিভিন্ন কাজে এলে তাঁদের তাঁরা পাত্তাই দিলেন না, তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন। দু চারবার টেলিফোন বেজে উঠল, মালিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেলিফোন তুলে একবার দুবার "হুঁ, হ্যাঁ" করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তখন রাজবধূর সান্নিধ্য ছাড়া তাঁর অন্য কিছুতে মন দেওয়ার মতো ইচ্ছাই না।

দেড় ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে যে চলে গেল দোকানের কেউ বুঝতেই পারলেন না। রাজবধূ দোকানে এসেছেন ঠিক দশটার সময়, তিনি সাড়ে এগারোটা নাগাদ বললেন, "আমার গয়নাগুলোর কত দাম হল দেখুন তো।" মালিক দাম কষে বললেন, "ন'লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা!" রাজবধূ তাঁর সেই বিখ্যাত হাসি ঠোঁটের কোণায় ভাসিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, সব এক জায়গায় প্যাক করে দিন।"

দুজন কর্মচারী সেগুলো গুছিয়ে দিতে রাজবধূ গয়নার বড় প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে বললেন, "চলি।" তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই মালিকের যেন সম্বিত ফিরল, তিনি বললেন, "কিন্তু - টাকা, টাকা তো দিলেন না।"

ঘাড় ফিরিয়ে রাজবধূ বিস্মিত মুখে বললেন, "সে কি, টাকা তো আমি দিয়ে দিয়েছি, আবার টাকা চাইছেন কেন?" দোকানের সবাই তাঁর কথা শুনে অবাক। মালিক বিস্মিত স্বরে বললেন, "তার মানে, কখন টাকা দিলেন?" রাজবধূ হেসে বললেন, "এর মধ্যে ভুলে গেলেন?" তারপর ক্যাশবাক্সের দিকে দেখিয়ে বললেন, "ওই তো ওই বাক্সে টাকাটা রাখলেন, খুলে দেখুন ঠিক ওই ন'লক্ষ তিরিশ হাজারই আছে, এখনও ব্যাঙ্কের সিল খোলা হয়নি।" মালিক রাজবধূর কথায় আশ্চর্য হয়ে বলল, "ওই টাকা তো আপনি দেননি, অন্য একজন দিয়েছেন।" রাজবধূ ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "দেখুন এভাবে আপনি আমাকে অপমান করতে পারেন না, টাকা নিয়ে বলছেন টাকা নিইনি, এটাই আপনাদের ব্যবসা? ছিঃ, আমাকে যেতে দিন, আমি কোন পরিবারের নিশ্চয়ই জানা আছে।"

এম.বি. সরকারের মালিক তো রাজবধূর কথায় অপমানে লাল হয়ে গেলেন। তাঁদের ব্যবসার সুনাম সম্পর্কে কোনও অভিযোগ কেউ কখনও করেনি। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা সরছে না। এ কী দেখছেন তিনি? এতক্ষণ যার রূপের আগুনের বিচ্ছুরণে মগ্ন হয়েছিলেন, তাকে তখন ঠিক কোনও ইংরেজি ভুতুড়ে ছবির ড্রাকুলার মতো "রক্তচোষা প্রেত" বলে মনে হচ্ছে। তিনি বুঝে গেছেন, এই সুন্দরী তাঁকে কোনও এক জালে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আর সেই ফাঁস থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি একজন কর্মচারিকে কোনও মতে বললেন, "থানায় একটা ফোন কর।"

মালিকের নির্দেশ মতো সে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করতেই রাজবধূ রাগতভাবে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল, পুলিশ ডাকুন, তাঁরাই ঠিক করবেন। এইভাবে অপমানিত হতে আমি এখানে আসিনি। এমন জানলে আমি অন্য দোকানে যেতাম।"

রাজবধূর কথা শুনে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে মালিক ভাবলেন, সেটাই ভাল ছিল, তা হলে এই হাঙ্গামার মধ্যে পড়তাম না। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তাঁর হাসি পেল। যে ভাগ্যকে তিনি ' দুঘণ্টা আগে কুর্নিশ করছিলেন, সকালবেলাতেই দুটো বড় বড় খদ্দের আসার জন্য আনন্দে চিন্তা করছিলেন, কার মুখ দেখে বিছানা ছেড়েছেন, সেই চিন্তাই তাঁর ফিরে এল, তবে অন্যভাবে, ঠিক বিপরীত রূপে।

বারোটা নাগাদ ফোন পেয়ে মুচিপাড়া থানা থেকে একজন অফিসার দুজন কনস্টেবল নিয়ে এম বি সরকারের দোকানে হাজির। অফিসার দুপক্ষেরই বক্তব্য শোনার পর ক্যাশবাক্স খুলিয়ে দেখলেন, সত্যি সত্যি তাতে ন'লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা আছে, যা রাজবধূর বর্ণনা অনুযায়ী পুরোপুরি মিলে গেল।

শনিবার। বারোটায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। সোমবারের আগে ব্যাঙ্ক থেকে জানাও যাবে না রাজবধূর দাবি মতো ওই নোটগুলো তিনি ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলেন কিনা। এদিকে অফিসার দেখলেন ওই সুন্দরী মহিলা নিজেকে ওড়িশার এক অঞ্চলের রাজপরিবারের বধূ বলে পরিচয় দিচ্ছেন, সুতরাং তাঁকে গ্রেফতার করবেন কি করবেন না, করলেও কীভাবে করবেন তা বুঝে উঠতে না পেরে তিনি লালবাজারে আমাদের গোয়েন্দা দফতরে ফোন করলেন।

লালবাজার থেকে একদল অফিসার বৌবাজার ছুটলেন। তাঁরা প্রথমেই দোকানের সামনের শাটার নামিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে সব শুনলেন এবং সেই টাকার বান্ডিল ও রাজবধূর কেনা গয়নাগুলোর সিজার লিস্ট বানিয়ে রাজবধূকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এলেন। রাজবধূকে রাখা হল লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে।

সোমবার। ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এক অফিসার ব্যাঙ্কে গিয়ে জানতে পারলেন রাজবধূর বক্তব্যই সঠিক। ওই নোটগুলো তিনি শুক্রবার ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছিলেন। নোটের তালিকার সঙ্গে এম.বি. সরকারের দোকানে পাওয়া টাকার নাম্বার মিলে গেল। অন্যদিকে ওড়িশার সেই রাজপরিবার থেকে অনুমোদিত হয়ে এল যে ধৃত রাজবধূ সত্যিই সেই পরিবারের বধূ এবং শুক্রবার পরিবারের অ্যাকাউন্ট থেকে দশ লক্ষ টাকা ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ওই শাখা থেকে তুলেছিলেন। সেদিনই রাজবধূ আদালত থেকে জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

অন্যদিকে এম.বি. সরকারের দোকান থেকে ন'লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার অলংকার রাজবধূ যাওয়ার আগেই যে ভদ্রলোক কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা চলে গেছে অনন্ত সিংহ ও মিঃ রায়ের তথাকথিত বৈপ্লবিক তহবিলে। অলংকার বিক্রি করে যা টাকা তারা পেয়েছিল, সেই টাকার ভাগ কিন্তু রাজবধূ পেলেন না। দুদিন লালবাজারের লকআপে থাকা ও নিজের টাকার ঝুঁকি নেওয়া, সবটাই তিনি করেছেন মিঃ রায়ের তথাকথিত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রচেষ্টার জন্য।

এম.বি. সরকারের মালিকের অভিযোগক্রমে রাজবধূর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা আদালতে উঠল। মামলায় রাজবধূ জিতে গেলেন, আদালতে প্রমাণ হয়ে গেল রাজবধূই ওই টাকা দিয়ে অলংকার কিনেছেন। তিনি সেই অলংকার পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ অনন্ত সিংহ ও মিঃ রায়ের বুদ্ধি দারুণভাবে সফল হয়ে গেল। একই টাকা দিয়ে দুবার একই পরিমাণের অলংকার এম.বি. সরকারের দোকান থেকে বিক্রি হয়ে গেল।

মামলায় জিতে রাজবধূ এম.বি.সরকারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করলেন এবং তার ক্ষতিপূরণ বাবদ দেড়কোটি টাকা দাবি করলেন। সেই মামলাও বহুদিন আদালতে চলল এবং এখানেও রাজবধূ জিতে গেলেন। এম.বি. সরকারের দোকানের মালিককে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজবধূকে দিতে হল। সেই টাকা দেওয়ার পর এম.বি. সরকারের বৌবাজারের দোকান বন্ধ হয়ে গেল। জানি না, এই কোটি টাকার কোনও অংশ মিঃ রায়েদের তহবিলে পৌঁছে ছিল কিনা। তবে এত নিখুঁত নিপুণ প্রতারণার পরিকল্পনা সচরাচর দেখা তো

যায়ই না, এমন কি আজ পর্যন্ত ক'টা হয়েছে তাও বলা যাবে না, যেখানে চোখের সামনে আসামি ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ তাকে ধরাও যাচ্ছে না, সাজাও দেওয়া যাচ্ছে না, নিজেদের হাত কামড়ে হতাশা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই!

এম.বি. সরকারের দোকানে প্রতারণার পর অনন্ত সিংহের সংস্রব ছেড়ে দিয়ে, মিঃ রায় নিজেই একটা দল তৈরি করে এখানে ওখানে প্রতারণা করে বেড়াতে লাগল। সে ধনী লোকেদের আড্ডায় ও ক্লাবগুলোতে যাতায়াত শুরু করল। শিক্ষা, দীক্ষা, কথাবার্তায়, আধুনিক চালচলনে ও চেহারার সুযোগ নিয়ে সে অনায়াসেই ধনী পরিবারের সঙ্গে মিশে যেতে পারত।

মিঃ রায় আলাপ জমাল এবার বিহারের দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সঙ্গে। বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডের পূর্ব দিকে দুটো অসাধারণ গম্বুজ সমেত বিয়াল্লিশের এক জওহরলাল নেহেরু রোডের ঠিকানায় মহারাজের বিরাট চারতলা বাড়ি, সেই বাড়ির একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত ইতালি থেকে আনা মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া। সেই বাড়িতে মিঃ রায়ের হয়ে গেল অবাধ গতি। মিঃ রায় তখনকার যে মহারাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন, তিনি ছিলেন খুবই ফুর্তিবাজ। শুধু ফুর্তিবাজই নয়, তাঁর ঘোড়ার রেসের নেশা ছিল এবং নিজের কাছে ক'টা রেসের ঘোড়া ছিল। সেই নেশার জন্য তিনি জলের মতো টাকা উড়িয়ে দিতেন। তাতে অবশ্য তাঁর কিছুই প্রায় যেত আসত না, কারণ বিহারের ভূস্বামীদের মধ্যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ছিলেন একেবারে প্রথম সারির। তাঁর অগাধ টাকা, অগাধ সম্পত্তি। তিনি অবশ্য কলকাতাতে বেশিদিন থাকতেন না, দ্বারভাঙ্গাতেই থাকতেন আর ঘোড়দৌড়ের খেলায় অংশ নেওয়ার ও প্রত্যক্ষ দর্শক হিসাবে দৌড়ের আনন্দ উপভোগ করার জন্য আজ কলকাতা, কাল বাঙ্গালোর কী চেন্নাই, বা মুম্বই চলে যেতেন।

মহারাজ দ্বারভাঙ্গাতে থাকলেই মিঃ রায় মাঝে মাঝে একটা ইম্পালা গাড়ি ভাড়া করে নিজেই চালিয়ে পৌঁছে যেত দ্বারভাঙ্গার রাজবাড়িতে। এমন ভাব দেখাত যেন ওই রকম দামি ইম্পালা তার অনেকগুলো আছে। তার চাকচিক্যের ঝলকানিতে মহারাজ, মিঃ রায়কে ভাবতেন যে সে তাঁর মতোই ধনী ও অভিজাত। রাজবাড়ির অন্য লোকেরাও তাই ভাবতেন, গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দুচারদিন হইহুল্লোড় করে চাপরাশি, দারোয়ানদের ভাল বকশিস দিয়ে মিঃ রায় ইম্পালা চালিয়ে কলকাতায় ফিরে আসত।

এরকম দু-চারবার দ্বারভাঙ্গায় রাজবাড়িতে গিয়ে মিঃ রায় মহারাজের খাস চাপরাশিকে নিজের বশে নিয়ে এল। তাকে নিজের বশে এনে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে তার মাধ্যমে মিঃ রায় মহারাজের ব্যক্তিগত চিঠি লেখার ক'টা ফাঁকা প্যাডের কাগজ ও মহারাজের সিল সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ দ্বারভাঙ্গার দুটো চেকের পাতা যোগাড় করল। এটা তাদের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ।

এবার দ্বিতীয় ধাপ। মিঃ রায় দ্বারভাঙ্গা স্টেশন থেকে ট্রাঙ্ককল করল কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে, চোস্ত ইংরাজিতে বলল, “আমি দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বলছি, অমুক দিন আমি কলকাতায় যাচ্ছি, আমার জন্য একটা স্যুইট রেখে দেবেন, তিনদিন থাকব।” হোটেলের রিসেপশনিস্ট উত্তরে জানাল, "ঠিক আছে স্যার।” মিঃ রায় মুচকি হেসে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। সে মহারাজের থেকে কথায় কথায় ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে, সেই সময় মহারাজ কলকাতায় যাবেন না, দ্বারভাঙ্গাতেই থাকবেন। .

গ্র্যান্ড হোটেলে ট্রাঙ্ককল করে মিঃ রায় দ্রুত চলে গেল পোস্ট অফিসে। সেখান থেকে কলকাতার এক নামকরা পাখা কোম্পানিতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল। তাতে লেখা, “আমার এক নতুন ফ্যাক্টরির জন্য অনেক পাখা চাই, আমি অমুক দিন থেকে গ্র্যান্ড হোটেলে থাকব। দেখা করুন। -দ্বারভাঙ্গার মহারাজ।” টেলিগ্রাম করে মিঃ রায় গাড়ি চালিয়ে চলে এলা কলকাতায়। ভাড়ার গাড়ি ছেড়ে ট্রামে উঠে চলে গেলা চিৎপুর। সঙ্গে রয়েছে নতুন ছেলে সনৎ।

তৃতীয় ধাপ। চিৎপুরের যাত্রাদলের যারা সাজসজ্জা ভাড়া দেয়, তেমনই একটা দোকানে

গিয়ে মিঃ রায় দোকানদারকে বলল, তার কোম্পানির নাটকের জন্য একটা মহারাজের ড্রেস চাই। দোকানদার মিঃ রায়কে কতগুলো পোশাক দেখাতে সে সনতের মাপের একটা মহারাজের পোশাক পছন্দ করে নিল। সঙ্গে একটা রূপালী রঙের গড়গড়াও ভাড়া করল। দোকানদার প্রশ্ন করল, "মহারাজের সাজসজ্জা নিলেন, সেনাপতি টেনাপতির নেবেন না?" মিঃ রায় হেসে বলল, "না, আমাদের নাটকে রাজসভা দেখান হচ্ছে না, তাই সেনাপতির প্রয়োজন নেই। আমাদের মহারাজা হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু, ভঙ্গুর এর রাজপরিবারের, তবু সে নেশায় বাঈজির বাড়িতে এসেছে, তাই একটা চাপরাশির ড্রেস চাই? সেটা দিন।" দোকানদার প্রশ্ন করলেন, "তবে তো বাঈজিরও ড্রেস চাই।" মিঃ রায় পাকা পরিচালকের মতো হেসে বলল, "এ আধুনিক বাঈজি, গান টান গায় না। মহারাজ তার কাছে যাবে, ঝটপট কাজ করে চলে আসবে।" দোকানদার মিঃ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো বোঝার ভান করে শুধু বললেন, "ও।" মিঃ রায় এরপর ধপধপে সাদা একটা চাপরাশির পোশাক ও পাগড়ি ভাড়া করে, সব জিনিস গুছিয়ে চলে এল।

ভাড়া করা সাজসজ্জা নিয়ে এসে মিঃ রায় তার ডেরায় সেগুলো পরিয়ে দিল সনৎ ও এস. দাসকে। সুপুরুষ সনৎ সাজল মহারাজ ও দাস তার চাপরাশি। দুজনকেই দারুণ মানিয়ে গেল। মিঃ রায় তাদের দেখে খুব খুশি। মুখে বলল, "সনৎ, তোদের দেখে দ্বারভাঙ্গার মহারাজও ঘাবড়ে যাবে। ভাববে সে নয়, তুই-ই আসল মহারাজ।" সনৎ একটা বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মহারাজের ভঙ্গিমা নকল করে ড্রেস রিহার্সাল করতে শুরু করল।

চতুর্থ ধাপ। আজ শুক্রবার। আজ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা গ্র্যান্ড হোটেলে পদার্পণ করবেন। ঠিক সাড়ে বারোটা নাগাদ গ্র্যান্ড হোটেলের পোর্টিকোতে একটা ইম্পালা গাড়ি এসে দাঁড়াল। চট করে সামনের দরজা খুলে নামল চাপরাশি। হোটেলের রক্ষী সেলাম ঠুকে খুলে দিল গাড়ির পেছনের দরজা। হিজ হাইনেস মহারাজ অফ দ্বারভাঙ্গা পা দিলেন গ্র্যান্ড হোটেলের বাঁধান পোর্টিকোতে। চাপরাশি মাথা নামিয়ে কুর্নিশ করে তাঁকে সাহায্য করল। হোটেলের রিসেপশানে ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে মহারাজ এসে গেছেন। সেখান থেকেও ত্রস্ত পায়ে দু তিনজন হোটেল কর্মচারী ছুটে গেলেন। মহারাজকে সুপ্রভাত জানিয়ে, তাঁদের হোটেলে তিনি এসেছেন বলে তাঁরা যে গর্বিত বোধ করছেন তাও জানালেন। মহারাজ মৃদু হেসে মাথা সামান্য নাচিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ!" মহারাজকে তাঁরাই নিয়ে গেলেন তাঁর জন্য রক্ষিত বিলাসবহুল কামরায়। মহারাজের পেছনে পেছনে আসছে তাঁর চাপরাশি, তার হাতে মহারাজের গড়গড়া ও টুকিটাকি জিনিস। হোটেলের দুজন কর্মচারী নিয়ে এল মহারাজের সুটকেস।

মহারাজকে তাঁর স্যুইটে পৌঁছে দিয়ে হোটেলের কর্মচারীরা সেলাম ঠুকে বিদায় নিলেন। মহারাজের এখন বিশ্রামের সময়, তিনি বিশ্রাম করবেন। আধ ঘণ্টা পর মহারাজ তাঁর ঘরের ইন্টারকম টেলিফোন তুলে হোটেলের এক্সচেঞ্জে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললেন, "লাইনটা দিন।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মহারাজের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। প্রথমে ধরল চাপরাশি। ধরেই প্রশ্ন করল, "এটা কি অমুক পাখা কোম্পানি?" অন্যপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, "হ্যাঁ, কাকে চাই?" চাপরাশি বলল, এম.ডি. কি আছেন? মহারাজা অফ দ্বারভাঙ্গা কথা বলবেন।" কোম্পানির তরফে উত্তর এল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এম.ডি আছেন, দিচ্ছি।" এবার একপ্রান্তে এম.ডি ধরলেন, অন্যদিকে মহারাজা। এম.ডি ফোন ধরেই বললেন, "গুড মর্নিং স্যার।" মহারাজ গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, "গুড মর্নিং, আমার টেলিগ্রাম কি পেয়েছেন?" এম.ডি বিগলিত গলায় বললেন, "হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি, আমরা প্রস্তুত, আপনি কবে নেবেন স্যার?" মহারাজ ঠিক তেমন গম্ভীর স্বরেই বললেন, "আগামীকাল, আপনি আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করে সব শুনে যান।" এম.ডি. ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, "কখন দেখা করব স্যার?" মহারাজা বললেন, "ঠিক চারটের সময়।" এম.ডি. বলে চলেছেন, "ও কে স্যার, নমস্তে স্যার।" অন্যপ্রান্তে ততক্ষণে মহারাজ টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে চাপরাশিকে লাঞ্চের জন্য

হোটেলে নির্দেশ দিতে বলে একটা বড় সোফায় গা এলিয়ে ইংরাজি ম্যাগাজিন পড়তে শুরু করেছেন।

বিকেল ঠিক চারটের সময় সেই পাখা কোম্পানির এম.ডি. মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। চাপরাশি স্যুইটের দরজা খুলে তাঁকে বসবার ঘরে বসিয়ে মহারাজকে খবর দিতে ভেতরের ঘরে এলেন।

মহারাজ লাঞ্চ সেরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তৈরিই ছিলেন। তিনি বসবার ঘরে আসতেই এম.ডি. উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে কুর্নিশ করলেন। মহারাজ হেসে করমর্দনের জন্য ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন।

এম.ডি. অভিভূত হয়ে করমর্দন করলে মহারাজ তাঁকে একটা সোফা দেখিয়ে বললেন, "বসুন।" এম.ডি. বসলেন। এম.ডি.র উল্টোদিকে মহারাজ তাঁর পোশাকের মচমচ আওয়াজ করতে করতে বসেই বললেন, "দেখুন, আমার হাতে সময় বেশি নেই, ফ্যাক্টরিটা তাড়াতাড়ি চালু করব, তাই কালই আপনাদের থেকে পাখা কিনব, দিতে পারবেন তো? নয়তো বলুন, আমি অন্যখানে বন্দোবস্ত করি।"

মহারাজের কথা শুনে এম.ডি. এতবড় অর্ডার নাকচ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রায় আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, "না না, আপনার টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। খুচখাচ বিক্রিও বন্ধ রেখেছি। আপনার অর্ডার কার্যকরি করার পর আবার ওদিকে নজর দেবো।"

মহারাজ এম.ডি.র কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "ঠিক আছে, দেখা যাক। " তারপর চাপরাশিকে ডেকে বললেন, "সাহেবকে ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও।" এম.ডি. সেটা শুনে বলে উঠলেন, "না না, কিছু আনাবেন না।" মহারাজ শান্ত দৃষ্টিতে এম.ডি.র দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কি হয়, আপনি আমার অতিথি, আমাদের নিয়ম অতিথিকে কিছু সেবা না করে বিদায় দিতে নেই।" চাপরাশি ফোন তুলে খাওয়ার অর্ডার দিয়ে দিল। মহারাজ এবার এম.ডি.কে বললেন, "আমি আগামীকাল সকালে ঠিক এগারটার সময় আপনাদের ফ্যাক্টরিতে পৌঁছব। তারপর দেখে কিনে নেব।" এম.ডি. বললেন, "ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন খুশি তখন আসবেন। আপনার জন্য আমরা ফ্যাক্টরিতে অপেক্ষা করব।" মহারাজ কিছু একটা চিন্তা করে বললেন, "না, আমি এগারোটাতেই যাব। তারপর অন্য কাজ আছে। আর হ্যাঁ, ওই সময় কোনও অবাঞ্ছিত লোক ফ্যাক্টরিতে রাখবেন না, আমি পছন্দ করি না।" এম.ডি. বিগলিত হয়ে বললেন, না-না, আজে বাজে কেউ থাকবে না।"

খাবার এসে গেল। টি পটে চা। চাপরাশি সেগুলো সাজিয়ে দিলেন এম.ডি.র সামনে। মহারাজ বললেন, "আপনি খান, আমি আসছি। আর যাওয়ার আগে আপনাদের ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার পথটা ভালভাবে লিখে দিয়ে যাবেন।" এম.ডি. শশব্যস্ত হয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করতে যাচ্ছেন দেখে মহারাজ হেসে বললেন, "ঠিকানা জানি। আপনি হোটেল থেকে আপনার ফ্যাক্টরি যাওয়ার রাস্তাটা এঁকে দিয়ে যাবেন।" তারপর চাপরাশিকে নির্দেশ দিলেন, "ওঁকে একটা কাগজ এনে দাও।" চাপরাশি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার লেটার হেডের একটা কাগজ এনে এম.ডি.র হাতে দিলেন। মহারাজ উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

এম.ডি. লেটার হেড হাতে নিয়ে দেখলেন, দামি কাগজের ওপর দ্বারভাঙ্গার মহারাজের নিজস্ব প্রতীক সমেত মহারাজের নাম জ্বলজ্বল করছে। তিনি খেতে-খেতে সেই লেটার হেডের কাগজে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে তাঁদের পাহাড়পুর ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার দিক নির্দেশ আঁকতে লাগলেন। ঘরের কোণায় ভেতরের দরজার পাশে টানটান দাঁড়িয়ে আছে চাপরাশি, অতিথি সৎকারের জন্য। এম.ডি.র খাওয়া শেষ হলে চাপরাশি মহারাজকে খবর দিলেন। মহারাজ অতিথিকে বিদায় দিলেন। এম.ডি. মহারাজের ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে কথা হারিয়ে বারবার কুর্নিশ করতে করতে বললেন, "আমি ভাল করে রাস্তা এঁকে দিয়েছি, আপনার যেতে

কোনও অসুবিধাই হবে না। আমরা অপেক্ষা করব।" তিনি মহারাজের স্যুইট থেকে খোসমেজাজে বেরিয়ে এলেন।

রাত আটটার সময় মিঃ রায় মহারাজের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এল। চাপরাশি দরজা খুলে দিতে মিঃ রায় স্যুইটের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মহারাজ পাশের ঘরে ছিলেন, তিনি মিঃ রায় এসেছে শুনে বৈঠকখানায় দেখা করতে এলেন। মিঃ রায় নিচু গলায় মহারাজকে বলল, "কিরে সনৎ, সব ঠিক আছে?" সনৎ একটা বড় সোফায় বসতে বসতে মিঃ রায়ের মতোই নিচু স্বরে বলল, "এমনিতে সব ঠিকই আছে, পাখা কোম্পানির এম.ডি. এসে দেখা করে গেছে। কাল সকাল এগারটায় যাব বলেছি।"

মিঃ রায় প্রশ্ন করল, "কিছু বোঝেনি তো?" "দূর, ও তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা।" মহারাজের পাশে সোফায় বসা চাপরাশি হেসে উত্তর দিল। মহারাজ বলল, "কিন্তু একটা দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে গুরু।" মিঃ রায় মহারাজের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "কিসের অস্বস্তি, আছিস তো পাঁচতারা হোটেলে, বাপের জন্মে তো থাকিস নি।" মহারাজ তার পরণের আলখাল্লার বুকের কাছ দিয়ে ডান হাত ঢুকিয়ে বাঁ দিকের পাঁজরের ওপর চুলকাতে চুলকাতে বলল, "অস্বস্তি হচ্ছে এই চুলকানোর, শালার ব্যাটা ওই চিৎপুরের দোকানদার বোধহয় কোনদিন এই ড্রেসটা কাচেনি, ভাড়াই দিয়ে গেছে। বোটকা গন্ধ, কত মহারাজ যে পরেছে, তার মধ্যে কারও নিশ্চয়ই দাদ ছিল, খালি চুলকাচ্ছে। কিন্তু পাবলিকের সামনে তো চুলকাতে পারি না। কেটে পড়ে বাথরুমে গিয়ে চুলকে আসতে হচ্ছে।" চাপরাশি বলল, "আমার শালা ড্রেসটায় ঝামেলা নেই, ঝামেলা পাগড়িতে।" মিঃ রায় প্রশ্ন করল, "পাগড়িতে আবার কী হল?" চাপরাশি দুহাত দিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কোন শালা আমার আগে চাপরাশি সেজেছে, শালার মাথায় উকুনের বাসা ছিল, সে মালগুলো এই পাগড়িতে ছেড়ে গেছে, এখন তারা আমার মাথায় খেলা করছে। একা থাকলে খুব করে চুলকে নিচ্ছি, কিন্তু লোকের সামনে মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের সামাল দিতে হচ্ছে। শালার উকুনগুলো সময়অসময়ও বোঝে না, সারাক্ষণই কিলবিলিয়ে চলাফেরা করে।" মিঃ রায় হেসে বলল, "কী করবি, আর একদিন সহ্য কর, তারপর কালীঘাটে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে আসিস।" এম.ডি.র আঁকা তাঁদের কারখানার দিক-নির্দেশিকা চাপরাশি মিঃ রায়কে দেখাতে সে হাসল। তারপর মিঃ রায় মহারাজ ও চাপরাশির সঙ্গে জরুরি কথা বলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল।

পঞ্চম ধাপ। শনিবার, সকাল দশটা। মহারাজ চাপরাশিকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের ঘর থেকে নিচে নেমে এলেন। হোটেলের সর্বস্তরের কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে সেলাম ঠুকছে। মহারাজ মিটি মিটি হেসে হাতজোড় করে প্রত্যুত্তর দিতে দিতে তাঁর জন্য অপেক্ষমান ইম্পালা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। হোটেলের দ্বাররক্ষী গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল, মহারাজা উঠে বসলেন। চাপরাশি ড্রাইভারের পাশে মহারাজের একটা চামড়ার অ্যাটাচি ব্যাগ কোলে নিয়ে বসতে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। মহারাজের গাড়ি ছুটল পাহাড়পুরের দিকে এগারোটার সময় পাখার কারখানার মূল গেটের সামনে মহারাজার ইম্পালা গাড়ি এসে দাঁড়াল। পেছনে একটা লরি। মহারাজের আসার অপেক্ষায় কারখানার লোকেরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কারখানার মূল দরজা খুলে গেল, গাড়ি দুটো ঢুকে গেল কারখানার ভেতর। এম.ডি. সমেত কারখানার মালিকেরা ছুটে এসে মহারাজাকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

এম.ডি. মহারাজকে বললেন, "স্যার, আমাদের কারখানাটা একটু ঘুরে দেখবেন না?" মহারাজ তৃপ্ত হেসে বললেন, "আমার কিন্তু তাড়া আছে, আপনি যখন বলছেন, চলুন কিছুটা ঘুরে দেখি।" এম.ডি. ও মালিকপক্ষের অন্য লোকেরা মহারাজকে কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। শ্রমিকরা কাজ করছে। মহারাজকে দেখে চোখ বড় বড় করে তাঁকে সবাই সেলাম ঠুকছে। স্মিত হেসে মহারাজ হাত তুলে তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। পেছন পেছন চাপরাশি। সে মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। শ্রমিকরা সেটা দেখে মনে

করছে, মাথা ঝাঁকানোটা বোধহয় চাপরাশিটার মুদ্রাদোষ মিনিট পনের কারখানায় ঘোরার পর মহারাজ এম.ডি.কে বললেন, "চলুন, এবার কাজ সারি, নয়তো আমার দেরি হয়ে যাবে।" উপস্থিত কারখানার সবাই বিগলিত হয়ে মহারাজকে পথ দেখিয়ে তাঁদের অফিস ঘরের দিকে নিয়ে চললেন।

অফিসে এসে মহারাজ বাথরুমের খোঁজ করলেন। এম.ডি. ত্রস্ত হয়ে নিজেই তাঁকে অফিসের সংলগ্ন বাথরুমের কাছে নিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলে দিলেন। মহারাজ বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে পোশাকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খচখচ খচখচ করে, মনে মনে আগের মহারাজকে গালাগালি দিতে দিতে মিনিট পাঁচেক পেট পিঠ বুক চুলকে নিয়ে আরামের মুখ করে বেরিয়ে এলেন। এম.ডি. বাথরুমের দরজার কাছটায় ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মহারাজকে নিয়ে একটা দামি চেয়ারে বসালেন। চাপরাশি কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

কারখানার একটা লোক ভাল ট্রের ওপর সুন্দর কারুকাজ করা একটি বড় কাঁচের গ্লাসে পেস্তা বাদামের সরবৎ এনে মহারাজকে দিল। মহারাজ এম.ডি.কে বললেন, "আমি তো নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কিছু খাই না।" এম.ডি. কাতর হয়ে বললেন, "আমাদের এখানে এসেছেন স্যার, কিছু মুখে না দিলে আমাদের কষ্ট হবে।" মহারাজ তখন তাঁদের তুষ্ট করতে বললেন, "ঠিক আছে, তবে কিছুটা কমিয়ে দিন।" এম.ডি.র কোনওরকম অনুরোধ শুনলেন না। এম.ডি. তখন বললেন, "ঠিক আছে স্যার, আপনি যতটা পারেন খান, কমাব না।" মহারাজ হেসে সরবতের গ্লাসে চুমুক দিলেন। চাপরাশিকেও সরবৎ পরিবেশন করা হয়েছে, সে কোনও প্রতিবাদ না করে পুরোটাই পান করে নিল।

মহারাজ এরপর তাঁর পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের সিলিং পাখা, দাঁড় করানো পেডিসট্রিয়াল পাখা কিনলেন। এম.ডি.কে প্রশ্ন করলেন, "মোট কত টাকা হলো?" এম.ডি. গদগদ চিত্তে একটা সাদা কাগজে দাম কষে জানালেন, "দু'লক্ষ পনেরো হাজার টাকা, তবে আপনার সম্মানে আমরা নেব দু'লক্ষ দশ হাজার টাকা।" মহারাজ হেসে বললেন, "বিলটা আপনি দু'লক্ষ কুড়ি হাজারের বানান, যে দশ হাজার বেশি হচ্ছে, সেটা আপনারা আপনাদের শ্রমিকদের দিয়ে দেবেন, আমার তরফ থেকে ওটা একটা তোফা, না করবেন না।" তারপর চাপরাশির দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা চেক দাও।" চাপরাশি মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের চামড়ার অ্যাটাচিটা খুলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ দ্বারভাঙ্গার একটা চেকের পাতা ও একটা দামি কলম মহারাজের হাতে এগিয়ে দিলেন। চেকের নিচে মহারাজার বিশেষ সিলটা দেওয়াই আছে। মহারাজা সেই চেকের ওপর কোম্পানির নাম ও তাকে প্রদেয় দু লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা লিখে চেকের তলায় মহারাজের সিলের মাঝখানে খসখস করে সই করে দিলেন।

এম.ডি. সেই চেকটা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলেন। মনে মনে ঠিক করে নিলেন, মহারাজাদের কটা চেক আর এ জীবনে পাবেন? তাই এ চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার আগে একটা ফটো কপি করে অফিসে বাঁধিয়ে রাখবেন।

ইতিমধ্যে কারখানার শ্রমিকদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে মহারাজ তাঁদের জন্য উপহারস্বরূপ দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন। তাঁরা মহারাজার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে অতি উৎসাহে মহারাজার আনা লরিতে পাখা তুলতে শুরু করেছে। এম.ডি. নিজের হাতে লরির নম্বর লিখে চালান বানিয়ে দিয়েছেন। পাখার গ্যারেন্টি কার্ড ঠিকমত সাজিয়ে দিয়েছেন।

মহারাজ সবার সঙ্গে হেসে হাতজোড় করে বিদায় নিলেন। তাঁর ইম্পালা গাড়ি বেরিয়ে গেল কারখানার মূল দরজা দিয়ে। তখন ঘড়িতে দুপুর বারোটা দশ। মহারাজের কলকাতার এক কর্মচারী চালান দেখে পাখা গুনে বুঝে নিয়ে গেটপাশ হাতে লরি বোঝাই করে যখন কারখানা ছেড়ে রাস্তায় পড়ল তখন সাড়ে বারোটা।

ষষ্ঠ ধাপ। লরি এসে দাঁড়াল আউটরাম ঘাটের পাশে গঙ্গার ধারে। সেখানে মিঃ রায়ের একটা লোক প্রস্তুতই ছিল। সে লরি দাঁড়াতেই নিঃশব্দে লরির দুদিকের দুটো ঢাকা ফুটো করে দিল। ড্রাইভার লরি থেকে নেমে অবাক। একসঙ্গে দুটো চাকা পাংচার হতে সে আগে দেখেনি। কী করবে, স্টেপনি তো একটা। এমন সময় মহারাজের ইম্পালা আবার সেখানে উপস্থিত, তিনি গাড়ি থেকে নামলেন না। ড্রাইভার আর লরিতে কর্মরত তাঁর কর্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। তাদের কাছে শুনলেন, গাড়ির দুটো ঢাকা একসঙ্গে পাংচার হয়েছে। তিনি প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "না, না এ গাড়ি অতদূর পাঠানো যাবে না।" ড্রাইভার মহারাজকে কী বলবে? কাচুমাচু মুখে শুধু কোনমতে বলল, "হুজুর।" মহারাজ তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হাত তুলে তার কথা থামিয়ে কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন, "এক্ষুণি আমি একটা অন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাতে মাল তোল। আর এই ড্রাইভারকে ওর পয়সা দিয়ে দাও আর কিছু খাইয়ে দিও, সকাল থেকে না খেয়ে আছে।" ড্রাইভার মহারাজের নির্দেশ শুনে মোহিত হয়ে অনবরত সেলাম ঠুকতে লাগল। মহারাজের ইম্পালা গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে চলে গেল।

মহারাজ স্থান ত্যাগ করার মিনিট দশেকের মধ্যে মিঃ রায় অন্য একটা লরি নিয়ে সেখানে হাজির। সে কর্মচারীর থেকে সবকিছু শুনে দ্বিতীয় লরিটায় পাখাগুলো তুলতে নির্দেশ দিল তার সঙ্গের খালাসিদের। এই ফাঁকে কর্মচারীটি দুপুরের খাওয়া খাওয়াতে ড্রাইভারকে নিয়ে চলল পার্ক স্ট্রিট। ঢুকল এক রেস্তোরাঁয়। পার্ক স্ট্রিটের অভিজাত রেস্তোরাঁয় লরির ওই ড্রাইভার কখনও ঢোকেনি। সে ইতস্তত করে একটা টেবিলে বসল। কর্মচারীটি খাবারের অর্ডার দিল, সঙ্গে বিয়র। তারা দুজনে মিলে খেতে খেতে শুরু করল গল্পগুজব।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কেটে গেল। কর্মচারিটা বুঝল, এতক্ষণে মিঃ রায় সব মালপত্তর নিয়ে পগাড়পার। ড্রাইভারকে এবার ছেড়ে দেওয়া যায়। ড্রাইভার ফিরে কিছু সন্দেহ করলেও কোনও পাখার আর হদিশ পাবে না, বা কোথায় দ্বিতীয় লরিটা চলে গেল তাও জানতে পারবে না। সে ড্রাইভারকে কিছু টাকা দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকেই বিদায় দিল। চলে গেল গ্র্যান্ড হোটেলে মহারাজের কাছে।

অন্যদিকে মিঃ রায় লরি নিয়ে এসেছে বড়বাজারে। তারপর বড়বাজারের চোরাই মালের বাজারে শেটিয়া ও লাখটিয়াদের গুদামে পাখা সব ঢুকিয়ে দিয়েছে। সব হাওয়া। কোথায় কার মাথার ওপর তারা ঘুরবে কে জানে। মিঃ রায় পাখা বিক্রির কড়কড়ে দেড় লক্ষ টাকা লাখটিয়াদের কাছ থেকে নিয়ে চলে গেল গ্র্যান্ড হোটেলে। সেখানে রাতে জোর খানাপিনা ও টাকার ভাগ বাটোয়ারা হল। পরদিন মহারাজ হোটেল ছেড়ে বিদায় নিলেন। তার ও চাপরাশির পোশাক, গড়গড়া সমেত ফেরত চলে গেল চিৎপুরের দোকানে। তারা মহারাজ ও তার চাপরাশির বেশভূষা ছেড়ে আবার সনৎ ও দাস হয়ে মিশে গেল কলকাতার জনসমুদ্রে।

মহারাজ যেদিন পাখার কারখানায় গিয়েছিলেন সেদিন ছিল শনিবার। তিনি যখন চেকটা এম.ডি.র হাতে তুলে দেন তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা পার হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে, তাই চেকও আর জমা দেওয়া হয়নি। পরদিন রবিবার, ব্যাঙ্ক বন্ধ। সোমবার সকালে এম.ডি. প্রথমে সেই চেকটার একটা ফটোকপি করালেন, সেটা স্মৃতি হিসাবে অফিসে রাখবেন। তারপর ঠিক দশটায় নিজেদের ব্যাঙ্কে গিয়ে সেটা জমা দিয়ে এলেন। তিনি জানেন, চেকটা দ্বারভাঙ্গার, তাই সেটা নগদ টাকায় সম্মানিত হয়ে তাঁদের ব্যাঙ্কে জমা পড়তে অন্তত দশ দিন সময় লাগবে, সেই মতো তিনি কারখানার মালপত্র সরবরাহকারীদের দিনক্ষণ দিতে লাগলেন, তাঁদের পাওনা টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ন'দিনের দিন এম.ডি. ব্যাঙ্কে গেলেন, চেকটার খোঁজে। তিনি ব্যাঙ্কে ঢুকতেই অ্যাকাউটেন্ট সাহেব তাঁকে ডাকলেন। তাঁর বহুদিনের পরিচিত, তিনি হাসতে হাসতে অ্যাকাউটেন্ট সাহেবের সামনে গিয়ে তাঁর টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে প্রশ্ন করলেন, "আমার কোনও খবর আছে?" অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব মাথা নেড়ে তাঁর টেবিলের

ড্রয়ার খুলে সেই চেকটা এম.ডি. হাতে দিয়ে বললেন, "আজই ফেরত এসেছে।" এম.ডি. চেকটা হাতে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "ক্যাশ হয়নি?" অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "না, হলে তো দেখতেই পেতেন। "

এম.ডি.র কেমন যেন আশ্চর্য লাগছে, দ্বারভাঙ্গার মহারাজের চেক ক্যাশ না হয়ে ফেরত এল, তিনি ভাবতেই পারছেন না, একটা ঘোরের মধ্যে তিনি চেকটা ফেরত আসার কারণগুলো পড়তে শুরু করলেন। দেখলেন, কারণ হিসাবে বলা হয়েছে চেকটা ঠিকই আছে, কিন্তু নিচের সইয়ের সঙ্গে মহারাজার সইয়ের কোনও মিল নেই। এম.ডি.র মাথা ঘুরতে লাগল, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তার মানে ওই লোকটা মহারাজা অফ দ্বারভাঙ্গা নয়? বিড়বিড় করতে করতে টাল সামলে কোনমতে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেদিনই সন্ধে নাগাদ এম.ডি. ভদ্রলোক লালবাজারে এসে দেবীবাবুর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। দেবীবাবু মহারাজ, চাপরাশি ও লরিতে আসা মহারাজের কলকাতার কর্মচারীর চেহারার বিবরণ শুনে হেসে বললেন, "এটা কর্ড পার্টির কাজ।"

এম.ডি. অনেক পার্টির কথা শুনেছিলেন, কিন্তু কর্ড পার্টির নাম কোনও দিনও শোনেননি। তাই তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কোন পার্টির?" দেবীবাবু বললেন, "কর্ড পার্টি। এরা চিটিংবাজি করে বেশ গুছিয়ে, বহুদিনের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করে।"

দেবীবাবুর কথা এম.ডি. হাঁ করে শুনছিলেন। তারপর প্রায় কান্নার স্বরে বলে উঠলেন, "জানেন স্যার, সেদিন ওই ব্যাটাকে আমরা ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করেছি, আমি নিজে ওর গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছি, বাথরুমে নিয়ে গেছি, আবার ওই লোকটা আমাদের কারখানার শ্রমিকদের দশ হাজার টাকা দান করে এসেছে!"

দেবীবাবু এম.ডি.র কথা শুনে আবার হেসে ফেললেন। তারপর তার নিজস্ব আর্দালিকে দিয়ে অফিসার মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে আনলেন। কারণ মনাদা কর্ড পার্টির সব অলিগলি চিনতেন, তাদের ভেতরে তার অসম্ভব যোগাযোগ ছিল। মনাদাও এম.ডি.র সব কথা শুনলেন।

এম.ডি. দেবীবাবু ও মনাদাকে সব জানিয়ে, যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে দেবীবাবুর দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বললেন, "কিছু করা যাবে না স্যার? আমরা তো মরে যাব, কারখানাই হয়তো বন্ধ করে দিতে হবে।" দেবীবাবু মনাদাকে বললেন, "দেখুন তো মনোরঞ্জনবাবু, কতদূর কী করা যায়।" মনাদা মুখ থেকে শুধু "হ" শব্দটা বার করে চুপ করে গেলেন।

কিন্তু ওই আশ্বাস পর্যন্তই। মনাদা কী দেখেছিলেন, তা তিনিই জানেন। লালবাজারের অন্য কেউ জানেন না। অনেকদিন পর ওই কর্ড পার্টির ক'জন গ্রেফতারও হয়েছিল, কিন্তু তাদের সাজাও হয়নি আর ওই পাখা কোম্পানি একটা টাকাও ফেরত পায়নি। জানি না, সেই এম.ডি. ভদ্রলোক এখনও সেই চেকটা তাঁর কাছে মহারাজের স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছেন কিনা!

তবে মিঃ রায় পার্ক সার্কাসে এক গলির ভেতর এখন যেখানে থাকেন, সেখানে একটা দোকানের কাঠের বেঞ্চের ওপর বসে স্মৃতি রোমন্থন করেন। এখন তিনি বৃদ্ধ, হয়তো বসে বসে ভাবেন যৌবনে কর্ড ও মেইন লাইনে ছক করে কত টাকা উপার্জন করেছেন! একটা কৃতিত্ব তিনি অবশ্যই দাবি করতে পারেন, এত প্রতারণা করেও তাঁকে জেলের গারদের পেছনে কেউ ঢোকাতে পারেনি।

মিঃ রায়কে ছেড়ে তার সুযোগ্য চেলারা নিজেরা দল করেও বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণা করেছে। তারা এব্যাপারে এতই ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে প্রতারণা করতে অন্য প্রদেশেও যেত।

একবার তারা পাড়ি দিল মুম্বই। দলে সনৎ ও দাস ছাড়া আরও দুজন ছিল এবং তারা তাদের কাজের জন্য এক বিনিয়োগকারীকে দলে নিয়েছিল। তার সঙ্গে অন্য চারজনের চুক্তি ছিল যে, সে তাদের 'কাজ' হওয়ার আগে পর্যন্ত কাজের জন্য টাকা বিনিয়োগই করবে, সরাসরি ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা মাফিক অন্য কাজে নিজে যুক্ত হবে না। সেগুলো করবে বাকি চারজন।

চুক্তির ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে তারা ট্রেনে চড়ে পৌঁছাল মুম্বই শহরের দাদার রেলওয়ে স্টেশনে। এবং দাদার এলাকাতেই একটা হোটেলে তারা আস্তানা গাড়ল। যে পরিকল্পনা নিয়ে তারা মুম্বইতে এসেছে তার উদ্দেশ্যে তারা ছুটতে লাগল, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। যে প্রতারণার মাধ্যমে তারা তিন লক্ষ টাকা হস্তগত করতে চেয়েছিল, তা অধরাই রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মাস দেড়েক সময় কেটে গেছে। মুম্বইতে হোটেলে থাকা, খাওয়া, পরিকল্পনা সাজাতে বিনিয়োগকারীর পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। সে সনৎ ও দাসেদের ওপর খুব চোটপাট করতে লাগল। তাদের বলতে লাগল, “আমার টাকা উদ্ধার করে দাও, আমি তোমাদের মুম্বইতে বেড়াতে নিয়ে আসিনি।”

সনৎ বলল, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও একটা অপারেশন করে আমরা টাকা উদ্ধার করে দেবই।” বিনিয়োগকারী মিঃ চক্রবর্তী জানতে চাইল, “কতদিনের মধ্যে?” দাস হেসে উত্তর দিল, “মাস খানেকের মধ্যেই।” তারা চারজনই মিঃ রায়ের মন্ত্রপূত শিষ্য, কলকাতা থেকে এসেছে মুম্বইতে একটা খেলা খেলতে, সেই খেলাটা না খেলে, পাততাড়ি গুটিয়ে হেরে ফিরে যাবে, এতে তাদের আঁতে লাগল। মুম্বই, দিল্লি, গাজিয়াবাদ প্রতারণার অপরাধের মানচিত্রে কলকাতার আগে আছে, তবু কলকাতার প্রতারক কতটা উন্নতি করেছে তা একটু না দেখিয়ে মাঠ পরিত্যাগ করতে তারা চারজন চাইল না।

শুরু হল নতুন করে তাদের নতুন অভিযান। মুম্বই শহরে বাসকারী সনতের এক পরিচিত লোকের সাহায্যে তাঁরই পরিচিত লোক হিসাবে দাদারেই একটা ব্যাঙ্কের শাখায় সনতের নামে খোলা হল একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তাতে জমা দেওয়া হল পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই ব্যাঙ্কে সনৎ প্রায় প্রতিদিনই যায় টাকা তুলতে কিংবা জমা দিতে। যেতে যেতে এবং অ্যাকাউন্টটা সক্রিয় রাখার সূত্রে ব্যাঙ্কের বেশ ক'জন কর্মচারীর সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়ও হয়ে গেল।

এবার তারা ধরল রত্নব্যবসায়ীদের বাজারের এক দালালকে, যে ব্যবসায়ীদের মাঝে যোগাযোগ ও লেনদেন করিয়ে দেয়। তার কাছে সনৎ হীরের সঠিক বিচার কীভাবে করা যায়, তার পাঠ নিতে শুরু করল। তার কাছ থেকে জেনে নিল মুম্বইয়ের জাভেরির রত্নের বাজারে কোন কোন দোকানে বেশি দামের হীরে মজুত আছে।

জাভেরির রত্নবাজার পর্যবেক্ষণ করে তারা একটা দোকান নির্দিষ্ট করল। এবং ওই অঞ্চলের থানার এক কনস্টেবলের সঙ্গে আলাপ করে তাকে খাইয়ে দাইয়ে বন্ধুত্ব পাতিয়ে খবর নিল থানার কোন অফিসার কী স্বভাবের। কে কিসে তুষ্ট হয়।

মিঃ রায়ের শিষ্যরা জানে, কনস্টেবলরাই খবর রাখে কোন অফিসার কী রকম, কার কোথায় দুর্বলতা, কে টাকা খায়, কে বা অন্য কিছু খায় ইত্যাদি। সেই কনস্টেবলের কাছ থেকেই সনৎরা জেনে নিল তাদের সাহায্য কোন অফিসার করতে পারে। এবং সেই কনস্টেবলের মাধ্যমেই সেই অফিসারের সঙ্গে তারা আলাপ করল। তাকে তারা প্রায় প্রতিদিন হোটেলে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে মদ্যপান করাতে শুরু করল। আলাপ জমে যাওয়ার পর তাকে একদিন সন্ধেবেলা দাস বলল, “স্যার, আপনার এলাকায় আপনার ডিউটির সময় আমরা একটা কাজ করব। সেই কাজের ভাগ আপনি অবশ্যই পাবেন, খালি যদি ধরা পড়ে

যাই, আপনি একটু দেখবেন।”

অফিসার হেসে জানতে চাইল, “কোনও খুন, জখম, ডাকাতি নয়তো?” সনৎ বলল, “ধুর, খুন বা ডাকাতি করতে যাব কেন, ওই সব তো বোকারা করে, আমাদের কাজ হাল্কা, কারও গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না।” অফিসার প্রশ্ন করল, “কোন সময় কাজটা করবেন, দিনে না রাতে?”

সনৎ হেসে বলল, “আরে আমরা কি ছিঁচকে চোর নাকি যে রাতে কাজ করব, আমরা দিনে সবার সামনে কাজ করি।” অফিসার একটু চিন্তা করে বলল, “ঠিক আছে, তবে কাজ হয়ে যাওয়ার পরই আমাকে কিছু ছাড়তে হবে।” দাস বলল, “সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। খালি কবে আপনি সকালের দিকে থানায় ডিউটিতে থাকবেন, সেই খবরটা আমাদের আগাম চাই।”

অফিসার আগাম খবরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে খাবার খেয়ে হোটেল থেকে সে-রাতের মতো বেরিয়ে গেল। সনৎরা অফিসারকে হাত করে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হল, ধরা পড়লে মারধোর তাদের পিঠে বিশেষ পড়বে না। পরদিন সকালবেলা দাস বান্দ্রা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এক বৃদ্ধ ভিখারিকে পাকড়াও করল। সে ভিখারিকে বলল, একটা হিন্দী ছবির শুটিংয়ের জন্য তার ভাঙ্গাচোরা কলাইয়ের ভিক্ষার থালি, পরণের ছেঁড়া জামা, লুঙ্গি ও গামছাটা চাই। তারপর ভিখারির সঙ্গে তার ওই সব জিনিসগুলো দরদাম করে দেড়শ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে একটা ব্যাগে ভরে হোটেলে ফিরে এল।

পরদিন ভোরবেলায় জাভেরির রত্নবাজারে সবাই দেখল কালো, বেঁটে, বহুদিনের না কাটা দাড়ি, চোখের কোণায় পিচুটি, ছেঁড়া জামা ও ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি পরে একটা ভাঙা কলাইয়ের থালি সামনে বসিয়ে এক নামকরা রত্নবিক্রেতার দোকানের সামনে রাস্তায় বসে একটা ভিখারি ভিক্ষা করছে। ভিখারিটা বোবা, গলা দিয়ে গরগর করে একটা আওয়াজ করে ভিক্ষা চায়। প্রতিদিন সে ভোরবেলায় সেখানে বসে, তারপর দুপুর একটা নাগাদ থালি হাতে সেখান থেকে উঠে অন্যখানে ভিক্ষা করতে চলে যায়। তার কাঁধে ঝুলতে থাকে একটা ফাটাফুটা চটের থলি।

ভিখারি বসার ছদিন পর ওই রত্নবিক্রেতার দোকানে সকাল এগারোটা নাগাদ দুজন সুন্দর দেখতে মধ্যবয়সী স্যুটেড বুটেড লোক ঢুকল। তার মধ্যে একজনের হাতে একটা বড় আপেল, সে সেটায় মাঝে মাঝে কামড় দিচ্ছে।

খদ্দের দুজন দোকানদারকে দামি হীরে দেখাতে বলল। দোকানদার একটা পাতলা কাঁচের বাক্সে মখমলের ওপর রাখা বেশ কটা হীরে তাদের সামনে রাখলে, তারা কাউন্টারের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে পাকা হীরে ব্যবসায়ীর মতো সেগুলো দেখতে শুরু করল। এবং একটা করে দেখে নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলে আবার যথাস্থানে রেখে দিতে লাগল। তারা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, “এগুলো কি রকম দামের?” দোকানদার জানাল, যে হীরেগুলো তারা দেখছে, সেগুলোর দাম পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার মধ্যে। খদ্দেরদের একজন দোকানদারকে বলল, “এ চলবে না। বেশি দামের দেখান।” ,

দোকানদার এবার চারটে হীরে তাদের সামনে রেখে বলল, “এগুলো সব প্রায় চার লক্ষ টাকা দামের।” তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা যা বলছে, সিন্ধ্রি দোকানদার তা কিছুই বুঝতে পারছেন না। খদ্দেররা ওইরকম দামের আরও কটা দেখাতে বললে, দোকানদার আরও চারখানা হীরে তাদের দেখতে দিল। তারা আটখানা হীরেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেখছে। দোকানের বাইরে ভিখারিটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে গলায় গরগরে আওয়াজ করে এই খদ্দেরদের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষা চাইছিল। এক খদ্দের বিরক্তিভরে তার আধখানা আপেল ছুঁড়ে দিল। ভিখারিটা একগাল হেসে “হে হে, হে হে” শব্দ করতে করতে ভিক্ষার থালিটা তুলে আপেলটা খেতে খেতে অন্যদিকে চলে গেল।

খদ্দেররা তখন একটা হীরে নিয়ে বিশেষভাবে দেখছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা

করছে। এভাবে প্রায় দশ মিনিট পার হওয়ার পর তারা বলল, "না, এত দামের আমাদের চলবে না। এগুলো তুলে নিন। এর চেয়ে একটু কম দামের কী আছে তা দেখান।"

দোকানদার হীরেগুলো কাউন্টারের ওপর থেকে তুলতে গিয়ে দেখল, যে আটটা দামি হীরে তারা খদ্দেরদের দেখতে দিয়েছিল তার মধ্যে সাতটা আছে, একটা নেই। সে খদ্দেরদের প্রশ্ন করল, "আর একটা হীরে কোথায়?" খদ্দেররা বলল, "হয়তো পড়ে টড়ে গিয়েছে নিচে, খুঁজে দেখুন।" দোকানদার আশ্চর্য হয়ে চারদিক খুঁজতে শুরু করল, খদ্দেররাও খুঁজছে, কাউন্টারের নিচে, আশেপাশে। এভাবে আরও পাঁচ সাত মিনিট খোঁজাখুঁজির পরও কোথাও হীরেটা পাওয়া গেল না। কী করেই বা পাওয়া যাবে, সেটা তো তখন সেই ভিখারিটার ছেঁড়া থলিতে অর্ধেক খাওয়া আপেলের ভেতর নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাতে ঘুমাতে কোথায় কোন নিরুদ্দেশের পথে চলেছে তা জানে না।

অন্যদিকে দোকানে তখন মালিক ও কর্মচারীদের সঙ্গে খদ্দের দুজনের তুমুল বচসা শুরু হয়ে গেছে। রত্নব্যবসায়ী তাদের বলছে, "আপনারাই হীরেটা সরিয়েছেন, বের করে দিন।" খদ্দেররা অভিযোগ অস্বীকার করছে, "ধ্যাৎ, আমরা কেন সরাব? আমরা কি চোর, ভদ্রলোকের ছেলে, আপনারাই ভুল করেছেন, সাতটা হীরে দেখতে দিয়ে বলছেন আটটা হীরে দেখতে দিয়েছেন।"

ঝগড়াঝাঁটি যখন চরমে পৌঁছে গেল, মালিকের নির্দেশে এক কর্মচারী দোকানের মূল ফটক বন্ধ করে দিয়ে স্থানীয় থানায় ফোন করে দিল। নামকরা দোকান থেকে থানায় ফোন গিয়েছে, তার ওপর আসামিকেও ধরে রেখেছে শুনে মিনিট দশেকের মধ্যে একজন অফিসার দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে দোকানে হাজির। দোকানে এসে তিনি মালিকের কাছ থেকে সব কিছু শুনে তদন্ত করতে শুরু করলেন।

ওদিকে ভিখারিটা আন্ধেরি রেলওয়ে স্টেশনে এসে নামল। কাঁধে থলিটা আছে, কিন্তু হাতে থালিটা নেই। সে স্টেশনের এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা শৌচাগারে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করে দিয়ে থলির থেকে কাগজে মোড়া ভাল জামা প্যান্ট বার করল। ছেঁড়া লুঙ্গি ও পরণের শতছিদ্র জামাটা খুলে ভালগুলো পরে নিল। থলি থেকে আপেল ও একটা ছুরি বার করে আপেলটা কেটে হীরেটা সেখান থেকে মুক্ত করে প্যান্টের পকেটে রাখল। থলিতে ছিল জুতো ও মোজা, সেগুলো পরে যখন সে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে এল, কে বলবে সে কিছুক্ষণ আগেও ছিল ভিখারি। তার ভিখারির, বেশভূষা ও ভিক্ষার থলিটা ছেঁড়া থলির মধ্যে শৌচাগারের এক কোণায় পড়ে রইল।

স্টেশনের অন্যদিকে এক ভদ্রলোক দুটো সুটকেস ও একটা অ্যাটাচি নিয়ে একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে ছিলেন। তিনি শৌচাগারের দিকে তাকাতে লোকটা একটু হেসে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। সিমেন্টের বেঞ্চির কাছে আসতে বসা লোকটি নিচু স্বরে প্রশ্ন করল, "কি, কাজ হয়েছে দাস?" দাস মুচকি হেসে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে হীরেটা একবার তালু বন্দি করে ঘাড় নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।" লোকটি এবার জানতে চাইল, "আমার টাকা উদ্ধার হবে তো?" দাস নিচে রাখা অ্যাটাচিটা" বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে একটা স্যুটকেস তুলতে তুলতে বলল, "হয়েও অনেক বেশি থাকবে। আমরা কি খালি মুখে ফিরে যাব?"

হাঁটতে হাঁটতে দাস ও তাদের বিনিয়োগকারী আন্ধেরি স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা সেলুনে ঢুকে গেল। দাস সেখানে তার চোদ্দ পনেরো দিনের গাল ভর্তি দাড়ি পরিষ্কার করে, অ্যাটাচি কেস খুলে রিমলেস চশমা পরে সেলুন থেকে বিনিয়োগকারীর সঙ্গে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

জাভেরিতে তখন অন্য নাটক। পুলিশ অফিসার একপ্রস্থ তদন্ত সেরে খদ্দেরদের বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাদের এখানেই একবার শরীর তল্লাশি করতে চাই।" একজন খদ্দের বলল, "আমাদের মনে করার অনেক কারণ আছে, তবু এদের ভুল ভাঙার জন্য আমরা তল্লাশি করতে দিতে প্রস্তুত, আপনি দেখুন, আমাদের কাছে হীরে আছে

কি না।”

অফিসার তাদের একজন একজন করে তল্লাশি শুরু করলেন। সবাই অধীর আগ্রহে সেদিকে তাকিয়ে আছে, হীরেটা পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য। না, কারও কাছে পাওয়া গেল না। অফিসার দোকানদার ও কর্মচারীদের বক্তব্য লিখে তাতে প্রত্যেকের সই করিয়ে নিলেন এবং খদ্দের দুজনের থেকে যে হারিয়ে যাওয়া হীরে পাওয়া যায়নি তাও মালিকের কাছ থেকে লিখিয়ে নিলেন। তারপর তাদের দুজনকে গ্রেফতার করে জিপে তুলে থানার দিকে রওনা দিলেন।

থানার সামনে এসে অফিসার জিপ থেকে আসামীদের নামতে বললেন। তারপর কনস্টেবলদের এড়িয়ে একজনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, “সনবাবু, আমি যে আজ সকালে থানায় ডিউটিতে থাকব, সে খবরটা তাহলে ঠিক সময় পেয়ে গিয়েছিলেন?” সনৎ হেসে বলল, “হ্যাঁ।”

তাদের দলের পঞ্চম সদস্য দাদারের হোটেলে টেলিফোন মারফত খবর পেয়ে গেল, সনৎদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেছে। সে ছুটল থানায়। সেখানে কথাবার্তা বলে পরদিন তার বন্ধুদের আদালতে জামিনের ব্যবস্থা করল। সনরা জামিন পেয়ে গেল। তারা দাদারের হোটেল ছেড়ে দিয়ে

মুম্বইয়ের পার্শ্ববর্তী শহরতলি শহর কল্যাণের একটা হোটেলে এসে উঠল। এখানে হোটেল ভাড়া কম, তাছাড়া থানার অন্য কোনও অফিসার নিজের উদ্যোগে মামলার তদন্ত করতে চট করে ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানার ভেতর পিটুনি দিতে পারবে না, কল্যাণের হোটেলের ব্যবস্থাটা ওদের নিশ্চিন্ত করল।

দাস ও বিনিয়োগকারী সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে এসে সন্ধের কলকাতাগামী বিমানে হীরে নিয়ে উঠে বসল। পরদিন সেই চার লক্ষ টাকার হীরে দু লক্ষ টাকায় বড়বাজারে বিক্রি করে দিল।

সনৎদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা শুরু হল, মামলায় তদন্ত করে তদন্তকারী অফিসার দেখেছেন, সনৎরা চুরি বা প্রতারণার জন্য ওই দোকানে যায়নি, তাদের ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, তা থেকে অনুমান করা যায় তারা হীরে কিনতেই গিয়েছিল। হীরের বাজারের এক নামকরা দালাল সনৎদের পক্ষে সাক্ষী দিয়ে গেল যে সনৎরা তার থেকেও বেশ কয়েকবার হীরে কিনেছে।

মামলায় সনৎরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। খালাস হয়ে সনৎরা সেই রত্নব্যবসায়ী দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করল এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করল। মামলায় নিশ্চিত পরাজয় দেখে দোকানদার সনৎদের দু লক্ষ টাকা দিয়ে আপোষে মীমাংসা করে নিল। সনত্রা দু লক্ষ টাকা নিয়ে আদালত থেকে দোকানদারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা প্রত্যাহার করে নিল।

সেই দু লক্ষ টাকা থেকে তারা পুলিশ অফিসারকে দিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, কনস্টেবল ও হীরের বাজারের দালালকে দশ হাজার করে টাকা দিয়ে মুম্বইকে কলকাতার কর্ড পার্টির একটা খেলা দেখিয়ে ট্রেনে চড়ে কলকাতার দিকে রওয়ানা দিল।

খেলা দেখাতে অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়রাও আমাদের প্রদেশে আসে। বিচিত্র রকমারি সে সব খেলা। সেই রকমারি খেলার ঝকমারিতে সাধারণ মানুষ আহত তো হনই, এমন কি আহত হন কলকাতার পুলিশের দাপুটে অফিসারও।

বিরাশি সাল, আমরা তখন প্রচণ্ড ভাবে ডাকাত ধরায় ব্যস্ত। রাত এগারোটা, গোয়েন্দা দফতর থেকে লালবাজারে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গেছি। কলিংবেল বেজে উঠল। বেলের আওয়াজ শুনে আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠল, ভাবলাম, এ সময় তো কারও আসার কথা নয়, জরুরি কোনও খবর থাকলে টেলিফোন 'আসবে, বেল বাজার ব্যাপার তো নয়!

ভাবতে ভাবতে সদর দরজা খুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অফিসার রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। ওর বিশাল দশাসই চেহারাটা কেমন যেন বিধ্বস্ত আর শুকনো লাগছে।

প্রশ্ন করলাম, "কী রে রাজ্জা, তুই এত রাতে, তুই তো ছুটি নিয়েছিস, কাল তো তোর বোনের বিয়ে।" শুকনো মুখটা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ স্যার, সে সব ঠিক আছে, কিন্তু আমি একটা অন্য ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি।"

আমাদের ডাকাতি দমন শাখার তখন চারদিকে নাম, সেই দফতরের অফিসার কি এমন ঝামেলায় পড়ল যে ছুটির সময়ও এত রাতে আমার কাছে ফিরে এসেছে? জানতে চাইলাম, "কি ঝামেলা?" অত বড় চেহারার মানুষটা প্রায় কান্নাঝরা গলায় বলল, "আমার সার্ভিস রিভলবারটা পাচ্ছি না স্যার।" রাজকুমারের কথা শুনে মনে হল সশব্দে আমার সামনে একটা বোমা ফাটল। কারণ সার্ভিস রিভলবার হারানোর অর্থ চাকরির থেকেও বিদায়। কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার লিখে জানিয়ে দেবে, "তুমি সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করতে পার না, তাই তুমি পুলিশ বাহিনীর যোগ্য নও। তাছাড়া তুমি যেটা হারিয়েছ, সেটা এমন একটা জিনিস, যা দিয়ে বহু অঘটন ঘটতে পারে, বহু জীবননাশের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তুমি বিদায় নাও ইত্যাদি ইত্যাদি।" নকশাল আন্দোলনের সময় থেকে প্রতিরক্ষার কাজে আমাদের বহু অফিসারকেই নিজের সঙ্গে রাখার জন্য স্থায়ী ভাবে রিভলবার দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকে রাজকুমারের কাছেও ছিল রিভলবার। সেটাই সে হারিয়েছে।

আমি দ্রুত বিভিন্ন দিক চিন্তা করতে করতে, যাতে সে বিচলিত না হয়, তাই খুব ঠাণ্ডা গলায় ওকে প্রশ্ন করলাম, "কখন বুঝলি, রিভলবারটা নেই?"

রাজকুমার কাঁপা গলায় বলল, "বাড়ি গিয়ে যখন জামাকাপড় পাল্টাচ্ছি, তখন দেখছি, রিভলবার, বুলেটের ব্যাগ কোনটাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার মোটর সাইকেলের কারিয়ারে দেখলাম, সেটা ফাঁকা, মানে সেখানেও রাখিনি। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকাল থেকে আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি সে সব জায়গায় খোঁজ করি, কিন্তু কোনখানেই কেউ হদিশ দিতে পারেনি। শেষে বাড়ি যাওয়ার আগে আপনার কাছে এলাম।"

ওর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। একটা দুরন্ত ঝড় ওর মনের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর ওই ঝড়ের দাপট সামলাতেই তার আমার কাছে ছুটে আসা। ও জানে ওকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে একজনই, সে ওই কালো রুণু।

রাজকুমারের মুখে রিভলবার হারানোর খবর শুনেই সাদা রুণুর অহমিকাতে ঘা পড়ে কালো রুণু জেগে উঠেছে। সাদা ভাবল, তার অধীনে কর্মরত অফিসারের গাফিলতির দায় তাকেই বইতে হবে। কীভাবে? সেটা কালো ভেবে নিয়েছে! কিন্তু সেটা রাজকুমারকে বলল না।

তাই ওকে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বললাম, "এখন বাড়ি যা, আগামীকাল তোর বোনের বিয়ে ভালভাবে চুকেবুকে গেলে তারপর আসিস, তখন যা হওয়ার হবে।"

"স্যার," রাজকুমার কী একটা বলতে যাচ্ছিল। থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আজ আর কোনও কথা নয়, এখন যা, বোনের বিয়ের চিন্তা কর।" আমি আর কোনও আলোচনা যে করব না, সেটা বুঝে রাজকুমার চলে গেল তার ডানলপের কোয়ার্টারে।

পরদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় আবার আমার কাছে দফতরে রাজকুমার এসে

হাজির। উত্তরপাড়ায় ওদের পৈতৃকবাড়িতে আজ ওর বোনের বিয়ে। বিয়েবাড়ি ফেলে চলে এসেছে। বুঝতে পারছি ওর ছটফটানি, রিভলবার না পাওয়া গেলে যে সে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে, সেই আশঙ্কা ওকে অস্থির করে তুলেছে। তাই কোনও কাজেই ওর মন বসছে না। আজ ওর ছুটি, শুনতে পাচ্ছি, সবাই রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করছে, "কী ব্যাপার, আজ এখানে?" রাজকুমার সেই প্রশ্নের উত্তরে ভাঙা রেকর্ডের মতো একইভাবে সবাইকে বলে যাচ্ছে, "স্যারের কাছে দরকার আছে।"

রাজকুমার চেম্বারে ঢুকে আমার উল্টোদিকে বসল। চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দিলাম। কারণ এখন আমাদের মধ্যে যা আলোচনা হবে, তা কাউকে জানানো যাবে না। কেউ জানতে পারলে রাজকুমারের বিপদ হতে পারে। রাজকুমার চুপ করে বসে আছে। কী-ই বা বলার আছে ওর? আমার কাছে এসেছে আমি কী ব্যবস্থা করি সেই আশ্বাসবাণীটা শুনতে। আমি ওর উদভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হাল্কা গলায় বললাম, "বিয়েবাড়ি ফেলে আজ এলি কেন, তোকে তো বিয়ের কাজ সব চুকিয়ে আসতে বলেছি।" রাজকুমার বলল, "ওই দিকে সব ঠিক করে এসেছি, আবার এখান থেকে যাব। আসলে কী যে করি কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

গতরাতেই রাজকুমার রিভলবার হারানোর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিলাম, যা ওকে বলিনি এবং চট করে বলবও না। বললে সে রিভলবার উদ্ধার করার প্রচেষ্টায় মনপ্রাণ ঢেলে উদ্যোগও নেবে না। ঠিক করেছি, ওর চাকরি ও আমাদের বিভাগের সম্মান বাঁচাতে যে সব দাবিদারহীন রিভলবার আমার হেপাজতে আছে, তার থেকে একটা রাজকুমারের রিভলবারের মতো একই 'বোরের' রিভলবার নিয়ে গোপনে সেই রিভলবার থেকে তার নম্বর তুলে রাজকুমারের রিভলবারের নম্বরটা খোদাই করে দেব। এই অত্যন্ত বেআইনী কাজটা করে হয়তো ওর চাকরি ও আমাদের ইজ্জত বাঁচাতে পারব, কিন্তু রাজকুমারের রিভলবারটা উদ্ধার করতে পারব না। আমার অফিসারের কাছ থেকে রিভলবার হারিয়ে যাবে আর সেই ব্যর্থতার দায় আংশিক হলেও আমাকে সারা জীবন বইতে হবে, এই ভাবনাতেই আমার আঁতে কুঠারাঘাত করতে লাগল। আমার ভেতরের প্রতিক্রিয়া রাজকুমার কিছুই বুঝতে পারছে না।

গতকাল ওর কর্মাকর্ম, চলনবলনের সম্পূর্ণ মানচিত্রটা নতুন করে সাজাতে ওকে জেরার ঢঙে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, "কাল কোথায় কোথায় গিয়েছিলি বল তো?" রাজকুমার বলল, "সে সব জায়গায় কালই আমি ঘুরে এসেছি, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না।" ওর এই এক দোষ, কিছু জানতে চাইলেই সবজান্তার মতো উড়িয়ে দিয়ে একটা উল্টো ধারায় উত্তর দেবে, যার থেকে নির্দিষ্টভাবে কিছু বাস্তব রাস্তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

অন্য সময় হলে ওর এরকম উত্তর শোনার পর আমিও ওকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে কিছু গরম কথা শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু সেসময় ওর মনের যা করুণ অবস্থা, বাড়িতে বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব ফেলে উদ্বেগে ছুটে চলে এসেছে আমার কাছে, সে মুহূর্তে আমি কটু কথা বলে আরও আহত না করে বললাম, "ঠিক আছে, তবু তুই বল। যেমন করে আমরা রিকনস্ট্রাকশন অফ ক্রাইম করি, তেমনভাবে বল।" রাজকুমার কী বুঝল জানি না, হয়তো আমার কণ্ঠস্বরের গভীরতা কিংবা এই বিপদের দিনে একমাত্র আমাকেই সহায় ভেবে অন্য প্রসঙ্গ আর না টেনে একে একে বলতে শুরু করল গতকাল সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কোথায় বসেছিল, কার সঙ্গে কী কী কথাবার্তা বলেছে, সব, বিস্তারিতভাবে।

রাজকুমারের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, একবার বলতে শুরু করলে আর থামে না। ফোয়ারার মতো অনর্গল বলেই যায়, তা প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক, কোনও দিকে তখন আর খেয়াল রাখে না। ও যে ভেতরে কতটা সরল প্রকৃতির মানুষ, সেই সময় ধরা যায়। প্যাচপোঁচ, পরিস্থিতি, পরিবেশ সব ভুলে মনের আগল খুলে দেয়, মাপজোখ কিছুই বোঝে না। রাজনীতি করলে ও ডাহা ফেল করত।

আজ ঠিক করেছি, ওকে থামাব না, যত খুশি, যত ইচ্ছা সে বলে যাক, আমি শুনে যাব। কিছু বলে ওর মনসংযোগ ছিন্ন করব না। আসলে আমি যে একটা তদন্তে নেমেছি, সেটাও বুঝতে দেব না। নিজের থেকে যতটা বোঝে বুঝুক। এমনিতে বিপদের সময় মানুষের বুদ্ধি বিভ্রম হয়, তখনই তার দরকার একজন প্রকৃত বন্ধুর, যে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে বুদ্ধি দিয়ে সঠিক পথে যেতে সাহায্য করতে পারে। আমার কাছ থেকে সে তখন সেই বন্ধুত্বটাই আশা করছে। রাজকুমার গতকালের তার গতিবিধির পূর্বাপর সব সবিস্তারে বলে পরিশেষে বলল, "এই সবখানে আমি গিয়েছি, কেউ কিছু বলতে পারেনি।"

ওর কথার গুরুত্ব না দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, "রিভলবারটা শেষ কখন দেখেছিস?" আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছি, আমার প্রশ্ন শুনে ওর ভ্রূটা কুঁচকে উঠল ও স্মৃতি হাতড়াতে লাগল।

আমি ওর চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা রাজ্জা, কাল তুই পান খেতে যাসনি?" আমার প্রশ্ন শুনতেই দেখলাম ওর মুখের ওপর একটা হাজার পাওয়ারের বাল্ব ঝলক মেরে জ্বলে উঠল। ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে "আমি আসছি স্যার" বলে ঝড়ের গতিতে আমার চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি জানি ও এখন পাগলের মতো মোটর সাইকেল চালিয়ে কোথায় যাবে। যাবে নিউ এম্পায়ার সিনেমা হলের পাশের একটা পানের দোকানে। ওই দোকানে রাজকুমার প্রতিদিন যায়। যেখানেই থাকুক, পান খাওয়ার জন্য ওই দোকানটায় যাবেই যাবে। ঠিক এই রকম স্বভাব দেখেছি, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। তিনি এক সময় টালিগঞ্জ থানার ওসি ছিলেন, তখন থেকে তিনি থানার কাছেই এক পান দোকান থেকে পান কিনতেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন টালিগঞ্জ থানা থেকে মুচিপাড়া থানায় বদলি হয়ে চলে এলেন, তখনও তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, ঠিক রাত বারোটা সোয়া বারোটার সময় ওই পানের দোকানে পান খেতে যেতেন। পুলিশ অফিসারদের এই রকম নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে যাওয়ার অভ্যেসটা পরিত্যাগই করা উচিত বলে মনে হয়, কিন্তু সব উচিত কাজ কি আমরা আর করি? এটাও একটা সেরকম উদাহরণ।

আধঘণ্টা পর রাজকুমার ফিরে এল। দেখেই বুঝলাম, যে জন্য সে ঝড়ের বেগে ছুটেছিল তা বিফলে গেছে। ওর মুখ থেকে হাজার পাওয়ারের বাল্বটা নিভে গিয়ে আবার পাংশুটে হয়ে গেছে।

ওকে দেখে আমার মায়া লাগল। আমার বহুদিনের সহকর্মী, সুখে দুঃখে বহুদিন কাটিয়েছি। ওর অসহায় অবস্থা দেখে আমার সহানুভূতি তো স্বাভাবিকই। ওর যদি কিছু হয়ে যায় তবে আমার বুকটা চৌচির হয়ে যাবে। শুধু রাজকুমার কেন, আমার সঙ্গীদের কারও কিছু খারাপ হলেই তেমন হবে। আস্তে বললাম, "বোস। বল কি হল?" রাজকুমার ধপাস করে চেয়ারে বসে ক্ষীণ স্বরে কোনও মতে বলল, "ওখানে দোকানদার, আশেপাশের কেউ কিচ্ছু বলতে পারল না, বলল, কিছু দেখিনি।"

বললাম, "কাল ওখানেই কি তুই শেষবার রিভলবারটা দেখেছিলি?" রাজকুমার বলল, "হ্যাঁ স্যার, আমার ঠিক মনে আছে, ওখানেই আমি শেষবারের মতো দেখেছি। কোমর থেকে ওটা আর বুলেটের ব্যাগটা খুলে মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে রাখবার জন্য সিটের ওপর রেখে মুখ ধুয়েছি, তারপর আর মনে নেই। ওরা পান দিল, আমি পান নিয়ে সোজা বাড়ি চলে গেছি, তখন সন্ধে পার হয়ে গেছে।"

জানতে চাইলাম, "সেইসময় কে কে ছিল?" রাজকুমার বলল, রোজ যারা থাকে, তারাই ছিল। রাধেশ্যাম, তার ছেলেটা, পাশের দোকানের মতি, কেলো। ওদের সন্দেহ করার কিছু নেই।" প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, ওইখানে নোংরা জামাকাপড় পরা কোনও বাচ্চা ছেলেটেলে দেখেছিস?" প্রশ্ন শুনে সে চোখ বড় বড় করে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, ক'টা নোংরা জামা পরা বাচ্চা ছেলে ঘোরাঘুরি করছিল, একটা ছেলে আমার মোটর সাইকেলের কাছে আসতে

আমি তাকে 'ভাগ ভাগ করে ধমকে তাড়িয়েও দিয়েছি।"

হেসে বললাম, "বেশ করেছি। এখন তুই বাড়ি যা। বাড়িতে আজ বোনের বিয়ে, তুই ওই দিকটা দেখ, আমি এদিকটা দেখি।"

রাজকুমার আমার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল, "স্যার।" "বললাম তো তুই যা, আমি দেখছি।" ওকে ওর মনের ভেতরের ঝড়টা শান্ত করার জন্য বললাম। রাজকুমার চলে গেল।

চলে যাওয়ার পর রাজকুমার সেদিন পানের দোকানের সামনে কী করেছিল সেই দৃশ্যগুলো আমি পর পর মনে মনে সাজাতে লাগলাম।

চোখ বুজে আমি দেখতে লাগলাম, রাজকুমার ভটভট শব্দ তুলতে তুলতে তার বড় মোটর সাইকেল এনে দাঁড় করাল পানের দোকানের সামনে।

তখন পড়ন্ত বিকেল। মোটর সাইকেলটা দাঁড় করিয়েই দোকানদারের নাম ধরে প্রশ্ন করল, 'কেমন আছিস রাধেশ্যাম?" সেলাম ঠুকে রাধেশ্যাম হেসে বলল, "ঠিক আছে সাব।" তারপর তার বিরাট চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাইক লাগানো গলায় বলল, "এ্যাই—কে আছিস, জল দে।" ওই জল দিয়ে সে মুখ কুলকুচি করে মুখের ভেতরের সুপারির ও পানপরাগের দানা পরিষ্কার করে আবার পান মুখে দেবে। জল আনতে বলে সে মোটর সাইকেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুলে ফেলল কোমরের বেল্ট। জিপারটা অল্প খুলে রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগটা কোমরের বাঁধন থেকে মুক্ত করে রাখল মোটর সাইকেলের সিটের ওপর। এবার আলগা হয়ে যাওয়া ফুলহাতা জামাটা ভাল করে গুঁজে জিপার টেনে প্যান্টটা কোমরে ঠিক করে এঁটে নিল। ইতিমধ্যে দোকানদারের কর্মচারী একটা ছোট ছেলে বড় কাঁচের গ্লাসে জল নিয়ে এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে। রাজকুমার তখন দাঁতের ফাঁকে টুথপিক দিয়ে সুপারির টুকরো বার করতে করতে আশেপাশের দোকানদারদের সঙ্গে চিৎকার করে কুশল বিনিময় করতে শুরু করেছে। রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে, ডেকে বলছে, "কি রে তুই কেমন আছিস?" রাজকুমার একসময় ময়দানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলত, বিশেষ করে ক্রিকেটে পুলিশ টিমের হয়ে খেলে বেশ নামও করেছিল, সেই সুবাদে ময়দান ও তার আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। তাছাড়া সে খুব আলাপী, সুতরাং পানের দোকানের সামনে দিয়ে যত লোক যাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই যেচে যেচে কথা বলে যাচ্ছে। রিভলবার ও বুলেট পড়ে আছে সিটের ওপর, সেদিকে ওর খেয়াল নেই, ভাবখানা এমন, ওসব থাক, আমি রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, লালবাজারের গোয়েন্দা, আমার জিনিস ধরে কার এত সাহস! কথা বলার ফাঁকেই একটা নোংরা জামা পরা ছেলে তার কাছে এলে সে তাকে হেঁড়ে গলায় ধমকিয়ে বলল, ' ভাগ এখান থেকে।' ছেলেটা সরে যায়। পেছনে নিঃশব্দে রাধেশ্যামের ছেলেটা তখনও গ্লাস হাতে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে ও তাকিয়েও দেখছে না। ওর চিৎকার চেঁচামেচির ঠেলায় ব্যস্ত রাস্তার অন্য সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে। যখন সে আর কথা বলার মতো লোক পেল না, তখন হতাশ হয়ে পেছনে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "কই রে জল এনেছিস?" রাধেশ্যামের ছেলেটা গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল, রাজকুমার তার বাঁ হাতটা দুবার সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে গ্লাসটা মধ্যমা ও বুড়ো আঙুল দিয়ে আলতো ভাবে ধরে মুখটা আকাশের দিকে তুলে বিরাট হাঁ করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিল। তারপর খ্যাঁ খ্যাঁ করে বিকট শব্দে কুলকুচি করে মুখের জলটা দোকানের একপাশে রাস্তার ওপর পিচকারির মতো ফেলতে লাগল। ওদিকে সিটের ওপর শুয়ে আছে রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগ। কুলকুচি করে মুখ ধোওয়ার পর ছেলেটা একটা চকচকে ঘটিতে জল নিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালে সে বাঁ হাতে ধরা ফাঁকা কাঁচের গ্লাসটা ছেলেটার হাতে দিয়ে দুটো হাত ওর দিকে এগিয়ে দিল। তখন ছেলেটা রাজকুমারের হাতে জল ঢেলে দিতে লাগল, রাজকুমার তার হাত কচলে কচলে ধুতে লাগল। হাত ধুয়ে সে পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতটা মুছে দোকানদারকে বলল, "রাধেশ্যাম, দে।" রাধেশ্যাম দুটো পান রাজকুমারের হাতে এগিয়ে দিলে সে দুটো পানই একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে ডান হাতটা রাধেশ্যামের দিকে

এগিয়ে দিতে রাধেশ্যাম কিছুটা জর্দা ওর হাতের তালুতে দিল। সে জর্দাটা মুখের ভেতর ফেলে দিল। একটা ঠোঙায় রাধেশ্যাম আট দশটা পান আলাদা করে বেঁধে রেখেছে। রাজকুমার পান চিবোতে চিবোতে মুখ থেকে জর্দার রস খানিকটা ফেলে মুখটা কোনও মতে অল্প ফাঁক করে বলল, "দে" রাধেশ্যাম পানের সেই ঠোঙাটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। সে বাঁ হাতে ঠোঙাটা নিয়ে ডান হাত দিয়ে প্যান্টের পেছন পকেট থেকে পার্সটা বার করে রাধেশ্যামকে পানের দাম চুকিয়ে বলল, "আজ চলি রে রাধেশ্যাম।" রাধেশ্যাম আবার সেলাম করে উত্তর দিল, "আচ্ছা সাব, নমস্তে!" রাজকুমার মোটর সাইকেলের দিকে এগিয়ে গেল। সিটের ওপর রাখা তার রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগটা যে নেই, তা তার মনেও পড়ল না। সে সিটের ওপর ডান হাতের দুটো বিরাশি সিক্কার চাপড় মেরে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে উঠে বসল, তারপর মোটর সাইকেল স্টার্ট দেওয়ার জন্য মারল এক কিক। ভটভট করে মোটর সাইকেল স্টার্ট হতেই সে ডানহাতটা ওপর দিকে তুলে দিল, অর্থাৎ বিদায়। কার থেকে বিদায়, কিসের থেকে বিদায়, কিছুই বোঝা গেল না। বাড়ি ফিরে দেখল, তার রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগটা নেই। '

পুরো চিত্রটা চোখের সামনে দেখে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলাম আমাদের নজরদারি বিভাগে। সেখানে গিয়ে খোঁজ করলাম, কোনও "কেপমারির দল" তখন কলকাতায় তাদের কাজ শুরু কোনও কেপমারি করেছে কি না। ওই বিভাগ থেকে জানান হল, না, কোনো দলের খবর তাঁদের কাছে নেই। এবার জানতে চাইলাম, "আচ্ছা কেপমারি দলের কারও কোনওদিন সাজা হয়েছে কি?" আমাকে জানাল, "না,

কারণ তারা জামিন নিয়ে, পালিয়ে যায়।" 'অর্থাৎ', আমি যা বোঝার বুঝে নজরদারি বিভাগ থেকে বেড়িয়ে এলাম। দ্বন্দ্ব একটা মনের মধ্যে খোঁচা মারছে। সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা দিকের চিন্তার মধ্যেই একটা বিশ্বাস। সেই দৃঢ় বিশ্বাসটা হচ্ছে কেপমারির দলের লোকেরাই রাজকুমারের রিভলবার নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়েছে।

চেম্বারে ফিরে ভাবতে লাগলাম, কেপমারির দলের হাতে যদি রিভলবারটা চলে যায়, তবে তা উদ্ধার করা ভীষণ কঠিন। এরা বড় সাংঘাতিক। এরা এক জায়গায় থাকে না। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এ শহরে ও শহরে। যাযাবর প্রকৃতির। তারা শহরের ভেতরে কোনও আস্তানা গাড়ে না। প্রথমে, যে শহরকে তারা 'কাজের' জন্য নির্দিষ্ট করে আসে, সেই শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে নির্জন জায়গায়, জঙ্গলের ধারে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে শুরু করে। দলে থাকে দলপতি বা সর্দার। যত দায়দায়িত্ব সব সর্দারের। দলের লোকের থাকা, খাওয়া, বিপদে পড়লে তাকে দেখা, সব দায়িত্ব তার। দলের বাকি সদস্যের কাজ হল, তারা "কাজের" মাধ্যমে যা কিছু পাবে, তা জমা দিয়ে দেবে সর্দারের কাছে। এরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। খুব বেশি হলে দু তিন মাস। তারপর তাদের কাজে কোনও রকম হইচই হলে সর্দার দল নিয়ে চুপচাপ চলে যায় অন্য এলাকায়। এ সব দলগুলো বেশির ভাগ দাক্ষিণাত্যের। দক্ষিণ প্রদেশের লোকেরাই দল গড়ে। দলে ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা, বুড়ো সব বয়সী লোকই থাকে। তবে "কাজগুলো" তারা করায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দিয়ে, বড়রা দূর থেকে তাদের পরিচালনা ও রক্ষা করে।

কেপমারির 'কাজ' হচ্ছে মানুষের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে জিনিস হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়া। সেই কাজে তারা মানুষকে চট করে বেখায়ালী করে নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করে নেয়। হয়তো একটা জায়গায় গিয়েছে তারা "কাজ" করতে দল নিয়ে। দলের দুটো লোক রাস্তায় পয়সা ছিটিয়ে দিয়ে কুড়োতে লাগল। কোন পথচারী তাকে সাহায্যের জন্য যদি তার হাতের ব্যাগটা রেখে পয়সা কুড়োতে যায়, পরে নির্ঘাত সেই সাহায্যকারী দেখতে পাবে, ব্যাগটা হাওয়া। কেপমারি দলের অন্য ছেলে সেটা নিয়ে চলে গেছে। এভাবে যে তারা কত লোকের সর্বনাশ করে তা তারাই জানে।

কেপমারির দলই যে রাজকুমারের রিভলবারটা সরিয়েছে, সেব্যাপারে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। তার প্রধান কারণ, এত ভাল হাত সাফাইয়ের কাজ আর কেউ করতে পারবে না। দু

নম্বর, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তিনটে দশ বারো বছরের ছেলে, অপুষ্ট, নোংরা জামা পরে ওই পানের দোকানের সামনে ঘুরছে আর রাজকুমার ও আশেপাশের অন্য লোকেদের অন্যমনস্কতার সুযোগ খুঁজছে। রাজকুমার যখন মুখ ধোওয়ার জন্য পেছন ফিরেছে, তখন একটা বাচ্চা ছেলে সিটের ওপর রাখা রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগের ওপর একটা ময়লা গামছা বা ওই জাতীয় কাপড় দিয়ে চট করে ঢেকে দিয়ে রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগ সমেত গামছাটা মুহূর্তের মধ্যে তুলে আস্তে সরে গেছে, যা কেউ খেয়াল করেনি। আর রাজকুমার তখন খ্যা খ্যাঁ করে আওয়াজ তুলে কুলকুচিতে ব্যস্ত। তিন নম্বর, অন্য কোনও লোক অত ব্যস্ত জায়গায় পুলিশের রিভলবার হাতানোর সাহস পাবে না। তারা জানে ধরা পড়লে কী দশা হবে। এই জায়গায় কেপমারিদের সুযোগ বেশি, কারণ ধরা পড়লে বলবে, বাচ্চা ছেলে, না বুঝে কাজটা করে ফেলেছে, মাপ করে দিন। সাধারণ জনতাও সহানুভূতি দেখিয়ে বলবে, 'ছেড়ে দিন।" তখন ধমকধামক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

এইসব কারণগুলো খুঁটিয়ে দেখেই আমার সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা দফতরের যে বিভাগের ওপর এইসব অপরাধীদের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব, তাঁরা আমাকে কোনও খবর দিতে পারলো না। কলকাতায় কেপমারির দল 'কাজ' করা শুরু করেছে কি করেনি তাঁরা জানেন না।

কি করি? সময় হাত থেকে চলে যাচ্ছে। কোথায় পাব এই দলকে? দুদিন পার হতে চলল। অথচ জানি দলের সর্দার তার কাছে জমা পড়া কোন জিনিসই বেশিক্ষণ হেফাজতে রাখে না। বিক্রি করে নগদ টাকা করে নেয়। একবার বিক্রি হয়ে গেলে সেই জিনিসের হদিশ পাওয়া মুশকিল। তাই যা করার খুব দ্রুত করতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব তার কোনও ঠিকানা পাচ্ছি না। এ যেন ঠিক তুলোর পাহাড়ে ছুঁচ খোঁজা।

পরদিন সকালেই তাড়াতাড়ি দফতর ঘুরে গাড়ি নিয়ে একা বেরিয়ে গেলাম। বহু চিন্তার পর একটা পথ পেয়েছি, সেখানে ঠিক মতো ঘা দিতে পারলে পাথর আলগা হলেও হতে পারে। রিভলবারের হদিশ পেতে পারি। এগারোটার সময় গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ালাম ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সামনে। ধরলাম আমার পরিচিত এক মুহুরীকে, সে আমাদের বিশ্বস্ত, আমাদের হয়ে অনেক কাজ করে। বললাম, "শোন, কোর্টে একজন মুহুরী আছে, যে কেপমারির দলের লোকেদের জামিন করায়। তাকে আমার দরকার।" সে জানাল, "হ্যাঁ আছে।" প্রশ্ন করলাম, "কোথায়? চল, আমাকে তার কাছে নিয়ে।" সে আমাকে নিয়ে গিয়ে অন্য এক মুহুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আলাপের দরকার ছিল না, আমি তাকে না চিনলেও সে আমাকে বিলক্ষণ চেনে। মাঝবয়সী সেই মুসলিম মুহুরীকে বললাম, "আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি দরকার আছে, এক্ষুণি একবার আমার সঙ্গে লালবাজারে যেতে হবে।" সে আমার প্রায় আদেশের মতো গলার স্বর শুনে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য থতমত হয়ে বলল, "কিন্তু আমার তো এখানে অনেক কাজ আছে।" বললাম, "আজকের ব্যবসায় আপনার যা লোকসান হবে তা পুরো আমি মিটিয়ে দেব। আপনার ব্যবসার যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেটা আমি দেখব।" বুঝল আমি নাছোড়বান্দা। ভেবে নিলাম আমাকে যখন চেনে, তখন ঠিক আমার নামের সঙ্গে যে মহিমা যুক্ত আছে সেই খবরও সে জানে। সেই সব ভেবেই বোধহয় বলল, "ঠিক আছে, চলুন।" আমি সেই মুহুরীকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে গাড়ি লালবাজারের দিকে ছোটালাম। জানতাম, কেপমারির দলের সর্দার যে শহরেই তাদের ক্রিয়াকলাপ চালাতে যায়, সেই শহরের এক মুহুরীকে আগের থেকে একটা মোটা টাকা দিয়ে রাখে, যাতে দলের কোনও সদস্য ধরা পড়লে তাকে সে জামিনে ছাড়াতে পারে। মুহুরীরা তাদের থেকে মোটা টাকা নিয়ে নেয়, কারণ তারা জানে, কেপমারির দলের যাকেই সে জামিনে ছাড়াবে, সে আর আদালতে মামলার জন্য হাজিরা দেবে না।

কলকাতা এলাকার আদালতের তেমন কেপমারির দলের মুহুরীকে আমি লালবাজারে আমার চেম্বারে নিয়ে এসে বসালাম। একমাত্র এই মুহুরীই জানবে, কেপমারিরা এবার অভিযানে এসে কোথায় ঘাঁটি গেড়েছে। অন্য কারও সেটা জানা সম্ভব নয়।

চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে সরাসরি বললাম, " পরশুদিন বিকেলে নিউ এম্পায়ার সিনেমা হলের পাশে এক পানের দোকানের সামনে থেকে আমাদের একটা রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগ কেপমারির দল তুলে নিয়ে গেছে, সেটা আমি ফেরত চাই।"

মুহুরী আমার কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, "সে আমি কি করব?" ওর ওই ভঙ্গিমা দেখে মনে মনে রাগ হলেও তা প্রকাশ না করে বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন একথা অন্য কাউকে না বলে আপনাকেই বলছি। আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন, আমি কিন্তু আপনার পেছনে লেগে যাব, তখন আপনার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ব্যবসা করা মুশকিল হয়ে যাবে।"

আমি কথা বলছি আর মুহুরীর প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করছি। আমার চোখ রাঙানিতে একটু যে কাজ হয়েছে তা বুঝতে পেরে, ওকে আর আমার কথার উত্তর দিতে না দিয়ে বললাম, "আমি তো আসামীকে চাইছি না, আমি শুধু রিভলবার আর বুলেটগুলো ফেরত চাইছি, তারপর ওরা যা ইচ্ছে করুক, আমি কিছু বলব না। আর রিভলবার যদি না পাই, আর তখন ওদের কাউকে যদি ধরতে পারি, ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব, এটা মনে রাখবেন।"

আমার হিমশীতল গলার প্রত্যক্ষ তীর খেয়ে মুহুরী কিছুটা ধরাশায়ী। সে আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু ওরাই যে নিয়েছে, তা আপনি জানলেন কী করে?" আমি গলায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সুর ঢেলে বলে উঠলাম, "ওরাই। ওরাই। ওরা ছাড়া কেউ এ কাজ করেনি, এতদিন পুলিশে আছি, কাজের ধরণ দেখে বুঝতে পারব না কে বা কারা কোন কাজটা করতে পারে?"

মুহুরী বুঝতে পারল, আমার কথা মতো কাজ না করে তার আমার হাত থেকে মুক্তি নেই। সে মাথা নিচু করে বলল, "ঠিক আছে, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু কোনও কথা দিতে পারছি না।" মুখে বললাম, "চেষ্টা করলে পাবেনই।" কিন্তু মনে মনে বললাম, তুমি যতক্ষণ না কেপমারির হাত থেকে রিভলবার এনে দিতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিস্তার নেই। আমি জানি, তুমিই পারবে সেটা উদ্ধার করতে, যতই. এটা সেটা বলে পাঁকালমাছের মতো আমার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যেতে চাও, আমি তোমায় যেতে দিচ্ছি না বাছাধন।' মুহুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি চলি, দেখি ওরা কোথায়।"

মুহুরীকে বললাম, "দাঁড়ান, আমি গাড়ি দিচ্ছি, তাতে যাবেন।" মুহুরী বলল, "সে তো অনেক দূর, ফিরতে দেরি হবে।"

"হোক, যতদূর দরকার ততদূর যাবে। আপনি বসুন, আমি ব্যবস্থা করছি।" গম্ভীরভাবে বললাম। মুহুরী বসে পড়ল। প্রশ্ন করলাম, "আপনার ফিরতে তো দেরি হবে বলছেন?" মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।" বললাম, "তবে আপনি আপনার বাড়ির ঠিকানাটা দিন, আমি লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে দিচ্ছি আপনার ফিরতে একটু দেরি হবে।" মুহুরী একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলে আমি একজন কনস্টেবল পাঠিয়ে খবরটা তার বাড়িতে জানিয়ে দিতে বললাম আর দেখে আসতে বললাম তার বাড়িতে কে কে আছে। সে পালালে কোথায় ধরব, সেটা জেনে রাখলাম।

মুহুরীকে একা ছাড়া যাবে না। সে যদি গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যায়, আবার ওকে ধরে কেপমারি সর্দারের ডেরায় পাঠিয়ে রিভলবার উদ্ধার করতে সময় বয়ে যাবে, সর্দার ততদিনে রিভলবার করে দেবে বেপাত্তা।

তখন আমার কিছুই করার থাকবে না। কারণ রিভলবারটা যে ওরাই চুরি করেছে তার তো কোনও সাক্ষী নেই, একটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আমি চলেছি। আর অনুমান তো কখনই একশ ভাগ সত্যি হতে পারে না, যতক্ষণ না সেটা পরীক্ষিত হচ্ছে। তাই মুহুরী পালালে আমার আইনত কিছু করার নেই। চোখ রাঙিয়ে কাজ উদ্ধার করা ছাড়া উপায় কি? আর সে পালালে আমার অনুমানটাও পরীক্ষা করা যাবে না, কারণ তারই সঙ্গে কেপমারির দলের রয়েছে একমাত্র যোগসূত্র। সেটা হাতছাড়া হলে আবার আমাকে অথৈ জলে ডুবে যেতে হবে,

যা এই মুহূর্তে আমার কোনও ভাবে কাম্য নয়।

এবার চিন্তা করলাম, মুহুরীর সঙ্গে কাকে পাঠাব? সেটাও একটা সমস্যা, কারণ, ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে রাজকুমারের সমূহ বিপদ। যে বিপদ থেকে বাঁচা ভীষণ কঠিন। এখন পর্যন্ত লালবাজারে ঘটনাটা শুধু রাজকুমার আর আমি জানি। এবার তৃতীয় জনকে জানাতে হবে। মুহুরীর সঙ্গে যে সাহায্যকারী হিসাবে যাবে, কিন্তু আসলে সে যাবে পাহারাদার হয়ে। কিন্তু কাকে পাঠাব? অনেক ভেবে ঠিক করলাম, পাঠাব কনস্টেবল অসিত বেরাকে। সে আমার খুবই বিশ্বস্ত, তার থেকে অন্তত গোপন কথা বাইরে যাবে না।

অসিতকে ডেকে আলাদা করে সব বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিলাম। মুহুরী ও অসিতকে আমার গাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম কেপমারির দলের সর্দারের কাছে। দুপুর একটা নাগাদ ওদের পাঠিয়ে দেওয়ার পর থেকে দুশ্চিন্তায় আমার মাথা আস্তে আস্তে ভারি হতে লাগল। খালি ভাবছি, পাবে তো, পাবে তো? না পেলে কী করব ঠিক করে রাখলেও, রিভলবার হারিয়ে যাওয়াটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। ওই রিভলবার তো কোন ভদ্রলোকের হাতে যাবে না, যাবে সমাজবিরোধীর হাতে, আর সেটা তারা দেশের কোনও উপকারের জন্য ব্যবহার করবে না। করবে ডাকাতি কিংবা খুন। এই জন্য মাঝে মাঝে রাজকুমারের ওপর রাগও ধরছে। রিভলবার নিয়ে এত উদাসীনতা পুলিশ অফিসারের মানায় না। সময়ের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে দফতরে বসে রইলাম। তখন যারাই দেখা করতে আসছে, কিংবা কাজ করতে আসছে কোনও কিছুতেই ঠিক মতো মনসংযোগ করতে না পেরে অযথা তাদের খিঁচিয়ে উঠছি। আমার মানসিক অবস্থা তো তারা কেউ জানে না, কি জন্য আমি মেজাজ খারাপ করছি। আমি জানি, রিভলবারটা যতক্ষণ না ফেরত পাচ্ছি, ততক্ষণ আমি এইভাবে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগব আর আমার আশেপাশের সবাইকে সেই যন্ত্রণার তাপ অকারণে বিকীরণ করে যাব।

পরদিনও রাজকুমারের ছুটি। কিন্তু সে বাড়িতে থাকতে না পেরে, বোন শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পরই চলে এসেছে আমার কাছে। ওকে দেখে আমার রাগ হলেও আমি মুখে ব্যক্ত না করে প্রশ্ন করলাম, “কি রে, বোনের বিয়ে সব ভালমতো মিটেছে?” সে বলল, “হ্যাঁ। সব ভালভাবেই হয়েছে।” নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, “বোস।” রাজকুমার আমার উল্টো দিকে চেয়ারে বসল। কিছু জিজ্ঞেস করছে না। জানি, ওর পেট ফুলে উঠছে, রিভলবার উদ্ধারে কোনও অগ্রগতি করতে পেরেছি কিনা তা জানার জন্য। আমি কিন্তু অন্য কাজ করে যাচ্ছি।

ধৈর্য হারিয়ে রাজকুমার বলল, “স্যার।” অর্থাৎ জানতে চাইছে আমি কি পদক্ষেপ নিয়েছি। নির্লিপ্ত স্বরেই বললাম, “লোক পাঠিয়েছি, দেখি কী খবর আসে। রাজকুমার বলল, “ও।” আবার নিশ্চুপ।

একটার সময় অসিতদের রওয়ানা করিয়ে দিয়ে বসে আছি, কখন তারা কি খবর নিয়ে আসে তারই উদগ্রীব প্রতীক্ষায়। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি, সময় পার হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছি। রাজকুমার আর উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে “আসছি” বলে আমার চেম্বার ছেড়ে অন্যখানে চলে গেছে। ওকে জানিয়েছি, মুহুরী আর অসিতকে পাঠানোর কথা। তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তারও স্বস্তি নেই।

সাড়ে সাত ঘণ্টার চরম দমবন্ধ করা উত্তেজনার পর চেম্বারের দরজা ঠেলে প্রথমে ঢুকল অসিত, পেছনে মুহুরী। ওদের দেখে মনটা নেচে উঠল। কিন্তু ঘরে অন্য লোক থাকাতে কোনও প্রশ্ন করলাম না, ওরাও কিছু বলল না। আমি তাড়াতাড়ি অন্য লোকেদের বিদায় করে দিতে মুহুরী বলে উঠল, “সর্দারকে পাইনি, কোথায় গেছে তা দলের অন্য কেউ বলতে পারল না। তবে রিভলবারটা ওরাই নিয়েছে, সর্দারের কাছে আছে, সেটা এখনও সর্দার বিক্রি করেনি। বলে এসেছি, বিক্রি না করতে।” প্রশ্ন করলাম, “সর্দার কখন ফিরবে?” মুহুরী বলল, “তাও কেউ জানে না, তবে আজ রাতেই ফিরবে।” মুহুরীকে বললাম, “আরও অপেক্ষা

করলেন না কেন?” মুহুরী বলল, “এক ঘণ্টা ওদের ওখানে ছিলাম, তারপর রাত হয়ে যাবে বলে চলে এসেছি, বলে এসেছি, আগামীকাল সকালে যাব, সর্দার যেন আমার জন্য তাঁবুতেই থাকে।” তারপর মুহুরী কাতরকণ্ঠে আমার কাছে আবেদন করল, “এখন আমি বাড়ি যাই।” বললাম, “না, না, বাড়ি যাবেন কি, এখানে থাকুন, খান দান, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনার বাড়িতে আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।” মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি মুহুরীকে ছাড়া যাবে না যতক্ষণ না রিভলভারটা হাতে ফেরত পাই।

একটা ব্যাপারে খুশি যে আমার অনুমান সত্যি। রিভলবারটা কেপমারি দলই হাতিয়ে নিয়ে গেছে। রাজকুমার ঢুকল এবং অসিতের কাছে শুনল। ওর শুকনো মুখে দেখলাম একটু রক্ত ছলকে উঠে ঝিলিক মারল, তারপরই চুপ। আমি মুহুরীকে দেখিয়ে রাজকুমারকে বললাম, “ওর জন্য কিছু খাবারদাবারের ব্যবস্থা কর, আমি আসছি।”

আমি চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম অসিতকে নিয়ে। আড়ালে গিয়ে জানতে চাইলাম, “তোকে কতদূর নিয়ে গিয়েছিল?” অসিত বলল, “স্যার, হালিশহর ছাড়িয়ে প্রায় দু তিন কিলোমিটার হবে, সেখানে একটা বিরাট মাঠের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মুহুরী নেমে গেছে, তারপর সে হেঁটে মাঠ পার হয়ে অনেকদূরে একটা জঙ্গলের ধারে একটা তাঁবুতে যায়।” প্রশ্ন করলাম, “সেখানে তোকে নিয়ে গেল না কেন?” অসিত জানাল, “আমাকে মুহুরী বলল, ওখানে অপরিচিত কেউ গেলেই কেপমারির লোকেরা পাশের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। তখন ওদের ধরা দুঃসাধ্য। তাই আমাকে নিয়ে যায়নি।”

অসিতের কথা শুনে আমি একটু চিন্তা করে নিয়ে বললাম, "ঠিক আছে, আজ রাতেই তোরা আবার যা, সর্দার বেটাকে রাতেই ধরে মালটা নিয়ে আয়। মুহুরীর কথামতো আগামীকাল সকালে সে অপেক্ষা নাও করতে পারে। কিন্তু আজ রাতে ফিরে সে যখন শুনবে মুহুরী কাল সকালে ওর কাছে যাবে, তখন সে আর অন্য ফন্দি করার সময় পাবে না, তাঁবুতেই থাকবে।” অসিত আমার কথা শুনে মাথা নাড়ল।

রাজকুমার মুহুরীর জন্য খাবার আনিয়ে দিয়েছে, সে খাচ্ছে। আমি চেম্বারে ঢুকে মুহুরীকে বললাম, “শুনুন আজ রাতেই আবার যান, ওদের বিশ্বাস নেই, কাল হয়তো আপনার জন্য অপেক্ষা না করে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। একবার যখন খোঁজ পাওয়া গেছে তখন সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।”

মুহুরী আমার চাল মোটামুটি ধরে ফেলেছে, সেও সারাদিন কোর্টে লোক চরিয়ে খায়, আমার চাল না বোঝার কিছু নেই। সে যে রিভলবার উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না সেটা বুঝে গেছে। হালিশহর না গেলে যে তাকে লালবাজারেই রাত কাটাতে হবে, তাও জেনে গেছে। সে বোধহয় লালবাজারে রাত কাটানোর চেয়ে হালিশহরের পথে রাত কাটানোটাই শ্রেয় মনে করে বলল, “ঠিক আছে, আপনার যা খুশি।”

গাড়িতে পুরো পেট্রল নিয়ে রাত ন'টা নাগাদ আবার অসিত আর মুহুরী রওয়ানা দিল, এবার ওদের সঙ্গে রাজকুমারকে পাঠিয়ে দিলাম। যাতে সে লালবাজারে বসে উত্তেজনায় ছটফটের হাত থেকে মুক্তি পায়। আর ওদের সঙ্গে গেলে পথে ওরা সাহসও পাবে, সঙ্গীও পাবে।

রাজকুমারদের পাঠিয়ে আবার আমার প্রতীক্ষা শুরু। এবার অন্য ভাবনা, সর্দার ফিরল কি না, রিভলবারটা সে মুহুরীকে ফেরত দিল কি না, এসব জানি আমি যখন এসব প্রশ্নের উত্তর পাব তখন তারিখ পাল্টে যাবে কারণ ওই তিনজনের ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে যাবে। আমি তাই যথা নিয়মে কোয়ার্টারে চলে গেলাম।

ভোর হয়ে গেছে। কলিং বেল। এই বেলের আওয়াজটা শোনার অপেক্ষায় রাতে আমার ঘুম হয়নি। কলিং বেলের আওয়াজ শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুললাম। সামনেই রাজকুমার, পেছনে অসিত ও মুহুরী। রাজকুমারের উদ্ভাসিত মুখ দেখেই বুঝে গেছি, ভোর হয়েছে, সে জীবন খুঁজে পেয়েছে। রাজকুমার বলল, “গুড মরনিং, স্যার।” উত্তরে বললাম,

“ঘরে ঢোক।”

ওরা তিনজন ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করেই প্রশ্ন করলাম, “মালটা কই?” রাজকুমার তার হাতে রাখা একটা কাপড়ের পুঁটলি খুলে দেখাল। দেখলাম তার হারিয়ে যাওয়া রিভলবার ও বুলেটের ব্যাগটা। একই রকম আছে। মুহুরীকে' দেখিয়ে রাজকুমারকে বললাম, “ওকে পাঁচশ টাকা দিয়ে দিস। ওর কাল সারাদিন ও রাত নষ্ট হয়েছে।” বলল, “অবশ্যই দেব স্যার।” মুহুরীকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। রাজকুমার ওর প্যান্টের পকেট থেকে পানপরাগ ও জর্দার প্যাকেট বার করে কিছুটা ডান হাতের তালুতে ঢেলে মুখে ফেলে বলল, "স্যার, যাই।” বললাম, “যা, এবার থেকে একটু খেয়াল রাখিস। সাবধানে থাকিস।” ওরা তিনজন চলে গেল।

অবশ্য সাবধানে থাকলেই যে প্রতারণার আশঙ্কা থাকে না তা নয়। প্রতারকরা অলক্ষ্যে চুপচাপ এমন নিপুণ কাজ করে যায় যে যাদের তারা সর্বনাশ করছে তারা তা চট করে টেরও পায় না।

যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধরে গেছে ঘুন, যেখানে আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত বলে কোনও বস্তু নেই, যেখানে মায়া, মমতা, ভালবাসা, দেশপ্রেম, সামাজিক বোধবুদ্ধি, রীতিনীতি বলে অবশিষ্ট প্রায় কিছু নেই, সেখানে প্রতি মুহূর্তেই জন্মাবে প্রতারক। কারণ তারা জেনে গেছে প্রতারণা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় হাতের সামনে নেই যা দিয়ে ভোগবিলাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়া যাবে।

সেদিন ছিল শনিবার, শীতের কুয়াশা ঠেলে শেষ লোকাল ট্রেন চলেছে শান্তিপুরের দিকে। ভিড় কম। কামরায় কামরায় স্বল্প আলো। কামরার মধ্যে মাত্র দশ পনেরো জন করে যাত্রী। কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে, কেউ মাফলার জড়িয়ে বসে গল্প করতে করতে যাচ্ছেন। তাঁরা নিত্যযাত্রী, প্রত্যেকেই প্রায় প্রত্যেককে চেনেন, ভিড়ের দিনে যিনি আগে ট্রেনে ওঠেন তিনি সহযাত্রীর জন্য বসবার জায়গা আগের থেকে দখল করে রাখেন। কামরাগুলো তাঁদের নির্দিষ্ট করা, কে কোন কামরায় থাকবেন তাদের জানা, তাই আগে উঠলে কি পরে উঠলে তাঁদের কোনও অসুবিধা হয় না। এভাবেই তারা অভ্যস্ত। শেষ ট্রেনেও দু একজন হকার মাঝে মাঝে তাদের পসরা নিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, তবে গলায় তত জোর নেই, কিছুটা ক্লান্ত, নিয়মমাফিক তাদের হাঁকতে হয় বলে হাঁকা, নিত্যযাত্রীদেরও তারা চেনে, কে কোন জিনিসটা তাদের থেকে কিনতে পারে তাও জানা। তাই তাদের কোনও ছোটাছুটি নেই, তারাও দিন শেষে ঘরে ফিরছে, যে যার নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে চলে যাবে ঘরে, আবার আগামী সকালের ট্রেন ধরার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটুখানি বিশ্রামের জন্য।

ট্রেনটা এসে থামল বেলঘরিয়া স্টেশনে। দরজার পাশের সিটে একজন যাত্রী মাথায়-মুখে মাফলার জড়িয়ে বসেছিলেন, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উঠেই তিনি বসে বসে ঘুমচ্ছিলেন। বেলঘরিয়া স্টেশনে ট্রেন থামতেই তিনি ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে স্টেশনে নেমে গেলেন, আবার নড়েচড়ে ছুটতে শুরু করল।

ক'জন যাত্রী ওই যাত্রীটির থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে বসে গল্পগুজব করছিলেন। তাঁরা সামনেই বিভিন্ন স্টেশনে নামবেন। যাঁর যেখানে নামার তিনি অন্যদের থেকে রাতের মতো বিদায় নিয়ে নেমে যাবেন গন্তব্য স্টেশনে। গল্প করতে করতে হঠাৎ এই দলের একজনের নজরে পড়ল ট্রেন চলার আলো-আঁধারির খেলার মাঝে, একটা রেক্সিনের ফোলিও ব্যাগ। ব্যাগটা সদ্য নেমে যাওয়া ওই ভদ্রলোকেরই হবে কারণ তিনি যেখানে বসেছিলেন, ঠিক তার পাশেই ফোলিও ব্যাগটা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুমতে ঘুমতে চলেছে।

ওই ভদ্রলোকের আশেপাশে অন্য কোনও লোক ছিলেন না, তাই ব্যাগটা যে তাঁরই হবে এটা মোটামুটি বোঝা গেল।

যে ভদ্রলোকের নজরে ওই ব্যাগটা প্রথম পড়ল, তিনি উঠে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে সঙ্গী যাত্রীদের সেটা দেখিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, যে ভদ্রলোক বেলঘরিয়ায় নেমে গেলেন তাঁকে তাঁরা কেউ চেনেন কিনা। কেউ বললেন, "তাকে খেয়াল করিনি।" কেউ বললেন, "চিনি না।" কেউ বা বললেন, "দেখিনি।" ইত্যাদি। যিনি সেটা তুলে এনেছেন, তিনি অন্যদের প্রশ্ন করলেন, "তাহলে ব্যাগটা নিয়ে কি করি?" দুজন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কি দরকার মশাই, ঝুটঝামেলা। কার মাল, ওটা রেল পুলিশে জমা দিয়ে দিন।" একজন বললেন, "জানলা দিয়ে টপকে দিন, কি না কি ভেতরে আছে, কে জানে। রেল পুলিশে দিলে আবার আমাদের নিয়ে টানাটানিও হতে পারে।"

সেই ভদ্রলোক হাতে ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে হেসে রললেন, "ঠিক আছে, সবই করা

যাবে, কিন্তু তার আগে খুলে দেখা যাক কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় কি না। তাহলে সেখানে নয় পৌঁছে দেওয়া যাবে, ভেতরে কোনও জরুরি কাগজপত্রও থাকতে পারে। রেল পুলিশে জমা দিলে তিনি কি আর চট করে ফেরত পাবেন? এমন তো আমাদেরও হতে পারে, তখন অন্য কেউ সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে কি তার ওপর আমাদের রাগ হবে না?"

তার হাসির ছলে এই কঠিন কথায় কেউ আর প্রতিবাদ করলেন না। তিনি ফোলিও ব্যাগটার চেনটা টেনে খুলে ফেললেন। হাত ঢুকিয়ে অনুভব করলেন ভেতরে রয়েছে বেশ কিছু কাগজপত্র। তিনি উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এত কাগজ যখন তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে সেই ভদ্রলোকের ঠিকানাটা পাওয়া যাবে, তাহলে তিনি হারানো ব্যাগটা ফেরত পেয়ে যাবেন। উৎসাহিত হয়ে তিনি ব্যাগ থেকে টেনে বার করতে লাগলেন কাগজগুলো। সেগুলো সিটের পাশে রাখতে লাগলেন। ট্রেন ছুটছে আগরপাড়ার দিকে। সবাই কাগজগুলোর দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে অবাক হতে লাগলেন ক্রমশ।

যতগুলো কাগজ ব্যাগ থেকে বার হল, সবই চেক কিংবা ড্রাফট। তাছাড়া বের হল বহু ব্যবহৃত একটা বল পেন। ব্যাগটা উল্টে দেখা হল, না, আর কিছু নেই।

এবার তাঁরা আরও হতবাক। ট্রেনের কম আলোর মধ্যেই তাঁরা দেখলেন, প্রায় সব চেক কিংবা ড্রাফটগুলো আমেরিকা কিংবা কানাডার বিভিন্ন নামি ব্যাঙ্কের। আর সেগুলো পাঠান হয়েছে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কিংবা মাদার টেরিজার নামে! কোনওটা দু হাজার ডলারের, কোনটা এক হাজার কিংবা পাঁচশ কি দু-তিনশ ডলারের। দু একটা অন্য চেকও আছে, কিন্তু সেগুলো কোনও অত গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সেসব আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কের।

আশ্চর্য হওয়ার উত্তেজনাটা কিছুটা কমলে তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করলেন, চেকগুলো রেলপুলিশের হাতে জমা না দিয়ে 'মাদারস হাউসে' গিয়ে মাদারের হাতে দিয়ে আসবেন। পরদিন রবিবার তাঁরা এলেন না।

পঁচাশি সালের শেষ দিকে, সেদিন সোমবার সকালবেলা দশটা নাগাদ কথা অনুযায়ী দুজন ভদ্রলোক ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে চুয়ান্ন এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে মাদারস হাউসে উপস্থিত। সদর দরজার সামনে মিশনারির একজন সন্ন্যাসিনীকে বললেন, তাঁরা মাদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, একটা বিশেষ অতি প্রয়োজনীয় কাজে। সন্ন্যাসিনী তাঁদের অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এসে তাঁদের তিনি মাদারস হাউসের দোতলায় নিয়ে গেলেন এবং মাদার যে ঘরটায় থাকতেন সেই ঘরের সামনে একটা পুরনো মোটা কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়ে মাদারের ঘরে চলে গেলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই মাদার ঘর থেকে বার হয়ে সেই বেঞ্চিতে তাঁদের দুজনের পাশে এসে বসলে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে মাদারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। মাদার তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। মাদার তাঁদের বসতে বলে প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে?" তাঁরা মাদারের কাছে জানতে চাইলেন, "মাদার, আপনি কি গত শনিবার কোনও লোককে চেক আর ড্রাফট জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিলেন?" মাদার বললেন, "না, তেমন কোনও লোক তো আমাদের নেই।" ভদ্রলোক দুজন তখন ফোলিও ব্যাগটা খুলে চেক ও ড্রাফটগুলো বার করে মাদারের হাতে দিয়ে বললেন, "দেখুন, এগুলি আমরা শনিবার রাতে এই ব্যাগটার ভেতর বেলঘরিয়া স্টেশনে ট্রেনের মধ্যে কুড়িয়ে পাই।"

মাদার চেক ও ড্রাফটগুলো হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "এমন তো হওয়ার কথা ছিল না।" ভদ্রলোক দুজন বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও চক্র এর পেছনে কাজ করছে, আপনি দয়া করে এব্যাপারটা অনুসন্ধান করুন।" মাদার তাঁদের কথা শুনে আস্তে একবার ঘাড় নাড়লেন, তাতে সঠিকভাবে বোঝা গেল না, তিনি এব্যাপারে কোনও তদন্ত করবেন কিনা। মাদারকে তো আর এর বেশি বলা যায় না, ভদ্রলোক দুজন আবার প্রণাম করে মাদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দিন দুই পর মাদার তখনকার পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমকে লালবাজারে এসে এই

ঘটনার কথা জানালেন। সোমসাহেব তদন্তের ব্যাপারে ভীষণভাবে উৎসাহী ছিলেন, এক মুহূর্তও দেরি না করে আমাদের গোয়েন্দা দফতরের প্রতারণা দমন শাখাকে দায়িত্ব দিলেন ঘটনাটা তদন্ত করে দেখবার জন্য। কিন্তু একটা ব্যাপারে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, মাদার কোনও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করান নি।

অভিযোগ লিপিবদ্ধ করানোর জন্য আমাদের অফিসাররা মাদারস হাউসে গিয়ে অনুরোধ করলেন। কিন্তু মাদার কিছুতেই তা করতে চাইলেন না। তিনি শুধু বলতে লাগলেন, "না, না, কাকে আবার ধরবেন, জেলে পাঠিয়ে দেবেন, তখন তার বাড়ির লোকেদের কী হবে?" আমাদের অফিসাররা তাঁকে বোঝালেন, "মাদার, আপনি তো কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন না, আপনি অপরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছেন।"

সোমসাহেব ও অন্য অফিসারদের অনেক অনুরোধ উপরোধের পর মাদার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে রাজি হলেন এবং তিনি পার্ক স্ট্রিট থানায় অপরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে নালিশ লেখালেন।

প্রতারণা দমন শাখার অফিসার প্রবীর দাশগুপ্তের নেতৃত্বে একটা টিম তৈরি করে তাদের ওপর তদন্তের ভার দেওয়া হল। তারা তদন্ত করতে করতে জানতে পারল, দমদম বিমানবন্দরের যে পুরনো টার্মিনাল ভবনটা আছে, সেটা পোস্ট অফিসের লোকেরা চিঠিপত্র বাছাই করার অফিস করেছে। সেখানেই চিঠি বাছাইয়ের সময় পোস্ট অফিসের দু একজন কর্মী যখনই মাদার কিংবা মিশনারিজ অফ চ্যারিটির নামে কোনও চিঠি দেখে, সেটা নিয়ে চলে যায় প্রস্রাবালয়ে এবং সেটা খুলে যদি দেখে তার মধ্যে কোনও চেক বা ড্রাফট আছে, তবে তারা সেটা পকেটস্থ করে চিঠিটাও বেপাত্তা করে দেয়। আর যদি দেখে তেমন কোনও চেক বা ড্রাফট নেই, শুধু চিঠি, তবে সেটা আবার সুকৌশলে আঠা দিয়ে আটকে দেয়। এভাবেই তারা বেশ ক'বছর ধরে বহু চেক ও ড্রাফট উধাও করে দিয়েছে।

এটা জানার পর সোমসাহেব কলকাতার ডাক ও তার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তাঁরা ঠিক করলেন, দমদমে চিঠি বাছাইপর্বে একজন সহকারী পোস্টমাস্টার উপস্থিত থাকবেন এবং তিনিই- মাদার বা মিশনারিজ অফ চ্যারিটির নামে যে সব চিঠিপত্র আসবে সেগুলো একটা আলাদা ব্যাগে সিল করে বন্ধ করে দেবেন এবং সেটা সোজা পাঠিয়ে দেবেন পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসে। সেখান থেকে অন্য একজন সহকারী পোস্টমাস্টার সেই ব্যাগ নিজে নিয়ে যাবেন মাদারস হাউসে এবং তিনিই ব্যাগ খুলে চিঠিপত্র যথাস্থানে দিয়ে আসবেন। এই ব্যবস্থা বর্তমানেও অব্যাহত। নতুন করে চুরি যাওয়া বন্ধ করা গেলেও, কে বা কারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এবং কারা সেইসব চেক ও ড্রাফটের ডলার আত্মসাৎ করেছে, তা জানতে হবে এবং তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার।

এর কিছুদিন পর প্রতারণা শাখায় দায়িত্বে এল প্রদ্যুৎ কুমার লাহিড়ী। প্রদ্যুৎকে আমরা পি.কে. বলে ডাকি। সেই পি.কে. আমাদের গোয়েন্দা দফতরে ফিরে আসার পর মাদারের চেক চুরির মামলার তদন্তে আরও জোর দেওয়া হল।

তদন্তের মাধ্যমে জানা গেল, তিনটে লোকের জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথা। তার মধ্যে একজন দমদম বিমানবন্দরে ডাক ও তার বিভাগের চিঠি বাছাইয়ের কর্মী, আর দুজনের একজন বাগবাজারের রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য একজন চৌরঙ্গি মার্কেটের দিলীপ নামে একটা ছেলে।

পিকে আর প্রবীর একে একে ওই তিনজনকেই গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এল। কিন্তু তাদের বাড়ি তল্লাশি করে এমন কিছু পাওয়া গেল না যাতে প্রমাণ হয় তারা মাদারের চেক চুরির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু রবীন ও দিলীপের আন্তর্জাতিক পাশপোর্ট ছিল। এবং সেই পাশপোর্টে দেখা গেল তারা বহুবার সিঙ্গাপুর, হংকং ও কাঠমান্ডু গেছে। সরাসরি কাঠমান্ডু যেতে ভারতীয় নাগরিকের পাশপোর্ট লাগে না, কিন্তু যেহেতু তারা কাঠমান্ডু যেত সিঙ্গাপুর ও হংকং থেকে, তাই তাদের পাশপোর্টে কাঠমান্ডুতে যাওয়ার অনুমতির ছাপ দেওয়া আছে।

ওই দুজনের এতবার সিঙ্গাপুর, হংকং ভ্রমণের কারণ কি? তারা এমন কেউকেটা নয় বা এমন কোন ব্যবসায়ী নয় যে যখন তখন তাদের ওইসব অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া তারা কোনও সদুত্তরও দিতে পারল না কি কারণে তারা এত ঘন ঘন ওই সব দেশে গিয়েছে। অতএব "অতএব।" সেই অতএবের গুঁতোয় তারা স্বীকার করল, তারা চেক চুরির ব্যাপারে জড়িত ঠিকই, কিন্তু সেইসব চেক বা ড্রাফট কোথায় কার নামে ভাঙা হয় তা তারা জানে না। কারণ তারা বাংলাদেশের দু তিনজন লোকের হাতে কলকাতা, সিঙ্গাপুর, হংকং কিংবা কাঠমান্ডুতে সেগুলো দিয়েই খালাস। প্রতি এক ডলারের বিনিময়ে তারা পেত এক টাকা। এটা আমাদের বিশ্বাস হল না। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হল, কিন্তু তারা আদালত থেকে জামিন পেয়ে বেরিয়ে গেল।

চেক ও ড্রাফটগুলো কোথায় যায়, কোন ব্যাঙ্কে কার নামে ভাঙায় এটা না জানতে পারলে কিছুই করা যাবে না। তদন্ত এখানে এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল।

মাদারের সঙ্গে আমাদের লোকেরা যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিল, যদি তিনি এব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে পারেন সেই আশায়, কিন্তু তিনি কিছু বলতেই পারছেন না। ক'টা চেক বা ড্রাফট নিখোঁজ হয়ে গেছে, তাও তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। কারা কারা সেগুলো পাঠিয়েছেন তাও তাঁর অজানা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাদারের কাছে তাঁর কাজের জন্য যে দান আসত, কে কখন পাঠাচ্ছেন তা মাদার কীভাবেই বা আমাদের জানাবেন?

কিন্তু সেই জানাটা আমাদের দরকার। আর্তের সেবায়, দুঃস্থের সেবায় যে টাকা আসছে সেটা সেই কর্মযজ্ঞে না যুক্ত হয়ে কার পকেটে গিয়ে ভোগের উপকরণ সাজাচ্ছিল, তা জানতেই হবে। এটা বন্ধ করতেই হবে শুধু নয়, তাদের উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। মানুষের পৃথিবীতে এই কীটেদের বিনা সাজায় ছেড়ে দেওয়া যায় না।

পি.কে. একদিন সকালে মাদারস হাউসে মাদারের সঙ্গে দেখা করতে গেল খবরের আশায়। পি.কে. মাদারের ঘরের সামনের সেই বিখ্যাত কাঠের বেঞ্চিতে বসার পর মাদার কিছুক্ষণ পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে তার কাছে হাজির। মাদারের হাতে একটা কাগজ।

পি.কে. মাদারকে প্রণাম করার পর মাদার আশীর্বাদ করে তার হাতে কাগজটা এগিয়ে দিলেন। পি.কে. দেখল কাগজটা একটা চিঠি, আমেরিকা থেকে এক স্কুলের ছাত্রী মাদারকে চিঠিটা লিখেছে। তাতে সে অভিমান করে লিখেছে যে, "মাদার, আমি আপনাকে এক হাজার ডলার সেবার কাজের জন্য পাঠালাম। অথচ আপনি আমাকে কোনও আশীর্বাদও জানালেন না?"

চিঠিটা পড়ে পি.কে. যা বোঝার বুঝে গেছে, তবু সে মাদারকে জিজ্ঞেস করল "মাদার, এই ড্রাফটা আপনি পাননি নিশ্চয়ই?" মাদার মাথা নেড়ে বললেন, "না।" পি.কে. মাদারকে অনুরোধ করল, "মাদার, তবে একে লিখুন না, তুমি যে ড্রাফটটার কথা লিখেছ, সেটা কোথায়, কোন ব্যাঙ্কে কার নামে ক্যাশ হয়েছে তা তোমার ব্যাঙ্ক থেকে খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাও।" মাদার পি.কে.র কথা শুনে হেসে বললেন, "কি হবে, যা গেছে তা যাক, ওকে আমি ওর চিঠির উত্তর অন্যভাবে দিয়ে দিই।"

পি.কে. জেদের ভঙ্গিতে বলল, "না মাদার, এটা আপনার ব্যাপার শুধু নয়, এটা আমাদেরও জানা দরকার কারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এই জঘন্য পাপ কাজটা তারা কী করে করছিল?"

অনেক জোরাজুরি, অনুরোধের পর মাদার রাজি হলেন যে তিনি পি.কে.র কথা মতোই সেই স্কুল ছাত্রীকে চিঠি লিখে জানতে চাইবেন তাঁর পাঠানো ড্রাফটা কোথায় ভাঙানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী মাদার ছাত্রীটিকে চিঠি লিখে দিলেন।

ইতিমধ্যে ছাত্রীটির মতোই আরও বেশ কিছু চিঠি এল মাদারের কাছে। সেইসব চিঠির লেখকদেরও প্রায় একই ধরনের অনুযোগ। তাঁরা লিখেছেন, তাঁদের পাঠানো টাকার অন্তত

প্রাপ্তিস্বীকারটুকু তাঁরা মাদারের কাছে আশা করেছিলেন, সেটা না পেয়ে তাঁরা খুবই ব্যথিত, কেউ কেউ বা হতাশ।

পি.কে.র মিনতিতে মাদার তাঁদেরও চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন চেক বা ড্রাফট সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাঙ্কে গিয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে তার প্রামাণ্যক তথ্য মাদারকে পাঠান। চারদিকে চিঠি চলে যাওয়ার পর তার উত্তরের অপেক্ষায় চলে গেল দু দুটো মাস।

এই দুটো মাস নিয়মিতভাবে আমাদের দফতর থেকে যোগাযোগ রাখা হতো যে, কোনও উত্তর মাদারের কাছে এসেছে কিনা তা জানার জন্য। দুমাস পর আমেরিকার সেই স্কুল ছাত্রীটির কাছ থেকেই প্রথম উত্তর এল। সে মাদারের কাছে ক্ষমা চেয়ে পরে ড্রাফট সম্বন্ধে লিখেছে যে, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির নামে তার পাঠানো এক হাজার ডলারের ড্রাফটটা ভাঙানো হয়েছে পাকিস্তানের নাম করা ব্যাঙ্ক হাবিব ব্যাঙ্কের সিঙ্গাপুর শাখায় "অমর ব্রাদার্সের" নামে। ড্রাফটের পেছনে "পে টু অমর ব্রাদার্স" অর্থাৎ অমর ব্রাদাসকে ড্রাফটের ডলারটা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাতে মাদারেরই এম. টেরিজা, এম সি, হিসাবে সই আছে। ছাত্রীটি তার ব্যাঙ্ক থেকে সেই প্রামাণ্য কাগজগুলোর ফটো কপিও চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।

যে মাদার সারাজীবন দুঃখী মানুষের সেবায় আত্মমগ্ন, তিনি তো এমন একটা ঘটনায় আশ্চর্য হবেনই। কিন্তু আমরা তো আর আশ্চর্য হব না। আমরা জানি, কিছু কিছু মানুষ আত্মসুখের সন্ধানে কত রকম অপরাধ করতে পারে, কত রকম প্রতারণা, জালিয়াতি সম্ভব। কতটা নিচে নামতে পারে তারা, যে নামার কোনও সীমা পরিসীমা নেই।

মাদারের সইটা যে জাল, তাতে কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঠিক কতগুলো এমন ড্রাফট বা চেক জালিয়াতি করে ভাঙান হয়েছে?

প্রথম উত্তর আসার পর আরও উত্তর পর পর আসতে লাগল মাদারের কাছে। তাতে দেখা গেল, দক্ষিণ চিন সাগরের দক্ষিণ কোলের সিঙ্গাপুরের অমর ব্রাদার্স বাদে ওই দক্ষিণ চিন সাগরের উত্তর বুকের মাঝে হংকং--এর জুড়ি দ্বীপ কাংলঙে "সিল্ক সেন্টার" নামে এক দোকানের অ্যাকাউন্টে একই প্রথায় চেক ও ড্রাফটগুলো ভাঙানো হয়েছে।

এইসব প্রামাণ্য তথ্য ও কাগজপত্র হাতে পাওয়ার মাঝে কমিশনার সোমসাহেবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন বিকাশকলি বসু। আমাদের দফতর থেকে তাঁকে মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে প্রতারণার সম্বন্ধে সব কিছু জানান হলে তিনি এইসব অপরাধের তদন্ত করতে যে সিঙ্গাপুর ও কাওলঙ যাওয়া দরকার তা বুঝলেন। সেই প্রস্তাব রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরে অনুমতির জন্য পাঠালেন তিনি।

স্বরাষ্ট্র দফতরে অনুমতি চেয়ে আবার অপেক্ষা। অনুমতি এল এক মাস পর। কিন্তু রাজ্য সরকারের অনুমতিই যথেষ্ট নয়, বিদেশে তদন্তে যেতে গেলে সেই অনুমতি একটা প্রাথমিক ধাপ, সেটা প্রস্তাবের গুরুত্বের যথার্থতার স্বীকৃতি। আসল অনুমতির দরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ ও সরাষ্ট্র মন্ত্রকের। কারণ তদন্তকারি দলের বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসেব সাহায্যের প্রয়োজন ছাড়াও তদন্তের মূল ছাড়পত্রটা সেখান থেকেই পেতে হবে।

রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি পাওয়ার পর তদন্তের জন্য অনুমতিসহ চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সমস্ত কাগজপত্র নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হল। আবার চুপচাপ বসে থাকা। কারণ সেই ছাড়পত্র না আসা পর্যন্ত আমাদের আর কিছু করার নেই।

এক মাস গেল, দু'মাস, তিন মাস, চার মাস গেল। না, জল গলার কোনও খবর নেই। ইতিমধ্যে কত রকম ছোট বড় মন্ত্রী, তাদের চেলাচামুণ্ডা, দালাল, কত লোক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করতে, বাড়ির বাজার করতে কি বৈঠকখানার ফুলদানি কিনতে যে বিদেশ থেকে ঘুরে এল তার হিসাব নেই। তারা চটপট প্রয়োজনীয় অনুমতি, ভিসা, খরচের জন্য বিদেশী মুদ্রা সব পেয়ে যায়। মাদারের মিশনারিজ অফ চ্যারিটির টাকা কে কোথায় মেরে আত্মসাৎ করল তার খোঁজের এত গুরুত্বের কী আছে? ঘুমাও। যখন সময় হবে, ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি

সেদিন “আমদানিমূলক” কোনও “টপ প্রাওরিটির” কাজ নেই, সেদিন নয়তো আর্ত সেবার নমুনা দেখাতে, দিয়ে দেব ছাড়পত্র!

এল। সেই ছাড়পত্র এল ঠিক এক বছর পর। প্রতীক্ষার অবসানের পর আর সময় নষ্ট করার অর্থ নেই। প্রথমে সিঙ্গাপুর, তারপর কাওলঙের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন মামলার মূল তদন্তকারী অফিসার প্রদ্যুৎ কুমার লাহিড়ী ও তৎকালীন ডিসি ডিডি (টু) গৌতম চক্রবর্তী।

সিঙ্গাপুরে পৌঁছে পি.কে.রা যোগাযোগ করলেন সেখানকার সিআইডির সঙ্গে। সিআইডির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পিকে ও চক্রবর্তী সাহেবের আগমনের কারণ শুনে ও সেই কারণের গুরুত্ব বিচার করে তদন্ত ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্যের জন্য মিঃ নাথন নামে একজন ইন্সপেক্টরকে তাঁদের সঙ্গে দিলেন। মিঃ নাথনের পূর্বপুরুষ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। কিন্তু কয়েক পুরুষ তাঁরা সিঙ্গাপুরে বসবাস করে সিঙ্গাপুরেরই নাগরিক হয়ে যান। নাগরিক হয়ে গেলেও পুরোপুরি খোলস তো আর পাল্টে যায় না। মিঃ নাথনেরও পাল্টে যায়নি। তাঁর আদব কায়দা, আচার ব্যবহারের মধ্যে রয়ে গেছে ভারতীয় ছাপ। তাছাড়া সিঙ্গাপুরের আইন ও তার প্রয়োগের পদ্ধতি আমাদেরই মতো। এটা একটা বাড়তি সুবিধা।

মিঃ নাথনকে “অমর ব্রাদার্স” এর কথা বলা হলে তিনি কম্পিউটারের বোতাম পটাপট চালিয়ে বার করে আনলেন অমর ব্রাদার্স সম্পর্কিত পুরো তথ্য সম্বলিত কাগজ। সেটা ধরিয়ে দিলেন পি.কে.র হাতে।

সিঙ্গাপুর পুলিশের কম্পিউটারে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সংগঠনের সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত তথ্য হাতের কাছেই পাওয়া যায়। এবং সেটা আইন মাফিকই। এমন কি শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক, তাঁর অফিস, কর্মচারীদের তথ্যই নয়, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, ব্যাঙ্কের সর্বশেষ লেনদেনের অবস্থান, আর্থিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সবই মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া যায়।

কম্পিউটারের সেই তথ্য সম্বলিত কাগজে দেখা গেল, অমর ব্রাদার্সের অফিস সিঙ্গাপুরের হাই রোডে। তারা ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্রের কারবারী। তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আমাদের পাওয়া প্রমাণপত্র অনুযায়ী হাবিব ব্যাঙ্কের সিঙ্গাপুর শাখাতেই। সেই কাগজে আরও জানা গেল, অমর ব্রাদার্সের মালিক মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের এবং সে এক সময় ছিল ভারতীয় নাগরিক। তারপর দেশবিভাগের পর “শত্রু” সম্পত্তির অদলবদলের সুযোগ নিয়ে সে চলে যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে। সেখানেও সে স্থায়ী হল না, একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তান যখন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ হল, সে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে স্থায়ী বাসের জন্য চলে গেল সিঙ্গাপুর এবং নিয়ে নিল সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব।

অমর ব্রাদার্সের মোটামুটি একটা ছবি পাওয়া যেতে আর দেরি নয়, .

প্রদ্যুৎ ও চক্রবর্তী সাহেব মিঃ নাথনকে নিয়ে ছুটলেন হাইরোডে অমর ব্রাদার্সের অফিস তল্লাশি করতে। মিঃ নাথনই আমাদের দলের পথপ্রদর্শক ও সেই দেশের আইন সম্পর্কে নির্দেশক। মাদারের টাকা এইভাবে প্রতারণা হওয়াতে তিনি ভীষণ মর্মাহত এবং দোষীকে গ্রেফতারের জন্য খুবই সচেষ্ট।

হাই রোডে অমর ব্রাদার্সের বেশ বড় অফিসে গিয়ে দেখা গেল সেটা শুধু অফিসই নয়, দোকানও বটে। সেখানে গিয়ে পিকেদের পরামর্শ অনুযায়ী মিঃ নাথন অমর ব্রাদার্সের মালিককে তার ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাতে বললেন। মালিক ব্যবসার খাতা ও অন্যান্য কাগজ দেখাতে দেখা গেল, তার ব্যবসার রপ্তানির দিকটা মূলত মধ্য এশিয়া নির্ভর, অথচ টাকা এসেছে বেশি আমেরিকা থেকে।

যখন মিঃ নাথন ও পি.কে.রা তল্লাশি, কাগজপত্র পরীক্ষা এবং মালিক ও তার এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, সেসময় দুজন লোক দোকানের বাইরে এসে মালিকের খোঁজ করল। তাদের দেখে পিকের মনে হল তারা বাংলাদেশের লোক। তার কেমন সন্দেহ হল, সে সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় এবং সেই ভাষার টানটা অবিকল গলার

স্বরে ফুটিয়ে তুলে বলল, “আপনারা বাংলাদেশ থ্যাইকা আইছেন না কি?”

একজন বলে উঠল, “হ, তো মিয়াঁ কই?” পিকে বুঝে গেছে ওরা মালিকের কথা জিজ্ঞেস করছে, সে বলল, “আছে, ভিতরে আসেন।” তারা পিকের আমন্ত্রণে মহানন্দে দোকানে ঢুকতেই পি.কে. খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, “দেখি, কি আনছেন?”

তারা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সে একজনের হাতের ফোলিও ব্যাগটা টেনে নিয়ে সেটা খুলে ফেলল। মিঃ নাথন, চক্রবর্তীসাহেব, মালিক ও তার কর্মচারী সবাই ফোলিওর ভেতর থেকে কি বার হবে সেটা দেখার জন্য পি.কে.র হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যাঁ, সেই ব্যাগ থেকে বার হল মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে পাঠানো দশখানা চেক ও ড্রাফট। আর কি সন্দেহ আছে? মিঃ নাথন আর অপেক্ষা না করে বাংলাদেশী দুজন এবং অমর ব্রাদার্সের মালিক ও তার এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করে তাদের নিয়ে চলল স্থানীয় এক পুলিশ দফতরে। সেখানে আসামী চারজনকে রেখে তারা তিনজন ছুটল হাবিব ব্যাঙ্কে অমর ব্রাদার্সের অ্যাকাউন্টের হাল হকিকৎ পরীক্ষা করতে।

হাবিব ব্যাঙ্কের সিঙ্গাপুর শাখায় গিয়ে মিঃ নাথন অমর ব্রাদার্সের অ্যাকাউন্টের পূর্ণ বিবরণ চাইলে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা চট করে কম্পিউটার চালিয়ে কাগজ দিয়ে দিলেন। সেই বিবরণে দেখা গেল, অমর ব্রাদার্সের ব্যবসা যদিও মধ্য এশিয়া নির্ভর, কিন্তু সেখান থেকে খুব কম সময়ই টাকা এসেছে এবং সেই টাকার পরিমাণও কম। অন্যদিকে বেশি টাকা এসেছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থেকে। এবং সেইসব অংকের পরিমাপও বেশ বড় বড়। সেই কাগজ থেকে জানা গেল, ওইসব ডলার জমা পড়েছে সবই মাদারের চেক ও ড্রাফট থেকে। পিকেরা সেই অংক যোগ করে দেখল, অমর ব্রাদার্স মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মোট আঠারো লক্ষ ডলার আত্মসাৎ করেছে। ব্যাঙ্কের দেওয়া সেই অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিয়ে পিকেরা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল।

এবার অন্য সমস্যা। আসামী চারজনকে তো গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রামাণ্য দলিলও হস্তগত হয়েছে। মামলা করে তাদের শাস্তি দেওয়ার সব কিছুই মজুত। কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে, আমাদের দেশের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের তখন কোনও বন্দি প্রত্যর্পণের চুক্তি ছিল না। অর্থাৎ ওই বন্দিদের আমাদের দেশে এনে বিচার করে দণ্ড দেওয়ার উপায় নেই।

কী করা যাবে? তাদের তো আবার ছেড়ে দেওয়া যায় না। এতবড় একটা অপরাধ করে শুধুমাত্র একটা আন্তর্জাতিক আইনের ফাঁকে তারা বেঁচে যাবে, এটা সহ্য করা যায় না। বুদ্ধিটা দিলেন মিঃ নাথনই। তিনি পি.কে.দের বললেন, ওই বন্দিদের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরের পুলিশের কাছে একটা প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করতে, তখন সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মিঃ নাথন বন্দিদের দায়িত্বও নিতে পারবেন এবং তাদের আদালতেও অভিযুক্ত করে মামলা করতে পারবেন।

উপায়ান্তর না দেখে, মিঃ নাথনের পরামর্শ অনুযায়ী পি.কে. স্থানীয় পুলিশের কাছে অমর ব্রাদার্সের মালিক, তার এক কর্মচারী ও ধৃত দুই বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মিঃ নাথন ওই বন্দি চারজনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

সিঙ্গাপুরে আরও তিন দিন গৌতম চক্রবর্তী ও পি.কে. কাটালেন এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়ে। তারপর তাঁরা কাওলঙের উদ্দেশে হংকংয়ের বিমান ধরে হংকংয়ে নামলেন। তখনও হংকং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ, পুলিশ কর্তাব্যক্তিরা প্রায় সবাই ব্রিটিশ কিংবা তাদের অনুগত।

পিকেরা হংকংয়ে গিয়ে কি কারণে তাদের আসা সেটা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানালেন। ঠিক সেই সময়ে লন্ডন থেকে ব্রিটিশ পুলিশের একটা তদন্তকারী দল একটা মামলার সূত্রে হংকংয়ে এসেছে। কর্তৃপক্ষ লন্ডনের দলটির সঙ্গে তাদের তদন্তে সাহায্যের জন্য বেশ বড় এবং উঁচুপদের অফিসারদের দলকে দিলেন আর মাদারের টাকা আত্মসাৎকারী অপরাধীকে

গ্রেফতারের জন্য পিকেদের সাহায্যে দিলেন একজন নিচুস্তরের সাধারণ কর্মচারীকে। কি আর করা যাবে, পিকেরা তো আর বলতে পারেন না, "আমাদের একজন দক্ষ অফিসার দিন, যিনি প্রকৃতপক্ষেই আমাদের কাজে সাহায্য করতে পারেন।"

সেই পুলিশ কর্মচারীটিকে সঙ্গে নিয়ে পি.কে.রা পৌঁছল কাওলঙ। দিন দুইয়ের মধ্যেই তারা খুঁজে পেল "সিল্ক সেন্টার" নামে প্রতিষ্ঠানটি। সেটা একটা ছোট্ট দোকান, অ্যাম্বাসাডর হোটেলের নিচে প্রবেশ পথের ধারে সেই দোকানে যখন পি.কে. পৌঁছল, তখন দুপুরবেলা। দেখল, দোকানে পণ্যসামগ্রী বলতে কিছু শাড়ি, জামাকাপড়। যা আছে তা বিক্রি করে এমন কোনও অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা নেই, যা দিয়ে হংকংয়ের মতো দেশে জীবনধারণ সহজ। অথচ দোকানে যে সুন্দরী সিন্ধ্রি মহিলাটি বসে আছেন, তাঁর প্রসাধন ও সাজসজ্জার বহর থেকে ঠিকরে বার হচ্ছে যে জৌলুশ, তা উচ্চবিত্তের অর্থগরিমার কিরণ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

হংকংয়ের পুলিশ কর্মচারীর মাধ্যমে পি.কে.রা সেই সিন্ধ্রি মহিলার কাছে দোকানের হিসাবের খাতাপত্র ও ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট দেখতে চাইলে তিনি দেখাতে অস্বীকার করে বললেন, "আমার স্বামী আসুন তিনিই আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন।"

পিকেরা আর কি করবেন, তাঁরা মালিকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আধঘণ্টার মধ্যে সিন্ধ্রি মহিলার স্বামী, যে ওই "সিল্ক সেন্টারের" মালিক, তিনি এসে উপস্থিত। তাঁর কাছেও একই দাবি করলে তিনি পরিষ্কার বললেন, "আপনাদের কাছে এমন কোনও আদালতের নির্দেশ আছে কি যে আপনারা আমাদের খাতাপত্র দেখতে চাইছেন?"

নেই। তেমন কোনও নির্দেশ নেই। পি.কে.দের বাধ্য হয়ে ওই ভারতীয় বংশোদ্ভব হংকং নিবাসী সিন্ধ্রির দোকান থেকে চলে আসতে হল। তাঁরা এরপর খোঁজ করে জানলেন, হংকংয়ের আইন অনুযায়ী কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জানতে হলে দরকার সেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের অনুমতিপত্র। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ এব্যাপারে কোনও সাহায্যই করল না। ফলে "অমর ব্রাদার্সের" মতো কিন্তু "সিল্ক সেন্টারের" ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখা হল না। তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তাঁদের ব্যর্থতার ফলে জানা গেল না "সিল্ক সেন্টারের" মালিক "মিশনারিজ অফ চ্যারিটির" আর্তের সেবার জন্য আসা অর্থ কতটা আত্মসাৎ করে নিজের স্ত্রীর প্রসাধনের সেবায় নিয়োগ করেছে।

হংকং থেকে পি.কে.রা কলকাতায় ফিরে এলেন। পি.কে. মাদারস হাউসে গিয়ে মাদারের সঙ্গে দেখা করে জানালেন, সিঙ্গাপুরে প্রতারণার জন্য চারজন আসামীকে গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন। মাদার পি.কে.র সব কথা শুনে প্রশ্ন করলেন, "ওই লোকগুলো কি বিবাহিত?" পি.কে. বললেন, "হ্যাঁ।" মাদারকে তখন চিন্তান্বিত দেখাল, তিনি তখন জানতে চাইলেন, "ওদের নিশ্চয়ই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে।" মাদারের প্রশ্ন শুনে পি.কে. আর কি বলবেন? তিনি বললেন, "বোধহয় আছে।" মাদার খুবই উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, "ওদের তাহলে কি হবে?"

এর কি উত্তর তা পিকের জানা নেই। তিনি চুপ করে রইলেন। তিনি মাদারের চোখের দিকে তাকাতে পারলেন না। প্রণাম করে মাদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লালবাজারে ফিরে এলেন।

সাতাশির ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। দিন, মাস, বছর ঘুরে গেল। সিঙ্গাপুরের বন্দিদের শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হল তা জানা গেল না। যখন 'আমরা সবাই ধরে নিয়েছি, ওই ব্যাপারে আর কোনও খবরের আশা নেই, তখন উননব্বই সালের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক তদন্তকারী সংস্থা ইন্টারপোলের মাধ্যমে পি.কে.র কাছে সিঙ্গাপুর আদালতের সমন এল ওই প্রতারণার মামলায় সাক্ষী দেওয়ার জন্য। পি.কে. সাক্ষী দেওয়ার জন্য সিঙ্গাপুরে উড়ে গেলেন, এবার তাঁর সঙ্গী হলেন তখনকার এসি ডিডি সুজিত গুপ্ত।

পি.কে.র সাক্ষ্য শুনে ও সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা নথিপত্র দেখে সিঙ্গাপুরের আদালত ধৃত

চারজনকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন, কাউকে সাতবছরের জন্য, কাউকে বা আটবছরের জন্য।

পি.কে. কলকাতায় ফিরে এসে আবার মাদারস হাউসে গিয়ে মাদারকে ওই চার বন্দির সাজা হওয়ার খবর শোনালেন। মাদার পিকের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!"

মাদার প্রতারকদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হতে পারেন, কিন্তু প্রতারকরা মিশনারিজ অফ চ্যারিটির টাকা আত্মসাৎ করার সময় একবারও মাদারের আশ্রয়ে থাকা দুঃস্থ দরিদ্র লোকগুলোর কথা ভাবেনি। ঠিক তেমনি আমরা, পুলিশেরাও প্রতারকদের সাজা দেওয়ার সময় তাদের পরিবার পরিজনের কথা মাথায় রাখতে পারি না, কারণ, সেই দয়া দেখাতে গেলে পৃথিবীতে কোনও অপরাধীকেই সাজা দেওয়া যাবে না। আইনের চৌহদ্দির বাইরে আমরা কাউকেই দয়া মায়া দেখাতে পারব না।

মাদার ছিলেন সন্ন্যাসিনী, দয়ার সাগর। তাঁর চোখে পৃথিবীকে যদি সবাই দেখত, তাহলে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। না হতো বিপ্লব, না প্রতিবিপ্লব, না হতো খুন, ডাকাতি, রাহাজানি। | মাদারের তুলনা মাদারই, যুগের যতই পরিবর্তন হোক, মাদার তো আর হারিয়ে যাওয়ার নয়। যুগ আসে, যুগ চলে যায়। একটা যুগের থেকে অন্য যুগে উত্তোলনের সন্ধিক্ষণে আসে কত রকমের ঝড় ঝাপটা, মনে হয় পৃথিবীর বুকে নতুন যুগের জন্মের সেও এক গর্ভযন্ত্রণা।

পশ্চিমবঙ্গকে ষাট-সত্তরের দশকে সেরকম যন্ত্রণা কিছুটা সহ্য করতে হয়েছে। সেই যন্ত্রণা এসেছে বিভিন্ন পথ ধরে। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের গণ উত্তাল চেহারাটা রূপ পেল সাতষট্টির প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের চোরাবালিতে। যে চোরাবালির গহ্বরে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দেখা নতুন স্বপ্ন। সেই হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের মাঝ থেকে জো উঠল আর একটা বিস্ময়, আর একটা স্বপ্ন। সেই জোয়ার এল উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল নকশালবাড়ি থেকে।

যুগযন্ত্রণার সেই সন্ধিকালে সংকটের দোদুল্যমানতায় মানুষ যখন বিভ্রান্ত, তখন আটষট্টি সালের পয়লা জুলাই সকাল ন'টা নাগাদ পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের পুবদিকের গলির ভেতর পোস্টাল ভ্যান থেকে প্রায় চার লাখ টাকা ডাকাতি হয়ে গেল। ডাকাতি করার পর ডাকাতরা একটা কালো ল্যান্ডমাস্টার গাড়িতে চড়ে ক্যামাক স্ট্রিট ধরে উধাও।

এই ডাকাতির রহস্যের জট ছাড়াতে আমরা যখন প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত এবং কোন কূলকিনারা না পেয়ে আমরা সমস্যার গভীরে, তখন বাইশে অক্টোবর সকাল এগারটা নাগাদ সদর স্ট্রিটে লিটন হোটেলের সামনে ক্যালকাটা সিগারেট সাপ্লাই কোম্পানির এর লক্ষাধিক টাকা ডাকাতি হয়ে গেল।

ডাকাতি হওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে জানতে পারলাম, ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেটের ডিস্ট্রিবিউটর তাদের সদর স্ট্রিটের অফিস থেকে প্রতি "ব্যাঙ্ক ডে"তে সিগারেট বিক্রির জমা টাকা নিয়ে নেতাজী সুভাষ রোডে ইস্টার্ন ব্যাঙ্কে জমা দিতে যায়। সেদিনও যাচ্ছিল।

সেদিন একটা ট্যাক্সিতে ওই কোম্পানির কর্মী প্রদ্যুৎবাবু, মদনলাল, বানোয়ারলাল, সম্পতলাল যাচ্ছিল ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে। ট্যাক্সি যখন সবে চলতে শুরু করেছে, তখন হঠাৎ পেছন থেকে একটা কালো অ্যাম্বাসাডর

গাড়ি তাদের টপকে ট্যাক্সির পথ আটকায়, তারপর ওই গাড়ি থেকে পাঁচ ছ'জন ডাকাত স্টেনগান, রিভলবার নিয়ে তাদের ঘিরে ধরে তাদের কাপড়ের থলিতে রাখা টাকা নিয়ে ওই কালো গাড়িতে চড়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে চলে যায়।

বানোয়ারলাল ডাকাতদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়েছে, তার দু পায়েই গুলি লেগেছে। এবং তাকে দ্রুত ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। পালানোর সময় ডাকাতরা পথচারী ও অন্যান্য লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করতে আকাশের দিকে স্টেনগানের মুখ করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। ডাকাতদের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তাদের পরণে ছিল, জামা ও ট্রাউজার্স। ব্যস, এ পর্যন্তই প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানতে পারা গেল।

পার্ক স্টিট পোস্ট অফিসের ভেতর পোস্টাল ভ্যানের ডাকাতির কোনও কিনারা হওয়ার আগেই আবার দিনদুপুরে একটা ডাকাতি হওয়াতে কলকাতা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল দারুণ চাঞ্চল্য। দৈনিক পত্রিকাগুলো আমাদের তুলোধোনা করতে শুরু করেছে। আমাদের গোয়েন্দা দফতরেও সবাই বিশ্রামহীন।

আমাদের ডাকাতি দমন শাখা পোস্ট অফিসের ডাকাতি নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায়

কমিশনার সাহেবের নির্দেশে সদর স্ট্রিটের ডাকাতির তদন্তের ভার দেওয়া হল ইন্সপেক্টর শম্ভু দাস সরকারের নেতৃত্বে মার্ডার সেকশনকে। শম্ভু দাস সরকারের অধীনে তখন তরুণ এক ঝাঁক অফিসার শুরু করল সদর স্ট্রিট ডাকাতির তদন্ত। আমিও সেই ঝাঁকের অন্যতম সদস্য।

তদন্তকারী অফিসার হিসাবে কেমন ছিলেন শম্ভু দাস সরকার? এক কথায় তা ব্যাখ্যা করা যাবে না। তবে বলতে পারি, কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যদি প্রথম দশজন শ্রেষ্ঠ তদন্তকারী অফিসারের নাম বলা যায়, তবে তার মধ্যে শম্ভু দাস সরকারের নাম থাকবেই।

পঞ্চাশের দশকের একেবারে শেষ দিকে মুচিপাড়া থানা এলাকায় এক বাড়িতে রাতের অন্ধকারে বাড়ির মালিক ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে পেটে ছুরির আঘাতে খুন হয়ে গেলেন। যে ঘরে নিহত ব্যক্তি থাকতেন, সেই ঘরের লাগোয়া একটা বারান্দা ছিল আর ওই বারান্দায় ঘুমাত একটা প্রতিবন্ধি ছেলে। তার পা দু'টো ছিল অথর্ব, সরু, কোনও জোর ছিল না, সে দেওয়াল ধরে বা অন্য কিছুকে অবলম্বন করে হাঁটত। মুচিপাড়া থানা থেকে অফিসার পূর্ণানেন্দু চট্টোপাধ্যায় গেলেন তদন্ত করতে। সেই বাড়ির ও অন্যান্য লোকদের জবানবন্দি নিয়ে ও আশেপাশের পরিস্থিতি সরেজমিন দেখে খুনি হিসাবে সন্দেহের তীর ওই প্রতিবন্ধি ছেলেটার দিকে গেলে পূর্ণানেন্দু চট্টোপাধ্যায় তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন।

আমিও তখন মুচিপাড়া থানায়। আমরা প্রত্যেকেই প্রতিবন্ধি ছেলেটাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই ছেলেটা কী করে ওই লোকটার বুকে, পেটে ছুরির পর ছুরি ঢুকিয়ে খুন করতে পারে? অথচ পরিস্থিতির বিচারে সম্ভাব্য খুনি হিসাবে অন্য কোনও লোককেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ভাবনাটা অন্যখানে, তা হল, আদালতে বিচারক কি মানবেন যে ওই ছেলেটাই খুনি?

ভাবনার এই স্তরে গোয়েন্দা দফতর থেকে তদন্তের সাহায্যের জন্য মুচিপাড়া থানায় এলেন শম্ভু দাস সরকার। তিনি পূর্ণানেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর বললেন, "পূর্ণানেন্দু, তুমি যেভাবে ভাবছ, তাতে মামলা দাঁড়াচ্ছে না, আসামি খালাস হয়ে যাবে, ব্যাপারটা অন্যভাবে সাজাতে হবে।" পূর্ণানেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করলেন, "কীভাবে?" বলিষ্ঠ চেহারার শম্ভুবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো, আগে ওই বাড়িটা দেখে আসি।" শম্ভুবাবু গেলেন সেই বাড়িতে খুনের স্থান ও আশেপাশের জায়গা দেখতে। সেখানে গিয়ে তিনি তদন্ত শুরু করলেন একেবারে অন্যভাবে।

তিনি বাড়ির পুরোটা সবাইকে নিয়ে ঘুরে দেখলেন। ঘর, বারান্দা সব কিছু দেখা শেষ করে তিনি বাড়ির বাসিন্দা ও আশেপাশের প্রতিবেশিদের সঙ্গে আলাপের ঢঙে খোশগল্প করতে করতে টুকটাক প্রশ্ন করে যখন নিহত ব্যক্তি, তার সম্ভাব্য শত্রু ও প্রতিবন্ধি ছেলেটা সম্পর্কে জেনে নিচ্ছেন, তখন হঠাৎ একজন শম্ভুবাবুকে জানালেন, ওই বাড়ির পেয়ারা গাছে, আম গাছে, প্রতিবন্ধি ছেলেটা নিজে একাই উঠে পড়ে ফল পেড়ে খেত। আর সেই নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রতিদিনই ঝামেলা হত। শম্ভুবাবু এই কথাটা শুনে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পূর্ণানেন্দুবাবুকে বললেন, "কিছু বুঝলে?" উত্তরে তিনি বললেন, "কিছুটা আন্দাজ করেছি।"

"হ্যাঁ, ওই আন্দাজটাকেই ঠিক মতো প্রমাণ করতে হবে, চলো প্রফেসর এস কে রায়ের সঙ্গে দেখা করি।" শম্ভুবাবু এই কথা বলে, গাড়ি ঘুরিয়ে দিলেন মেডিকেল কলেজের দিকে। দেখা করলেন, তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রায়ের সঙ্গে। সব শুনে ডাক্তার রায় শম্ভুবাবুকে পরদিন আসতে বললেন।

পরদিন ঠিক সময়ে শম্ভু দাস সরকার ও পূর্ণানেন্দু চট্টোপাধ্যায় আসামি প্রতিবন্ধি ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন ডাক্তার রায়ের কাছে। ডাক্তার রায় প্রতিবন্ধি ছেলেটিকে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। পরীক্ষার জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, ছেলেটার হাতে এমন জোর আছে কিনা, যাতে সে একটা লোকের বুকে, পেটে পরপর ছুরি ঢোকাতে পারে। ডাক্তার রায়

ছেলেটিকে নিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর তাকে চেম্বারের বাইরে কনস্টেবলদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে শম্ভুবাবুকে বললেন, ছেলেটার হাতে ভালই জোর আছে, শরীরের মূল শক্তিটাই ওর হাতে। তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে একটাই জবাব, হ্যাঁ, অনায়াসেই পারে।” শম্ভুবাবু বললেন, “তবে সেটা লিখে দিন স্যার, চার্জশিটের সময় কাজে লাগবে।” ডাক্তার রায় লিখে দিলে তাঁরা সেই রিপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে -এলেন।

ডাক্তার রায়ের ওই রিপোর্ট ও সাক্ষ্যের জন্যই সেই প্রতিবন্ধি ছেলেটির খুনের দায়ে যাবজ্জীবন দণ্ড হয়ে গেল। নয়তো ওই ছেলেটির সাজা হতো কিনা সন্দেহ। ভাল কোচের যেমন ম্যাচ রিডিং ক্ষমতা ভাল থাকে, শম্ভু দাস সরকারেরও তেমন অনুসন্ধানের চোখ ও প্রখর বুদ্ধি ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর অধীনে যেসব অফিসার কাজ করতেন, তাঁদেরও তিনি শেখাতেন। আমাদের তিনি প্রফেসর এস কে রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন ফরেনসিকের বিষয়ে জানবার জন্য। ডাক্তার রায় মর্গে মৃতদেহ কাঁটাছেঁড়া করে আমাদের দেখিয়ে দিতেন মৃত্যুর কারণগুলি কী। তাছাড়া তাঁর কাছ থেকেই আমরা শিখেছিলাম, কী কী চিহ্ন দেখলে মৃত্যুর আপাত কারণগুলো প্রাথমিকভাবে বোঝা যায়। ডাক্তার রায়ের কাছে ওই শিক্ষালাভ আমাদের পরবর্তী বহু তদন্তে দারুণভাবে কাজে লেগেছে। বিশেষ করে সেই বাঙালি অভিযাত্রীর মৃত্যুরহস্য উদঘাটনের সময়, যে দক্ষিণেশ্বরের কাছে গঙ্গাবক্ষে নতুন অভিযানের প্রস্তুতির প্রাকমুহূর্তে দুই বন্ধু ও এক বান্ধবী ও প্রেমিকার উপস্থিতিতে নৌকা উল্টে মারা গিয়েছিল।

সেই শম্ভু দাস সরকারের অধীনে আমরা শুরু করলাম সদর স্ট্রিট ডাকাতির তদন্ত। বাইশে অক্টোবর ডাকাতি হওয়ার দুদিন পর অফিসার আশিস মুখোপাধ্যায় একটা খবর আনলেন যে, বড়বাজারের আদি বাঁশতলায় এক ছোট্ট সোনার দোকানের মালিক মহাবীর সোনার মাসখানেক আগে ইস্টার্ন ব্যাঙ্কের কর্মচারী জগমোহন পাঠকের সঙ্গে বি কে পাল অ্যাভিনিউর কমলা নামে এক বারবণিতার ঘরে বসে সিগারেট সংবরাহকারী কোম্পানির টাকা লুঠ করার পরিকল্পনা করেছিল। তারা দুজনেই সেই বারবণিতার ঘরে যেত এবং সেখানেই তারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়।

পরদিনই মহাবীর ও জগমোহনকে গ্রেফতার করে আনা হল। তারা দুজনেই স্বীকার করল যে তারা তেমন একটা পরিকল্পনা করে বড়বাজারের পুরনো ডাকাত গাসিয়া মহারাজকে বলেছিল ডাকাতিটা করার জন্য। কিন্তু গাসিয়া পুরো অনুসন্ধান করে সেই পরিকল্পনা তার দ্বারা কার্যকর করা সম্ভব না বলে নাকচ করে দেয়। তার বেশি তারা দুজন আর কিছুই জানে না। এরপর ধরে নিয়ে আসা হল ওই সিগারেট কোম্পানির কর্মচারী মহঃ সুলেমানকে, কিন্তু তার থেকেও কোনও নতুন কিছুই জানা গেল না।

বিপদের মধ্যে আবার নতুন উৎপাত। আঠাশ তারিখ সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ যখন আমাদের দফতর প্রায় ফাঁকা, সে সময় কনস্টবল সিদ্ধেশ্বর চৌধুরি জগমোহন পাঠককে নিয়ে দফতরের শৌচাগারে গেল। জগমোহন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মিনিট পনেরো পরে যখন জগমোহন দরজা খুলছে না, তখন সিদ্ধেশ্বর দরজায় ধাক্কা দিয়ে জগমোহনকে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে সে দরজাটা জোর করে খুলে দেখে ভেতরে কেউ নেই। ফাঁকা। সে দেখল, শৌচাগারের ওপরের পুরনো জং ধরা, দুর্বল জানালাটা ভাঙা, অর্থাৎ জগমোহন সেখান দিয়ে গলে পেছনের পাইপ বেয়ে রাধাবাজার স্ট্রিটে নেমে পালিয়েছে।

জগমোহনের পালানোর দরকার হতো না, কারণ তার ও মহাবীরের বাড়ি, কমলার বাড়ি ও অন্যান্য জায়গা তল্লাশি করে এবং ওদের কথাবার্তায় এমন কিছু প্রকাশ হয়নি যে, তারা কোনওভাবে ওই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত তা প্রমাণিত হয়। ফলে ওকে আমাদের এমনিতেই ছেড়ে দিতে হতো, কিন্তু সে পালাল আমাদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে। ওই সময় পরপর ডাকাতি হয়ে যাওয়ার ফলে এবং কোনও ডাকাতির কিনারা করার কোনও রকম সূত্র না পেয়ে আমাদের দফতরের অফিসাররা এমন হয়ে গিয়েছিল যে কোনও সূত্রের জন্য

আসামিকে গ্রেফতার করে আনলেই তাকে মোচড় দিয়ে কথা বার করার চেষ্টা করত। জগমোহনকে কিন্তু তেমন কিছুই করা হয়নি। তবু করা হতে পারে, এই আগাম চিন্তায় সে আতঙ্কে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তিনতলা থেকে পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যায়। এবার কিন্তু পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়ে সে একটা অপরাধ করে বসল। যে অপরাধের জন্য তার আদালতে সাজা হতে পারে। অথচ যে অপরাধের আসামি সন্দেহে তাকে ধরা হয়েছিল, সেই অপরাধ সে করেনি। জগমোহন পালাতে পত্রিকাগুলোর আরও সুবিধা হল আমাদের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করার।

জগমোহন পালানোর পরদিন সমস্ত পত্রিকাগুলোতে যখন আমাদের আদ্যশ্রাদ্ধ

করে মন্তব্য বেরিয়েছে, তার আগেই কিন্তু আমরা সদর স্ট্রিটে ডাকাতির এক মূল আসামিকে জালে তুলে এনে লালবাজারের গোলায় পুরে দিয়েছি, যে খবর সাংবাদিকরা পাননি।

তখন আমরা প্রচার মাধ্যমকে খুব সতর্কভাবে, বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে ব্যবহার করতাম। একটা আসামিকে গ্রেফতার করে এনেই নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য সাংবাদিক ডেকে এনে চা জলখাবার খাইয়ে খবর পরিবেশন করতাম না। তার প্রধান ও প্রথম কারণ, একটা আসামিকে গ্রেফতার করলেই তো কাজ ফুরিয়ে যায় না, তার সঙ্গী সাথীদেরও গ্রেফতার করতে হয়, ষড়যন্ত্রের নেপথ্য কাহিনীকে চোখের সামনে ছায়াছবির মতো মেলে ধরতে হয়। সেটা করতে হলে প্রচার মাধ্যমকে কিছুটা এড়িয়ে চলতেই হবে, যাতে ধৃত আসামির সঙ্গীরা সতর্ক হয়ে যেতে না পারে।

নব্বইয়ের দশকে এসে গোপনীয়তার এই কৌশল ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে গেছে। এখন কলকাতা পুলিশ, বিশেষ করে গোয়েন্দা দফতর তার কার্যদক্ষতা হারাতে হারাতে তলানিরও তলায় চলে যাওয়াতে, তারা জনসাধারণকে বোকা বানাতে গিয়ে, নিজেদের ‘কৃতিত্বকে’ প্রচারের আলোয় এনে ফেলে সমস্ত কর্মপদ্ধতিকেই ঢক্কানিনাদে পরিণত করে ফেলেছে। তাই দেখি, মীরা চট্টোপাধ্যায়ের মতো এক সামান্য প্রতারককে গ্রেফতার করলে পত্রপত্রিকায় বিরাট করে খবর দেওয়া হয়, যে মীরাকে আমরা একটা কনস্টেবলকে দিয়ে লালবাজারে ডেকে পাঠাতাম। আসলে, “আমরা আছি, আমাদের অস্তিত্ব লালবাজারে আছে, আমরা ঘুমিয়ে নেই” এটা জনসাধারণকে জানানোর তাগিদেই সাংবাদিক ডেকে মীরার খবর জানানোর পেছনের হাস্যকর পরিকল্পনা।

আঠাশ তারিখ সকালে যেদিন জগমোহন পালালো, সেদিনই বিকেলবেলা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সদর স্ট্রিট ডাকাতি সম্পর্কে একটা খবর আনলেন। মনাদা খবরটা পেয়েছে, তাঁর সোর্সের মাধ্যমে, যে সোর্স মধ্য কলকাতার এক জুয়ার বোর্ড চালাত। সেই খবরে আরও চমক ছিল। ওই ডাকাত দল ওই সদর স্ট্রিটেই একই কোম্পানির টাকা ঠিক তিনদিন আগে ডাকাতি করতে এসেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তারপর মাঝখানে কালীপুজো থাকায় ওই সিগারেট সরবরাহকারী কোম্পানি বন্ধ ছিল, ফলে তাদের টাকা লেনদেনও বন্ধ ছিল, তাই ডাকাতেরা তিনদিন অপেক্ষা করে বাইশে অক্টোবর ডাকাতি করেছে।

মনাদা যে খবর বিকেলবেলা আনলেন, তাকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিনই রাত দুটো নাগাদ আমাদের এক বিরাট দল মনাদার নেতৃত্বে তিনটে গাড়ি নিয়ে ছুটল যাদবপুরের দিকে। লক্ষ্যস্থল সন্তোষপুরের চৌধুরি বাগানের ভেতর বিধান কলোনির একটা বাড়ি। যে বাড়িতে সদর স্ট্রিট ডাকাতির এক আসামি থাকে। সঙ্গে জুয়ার বোর্ডের সেই সোর্স আছে। সে বাড়ি চিনিয়ে দেবে, নয়তো সন্তোষপুরের কলোনি এলাকায় ঘন বসতিতে অত রাত্রে বাড়ি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে ধৃত আসামি জানবেই না কে তার বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে গেল। তাকে সন্তর্পণে আলাদা লুকিয়ে রাখা হবে।

বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি রেখে আমাদের দল বিধান কলোনির একটা গলির ভেতর সেই বাড়িটা ঘিরে ফেলল। কলোনির কুকুরগুলো অসম্ভব চিৎকার করছে। তাছাড়া সব নিস্তব্ধ।

বাড়ির ভেতর সবাই ঘুমাচ্ছে। তখন রাত সাড়ে তিনটে। মনাদাই সদর দরজায় কড়া নাড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ নাড়ার পর ভেতর থেকে ঘুম জড়ানো গলায় একটা পুরুষ কণ্ঠ প্রশ্ন করল, "কে?"

মনাদা সোজাসুজি বললেন, "দরজাটা খোলেন, আমরা লালবাজার থেকে আইছি।" পুরুষ কণ্ঠের মালিক কী বুঝল বোঝা গেল না। দরজাটা খুলে গেল। সামনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। মনাদা তাকেই বললেন, "আপনার পোলার নাম তো রতন?" ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু কেন?" মনাদা ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "তারে ডাকেন।" ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, "কিন্তু সে তো এখন ঘুমাচ্ছে।" মনাদা একটা সিগারেট ধরিয়ে উত্তর দিলেন, "আর ঘুমাইয়া কাম নাই, এখন ক'দিন লালবাজারে গিয়া ঘুমাইবো।"

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মাঝারি উচ্চতার শ্যামলা রঙের গোলগাল চেহারার সুন্দর করে গোঁফ ছাটা রতন রায়কে ঘুম থেকে তুলে গ্রেফতার করা হল। প্রতিবেশি দিগ্বিজয় দত্ত ও নলিনীবাবুকে সাক্ষী রেখে রতনের থেকে যা পাওয়া গেল, তা বাজেয়াপ্ত করে আমাদের দল যখন লালবাজারে ফিরল, তখনও সূর্যের পুব দিকে উঁকি দিতে ঘণ্টাখানেক দেরি। তবে কার্তিক মাসের ভোরের হাওয়া শীতের আগমনী বার্তা বয়ে আনছে।

উনত্রিশ অক্টোবরের সেই ভোরবেলায় আমাদের মনে কিন্তু শীত অনুভূত হচ্ছে না। দারুণ উত্তেজনা, কারণ মনে হল এই প্রথম সদর স্ট্রিটের ডাকাতির সত্যিকারের অপরাধী ধরেছি। সেই জুয়াড়ি সোর্স শুধু রতনের খবরই দেয়নি, সে আরও খবর দিয়েছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে আমাদের অন্য এক দল চলে গিয়েছিল উইলিয়ামস লেনে, সেখানে চারের এ বাড়ি থেকে সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে গ্রেফতার করে আনল অরবিন্দ চৌধুরি ওরফে মন্টুকে। বছর তিরিশের মন্টু দেখতে বেশ সুন্দর, লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী, সে আবার রানী রাসমণির বাড়ির জামাই।

মনাদার সোর্সকে লালবাজারের অন্যখানে রাখা হয়েছে, যাতে রতন কিংবা মন্টু তাকে দেখতে না পায়। তাকে আরও একজনকে চেনানোর জন্য দরকার। সকাল ন'টা নাগাদ মনাদা ও সোর্স নিয়ে সাদা পোশাকে ছুটলাম মধ্য কলকাতার রমানাথ বিশ্বাস লেনের দিকে। পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলা হল। আমরা একজন কিংবা দুজনে মিলে দাঁড়িয়ে আছি বা পথচারীর মতো গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেন কারও হাতে কোনও কাজ নেই, অখণ্ড সময়। মনাদা ও সোর্স একটা গাড়ির ভেতর থেকে সমস্ত লোকজনের আসা যাওয়ার ওপর নজর রাখছে। রমানাথ বিশ্বাস লেনে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে এগারটার মধ্যে ব্যারাকপুরের কালিয়ানিবাস কলোনি থেকে একজন আসে যে সদর স্ট্রিটের ডাকাতির অন্যতম প্রধান আসামি।

আমরা একটু আগেই রমানাথ বিশ্বাস লেনে পৌঁছে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করে আছি। দশটা বাজল, এবার সময় হয়েছে আসার। যখন তখন আসতে পারে, তাই আমরা সবাই সজাগ। এক একটা মুহূর্ত কাটছে আর আমরা অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে আছি কখন সংকেত পাব এবং আগন্তুককে ধরব। সে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে ট্রেন থেকে নামে, তারপর হেঁটে নির্দিষ্ট একটা বাড়িতে এসে বসে। শিয়ালদহে ধরা যেতে পারত, কিন্তু সকালের কোন ট্রেনে আসবে তার কোনও ঠিক নেই, তাছাড়া সকালের ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের ঠাসা ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনকে খুঁজে বার করা ও তাকে গ্রেফতার করা খুবই ঝঞ্ঝাট, সেটা এড়াতেই রমানাথ বিশ্বাস লেনে ফাঁদ পাতা।

আধ ঘণ্টা চলে গেল। এগারটা। অর্থাৎ তার আসার সময় পার হয়ে গেছে। আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে। খালি হাতে ফিরে যেতে হবে লালবাজার। মনাদাকে দেখছি একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকে রেখে মুঠো পাকিয়ে ফুঁ ফুঁ করে নিজস্ব ঢঙে টেনে যাচ্ছে। স্থানত্যাগও করতে পারছি না। আজকেই সেই লোকটিকে ধরার প্রকৃষ্ট সময় কারণ আগামীকাল যদি আবার আমরা একই কায়দায় ফাঁদ পেতে বসি

তখন সে নাও আসতে পারে। কারণ তখন সে পেয়ে যাবে আজকের গোটা একটা দিন এবং সেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসেই জেনে যেতে পারে মন্টু ও রতনের গ্রেফতারের কাহিনী। তার ওপর মন্টুর বাড়ি থেকে রমানাথ বিশ্বাস লেন বেশি দূরে নয়, বাতাসে কান পাতলেই মন্টুর খবর শোনা যাবে, তার প্রমাণ আমরাও ততক্ষণে পেয়ে গেছি। তাই অকারণ আশঙ্কায় যে আমরা উদ্বিগ্ন, তা নয়।

মিনিটের পর মিনিট চলে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম মনাদা গাড়ির পেছনের দরজা খুলে নেমে একটা ধুতি জামা পরা, গাল ভাঙা, রোগা, সাধারণ চেহারার, কালো, মাঝারি উচ্চতার বছর পঞ্চাশের বয়সের লোকের থেকে হাত দশেক দূরত্ব রেখে পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করেছে। আমাদের তখন যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। বুঝে নিয়েছি, এই হচ্ছে জ্যোতি বিকাশ দাস ওরফে বাদল, যাকে ধরতে আমরা সকাল সাড়ে ন'টা থেকে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছি।

মনাদা যেমন তার পেছন পেছন হাঁটছে, আমরা আবার উল্টো দিক থেকে তার সামনের দিকে হাঁটছি। মিনিট দুয়েক, ব্যস সে আমাদের ঘিরে ফেলা বৃত্তের মধ্যে আটক। এবার চল বাছা তোমাকে তোমার আরও দুজন সতীর্থের কাছে লালবাজারে নিয়ে যাই। আজ থেকে কিছুদিন ওটাই তোমার ঠিকানা হবে। বাদলকে যখন গ্রেফতার করা হল, তখন সকাল এগারোটা পনেরো। আমরা মিনিট দশেকের মধ্যেই লালবাজার।

নিয়মমাফিক আদালতে হাজিরা করিয়ে তিনজনকেই ফেরত আনা হল লালবাজারে। বিকাল থেকে শুরু হল মোচড়। প্রথমে রতন মোচড় বেশ কিছুটা হজম করলেও একসময় স্বীকার করল, সে সদর স্ট্রিটের ডাকাতির অন্যতম আসামি। মন্টু ও বাদলেরও অস্বীকার করার উপায় রইল না।

তখন ডিসি ডিডি ছিলেন নিরুপম সোম আর অতিরিক্ত ডিসি ডিডি দেবী রায়। তাঁরা তো ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেনই, এমনকি তৎকালীন কমিশনার পি.কে. সেনও গোয়েন্দা বিভাগে এসে তাদের জেরা করে গেলেন। জেরা করে আমরা সদর স্ট্রিট ডাকাতির ষড়যন্ত্রের একটা মোটামুটি চিত্র পেলাম। আর পেলাম অন্য আসামিদের পরিচয়, কিন্তু তাদের সবার ঠিকানা পাওয়া গেল না। যাদের যাদের ঠিকানা পাওয়া গেল তাদের দ্রুত গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে আমাদের এক একটা দল বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে চারদিকে ছুটল। পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ডাকাতির কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না বলে সদর স্ট্রিট ডাকাতির আসামিদের সন্ধান পাওয়াতে আমাদের কলকাতা পুলিশের মান সম্মান বাঁচানোর তাগিদে পুরো গোয়েন্দা দফতরের অফিসাররা তাড়াতাড়ি তাদের ধরবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জাল গুটিয়ে তাদের খাঁচায় আটকাতে সবাই উদগ্রীব, তাই সারারাত অফিসাররা ঘুমহীন, জাগ্রত।

ঊনত্রিশে অক্টোবরের রাতে রতন ও মন্টু, তিরিশের সকালে বাদলকে গ্রেফতার করার পর সেদিনই রাতে মনাদা, অফিসার এস.আর. দেবনাথ আট দশজনের ফোর্স নিয়ে চলল ভবানীপুরের দিকে। সেখানে লক্ষ্মীবাবুর সোনা চাঁদির দোকানের পাশে জওহরলাল নেহরু রোডে থাকে সুপ্রভাত বসু ওরফে বাপি। সে সদর স্ট্রিট ডাকাতিতে শুধু অংশগ্রহণই করেনি, রীতিমত পরিচালনাও করেছে।

অফিসার পিকে কুণ্ডু, এসএম সাহা গেল ছুতারপাড়া লেনে, সেখানে থাকে আর এক ষড়যন্ত্রকারী। সে রেলওয়ের কর্মচারী, কিন্তু মূল নেতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জে.আর ভৌমিক ছুটল চৌরঙ্গি হোটেলে, সেখানে থাকে আর এক আসামি।

আমি আর দীপক রায় অন্য আর একজনের খোঁজে বার হওয়ার মুখে সোমসাহেব ও অফিসার জগদীশ সরকার গরচা থেকে ফিরে এলেন সেই কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়িটাকে বাজেয়াপ্ত করে, যেটা চড়ে রতনরা সদর স্ট্রিটের ডাকাতিটা করেছিল। রাত দুটো। আমরা

লালবাজার থেকে একটা গাড়িতে বার হলাম। যাব আলিপুর ছাড়িয়ে ডানদিকে তারাতলা রোড ধরে এগিয়ে বাঁ দিকে বজবজ রোড হয়ে বাটায়। যাকে আমরা ধরতে যাচ্ছি, রতনদের বক্তব্য অনুযায়ী সে ডাকাতির সময় কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা চালিয়ে ছিল। সেই আসামির ঠিকানা মন্টু জানাতে পারেনি, তবে জানিয়েছে সে বাটা সু কোম্পানির এক সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ছেলে।

গভীর রাত। আমাদের গোয়েন্দা দফতরের অনেকগুলো গাড়ি চারিদিকে ছুটছে ডাকাতদের ধরবার জন্য। আটষট্টি সালের শেষ দিকে, তখনও কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে বারুদের গন্ধ ছড়ায়নি। যখন তখন যেখানে সেখান দিয়ে বোমা এসে পড়ত না। তবে কলকাতার গর্ভে শুরু হয়ে গিয়েছিল তার প্রস্তুতিপর্ব, যদিও আমরা সেই অশনি সংকেত গভীরভাবে টের পাইনি। টের পেলে কী হতো জানি না, তবে একুশে পা দেওয়া স্বাধীন ভারতের মধ্যে যে একটা অনিশ্চয়তার বাতাবরণ বইতে শুরু করেছে তা খুব ভালভাবেই টের পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাতাবরণ কি শুভ পথের প্রতীক না অশুভ পথের দিকনির্দেশ তা তখন বুঝিনি।

ফাঁকা রাস্তায় হু হু করে ছুটছে আমাদের গাড়ি। দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই আলিপুর পেরিয়ে মাঝেরহাট ব্রিজ পার হয়ে ডানদিকে ট্যাঁকশাল রেখে আমরা তারাতলা রোডে পড়লাম। দিন দশ আগেই কালী পুজোর দিনে ঘোর অমাবস্যা চলে গেছে, এখন আকাশ পূর্ণিমার আগত সংবাদ জানান দিচ্ছে, বাতাসে বেশ ঠাণ্ডা আমেজ, শিশিরের নিঃশব্দ পতন।

আমি আর দীপক তখন দুজনেই শম্ভু দাস সরকারের অধীন আমাদের গোয়েন্দা দফতরের মার্ডার সেকশনে। আমরা দুজনে বকবক করে চলেছি, সঙ্গী অন্য সহকর্মীরা মাঝে মধ্যে টুকটাক কথা বলছে। আমরা তারাতলা রোডের দুধারের কারখানাগুলো ছাড়িয়ে ব্রেসব্রিজের ওপর উঠতেই ব্রিজের নিচে ব্রেসব্রিজ স্টেশনের পশ্চিমদিকে একটা মালগাড়ির দুটো রেকের মধ্যে পরস্পরে ধাক্কা লাগার আওয়াজ পেলাম। স্টেশন সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের বিরাট জলাশয়ের ধারের গাছগুলোয় ঘুমিয়ে থাকা পাখিরা ভয়ে জেগে উঠে ভয়ার্ত গলায় শুরু করল কলরব। আমাদের গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরে বজবজ রোডে পড়ল। সোজা আমরা যাব বাটার মোড়ে।

লালবাজার থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা বাটা সু কোম্পানির এলাকায় পৌঁছে গেলাম। ভেতরের রাস্তায় এদিক ওদিক দুটো চক্কর মারল আমাদের গাড়ি, কিন্তু একটা লোককেও পেলাম না, যাকে আমরা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব।

আসামির বাবা ওই কোম্পানির এক অফিসার এবং তাঁর উপাধি লাহিড়ী এই সূত্র থেকে বার করতে হবে বাটা কোম্পানির কোন কোয়ার্টারে লাহিড়ীদের বাস। এখানে ওখানে ঢুঁ মেরে আগের থেকে আসামিকে সজাগ করা যাবে না। কিন্তু কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। ভেতরে প্রায় গঙ্গার ধারে একটা বটগাছের তলায় একটা সাইকেল রিক্সার ওপর রিক্সাচালক মদ খেয়ে ঘুমাচ্ছে। তাছাড়া অন্য কোনও মানুষের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। ওকে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ হবে না তা একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝবে। তাই আমরা ওর নেশার ব্যাঘাত করলাম না।

কিন্তু কীভাবে খুঁজে বার করব? কোনও লোককেই দেখতে পাচ্ছি না। নিঝুম রাতে সবাই ঘরে ঘরে ঘুমে কাতর। কিন্তু এই চারপাশের কোয়ার্টারের মাঝে কোনও এক কোয়ার্টারের ঘরে সেই ডাকাতটিও ঘুমাচ্ছে। তার ঠিকানাটা কে জানাবে? তাই একবার ভাবছি ফিরে যাই, ভোর হলে আবার আসব। আবার ভাবছি ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাই করে যাই। কিন্তু অপেক্ষা করতে গেলে বাটা অঞ্চল থেকে বার হয়ে পাশের নুঙ্গি, সন্তোষপুর বা ডাকঘরের দিকে চলে যেতে হবে, এইভাবে গাড়ি নিয়ে চক্কর মারলে আমরা অবাঞ্ছিত হিসাবে কোম্পানির পাহারাদারদের নজরে পড়ে যাব। এটা মনে হতেই আমার মাথায় বিদ্যুতের চমক।

আমরা সোজা চলে গেলাম কারখানার সদর দরজায়। সদর দরজা ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ। আমি আর দীপক গাড়ি থেকে নেমে দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুটে এল, "কে?" উত্তরে মোলায়েম ভাবে বললাম, "একটু আসবেন?"

পুরুষ কণ্ঠের মালিক এগিয়ে আসছে বুঝতে পারলাম তার খটখট জুতোর আওয়াজ শুনে। সদর দরজাটা খুলল না, তার বদলে দরজার মাঝখানে ছোট একটা ঘুলঘুলি খুলে গেল। সে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখেই বলল, "কোথা থেকে এসেছেন, কী চাই?" তার মুখটা শুধু দেখা যাচ্ছে। তাতেই বুঝলাম সে কারখানার পাহারাদার। বললাম, "আমরা লালবাজার থেকে এসেছি, এখানকার সিকিউরিটি অফিসারকে একটা খবর জানাতে হবে, তার কোয়ার্টারটা কোথায়?" সে সিকিউরিটি অফিসারের কোয়ার্টারের নম্বর বলে পথের নির্দেশও দিয়ে দিল।

সিকিউরিটি অফিসার অধিকারীবাবু আমাদের কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন অফিসার। স্বেচ্ছা অবসরের পর তিনি বাটা সু কোম্পানির সিকিউরিটি অফিসারের চাকরি নেন। আমাদের খুবই পরিচিত। আমরা যখন কী করব ভেবে ভেবে কূলহারা, তখনই হঠাৎ তাঁর কথা ঝিলিক মেরে মনে এল। আমরা আর দেরি না করে সোজা কারখানার গেটে হাজির হয়ে তার ঠিকানা নিয়ে চলেছি তাঁর কাছে। আশা করছি তিনি ওই লাহিড়ীদের খোঁজ আমাদের দিতে পারবেন।

ডাইনে বাঁয়ে করে মোটামুটি একটা রাস্তার দিক নির্দেশ কারখানার পাহারাদার বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমাদের গাড়ি সেই অনুযায়ী চলল। কোয়ার্টারের নম্বর দেখে দেখে আমরা সিকিউরিটি অফিসারের বাড়ি যখন খুঁজে পেলাম, তখন তিনটে বেজে গেছে। কলিং বেল বাজিয়ে কোয়ার্টারের দরজা খোলালাম। তিনি তো আমাদের দেখেই অবাক। প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার, এত রাতে তোমাদের দর্শন?" বললাম, "রাত আর বেশি নেই, ভোর হতে চলল। আমরা এসেছি একটা খোঁজে।" তিনি জানতে চাইলেন, "কী খোঁজে?"

দীপকের গলার স্বর এমনিতে একটু নিচুর দিকে, সে আরও চাপা কণ্ঠে বলল, "এখানে লাহিড়ী নামে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছেন, যাঁর একটা মরিস মাইনর গাড়ি আছে, তার ছেলেই সেটা বেশি চালায়, কোথায় তাঁর কোয়ার্টারটা?" লাহিড়ীদের যে একটা মরিস মাইনর গাড়ি আছে তা আমরা মন্টুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। সেটাই একটা পরিচিতির গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। তাই দীপক সেটার উল্লেখ করল।

দীপকের প্রশ্ন শুনে অধিকারীবাবু চট করে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিনব না, আমি এখানকার সিকিউরিটির দায়িত্বে আছি, কিন্তু কী ব্যাপার?

কোন খুন টুনের সঙ্গে —।" বললাম, "না-না, ওসব নয়, পরে জানাব। আসলে সেটাও একটা খবরের আশায় খোঁজা।" আমাকে আর দীপককে দেখে তিনি ধরেই নিয়েছেন, কোনও খুনের সঙ্গে লাহিড়ীদের বাড়ির কেউ জড়িত বলেই আমরা তাঁদের খোঁজ করছি। কারণ আমরা দুজনেই যে তখন মার্ডার সেকশনে আছি, তা তিনি জানতেন। তিনি লাহিড়ীদের কোয়ার্টারের ঠিকানা ও কোন পথে যেতে হবে তা জানালেন।

আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। সোজা গাড়ি নিয়ে ছুট। পৌঁছে গেলাম অ্যাবসোলভেন্ট কোয়ার্টার্স এলাকায়। কোয়ার্টারগুলির নম্বর দেখতে দেখতে পেয়ে গেলাম দশের তিন নম্বর কোয়ার্টার। আমাদের সঙ্গী কনস্টেবলরা দ্রুত পোজিশন নিয়ে ঘিরে ফেলল কোয়ার্টার। আমি আর দীপক সদর দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ভেতর থেকে শুনতে পেলাম কেউ একজন গুরুগম্ভীর গলায় বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন, "কে এ সময়ে আবার জ্বালাতে এল?" তারপর দরজা খুলতে খুলতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কে?" বললাম, "আমরা।" আর কিছু শোনার আগেই তিনি দরজা খুলে আমাদের দেখে অবাক। ঘুম জড়ানো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার?" বললাম,

“আপনার ছেলে বাবুলকে ডাকুন তো।” তিনি বললেন, “সে তো এখন ঘুমাচ্ছে।” তাঁর উত্তর শুনেই মনটা খুশিতে ভরে গেল, জেনে গেলাম, যার খোঁজে এসেছি সে ঘরে আছে।

ভদ্রলোকের কথার উত্তর দেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করিনি। আমরা কোয়ার্টারের ঘরে ঢুকে গেলাম। লাহিড়ী পরিবারের সবাই ততক্ষণে জেগে গেছে। আমরা জ্যোতিরিন্দ্র লাহিড়ী ওরফে বাবুলকে গ্রেফতার করলাম। গ্রেফতারের সময় বাবুল বলে উঠল, “আমাকে ধরছেন কেন? আমি কিছু জানি না। ” বললাম, “মন্টু ডাকছে, তাই তোমায় নিতে এসেছি।” বাবুল তবু আমাদের এড়াতে বলল, “আমি মন্টু নামে কাউকে চিনি না।” বললাম, “সে তুমি লালবাজারে গিয়েই দেখতে পাৰে চেন কি চেন না।” অন্যদিকে তল্লাশি চলছিল, কিন্তু তল্লাশি করে কিছু পাওয়া গেল না।

ফর্সা, চশমা পরা, মাঝারি উচ্চতার চব্বিশ পঁচিশ বছরের তরুণ বাবুলকে নিয়ে আমরা লালবাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। আমরা যখন বাবুল লাহিড়ীকে নিয়ে লালবাজারে পৌঁছলাম, তখন ভোর আর কয়েক হাত দূরে। যেহেতু সেদিন আমাদের দফতরে রাতই হয়নি, নতুন করে ভোরের আকর্ষণ তাই কম।

দফতরে পৌঁছে দেখলাম মনাদারা ভবানীপুর থেকে সুপ্রভাত বসু ওরফে বাপিকে ধরে নিয়ে এসেছে। ফর্সা, গোলগাল চেহারা, কপালের সামনের দিকটায় চুল একেবারে খালি, ছাব্বিশ সাতাশ বছরের ছেলেটা তখনও গত রাতের মদ্যপানের নেশায় আচ্ছন্ন।

আমাদের অন্য দলগুলোও ফিরে এল একে একে। দিব্যেন্দুদা ও রবি রাজচন্দ্র সেন লেন থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে সুশান্ত দত্ত ওরফে সুশানকে। কালো, বছর তেইশ বছরের ছেলেটা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসে আছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত আরও একজনকে ধরে এনেছে গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। সে হচ্ছে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়সের সুকুমার বসু ওরফে ভোলা।

বাপির কথা অনুযায়ী গরচার একটা গ্যারেজ থেকে নিয়ে আসা হল দমদমের শিবপদ ভৌমিকের ক্রিম রঙের একটা ফিয়াট গাড়ি ও গ্যারেজের মালিক কেষ্ট মাঝিকে।

উনত্রিশ তারিখ রতন, মন্টু ও বাদলকে গ্রেফতার করার পর তাদের মোচড় দিয়ে আমরা সদর স্ট্রিট ডাকাতির পেছনের কাহিনীটা অনেকটাই জেনে নিয়েছিলাম। তিরিশে অক্টোবর বাবুল, সুশান, বাপিদের গ্রেফতারের পর পুরো পশ্চাদপট জেনে গেলাম।

জেনে গেছি, ডাকাত দলের নেতা ও দলের অন্যান্যদের নাম। জেনে গেছি তাদের কর্মপদ্ধতি, ডাকাতির পেছনের রহস্য। তিরিশে অক্টোবরের সন্ধেবেলা কমিশনার পি.কে সেন নিজে আমাদের বিভাগে এসে বাপির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে বসলেন। আমরা গোয়েন্দা দফতরের সব ছোট বড় অফিসার মজুত। কমিশনার সাহেব একটা ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতল খুলে মাঝে মাঝে খাচ্ছেন আর বাপির জবানবন্দি লিখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে ঘটনার পরম্পরা বজায় রাখতে জেনে নিচ্ছেন খুঁটিনাটি বিষয়গুলো। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ তিনি বাপির জবানবন্দি লেখা শেষ করে খুশি মনে আমাদের বিভাগের চেম্বার থেকে বেরিয়ে বাইরে অপেক্ষমান সব অফিসারের দিকে নিজের সিগারেট প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে ইংরাজিতে বললেন, “তোমরা দারুণ কাজ করেছ, আমার তরফ থেকে তোমাদের সিগারেট "প্রাপ্য।" কমিশনার সাহেবের থেকে কেউ সিগারেট নিলেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি আমাদের উৎসাহ দিতে যেভাবে আন্তরিকতা দেখালেন, তা একটা বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি নিজেও খুবই খুশি হয়েছিলেন, কারণ সদর স্ট্রিট ডাকাতির আগে পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ডাকাতির কিনারা করতে না পারায় সরকার ও পত্রপত্রিকার বিরূপ বক্তব্যে তিনি খুবই চাপে ছিলেন। সদর স্ট্রিট ডাকাতির আসামিদের ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রেফতার করতে সমর্থ হওয়ার ফলে সেই চাপ থেকে তিনি কিছুটা মুক্ত হয়েছিলেন।

কমিশনার সাহেব নিজে একটা ডাকাতের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে যেমন একটা নজির স্থাপন করে বাহিনীর মনোবল ও কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দিলেন, ঠিক তেমনি তিনি তাদের

কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নিচুতলার অফিসারদের সিগারেট দিতে চাইলেন। সেনসাহেব শুধু বাপিকেই জেরা করেননি, তিনি বহু আসামীকেই নিজে জেরা করেছেন।

পুলিশবাহিনীর মধ্যে এক পরিবারের আবহাওয়া তৈরি করতে তৎকালীন কমিশনাররা সচেষ্ট থাকতেন বলেই কলকাতা পুলিশের সাফল্যের মাত্রাটা উচ্চপর্যায়ে পৌঁছেছিল। এক অফিসারের পেছনে অন্য অফিসারকে, অন্য অফিসারের পেছনে আবার অন্য এক অফিসারকে লাগিয়ে দিয়ে চেম্বারে বসে নোংরা কাদাঘাটার রাজনীতির কথা তাঁরা চিন্তাই করতে পারতেন না। ব্যর্থতাকে নিজের ঘাড়ে নিয়ে সাফল্যটাকে বাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তাঁরা ভালভাবেই জানতেন, সাফল্য পেতে গেলে প্রশাসনের মধ্যে রাজনীতি ও পরচর্চার পরিবেশের বদলে সুস্থ কাজের ও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন প্রথম। 'ছোট' দিকে দেখবার প্রবৃত্তি তাঁদের ছিল না।

সেনসাহেব প্রশাসন চালাতেন খুবই দক্ষতার সঙ্গে। তিনি আবার একটু রোমান্টিকও ছিলেন। মাঝে মধ্যে শখ করে ড্রাইভারকে সরিয়ে নিজেই গাড়ি চালাতেন। একবার তাঁর জিপে চড়ে আমরা শ্যামবাজার থেকে লালবাজারে ফিরছি। তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন। পাশে বসে আছেন দেবী রায়, পেছনে বসে আছি আমি, ড্রাইভার ও আমাদের দফতরের কনস্টেবল কামেশ্বর প্রসাদ। আমরা ফিরছি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ হয়ে। বৌবাজারের মোড়ে এক ট্রাফিক কনস্টেবলকে এক লরিচালকের কাছ থেকে পয়সা নিতে দেখলাম আমরা সকলেই। দেবীবাবু সেটা দেখে সেনসাহেবকে বললেন, "দেখলেন তো স্যার।" সেনসাহেব উত্তর দিলেন না। তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। সেনসাহেব উত্তর না দিলেও আমাদের আশ্চর্য করে দেবীবাবুকে উত্তর দিল কামেশ্বর প্রসাদ। সে অর্ধেক হিন্দি ; অর্ধেক বাংলা মিশিয়ে বলল, "এসব ছোটখাট চিজ দেখলে কি আপনাদের মানায়, স্যার? আপনারা উঁচুদিকে নজর লাগান।" দেবীবাবু চুপ। সেনসাহেব কামেশ্বরের কথা শুনে দেবীবাবুকে বললেন, "দেবী, মাইন্ড ইট, এটাই আসল কথা।" হ্যাঁ, তিনি ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাতেন না। তিনি জানতেন, একটা ট্রাফিক কনস্টেবলকে দুটাকা ঘুষ খাওয়ার জন্য ধরে চাকরির থেকে বরখাস্ত করলেই পুলিশবাহিনীর ঘুষ খাওয়া ও দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। বরং ফল হবে উল্টো, তারা ত্রাসে সতর্ক হয়ে লুকিয়ে ঘুষও খাবে, অন্যদিকে আসল কাজটাও করবে না। সমস্ত মনসংযোগটা তখন ঘুষ খাওয়ার পরিকল্পনার ওপরেই নিয়োজিত করবে। তাই তিনি কৌশল করেই ছোট ব্যাপারে চোখ বুজে থেকে বাহিনীর কর্মীদের দক্ষতার ওপর জোর দিয়ে তাদের থেকে আসল কাজটা বার করে আনতেন।

সেনসাহেবের পর কমিশনার হয়ে এসেছিলেন রঞ্জিত গুপ্ত। গুপ্তসাহেবের সময় কলকাতা পুলিশের দক্ষতা প্রায় তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। গুপ্তসাহেবের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি নিচুতলার কর্মীদের ভুলত্রুটি হলে তাকে না বলে যে বিভাগে সে কর্মরত, সেই বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে সেই ভুলত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ চাইতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিভাগীয় প্রধানের অদক্ষ পরিচালনার জন্যই নিচুতলার কর্মীরা ভুল করে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিভাগীয় প্রধানরাও প্রচণ্ড সতর্ক থাকতেন এবং তাঁদের অধস্তন কর্মীরা যাতে ঠিক ঠিক কাজ করে, সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতেন। এজন্য নিচুতলার কর্মীরা সেই আমলে নির্ভয়ে কাজ করত। গুপ্তসাহেব সিদ্ধান্তগুলো খুবই দ্রুত নিতেন। তিনি জানতেন, মুষ্টিমেয় কিছু অফিসার কলকাতা পুলিশের মূল শক্তি নয়। মূল শক্তি হচ্ছে নিচুতলার তৃণমূলের কর্মীরা, তাই তাদের মনোবল যাতে সজীব থাকে, সে ব্যাপারে তিনি সজাগ থাকতেন।

কমিশনার সাহেবের অফিসটা লালবাজারের মাঝখানে রাস্তার ধারের মূল বাড়িটার দোতলায়। দোতলায় ওঠার জন্য সিঁড়ি ও লিফট দুটোই আছে। দোতলায় সিঁড়ি বা লিফটে উঠলেই আড়াআড়ি পূব পশ্চিম মুখী বিরাট লম্বা করিডোর। সেই করিডোরে পা দিয়ে ডানদিকে ঘুরে ডান পাশে কমিশনার সাহেবের বিশাল চেম্বার। পশ্চিমদিকে করিডোরের শেষপ্রান্তে রয়েছে তাঁদের জন্য বাথরুম।

গুপ্তসাহেব একদিন দুপুর বারোটা নাগাদ তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে

বাথরুমে যাচ্ছিলেন। চেম্বার থেকে বেরিয়েই তিনি দেখলেন, একজন কনস্টেবল সটান দাঁড়িয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে ক্রমাগত সেলাম ঠুকে যাচ্ছে। সেটা দেখে তিনি করিডোরের আশেপাশে চোখ বুলিয়ে ঝট করে বুঝতে চাইলেন কনস্টেবলটি কাকে ক্রমাগত সেলাম ঠুকে যাচ্ছে। আর একের পর এক সেলাম ঠুকেই বা যাবে কেন, তাও তিনি বুঝতে পারলেন না। গুপ্তসাহেব তাকে কোনও প্রশ্ন না করে করিডোরে যে সার্জেন্ট ডিউটিতে ছিল তার কাছে জানতে চাইলেন, 'ওই কনস্টেবল করিডোরে দাঁড়িয়ে একা একা ওইরকম সেলাম ঠুকে যাচ্ছে কেন? সেই সার্জেন্ট গুপ্তসাহেবকে বলল, “স্যার, ডি সি হেডকোয়ার্টার ওকে শাস্তিস্বরূপ আজ ওখানে দাঁড়িয়ে একশবার স্যালুট করে যেতে বলেছেন আর আমাকে বলেছেন, গুনে যেতে।” গুপ্তসাহেব সার্জেন্টের উত্তর শুনে একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, “কেন, কি হয়েছে?” সার্জেন্ট জানাল, "স্যার, গতকাল ফুটবল মাঠে ডিসি সাহেব গিয়েছিলেন, তখন ওই কনস্টেবল মাঠে ডিউটি দিচ্ছিল, কিন্তু ডিসি সাহেবকে দেখেও সে ওনাকে স্যালুট করেনি। সেজন্য আজ ডিউটিতে এসেই ডিসি সাহেব ওই কনস্টেবলকে ডেকে--।” সার্জেন্টের কথা থামিয়ে দিয়ে তাকে গুপ্তসাহেব বললেন, “বুঝেছি, ইউ কল, ডিসি হেডকোয়ার্টার”। গুপ্তসাহেব সার্জেন্টকে নির্দেশ দিয়ে আর বাথরুমের দিকে না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর চেম্বারের সামনে।'

উল্টোদিকেই ডিসি হেড কোয়ার্টার্সের চেম্বার। গুপ্তসাহেবের নির্দেশ পেয়েই সার্জেন্ট ছুটল তাঁকে ডাকতে। ডিসি সাহেব কমিশনারের ডাক শুনেই বেরিয়ে এলেন চেম্বারের সামনে। গুপ্তসাহেবের মুখোমুখি। গুপ্তসাহে তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, “ওয়েল, ইউ হ্যাভ গিভেন এ রাইট পানিশমেন্ট টু হিম। বাট হিয়ার স্যুড বি ওয়ান হু রিসিভস হিজ স্যালুট।” গুপ্তসাহেব আর সেখানে দাঁড়ালেন না, বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। ডিসি সাহেব আর কী করবেন, কমিশনারের আদেশ অনুযায়ী কনস্টেবলের স্যালুট গ্রহণ করতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক পর গুপ্তসাহেব বাথরুম থেকে করিডোর দিয়ে গটগট করে ফিরতে ফিরতে ডিসি সাহেবের দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠলেন, “লিভ হিম।” তারপর নিজের চেম্বারে ঢুকে গেলেন।

এমনই ছিলেন তখনকার কমিশনার সাহেবরা। ছোটখাট তুচ্ছ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে নিজের ক্ষমতা জাহির করে, বাহিনীর মনোবল দুর্বল করতেন না। আসলে যারা ভেতরে ভেতরে দুর্বল, তারাই নিজের দুর্বলতা ঢাকতে তুচ্ছ ঘটনাকে টেনে এনে প্রশাসনে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে চায়। পরিবারের যে কোনও কৃতিত্ব যে পরিবারের কর্তারই দক্ষতা ব্যক্ত করে, এই সাধারণ বুদ্ধিটুকু তাঁদের ছিল।

সেনসাহেব বাপির পুরো জবানবন্দিটা মূল তদন্তকারী অফিসার শম্ভু দাস সরকারের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের দফতর থেকে চলে যাওয়ার পর আমরাও রাত একটা নাগাদ যে যার বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম। গত দু'দিন আমাদের কারও বিছানার সঙ্গে দেখা হয়নি, স্বভাবত প্রত্যেকেই উৎসুক বাড়ি ফিরতে। ইতিমধ্যে আমাদের যে দল ছুতোরপাড়া লেনে গিয়েছিল, তারা আসামিকে না পেয়ে তার স্ত্রীর কথা শুনে ফিরে এসে রানাঘাটের দিকে চলে গেছে।

আরেক দল ফিরে এসেছে ফতেপুর থেকে আসামিকে না পেয়ে। সেখানে আসামির বাড়ির সদর দরজায় বিরাট এক তালা ঝুলছে, আসামি তার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বেপাত্তা।

ধৃত সাতজন আসামির থেকে যা জানতে পেরেছি তা হল, দলের নেতা হচ্ছেন হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে হেনা গাঙ্গুলি। পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে দমদম বসিরহাটে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হয়েছিল ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে মামলা চলেছিল, তার অন্যতম আসামি হলেন তিনি। জেল থেকে ছাড়া পেয়েও তিনি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ ছাড়েননি। রেভল্যুশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য বলে নিজেকে পরিচয় দিতেন। এবং সেই পার্টির তহবিলের জন্যই নাকি তিনি ডাকাতি করে বেড়াতেন।

সদর স্ট্রিট ডাকাতির পাঁচ-ছমাস আগেও তিনি এক ডাকাতির মামলায় প্রেসিডেন্সি জেলের অন্তরালে তাঁর আরও তিন সঙ্গী সুধীর, সোমনাথ ও তড়িৎসহ ছিলেন। এরা তাঁর হাওড়া গোষ্ঠীর সদস্য। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা যোগাযোগ করলেন তাঁর পুরনো কমরেড সুকুমার বসুর সঙ্গে। সুকুমারের বাড়ি রামধন মিস্ত্রি লেনে হলেও সে চৌরঙ্গি রোডের চৌরঙ্গি হোটেলের পাঁচ নম্বর ঘরে সারা বছরই প্রায় থাকত। সেখানে সে একটা ছবি প্রযোজনার অফিস খুলেছিল। 'মা ছিন্নমস্তা' নামে একটা ভক্তিমূলক ছবি তৈরি করছিল। কিন্তু প্রযোজনার ভাঁড়ারে টান পড়াতে সেটা মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়।

হেনাবাবুর সঙ্গে সুকুমারের আলোচনায় ঠিক হল, হেনাবাবু ডাকাতি করে সুকুমারকে তার ছবি সম্পূর্ণ করার জন্য টাকা দেবেন। আর হেনাবাবুরও টাকার প্রয়োজন নতুন করে দল তৈরি করার স্বার্থে।

হেনাবাবুর এহেন পদক্ষেপের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। কারণ একদিকে হেনাবাবু নিজেকে মার্কসবাদী হিসাবে প্রচার করতেন, অন্যদিকে তিনি প্রচণ্ডভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আটষট্টি সালের উনিশে মার্চ সুকুমারকে লেখা তাঁর একটা চিঠিতে দেখা যায়, "আপনি যে বলেছেন দৈববল, তা একান্তভাবে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এই দৈববল পুরুষকারের দ্বারা অর্জন করতে হয়, সব সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুক্ত হয়ে মন যখন পূর্ণচন্দ্রের অমল সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তখনই দৈববলের জ্যোতি আমাদের যাত্রাপথের সব অন্ধকার ও বাধাকে মুক্ত করবে। আমার বর্তমান বন্ধনদশা আপনার কথামত সত্যিই শক্তিরূপিনী নিগূঢ় নির্দেশ বহন করে আনছে।...মা ছিন্নমস্তার কৃপা আমাকে সব আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করছে ও করবে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়ে আছে।"

এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও মার্কসবাদের গন্ধ পাওয়া যায়? এটা কোন মার্কসবাদীর লেখা মনে হচ্ছে কি? অথচ হেনাবাবু নিজে আর.সি.পি.আই পার্টির সদস্য ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে বিপ্লবে বিশ্বাস করেন বলেই দাবি করতেন। এই বৈপরীত্য ও একের পর এক ডাকাতিতে আত্মনিয়োগ করে তিনি কী করতে চেয়েছিলেন তা একেবারেই পরিষ্কার নয়। এই বৈপরীত্যের জন্যই তিনি ডাকাতি করা টাকা 'মা ছিন্নমস্তা' ছবির জন্য দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

সুকুমারের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর সে তার আর এক পুরনো সহকর্মী ছুতোরপাড়া লেনের পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতায় ডাকাতির একটা নতুন দল দ্রুত বানানোর পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনায় তারা প্রথমেই ডেকে নিয়ে এল মধ্য কলকাতার কেশব সেন স্ট্রিটের মোহিনী মিত্র ওরফে ফেলু ও পুরনো কমরেড চৈতন্য সেন লেনের কাশীনাথ ভট্টাচার্য ওরফে কানু ও ব্যারাকপুরের বাদল দাসকে।

হেনাবাবু, সুকুমার, পরিতোষ, কানু, ফেলু ও বাদল হল কেন্দ্রীয় বা কোর গ্রুপ। এবার এই ছ'জন গোপনে যোগাড় করতে লাগল আরও সদস্য। পরিতোষ ও কানু দলে নিয়ে এল মন্টু ও বাপিকে। বাদল আনল সন্তোষপুরের রতন ও উৎপলকে। মন্টু আবার নিয়ে এল রাজচন্দ্র সেন লেনের সুশানকে। বাপি সদস্য করল বাটানগরের বাবুল লাহিড়ী ও তার পরিচিত গরচা গ্যারেজের মালিক কেষ্ট মাঝিকে। আর হেনাবাবু হাওড়ার গোষ্ঠী থেকে কলকাতার গোষ্ঠীতে নিয়ে এলেন বিজয় গঙ্গোপাধ্যায়কে।

হেনাবাবুর সদস্যকরণ করার কোনও নিজস্ব নীতি বা পদ্ধতি ছিল না। তাদের তিনি পরীক্ষা করেও দেখতেন না। তারা কারা, কোথা থেকে এসেছে, কী তাদের পরিচয়, তারা আদৌ বিপ্লবে বিশ্বাসী কিনা, তারা দেশের জন্য কোনও গণআন্দোলনে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছে কিনা এসব খবরের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবেই উদাসীন ছিলেন। তিনি শুধু বাজিয়ে নিতেন, তারা ডাকাতি করতে ইচ্ছুক কিনা। 'ডাকাতি করতে পিছপা নয়', তা হলেই চলবে। একটা ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার পর ছেলেগুলোকে নিয়ে কী করবেন সেই চিন্তাও তাঁর প্রায় ছিল না। তিনি স্রেফ চিন্তা করতেন, একটা ডাকাতির পর আর একটা ডাকাতি করবেন,

তারপর আর একটা, এইভাবেই চলবে। একের পর এক ডাকাতি।

কী উদ্দেশ্যে ডাকাতি, তার কোন রাজনৈতিক কারণও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাদের হেফাজতে ধৃত যে সাতজন আসামি রয়েছে, তাদের কারও বাড়ি থেকে এমন একটা কাগজও পাওয়া যায়নি, যাতে মনে হবে তারা কোনও না কোনওভাবে মার্কসবাদী। না, এটা তাদের নিজেদের আড়াল করার কোনও কৌশল নয়, ধৃত আসামীদের মধ্যে এমন ক'জন আছে যারা জীবনে কার্ল মার্কসের নামও শোনেনি। না, তাদের কারও কাছ থেকে এমন কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি, যাতে মনে হয় হেনাবাবু বা তাদের দলের কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ডাকাতি করার পেছনে।

অবশ্য হেনাবাবু তাঁর দলের নতুন সদস্যদের ডাকাতি করার উদ্দেশ্য হিসাবে বলেছিলেন, তিনি দেশে সশস্ত্র বিপ্লব করতে চান, সেজন্য প্রয়োজন অস্ত্র আর সেই অস্ত্রের জন্য চাই টাকা। সেই টাকা যোগাড় করতেই দরকার ডাকাতি। তাঁর কথায় সদস্যরা কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল জানি না কারণ পরবর্তীকালে তাঁর দলের সদস্যদের কাজকর্মে তাঁর বক্তব্যের কোনও ছিটেফোঁটার রেশও দেখা যায়নি। হয়ত তিনি ব্যক্তি হিসাবে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তিনি সদর স্ট্রিট ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারীদের মনে সেই আদর্শ জন্মাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন, তা প্রমাণিত।

সাতজন আসামিকে গ্রেফতার করতে পারলেও বাকি আসামিরা পলাতক। বিশেষ করে হেনাবাবুর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না ডাকাতিতে ব্যবহার করা কোনও আগ্নেয়াস্ত্রও। সেগুলোর খোঁজে আমরা চারদিকে তল্লাশি চালাতে লাগলাম।

পয়লা নভেম্বর ভোরবেলা কাশীনাথ ভট্টাচার্য ওরফে কানুকে তার চৈতন্য সেন লেনের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের মোটা, লম্বা, ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত কানু বলল, হেনাবাবু বেলুড়ে ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির কর্মী রবীন্দ্রনাথ মজুমদারের সুজাপুরের কোয়ার্টারে থাকতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি, আশিষদা, দেবনাথদা কানুকে নিয়ে একটা বেশ বড় দলকে দুটো গাড়িতে তুলে রাত তিনটে নাগাদ ছুটলাম বালির সুজাপুরের দিকে। কানু রবীন মজুমদারের কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিলে আমরা কোয়ার্টার ঘিরে ফেললাম।

কিন্তু আমরা সেখানে না পেলাম হেনাবাবুকে, না পেলাম এমন কোনও জিনিস যাতে প্রমাণিত হয় হেনাবাবু সেখানে ছিলেন। আমাদের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। আমরা খালি হতে ফিরে এলাম। অন্যদিকে আমাদের লোকেরা চব্বিশ ঘণ্টা বেলেঘাটার সুরেন সরকার রোডের উপেন্দ্র চন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালে নজরদারি রেখে দিয়েছে। কারণ ওই হাসপাতালে তখন ভর্তি হয়ে রয়েছেন হেনাবাবুর ছোট বোন ছায়া গঙ্গোপাধ্যায়। আমাদের আশা, হেনাবাবু বোনকে দেখতে হাসপাতালে এলেও আসতে পারেন। অবশ্য এই আশা অনেকটাই দুরাশা কারণ হেনাবাবুর মতো পাকাবুদ্ধির লোক যে এমন একটা কাঁচা কাজ করে ফেলবেন না, সে সম্পর্কে আমরা প্রায় নিশ্চিত ছিলাম। তবু আশা, কারণ ব্র্যাডম্যানও তো বাজে শট নিয়ে অনেকবার শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন। তেমন একটা বাজে শট যদি হেনাবাবু নিয়ে নেন, তবে আমরা সেই বাজে শটের তোলা ক্যাচটা ধরে তাঁকে আমাদের হেফাজতে লালবাজারের প্যাভিলিয়নে নিয়ে আসতে পারি!

হেনাবাবু সদর স্ট্রিটের ডাকাতির দু'দিন আগে আমাদের গোয়েন্দা দফতরে এসে মনাদার সঙ্গে গল্পগুজব করে গেছেন। এবং গল্প করার ফাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে পরদিন তিনি বিমানে গুয়াহাটি চলে যাচ্ছেন এবং প্রমাণস্বরূপ তেমন একটা টিকিটও মনাদাকে দেখিয়ে গেছেন। মনাদার সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয়ের সূত্রেই তিনি লালবাজারে আসতেন। আসলে ডাকাতির দু'দিন আগে মনাদার কাছে আসার উদ্দেশ্যই ছিল এটা বোঝাতে যে, তিনি ওই ডাকাতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই আড়ালটা করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন ডাকাতি একবার হলে সন্দেহের তালিকায় তাঁকেও আমরা নজরে রাখব। সেটা হিসাব করেই

তাঁর লালবাজারে আগমন। আমরা পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ডাকাতির ব্যাপারে তাঁকে অবশ্য সন্দেহ করিনি। কারণ পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ডাকাতিটা এত সংগঠিত, পরিকল্পিত ও নিখুঁত হয়েছিল যে, সেটা প্রচণ্ড শক্তিধর ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া অন্য কেউ করেনি সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। আর তেমন কৌশলী ষড়যন্ত্রকারী যে তিনি ছিলেন না, তা পরবর্তীকালে ভালভাবেই জানতে পেরেছি।

আমাদের হেফাজতে আসামিদের ওপর কম বেশি মোচড় চলতেই লাগল। মোচড়ের ঠেলায় রতন বলল, সে তার প্রতিবেশি অমল সরকারের বাড়িতে ডাকাতির টাকা রেখেছে। তাকে নিয়ে অমল সরকারের বাড়ি গেলাম, টাকা নিয়ে এলাম।

পরদিন আবার মোচড়। এবার রতন বলল, ডাকাতির আরও পাঁচ হাজার টাকা সন্তোষপুরেরই পারুলবালা সাহার কাছে রাখা আছে। আবার তাকে নিয়ে আমাদের দল ছুটল এবং টাকা নিয়ে চলে এল।

পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধারের পরদিন রতনকে আবার মোচড়। এবার সে বলল ডাকাতির আরও সাড়ে ন'হাজার ওই সন্তোষপুরের নীরেন সরকারের কাছে রাখা আছে। ব্যস, আবার আমাদের গাড়ি রতনকে নিয়ে ছুটল নীরেন সরকারের বাড়ির উদ্দেশে এবং টাকা পেয়ে গেল। প্রতিদিন রতনকে মোচড় দেওয়ার পর টাকা উদ্ধার হচ্ছে। এতে আমাদের অনেকে মজা পেয়ে গেল। তখনকার ডি সি ডি ডি নিরুপম সোমসাহেব তো প্রতিদিন অফিসে এসেই আগে প্রশ্ন করতেন, "রতনের থেকে আজ কত পাওয়া গেল?" অবশেষে তাঁকে বললাম, "না স্যার, রতনের কাছে আর টাকা নেই।"

হেনাবাবু, পরিতোষ, ফেলু ও উৎপলকে গ্রেফতার করতে পারলে বাকি টাকা ও অস্ত্র উদ্ধার করা যাবে। সেইজন্য আমরা সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

হেনাবাবু তাঁর দলের লোকেদের কাছে যে গুপ্ত সংগঠনের কথা বলেছিলেন, সেই গুপ্ত সংগঠনের সব গুপ্ত কথাই আমাদের কাছে পরিষ্কার। তিনি দলের ছেলেদের নিয়ে চৌরঙ্গি হোটেলে সুকুমারের ঘরে, পরিতোষের ছুতোর পাড়া লেনের বাড়িতে ও মন্টুর বাড়িতে মিটিংয়ে বসতেন। আর সি পি আইয়ের মূল সংগঠনের সঙ্গে যার কোনও যোগাযোগই ছিল না। সদস্যরা জানতই না সত্যিই তারা আর সি পি আইয়ের হয়ে কাজ করছে কিনা। একমাত্র হেনাবাবুর কথাতে বিশ্বাস করে তারা ডাকাতি করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। অন্য সদস্যদের কথা বাদ দিলেও মন্টুর এব্যাপারে জড়িয়ে পড়াটা আশ্চর্য লাগে। সে নিজে ইঞ্জিনিয়ার ছিল, ভাল চাকরি করত, ভদ্র পরিবারের সন্তান এবং বিয়েও করেছিল রানী রাসমণির পরিবারের এক অভিজাত ভদ্রমহিলাকে। কেন ওইভাবে সে ডাকাতি করতে গেল, বোঝা যায়নি।

আটষট্টির সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে যখন সারা বাংলাদেশ আসন্ন শারদোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, পাড়ার পাড়ায় যুবকরা চাঁদা তোলা ও মণ্ডপ সজ্জায় মেতেছে, কুমারটুলির মৃৎশিল্পীরা প্রতিমার চোখে মুখে শেষ তুলির টান দিতে মগ্ন, ঠিক তখনই একদিন হেনাবাবু, মন্টু, বাবুল লাহিড়ী ও বাপি তারাতলা রোডে একটা গাড়ি চুরি করতে গেল। কিন্তু ঠিক যখন গাড়ির সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে লাহিড়ী গাড়িতে উঠতে যাবে, তখনই সেখানে এসে গেল গাড়ির মালিক। ওরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল। ডাকাতির জন্য গাড়ি তাদের চাই-ই চাই। যদিও মন্টু দমদমের শিবপদ ভৌমিকের একটা ফিয়াট গাড়ি মিথ্যা কথা বলে নিজেদের কাছে রেখেছে, কিন্তু সেই গাড়ি নিয়ে তারা ডাকাতি করতে চাইল না। কারণ সেই গাড়ি নির্দিষ্ট হয়ে গেলে গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তারা আরও একটা চেষ্টা করল, কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হন।

এরপর একদিন রাত ন'টা নাগাদ পরিতোষ ও বিজয় একটা আকাশী রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ভাড়া করল। গাড়ির চালক এক বিহারী। তারা গাড়ি নিয়ে এল বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের কাছে সেখানে কথামত রাত দশটার সময় দাঁড়িয়েছিল লাহিড়ী। তারা তাকে গাড়িতে তুলে নিল। এবার তারা চলল আরও দক্ষিণ দিকে। চিড়িয়াখানা ছাড়িয়ে আলিপুর হয়ে তারা চলল

বেহালার দিকে। ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে গাড়ি চলেছে হু হু করে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে লাহিড়ী, পেছনের সিটে পরিতোষ ও বিজয়। রাত এগারটায় গাড়ি যখন ঠাকুরপুকুরে পৌঁছে গেল, লাহিড়ী ড্রাইভারকে বলল গাড়িটা থামাতে। সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষ তার কোমর থেকে একটা রিভলবার বার করে সেটা ড্রাইভারের মাথার বাঁ দিকে চেপে ধরল। এদিকে ড্যাসবোর্ড থেকে লাহিড়ী খুলে নিয়েছে গাড়ির চাবি। বিজয় পেছনের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে চট করে ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে ড্রাইভারের গলার সামনে ধরেছে একটা বেশ বড় চকচকে ছুরি, ড্রাইভারের আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। লাহিড়ী ড্রাইভারকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বসে পড়ল ড্রাইভারের সিটে। ড্রাইভার রয়ে গেল রাস্তায়, গাড়ি নিয়ে পরিতোষরা পালাল।

গাড়ির নম্বর পাল্টে ওরা গাড়িটা রাখতে শুরু করল কখনও গরচায়, কখনও সন্তোষপুর কিংবা বৌবাজারে। এদিকে কীভাবে ডাকাতি করা যায় সেই পরিকল্পনায় ব্যস্ত রইল। পয়লা অক্টোবর, সেদিন ছিল বিজয়া দশমীর পরদিন অর্থাৎ একাদশীর দিন, হেনাবাবু সবাইকে নিয়ে পরিতোষের ছুতোরপাড়া লেনের বাড়িতে বসলেন ডাকাতির ছক কষতে।

সেখানে ঠিক হল, সাতই অক্টোবর সকালে হিন্দ মোটর কারখানার ক্যাশ ভ্যান তারা লুট করবে। ঠিক হল, জি টি রোড থেকে ভ্যান যখন হিন্দ মোটরের রাস্তা ধরবে, সেখানে ভ্যান দাঁড় করিয়ে ভ্যানের আরোহী ও পাহারাদারদের নামিয়ে টাকা নিয়ে পালাবে।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে প্রতিদিনের মতো সেদিন সকালেও পরিষ্কার করার পালা চুকিয়ে পুজোর আয়োজনে পুরোহিতরা ব্যস্ত। দর্শনার্থীরা আস্তে আস্তে ভিড় বাড়াচ্ছে। প্রবাসী বাঙালিরা পুজোর ছুটি কাটাতে এসে মন্দিরের কালীপ্রতিমা দর্শন করে ঘাটে গিয়ে নৌকায় চড়ে উল্টো দিকে বেলুড় মঠে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। সেই দর্শনার্থীদের মধ্যে দেখা গেল হেনাবাবু, বিজয়, নির্মল ও ধীরেনকে। তারা এসেছে মাকে প্রণাম করে ডাকাতির সাফল্য কামনা করতে। মন্দিরের অদূরেই সকাল দশটার মধ্যে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা চড়ে এসে যাবে রতন, লাহিড়ী, বাদল আর শিবপদ ভৌমিকের ফিয়াট গাড়িতে আসবে মন্টু ও বাপি। অন্যদিকে ব্র্যাবোর্ন রোডের ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কে দশটার আগেই হাজির হবে ফেলু। সে সেখানে দেখবে ব্যাঙ্ক থেকে হিন্দ মোটরের লোকেরা টাকা তুলল কিনা। আর সেই খবর সে টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে মন্টুকে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দরজার সামনে থেকে সকাল ন'টার আগেই রতন, বাদল ও লাহিড়ী রওয়ানা হল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। রতনের কাছে আছে ক'টা তাজা বোমা। সে পেছনের সিটে বসেছে। লাহিড়ী চালাচ্ছে গাড়ি। তার পাশে বাদল, বকবক করে যাচ্ছে। ওর মুখ থেকে আগের রাতের পানীয়ের গন্ধ তখনও বেশ জোরালো ভাবে বেরিয়ে লাহিড়ীদের নাকে পৌঁছাচ্ছে।

ওদিকে ভবানীপুর থেকে রওয়ানা হয়েছে বাপি ও মন্টু। মন্টুর কাছে হেনাবাবুর দেওয়া একটা স্টেনগান। দুজনেই সামনে বসা। ফিয়াট গাড়িটা চালাচ্ছে বাপি।

সব ঠিক। দশটা দশ। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছে দুটো গাড়িই হাজির। হেনাবাবুরা আগের থেকে প্রস্তুত। বিজয় ও নির্মলের হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ, যার ভেতর রয়েছে একটা করে রিভলবার। ধীরেনের হাতে একটা কাপড়ের রেশন ব্যাগ, ব্যাগের ভেতর স্টেনগান।

এবার একটাই কাজ, ফেলুর থেকে জেনে নেওয়া, ব্যাঙ্ক থেকে হিন্দ মোটরের ক্যাশ ভ্যান টাকা তুলে কারখানার দিকে ছুটেছে কিনা। মন্টু চলে গেল কাছেই তার পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ি, সেই বাড়িতে ফোন আছে, সেখানেই ফেলু মন্টুকে ভ্যানের খবরটা দেবে।

সাড়ে দশটা, ফোন এল না। এগারটা, না, তাও এল না। মন্টু ওই বাড়িতে বসে গল্পগুজব করছে আর ফোনের আওয়াজের জন্য কান টানটান করে উতলা হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে মন্দির চত্বরের বাইরে দুটো গাড়িতে হেনাবাবু তাঁর হাওড়া ও কলকাতার ছেলেদের নিয়ে

মন্টুর অপেক্ষায় বসে আছেন। বাদলের বকবকানি তখনও অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরছে।

সাড়ে এগারটায় ফোন বেজে উঠল, ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেওয়ার ইচ্ছা মনে মনে করলেও মন্টু তুলল না, সেটা ততক্ষণে তুলে নিয়েছে ওই বাড়ির কিশোরী কন্যা। সে ফোন ধরে অন্যদিক থেকে তার স্কুলের বন্ধুর গলা শুনে লাফিয়ে উঠে গল্প করতে শুরু করেছে। ওরা গল্প করছে আর মন্টুর ঘাম ঝরছে। সে ভাবছে, ফেলু যদি এখন ফোন করে তবে লাইন এনগেজড পাবে। আর যত দেরি হবে হিন্দ মোটরের গাড়ি তত এগিয়ে আসবে। ওরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই ভ্যান চলে যাবে। কি করবে মন্টু ভেবে পাচ্ছে না। সে খালি ঘড়ি দেখছে। ওদিকে মিনিট সাতেক ধরে ফোনে ওদের গল্প চলছেই। হঠাৎ মন্টু কায়দা করে কিশোরীকে ফোনের থেকে সরিয়ে আনার জন্য বলল, "আমায় এক গ্লাস জল দেবে?" কিশোরী মন্টুর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "ওমা কাকু, এক্ষুনি তো তুমি জল খেলে। ঠিক আছে, তোমায় জল দিতে বলছি।"- কিশোরী বাড়ির পরিচারিকাকে ডেকে বলল, "কাকুকে এক গ্লাস জল এনে দাও তো।" আবার সে ফোনে বন্ধুর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে শুরু করল।

মন্টু জল খেল। তার রাগ উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগল। কিন্তু কোনও উপায় নেই। সে এখন ডাকাতির পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ওই বাড়িতে ফেলুর ফোনের অপেক্ষায় বন্দি। সে উত্তেজনা দমন করতে একটা পত্রিকা তুলে চোখের সামনে ধরল। আরও প্রায় আট দশ মিনিট পর কিশোরীদের গল্প শেষ হল। মন্টুও পত্রিকাটা নামিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু কোথায় ফের ফোন? সে বারবার নিজের হাতঘড়ির দিকে দেখছে। বারোটা বাজতে দশ। অর্থাৎ মেয়েগুলো প্রায় কুড়ি মিনিট ফোনে গল্প করেছে। এই কুড়ি মিনিটে যদি ফেলু ফোন করে থাকে, তবে আজ তার কপালে হেনাবাবুর গালাগালি শোনার দুঃখ আছে।

দুপুর বারোটা। ফোন বেজে উঠল। আবার মন্টু ধরার আগেই কিশোরী ধরল। এবার মন্টুর ডাক। সে মন্টুকে বলল, "কাকু, তোমাকে ফেলু নামে এক ভদ্রলোক ফোন করেছে।" মন্টু লাফিয়ে উঠে ফোনের রিসিভারটা কিশোরীর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, "আমি মন্টু বলছি।" ফেলু অন্যপ্রান্ত থেকে জানাল, "তোরা ফিরে আয়, আজ ওরা আসেনি।" ফের কথা শুনে মন্টু চুপসে গিয়ে মুখ থেকে শুধু বার করল, "ঠিক আছে।"

রিসিভার নামিয়ে মন্টু ওই বাড়ির থেকে বেরিয়ে সোজা হেনাবাবুদের কাছে চলল। মন্টুর কাছ থেকে হেনাবাবু ফেলুর বার্তা শুনে বিড়বিড় করে আজ বোধহয় মায়ের ইচ্ছা নেই, চল আমরা কলকাতায় বলে উঠলেন, ফিরে যাই।"

দুটো গাড়িই কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করল। রাস্তায় অ্যাম্বাসাডর গাড়িটার বাঁদিকের মাডগার্ডটা খুলে ভেঙে গেল। সেটা বেঁধে কোনমতে লাহিড়ী গাড়ি নিয়ে এল গরচায় কেষ্ট মাঝির গ্যারেজে। সেখানে মাডগার্ড সারানোর সঙ্গে সঙ্গে একদিনের মধ্যে গাড়ির রঙ আকাশী নীল থেকে পাল্টে কালো করে ফেলা হল।

সাত তারিখ রাতে বাদলের খবর অনুযায়ী অন্য একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করা হল। ডাকাতিটা করা হবে শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেনের কাছে। একটা জুট মিল কোম্পানির গাড়ি হাওড়ার স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বোটানিকাল গার্ডেনের সামনে দিয়ে আন্দুলের দিকে যাবে। ঠিক হল, ন'তারিখেই এই ডাকাতিটা করা হবে।

ন'তারিখ সকাল দশটার সময় যথারীতি হেনাবাবু তাঁর হাওড়ার দলের নির্মল, বিজয় ও ধীরেনকে সঙ্গে নিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনের সামনে হাজির। নির্মল, বিজয় ও ধীরেনের হাতে ফোলিও কিংবা রেশন ব্যাগ। ওই ব্যাগগুলোর ভেতর কি আছে তা আশেপাশের পথচারীরা জানে না। ওরা ভদ্রবেশে ভদ্রলোকের মতো কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতা থেকে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটায় রওয়ানা হয়ে গেছে বাপি, উৎপল ও রতন। গাড়ি চালাচ্ছে লাহিড়ী। এখন গাড়িটার রঙ কালো।

লাহিড়ীরা সাড়ে দশটাতেই হাজির। হেনাবাবু ইশারায় জানিয়ে দিলেন, তাঁর সঙ্গে এখন

যেন কেউ কথা না বলে। তাই বাপি ও রতনরা একটু দূরে গাড়িটা বম্বে রোডের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে নিজেরা কথা বলতে শুরু করল। সতর্ক রইল, যে কোনও সময় সংকেত আসতে পারে। সংকেত এলে মিলের গাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ওদের সঙ্গে আছে বোমা ও একটা স্টেনগান।

এগারটা নাগাদ হেনাবাবুর কাছে হাওড়ার একটা ছেলে এল। হেনাবাবু তাকে আসতে দেখেই সজাগ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ছেলেটা কাছে যেতেই হেনাবাবু নিজের কানটা ছেলেটার প্রায় মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। ছেলেটা হেনাবাবুকে ফিসফিসিয়ে বলল, "সুধীর বলেছে, গাড়ি এসেছিল ব্যাঙ্কে, কিন্তু কোনও টাকা না তুলে ফিরে গেছে।" ছেলেটার কথা শুনে হেনাবাবুর মুখ থমথমে হয়ে গেল। তিনি বাপিদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে ওদের বললেন, "মাতাল বাদলটার দ্বারা কিচ্ছু হবে না, কখন কোন নেশার ঘোরে কী খবর আনে ওই-ই জানে। তোমরা সবাই ফিরে যাও, সন্ধে ঠিক সাতটায় আমি পরিতোষের বাড়িতে থাকব, তোমরা ওখানেই দেখা করবে।"

হেনাবাবু ফিরে এলেন তাঁর হাওড়ার দলের সদস্যদের কাছে। লাহিড়ী উঠে বসল চালকের জায়গায়। বাপি, বাদল ও রতন সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে বসলে লাহিড়ী গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চলল কলকাতায়।

হিন্দ মোটর কারখানা ও বোটানিকাল গার্ডেনের সামনে জুট মিলের ক্যাশ ভ্যান ডাকাতি করতে না পারার জন্য হেনাবাবু প্রচণ্ড হতাশ হয়ে যান, আর সেই হতাশা থেকে তিনি সদস্যদের গালাগালি দিয়েই ক্ষান্ত রইলেন না, জরুরি ভিত্তিতে যে কোনও একটা ডাকাতি করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন।

চাপে পড়ে সদস্যরা এতটাই বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে-ডাকাতি করার জন্য যে ন্যূনতম পরিকল্পনার প্রয়োজন, তারও মানসিকতা হারিয়ে ফেলল। ফলে তারা এক সপ্তাহ পরেই একটা খবরের ভিত্তিতে চলে গেল দক্ষিণ কলকাতার রানিকুঠির কাছে একচল্লিশ নম্বর বেসরকারি বাস ডিপোর পাশে। তাদের কাছে খবর ছিল, মুর অ্যাভিনিউর এক রেশন দোকানের টাকা একটা গাড়িতে করে দুপুর দুটো নাগাদ নেতাজী সুভাষ বসু রোড দিয়ে যাবে।

সেই খবরের সূত্র ধরে মন্টু, ফেলু, লাহিড়ী, নির্মল ও ধীরেন গিয়ে দাঁড়াল রাস্তায়। লাহিড়ী যথারীতি গাড়ির চালক। নির্মল ও ধীরেনের কাছে আছে রিভলবার, মন্টুর কাছে স্টেনগান। কিন্তু না, এবারও কোনও ক্যাশ ভ্যান এল না। তারা অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করল। ফেরার পথে, গাড়ি বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানার সামনের কাঁচা নর্দমায় গেল পড়ে। কি করবে? ওরা সবাই মিলে চেষ্টা করল গাড়িটা নর্দমার থেকে তুলতে। পারল না। তখন বাধ্য হয়ে ওরা খবর দিল রতনের মাংসের দোকানে। রতন তার বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে এসে তুলে দিল অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা।

এবার হেনাবাবু নিজেই আনলেন সদর স্ট্রিটের ক্যালকাটা সিগারেট সাপ্লাই কোম্পানির টাকার খবর। তিনি জানালেন, প্রতিদিন সকালে কোম্পানির লোকেরা সিগারেট বিক্রির টাকা ট্যাক্সিতে চড়ে ব্যাঙ্কে জমা দিতে যায়। ঠিক হল, তারা যখন সকালে টাকা জমা দিতে যাবে, সেসময় লুঠ করা হবে। এই খবরের ভিত্তিতে প্রথমে চৌরঙ্গি হোটেলে সুকুমারের ঘরে বসল বৈঠক। আলোচনায় ঠিক হল, অন্য কোনও ডাকাতি করার আগে এই টাকাই ডাকাতি করা হবে।

পরদিন মন্টুর বাড়িতে জমায়েত হল সদস্যরা। হেনাবাবুর পরামর্শ মতো এই জমায়েতে বাদ রইল বাদল। কারণ হিসাবে হেনাবাবু বললেন, "বাদল পুরোপুরি মাতাল, মদ খেয়ে কখন কোন কথা কোথায় বলে দেবে ঠিক নেই, তাই ওকে কিছু না জানানোই ভাল।" হেনাবাবুর নির্দেশ মেনে অন্য সদস্যরাও বাদলকে আর মিটিংয়ের খবর দিল না। আর মিটিং মানেই যখন শুধু ডাকাতির কথা, তখন ষড়যন্ত্রে বাদলকে বাদ রাখাই ভাল। মন্টুর বাড়ির মিটিংয়ে

ঠিক হল, ডাকাতিটা করা হবে উনিশে অক্টোবর।

হেনাবাবু আঠারোই অক্টোবর সকালে বাপি, পরিতোষ ও লাহিড়ীকে নিয়ে গেলেন সদর স্ট্রিটের সেই সিগারেট কোম্পানির টাকা কোন দিক দিয়ে যায়, তা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে।

সেদিন সন্ধেবেলা তারা মিলল পরিতোষের ছুতোরপাড়া লেনের বাড়িতে। সেখানে বাদল এসে দিয়ে গেল বোমা। মন্টু পরদিন ডাকাতির ছক অনুযায়ী স্টেনগান ঠিক করে ফেলল। হেনাবাবু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন সবাইকে।

উনিশ তারিখ সকাল ন'টায় হেনাবাবু, মন্টু, বাপি, বাবুল, লাহিড়ী ও ফেলু মৌলালির স্টুডেন্টস হেল্থ হোমের সামনে জড়ো হল। সেখানে হেল্থ হোমের কর্মচারী বিশুর তত্ত্বাবধানে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা রাখা ছিল। হেনাবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী, গাড়ির চালকের আসনে বসল লাহিড়ী, আর বাপি ও ফেলু পেছনের সিটে বসল। বাপির কাছে রয়েছে স্টেনগান। গাড়ি নিয়ে লাহিড়ী সোজা চলে এল সদর স্ট্রিট। তখন সকাল প্রায় দশটা। সেখানে তখন পৌঁছে গেছে বিজয়, নির্মল ও ধীরেন। ওদের হাতের ফোলিও ব্যাগে আছে রিভলবার। নির্মল ও ধীরেন দাঁড়াল জাদুঘরের সদর স্ট্রিটের দিকের দরজার সামনে। বিজয় দাঁড়াল পাশেই একটা দুধ বিক্রির বুথের কাছে। ফেলু চলে গেল সিগারেট কোম্পানির অফিসের সামনে। সে দেখবে, কোম্পানির টাকা নিয়ে লোকেরা ট্যাক্সিতে চড়ে বার হল কিনা। তারা রওয়ানা দিলেই . সে সংকেত দেবে বিজয়কে। বিজয় ইশারা করবে লাহিড়ীকে। লাহিড়ী গাড়ি চালিয়ে ট্যাক্সির পথ আগলে দাঁড়াবে। তখন দৌড়ে এসে ট্যাক্সির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজয়, নির্মল ও ধীরেন আর গাড়ি থেকে বাপি নেমে স্টেনগান নিয়ে যোগ দেবে তাদের সঙ্গে।

মঞ্চ পুরো তৈরি। নাটক শুরু হওয়ার জন্য শুধু পর্দা তোলার কাজটুকু বাকি। এমন সময় লাহিড়ী বাপিকে বলল, “গাড়ি গড়বড় করছে।” বাপি আগের থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, ইঞ্জিনে একটা অতিরিক্ত আওয়াজ হচ্ছে, স্টার্ট নিতেও অসুবিধা হচ্ছে। সে নিজেও গাড়ি চালায়, গরচার গ্যারেজে আড্ডা মারে, কেষ্ট মাঝির সঙ্গে সন্ধেবেলা গ্যারেজেই মদ্যপানের আসর বসায়, সুতরাং গাড়ি সম্পর্কে ভালই ধারণা আছে। লাহিড়ীর কথাটা বিশ্বাস করেও তবু সে বলল, “সর দেখি, আমি একবার চেষ্টা করি।” লাহিড়ী স্টিয়ারিও "ছেড়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। নির্মলরা বাপিদের গাড়ির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ওরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না, লাহিড়ীরা কি করছে। বাপিও দু তিনবার গাড়ির সেল্ফ ধরে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু 'গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়া কিছু বার হল না। ব্যাটারিটা ভাল আছে ওরা জানে, কিন্তু ডায়নামো কাজ দিচ্ছে না নাকি? যাই হোক, এ গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করা যাবে না কারণ ট্যাক্সিটাকে ধরতে গেলে নিজেদের গাড়ির স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতেই হবে।

বাপি ইশারায় ফেলুকে ডাকল। ফেলু এল। ফেলু গাড়ির শরীর খারাপের খবর শুনে ডাকাতির পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বলল। তারা নির্মল, বিজয়দের জানিয়ে দিল সেই কথা। নির্মলরা ফিরে গেল হাওড়ায়। মন্টু, ফেলু ও বাপি কোনমতে গাড়ি স্টার্ট করে চলে এল নোনাপুকুরের ট্রাম ডিপোর কাছে, সেখানে পার্ক সার্কাস সমাধিস্থলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মন্টু ও কানু, ডাকাতির টাকা বাপিদের হাত থেকে নেওয়ার জন্য।

ডাকাতি করা যায়নি শুনে হতাশ মন্টুরা আর কি করে, গাড়িতে উঠে বসল। গেল সেই মৌলালির স্টুডেন্টস হেল্থ হোমে। হেনাবাবু ওদের ফিরতে দেখেই একগাল হেসে এগিয়ে এলেন।

মন্টুই খবরটা দিল হেনাবাবুকে। আর যায় কোথায়? একপ্রস্থ চোটপাট গালাগালি। মাথা ঠাণ্ডা হলে তিনি মন্টুর বাড়িতে সবাইকে সন্ধেবেলা মিলতে বললেন।

সন্ধেবেলা মন্টুর বাড়িতে হেনাবাবু, পরিতোষ, বাপি, ফেলু, রতন, উৎপল মিটিংয়ে বসল। হেনাবাবু এবারে পরিতোষকে দায়িত্ব দিলেন ডাকাতিটা ঠিকঠাক অক্টোবর সংগঠিত করার জন্য। মাঝখানে কালীপুজো, তাই এই তিনদিনের মধ্যে কোনদিন ডাকাতিটা করা যাবে না। কারণ ওই সিগারেট কোম্পানিও সে ক'দিন বন্ধ থাকবে, টাকাও আসবে না। হেনাবাবু সদস্যদের বললেন, তিনি সেদিন কলকাতায় থাকবেন না কারণ তিনি গুয়াহাটিতে তাঁর নিজের বাড়িতে যাচ্ছেন কুড়ি তারিখেই। মন্টুও তার অনুপস্থিতির কথা জানাল, কারণ সেও কালীপুজো উপলক্ষে অর চাকদহের আদি বাড়িতে যাবে।

পরদিন সন্ধেবেলা পরিতোষের বাড়িতে লাহিড়ী, বাপি, রতন ও উৎপল আবার আলোচনায় বসল। আলোচনার শেষে তারা গেল মৌলালির স্টুডেন্টস হেল্থ হোমে বিশুর কাছে। সেখানে ইঞ্জিনের গণ্ডগোল ঠিক হওয়ার পর গাড়ি ফিরে এসেছে। পরিতোষ কিছুটা লাল রং কিনে এনে গাড়ির সামনের পেছনের কাঁচে সেই রং দিয়ে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিল, যাতে মনে হয় গাড়িটা কোনও ডাক্তারের।

একুশ তারিখ কালীপুজো। যে যার মতো কাটাল। কারও সঙ্গে কারও দেখা হল না। হাওড়ার সদস্যদের হেনাবাবু এবারের পরিকল্পনায় বাদ দিয়ে রেখেছেন। শুধু তাদের কাছে রাখা তাঁর রিভলবারগুলো নিয়ে এসে পরিতোষের হাতে দিয়ে গেছেন। পরিতোষ এবারের অভিযানে নেতৃত্বে দেবে।

বাইশ তারিখ। সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যেই উৎপল, লাহিড়ী, বাপি, ফেলু, পরিতোষ ও রতন হাজির। অ্যাম্বাসাডর গাড়ির স্টিয়ারিঙে বসল লাহিড়ী। তার পাশে বাপি ও পরিতোষ। পেছনের সিটে রতন, উৎপল ও ফেলু। গাড়ির পেছনের কাঁচের সামনে ক'টা বোমা রাখা আছে একটা বাক্সে। ড্যাস বোর্ডে দুটো পেট্রল বোমা। পরিতোষ ও বাপি স্টেনগানটা পায়ের কাছে গাড়ির মেঝেতে কাপড় চাপা দিয়ে রাখল। পরিতোষ তার ফোলিও ব্যাগ থেকে রতন ও উৎপলকে দিল একটা করে রিভলবার। তারা সেগুলো তাদের কোমরে গুঁজে নিল।

লাহিড়ীর গাড়ি এস এন ব্যানার্জি রোড পেরিয়ে জওহরলাল নেহরু রোডে পড়ল। তারপর জাদুঘরের উত্তর দিক দিয়ে সদর স্ট্রিটে ঢুকে লিটন হোটেলের সামনে দাঁড়াল। বাপি ছাড়া সবাই নেমে গেল। লাহিড়ী গাড়িটা ঘুরিয়ে জাদুঘরের দিকে ফুটপাথের পাশে চৌরঙ্গির দিকে মুখ করে রাখল। ফেলু গিয়ে দাঁড়াল একটা গলির মুখে। সেখান থেকে সে দেখতে পাবে সিগারেট কোম্পানির টাকা নিয়ে ট্যাক্সি ছেড়েছে কিনা। উৎপল দাঁড়াল লিটন হোটেলের সামনে, ঠিক তার উল্টো দিকে পরিতোষ ও রতন।

সাড়ে দশটা নাগাদ কোম্পানির একটা লোক ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে এল। দাঁড় করাল কোম্পানির সদর দরজায়। সেখান থেকে টাকার থলি তুলে কোম্পানির চারজন লোকে ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ফেলু সংকেত দিল। ট্যাক্সি আস্তে আস্তে গলি থেকে বেরিয়ে সদর স্ট্রিটে পৌঁছতেই লাহিড়ী গাড়িটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে মুখ করে ট্যাক্সির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। ট্যাক্সিটা জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যেতেই বাপি একলাফে গাড়ি থেকে স্টেনগানটা নিয়ে বেরিয়ে ট্যাক্সির ড্রাইভারের মুখের কাছে স্টেনগানের নলটা চেপে ধরল। রতন রিভলবার নিয়ে ড্রাইভারের পাশে কোম্পানির কর্মচারী বানোয়ারলাল ভোরার দিকে তাক করে রইল। বানোয়ারিলাল রতনের হাত ধরে টানাটানি শুরু করল, রতন দিল গুলি চালিয়ে। বানোয়ারিলাল চিৎকার করে ট্যাক্সির সিটের ওপর শুয়ে পড়ল। তার হাত ও বাঁ পায়ের থেকে গলগল করে রক্ত পড়ে ট্যাক্সির সামনের দিকটা ভিজে যেতে লাগল। পেছনে ততক্ষণে উৎপল, পরিতোষ ও ফেলু কোম্পানির অপর কর্মচারী প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, মদনলাল ও সম্পতলাল শেট্টির কাছ থেকে টাকা রাখা কাপড়ের থলিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে উঠে বসেছে।

গাড়িটা লাহিড়ী ব্যাক গিয়ার দিয়ে পেছনে এনে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে পড়লো। পরিতোষ সামনে বসল। উৎপল, রতন ও ফেলু পেছনে, রাস্তায় কিছু হইচই হওয়াতে বাপি

স্টেনগানের গুলি আকাশের দিকে চালিয়ে রাস্তা প্রায় ফাঁকা করে দিল। বাপি উঠলে, গাড়ি চলল। তারপর সে ডান দিকে গিয়ে সেই নোনাপুকুরের ট্রাম গুমটির লাগোয়া পার্ক সার্কাস সমাধিস্থলে যাবে। যেখানে মন্টুরা অপেক্ষা করছে।

এগারটা বেজে দশ মিনিট। লাহিড়ীর গাড়ি নোনাপুকুরের নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির। মন্টু একা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কানু আসেনি। শরীর খারাপ। লাহিড়ীদের হাসি হাসি মুখ দেখেই মন্টু বুঝে গেছে, এবার আর হেনাবাবুর কাছ থেকে তাদের গালাগালি শুনতে হবে না।

পরিতোষ সেখানেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল। সেই ট্যাক্সিতে ফেলু, রতন ও উৎপল লুঠের টাকার ব্যাগ, স্টেনগান, রিভলবার ও বোমাগুলো নিয়ে যাদবপুরের দিকে চলে গেল।

লাহিড়ীরা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির লাল ক্রস দুটো কাজল লাগিয়ে মুছে দিয়ে চলে গেল দমদম, সেখানে শিবু ভৌমিকের একটা ভাড়া করা গ্যারেজে গাড়িটা ঢুকিয়ে ফিরে এল কলকাতায় কেষ্ট মাঝির গরচার গ্যারেজে।

বিকেলে বাপির অস্টিন গাড়ি নিয়ে পরিতোষ, কানু ও কেষ্ট গেল উৎপলের সঙ্গে যাদবপুরে, দেখা করতে। যাদবপুরের ন'নম্বর বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল উৎপল, পরিতোষরা সেখানে গেলে উৎপল তাদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ি থেকে নিয়ে এল টাকার থলি ও আগ্নেয়াস্ত্রগুলো। সেগুলো দিয়ে দিল পরিতোষের জিম্মায়। ফেলু, উৎপল আর রতন ছিল লুঠের টাকা গোনার সময়। বাস স্ট্যান্ডে ফেলুই পরিতোষকে বলল, "আমি নিজে গুনেছি, খুচরো পয়সা বাদ দিয়ে মোট টাকা ছিল বিয়াল্লিশ হাজার। যা এই থলিতে পুরোটাই আছে। এবার তুমি হেনাদাকে দিয়ে দিও।"

আসলে টাকা ছিল লক্ষাধিক। বাকি টাকাটা ফেলু, রতন ও উৎপল সরিয়ে রেখেছিল। পরিতোষরা উৎপলদের বলে গেল, "হেনাদা তোদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন, কাকে কতটা দেবেন তিনিই ঠিক করবেন।" তারা যাদবপুর থেকে ফিরে এল।

চব্বিশ তারিখ সন্ধেবেলা মন্টুর বাড়িতে জমায়েত। সেখানে কানু, হেনাবাবু, পরিতোষ ঠিক সময়ই হাজির। একটু পরে সেখানে পৌঁছে গেল বাপি ও লাহিড়ী। হেনাবাবু সবাইকে ডাকাতির জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "অনেক টাকা ফেলু সরিয়েছে, সেটা তোরা রুখতে পারলি না?" বাপি ও পরিতোষ চুপ করে রইল। এরপর হেনাবাবু মন্টুকে একহাজার, লাহিড়ীকে ছ'শ আর বাপিকে পাঁচশ টাকা দিলেন। বাপি হেনাবাবুকে বলল, "আমার কম করে পাঁচহাজার টাকা চাই। নয়তো আমার কোনও কাজই হবে না।" হেনাবাবু বললেন, "এর চেয়ে বেশি টাকা তোমরা এখন পাবে না। পরে অন্য একটা কাজ করলে তখন দেখা যাবে। পরশুদিন সন্ধেবেলায় এখানে এস, কথা আছে।" বাপিরা হেনাবাবুর কথা মতো সেদিন ফিরে এল।

ছাব্বিশ তারিখ বাপি আর কেষ্ট অস্টিন গাড়ি চালিয়ে মন্টুর বাড়িতে পৌঁছে দেখল, সেখানে হেনাবাবু, পরিতোষ, বিজয় ও মন্টু মিটিংয়ে বসে গেছে। কেষ্ট ও বাপি সেই মিটিংয়ে যোগ দিল, এবং আসানসোল অঞ্চলে একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করতে শুরু করল। ঠিক হল, বিজয় ও বাপি আসানসোলে গিয়ে প্রথমে জায়গাটা দেখে আসবে। সেই অনুযায়ী যাতায়াত খরচের জন্য হেনাবাবু বিজয়কে ছ'শ ও বাপিকে দুশো টাকা দিলেন। কেষ্ট হেনাবাবুর কাছে তার ব্যবসা বাড়াবার জন্য দশ হাজার টাকা চাইলে হেনাবাবু সরাসরি নাকচ করে দিলেন।

উৎপল টাকা পেয়েই ডাকাতির দিন সন্ধেবেলাতেই চলে গেল উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল লেনের সন্ধ্যা নস্করের ঘরে ফুর্তি করতে। প্রচুর মদ্যপান সহযোগে সারারাত ধরে সন্ধ্যাকে নিয়ে ফুর্তি করার পর সে তাকে নিয়ে গেল গড়িয়াহাট। সেখান থেকে উৎপল হেনাবাবুর বিপ্লবী প্রয়াসের লুণ্ঠিত টাকা খরচ করে সন্ধ্যার জন্য কিনে দিল বেনারসী শাড়ি, ব্লাউজ ও সাটিনের সায়া। ফিরে আবার যথাস্থানে। চলল ফুর্তি। কিন্তু বেশি রাতে সে চলে গেল সন্ধ্যার

প্রতিবেশী ঊষারানী দাসের ঘরে। উৎপলের ফুর্তির ঘোড়ায় চড়ে সারারাত কেটে গেল ঊষার। সেই ফুর্তির মৌতাতের জন্য পরদিন ঊষাও পেল উৎপলের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ একটা সোনার আংটি। দিন দুই উৎপল সন্ধ্যা ও ঊষার সঙ্গে কাটানোর পর তাদের আর তার ভাল লাগল না। একঘেয়ে হয়ে যাওয়াতে সে আরও তিনজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে চলে গেল সোনাগাছি। সেখানে সে গেল অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটে উত্তরপ্রদেশীয় মেয়ে কৃষ্ণার ঘরে, দিন দুই কৃষ্ণার ঘরে রাত কাটিয়ে তাকে উপভোগ করার পর উৎপল তাকেও বঞ্চিত করল না। তাকে নিয়ে সে পরদিন এল বৌবাজার এবং বৌবাজারে দত্ত এন্ড কোম্পানি থেকে কৃষ্ণাকে কিনে দিল একটা সোনার হার। অন্যদিকে উৎপলের পয়সায় কৃষ্ণার পাশের ঘরের বাসিন্দা বীণাকে নিয়ে মদমত্তে মাতোয়ারা তার বন্ধুরা।

উৎপল লুঠের টাকা চুরি করে এক কাজে মগ্ন। রতন আবার গেল অন্য কাজে। সে সেই লুঠের টাকার ভাগ নিয়ে ডাকাতির দু'দিন পর গেল টাকা আরও বাড়াতে, জুয়ার বোর্ডে। কিন্তু জুয়াতে বসেই সে হারতে লাগল। কিন্তু তাতে কী? তার পকেট থেকে বার হতে লাগল গোছা গোছা টাকা। জুয়ার, বোর্ডের মালিক মনুর সেটা দেখে কেমন সন্দেহ হল, সে ভাবল যে ছেলে অর্ধ বেকার, পাড়ায় একটা খাসীর মাংসের দোকান চালিয়ে কোনমতে সংসার চালায়, তার পকেট থেকে এত টাকা কী করে অবলীলায় বার হচ্ছে? রতনের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, যেন সে কাউকে তোয়াক্কাই করে না। আরও দিন দুই ধরে রতন প্রতিদিনই একইরকম ব্যবহার করল। মনু পরদিন রতনকে জিজ্ঞেস করল, "কিরে রতন, এত মাল কোথা থেকে পেলি?" রতন পূর্ববাংলার ভাষায় কথা বলে। সে হেসে মনুকে বলল, "ক্যান, মনুদা, হিংসা হইতাছে? আমি কি সারাজীবন একই রকম থাকুম, ভাল দাও মারছি।" রতন আর কিছু না বলে সেদিনের মতো চলে গেল। মনু ভাবল, "ভাল দাঁওটা কী?" সে শুনেছে পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিস ও সদর স্ট্রিটের ডাকাতির কথা।

বাইশে অক্টোবর সদর স্ট্রিটের ডাকাতি হয়েছে। রতন মনুর জুয়ার বোর্ডে জুয়া খেলতে আসছে চব্বিশ তারিখ থেকে। সাতাশ তারিখ বিকেলেও রতন মনুর জুয়ার বোর্ডে যথারীতি খেলতে এল। মনু পাকা ওস্তাদ। সে তার শাসাল পার্টি রতনকে তোয়াজ করে খেলার মাঝে মাঝে মদ্যপান করাতে লাগল। রতন মদ্যপান করছে, আর জুয়া খেলছে। আজ রতন বেশ জিতছে। মনে জাগছে তার আনন্দ। একদিকে মদ্যপানের ক্রিয়া, অন্যদিকে জুয়ার পয়সা আমদানির ফলে সে কারণে অকারণে হাসতে লাগল। এমনিতে রতনকে চট করে কেউ হাসতে দেখে না। সে একটু রুক্ষ প্রকৃতির, খাসী বলি দিতে দিতে তার ভেতরের নমনীয় ভাবটা উধাও। কিন্তু টাকা আমদানিতে তার মনে হয়েছে নতুন করে আনন্দের সঞ্চার। টাকাকে রতন ভীষণ ভালবাসে। টাকাটাই তার কাছে সব। রাত এগারোটা। খেলা বন্ধ হল। রতন এবার ফিরে যাবে তার সন্তোষপুরের বাড়িতে। মনু তাকে ধরল। আদর করে ওকে ডাকল, "রত্না বোস, আজ আর একটু আড্ডা মেরে যা। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কী করবি, বাড়িতে তো আর তোর বৌবাচ্চা নেই।" রতন নেশার ঘোরে হেসে বলল, "না, বাড়িতে মাগিই নাই, ছাঁও হইব কোথ থিকা। লাগাও আর এক প্যাগ।" মনু তার হুইস্কির বোতল থেকে আরও এক পেগ রতনের গ্লাসে ঢেলে দিল। মদ খেতে খেতে ওদের আড্ডার বয়স আধ ঘণ্টা হওয়ার পর মনু খুব অন্তরঙ্গভাবে রতনকে বলল, "দাঁওটা তাহলে ভালই মেরেছিস।" রতন বলল, "হ, তোমারে মিথ্যা বলুম না, ভালই, আরও ভাল হইতো কিন্তু—" রতন হঠাৎ চুপ করে গেল। কিন্তু মনু ওকে চুপ করতে দিল না, জানতে চাইল, "কিন্তু কী?" রতন মনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বুদ্ধির দোষে ফসকাইয়া গেল, শালা উৎপলটা মাইরা দিল।" মনু একটা অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছে।

মনুদের মতো যারা জুয়ার বোর্ড চালায়, তাদের ভীষণ সতর্ক হয়ে চলতে হয়, অবাঞ্ছিত লোকজনকে তারা চায় না, কারণ সেইসব লোককে নিয়ে তাদের ফালতু কারণে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়। আর অবাঞ্ছিত লোকেদের জন্য, অবাঞ্ছিত কারণে গণ্ডগোলে জড়ালে জুয়ার বোর্ড চালিয়ে রোজগার করা যায় না। জুয়ার বোর্ড চালাতে গেলে প্রথমেই পুলিশি

হুজ্জুতি বাজে মস্তানদের ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হয়। মনু তাই জানতে উদগ্রীব, রতন কোথা থেকে উটকো টাকা পেয়েছে। কারণ রতনের সূত্র ধরে তার বোর্ডে ঝামেলা হলে তারই ক্ষতি। মনু রতনের উত্তর শোনার পর তার গ্লাসে আরও এক পেগ হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বলল, "তোর মতো বুদ্ধিমান ছেলেকে কে ঘায়েল করল রে?" রতন একটানে গ্লাসের মদটা শেষ করে বলল, "সে অনেক কথা।" মনু রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সস্নেহে, রতন তা দেখে গলে গিয়ে বলল, "তোমারে বিশ্বাস করা যায়, তুমি আমার কোনও ক্ষতি করবা না।" মনু বলল, "ধ্যুস, তোর ক্ষতি আমি করতে পারি?" রতন এবার প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, "সদর স্ট্রিটের মালটা আমরাই মারছি।" মনুর ভেতরটা লাফিয়ে উঠল এত বড় খবরে, তবু পাকা জুয়াড়ির মতো শান্ত গলায় বলল, "আমরা মানে?" রতন এবার গড়গড়িয়ে ডাকাতির ঘটনার আদ্যোপান্ত মনুর কাছে বমি করে দিল। রাত সাড়ে বারোটা, রতন এবার ট্যাক্সি ধরে বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠছে, মনু শুধু রতনকে জিজ্ঞেস করল, "পার্ক স্ট্রিটের মালটা কারা মারল রে রত্না?" রতন বলল, "তা জানি না। ওটা মারতে পারলে আজ হালা আমাগো পায় কে? হালা শের হইয়া ঘুরতাম, তবে মারুম, অমনই একটা মারুম।" রতন মনুর ওখান থেকে বাড়ি চলে গেল।

মনুর যা জানার জানা হয়ে গেছে। রাত পোহালে বাকি কাজটা করবে। সে জানে পুলিশের 'আশীর্বাদ' নিয়ে জুয়ার বোর্ড চালাতে গেলে অন্তরালে থেকে পুলিশের কাজও করে দিতে হবে। ভোর হল, মনুর তাড়া নেই। সে জানে, রতন তার কাছে মদ খেয়ে গতরাতে যা বলে গেছে, আর সে যে সেটা রেকর্ড করে নিয়েছে, সেটা রতন নেশার ঘোর কাটলে বেশির ভাগটাই ভুলে যাবে। অতিরিক্ত মদ্যপান করে মাতালরা যা যা কাণ্ড করে পরদিন নেশার আচ্ছন্নতা কাটলে তার বেশির ভাগটাই ভুলে যায়। মনু পাকা জুয়াড়ি। সে ভালভাবেই বুঝেছে, তার হাতে একটা বিরাট ট্রাম্পকার্ড আছে, যে খবরের জন্য পুরো কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলছে, তা এখন তার করায়ত্ব। এই খবরটা ঠিকমত দিতে পারলে তার জুয়ার বোর্ড আবার কিছুদিন নিশ্চিন্তভাবে চলবে। এটাই তো দেওয়া আর নেওয়ার' খেলা। ট্রাম্পকার্ড' সে ঠিক মতো ফেলবে। দুপুরবেলার মধ্যেই মনু মনাদার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা করল। এবং রতনের কথার রেকর্ডটা পুরো শুনিয়ে দিল। আমরা মনাদার কাছ থেকে বিকেলবেলা সেই রেকর্ডেড বক্তব্য শুনলাম। এবং প্রথমদিনেই আমরা জেনে গেলাম, হেনাবাবুর দল সদর স্ট্রিট ডাকাতির জন্য দায়ী। জেনে গেলাম, হেনাবাবু ডাকাতির দু দিন আগে মনাদাকে তার গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য যে বিমানের টিকিট দেখিয়ে গিয়েছিলেন তা একটা চালাকি, তিনি সেটা আমাদের ধন্দে ফেলে দেওয়ার জন্য করেছিলেন, যাতে ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাঁর খোঁজ না করি। আমরা জেনে গেছি, তিনি সেই টিকিটটা বাতিল করে দিয়ে কলকাতাতেই ছিলেন এবং ডাকাতির টাকা হস্তগত করেছেন।

তারপর আঠাশে অক্টোবরের রাত থেকে আমাদের শুরু হল অভিযান, এবং একে একে আটক করলাম তাদের সাতজনকে। দলের বাকি লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাদের গ্রেফতার করার জন্য আমাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। হেনাবাবু, পরিতোষ, ফেলুদের ধরবার জন্য আমাদের দল গেল জলপাইগুড়ি, খড়্গাপুর, বসিরহাট, রানাঘাট, গুয়াহাটি ও হাওড়ার অনেক অঞ্চলে, কিন্তু কোনখানে তাদের পাওয়া গেল না।

দোসরা নভেম্বর খবর পেলাম, উৎপল মুম্বই পালিয়ে গেছে, কোথায় আছে সেটাও জানা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার ডেপুটি কমিশনার মিঃ কুলকারনিকে খবর দেওয়া হল। উৎপলকে চিহ্নিত করার জন্য তার পেটে যে একটা লম্বা অপারেশনের দাগ আছে, তাও জানিয়ে দেওয়া হল। মিঃ কুলকারনি ও এ সি মিঃ বি কেনে তিন তারিখ ভোরবেলাতেই প্রেমনগর হাউসিং সোসাইটির একটা ঘর থেকে উৎপলকে গ্রেফতার করে আমাদের দফতরে খবর পাঠালেন। আমাদের একটা ছোট দল চলে গেল মুম্বই। সাত তারিখ

তারা আঠাশ তিরিশ বছরের উৎপলকে নিয়ে ফিরে এল। সাত তারিখেই আমরা হাওড়ার কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় লেন থেকে গ্রেফতার করলাম বিজয়কে, কিন্তু বিজয়ের কাছ থেকে কোনও অস্ত্র উদ্ধার করা গেল না।

খবর পেয়েছি, গ্রান্ট স্ট্রিটে পরিতোষের আত্মীয়ের বাড়িতে পরিতোষ প্রথমে লুঠের টাকা ও অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। সেখান থেকে একদিন সন্ধেবেলা পরিতোষ, তার ভাই শিবতোষ ও ভাগ্নে প্রশান্তকে নিয়ে হেনাবাবু দুটো বাক্সে ওই সব অস্ত্র ও টাকা ভরে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে চলে যান বেহালা সংলগ্ন মিন্ট কলোনির প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে। শিবতোষকে গ্রেফতার করে আমরা সেটার সত্যতা যাচাই করে প্রশান্তকে নিয়ে মিন্ট কোয়ার্টারে ছুটলাম। কিন্তু সেই কোয়ার্টারে তল্লাশি চালিয়ে কিছু পেলাম না। গৃহকর্তা জানালেন, খবর ঠিক, কিন্তু তাঁরা তাঁদের কোয়ার্টারে হেনাবাবুর কোনও জিনিস লুকিয়ে রাখতে অস্বীকার করার পর, হেনাবাবু পরদিন সকালে তাঁদের কোয়ার্টারে একা এসে বাক্সগুলো নিয়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা তাঁরা বলতে পারলেন না। আমরা আবার হেনাবাবু ও তাঁর সঙ্গী পলাতকদের খোঁজার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

দশই নভেম্বর খবর পেলাম, শোভানেন্দু বসু ওরফে ভানু বসু নামে একজন দমদম বসিরহাট মামলার আসামি, হেনাবাবুর পুরনো বন্ধু, বর্তমানে বেহালা থানার কাছে পঞ্চাননতলায় থাকে। ভানু বসুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী ও দমদম বসিরহাট মামলার আসামি ছিল। সেই সূত্রে হেনাবাবুর যাতায়াত ছিল বেহালার ভানু বসুর বাড়িতে। সেখানে হানা দিলে হেনাবাবুর খোঁজ এবং লুঠের টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা যেতে পারে।

দশ তারিখ রাত্রিবেলা বেহালার পঞ্চাননতলা লেনের বাড়ি থেকে ভানু বসুকে আমি ক'জন কনস্টেবলকে নিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তার বাড়িতে হেনাবাবু, কিংবা ডাকাতির কোনও কিছুই পেলাম না। বছর পঞ্চাশের ফর্সা, লম্বা, ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ভানুবাবু হেনাবাবুর সঙ্গে সবরকম যোগাযোগের কথা অস্বীকার করলেন!

চোদ্দই নভেম্বর আমাদের দফতরের এক কনস্টেবল খবর আনল, ফেলু হুগলি জেলার হরিপালের জেজুর গ্রামে কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের পৈতৃক আদি বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে। সেই বাড়িটা অবশ্য বছর তিনেক আগেই অতুল্যবাবু তাঁর ভাইপো অজিত ঘোষকে দান করে দিয়েছেন।

খবর পেয়ে কি আমরা চুপচাপ বসে থাকব? চল পাখি, বেরিয়ে পড়ি। রাত দশটা। আমি, দেবনাথদা, প্রদ্যুৎদা, সেই খবর সংগ্রহকারী কনস্টেবল নীহার ও আরও বাহিনী নিয়ে দুটো গাড়িতে যখন লালবাজার থেকে বার হলাম, তখন জেনে গেছি আজ রাতে আমাদের কারও সঙ্গে ঘুমের মোলাকাৎ হবে না। গাড়ি চলেছে হরিপালের দিকে। প্রদ্যুৎদা খুব মজার মজার গল্প বলতে পারতেন, তিনিই গাড়ির আরোহীদের গল্প বলে জমিয়ে রেখেছেন।

কার্তিক মাসের শেষ। গ্রাম বাংলার মাঠ ঘাটের ওপর শিশির নীরবে নেমে অন্ধকার আরও ঘন করে দিয়েছে। আমাদের গাড়ি হাওড়া জেলা ছেড়ে হুগলি জেলায় ঢুকে পড়েছে। আমাদের দুটো গাড়ির হেডলাইটের আলো পথের ধারের ঘুমন্ত গ্রামের ওপর পড়েই ক্ষণিকের মধ্যে সরে যাচ্ছে। তাতেই দেখতে পাচ্ছি, স্তূপ স্তূপ খড়ের গাদা ও তার পাশে কাদা-মাটি ও গোবরের চিকন ছোঁয়ায় লেপা গৃহস্থের উঠোন, যেখানে সারাদিন বাংলাদেশ জেগে থাকে তার গৃহবধূর নিপুণ হাতের নিঃশব্দ কর্মকাণ্ডে। হুগলির এ প্রান্তে প্রচুর আলুর চাষ হয়। সামনের রবি মরসুমের ফসলের জন্য প্রস্তুত মাঠের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, কৃষকদের প্রতিদিনের ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘাম ঝরানোর নিদর্শন। আলুগাছের লতানো ডগা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে নিজের জন্মবার্তা খুশি মনে জানাচ্ছে।

ঘুমন্ত হরিপাল থানায় আমরা যখন পৌঁছলাম তখন তারিখ পাল্টে গেছে। ওসি স্বাভাবিক ভাবেই থানায় নেই। যারা উপস্থিত, তারাও আশেপাশের পরিবেশের মতো নির্বিঘ্নে বিশ্রামরত। বুঝতে পারলাম, রাত একটার সময় আমরা সেখানে প্রকৃতপক্ষেই অনাহূত। কিন্তু

আমরা উপায়হীন, ধরতে এসেছি ডাকাত, ওদের কিছুটা সাহায্য আমাদের চাই। যে অফিসার সেই রাতে থানার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি ডেকে ডুকে গোটা দশেক কনস্টেবল জোগাড় করে আমাদের সঙ্গে অতুল্যবাবুর আদি বাড়ির দিকে চললেন।

পুরনো আমলের প্রাচীর ঘেরা বেশ বড় বাড়ি, প্রচুর গাছগাছড়া, অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না গাছগুলোর প্রকৃতি। আমরা বাড়িটা ঘিরে ফেললাম। তারপর প্রচুর ডাকাডাকি করে বাড়ির সদর দরজা খুলিয়ে আমরা ঢুকলাম। বাড়ির মালিক অজিতবাবু ঘুমচোখে আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। আমরা একটা ঘরে পেলাম ফেলুর স্ত্রী ও মেয়েকে। ফেলু নেই। অজিতবাবুর কাছে জানতে পারলাম, ফেলুর স্ত্রীর সঙ্গে অতুল্যবাবুর আলাপের সূত্র ধরে তাদের এখানে আগমন। আমরা ফেলুকে না পেয়ে ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসছি। অজিতবাবুই আমাদের এগিয়ে দিচ্ছেন।

বাড়ির সামনে ক'টা কুঁড়ে ঘর। তার পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেই অজিতবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, হঠাৎ আমি তাঁকে কুঁড়েঘরগুলোকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, "অজিতবাবু, আপনার এই ঘরগুলোতে কে থাকে?" তিনি আমার প্রশ্নটা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "ওই আমাদের বাড়ির কাজের লোকজন আর ক'টা জেলে।" আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, "ঘরগুলো আমরা একটু দেখব।" আমার কথা শুনে অজিতবাবু রেগে গেলেন মনে হল। তিনি এক সর্বভারতীয় নেতার ভাইপো, তাঁর কথার গুরুত্ব না দিয়ে ওই ঘরগুলো দেখতে চাওয়ার ধৃষ্টতা তিনি সহজমনে মেনে নিতে না পেরে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "দেখুন না। " কথা বলার ফাঁকে তাঁর চোখ দুটো যে রাগে জ্বলে উঠল, তা ওই অন্ধকারেও দেখে নিয়েছি। আমার ইশারায় নীহাররা ততক্ষণে ওই কুঁড়েঘরগুলোর বন্ধ দরজায় আঘাত দিয়ে ভেতরের বাসিন্দাদের দরজা খুলবার জন্য বলতে করেছে।

দরজা খুলল। ঘরের মধ্যে একটা বোটকা গন্ধ। ভেতর থেকে চারটে লোক বার হল। হরিপাল থানার অফিসারের টর্চের তীব্র আলো সেই চারটে লোকের মুখের ওপর পড়তেই দেখে নিয়েছি, চারজনের মধ্যে সবচেয়ে পেছনে অন্ধকারে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে ফেলু। ফেলুর চেহারার বর্ণনা আমরা আগে থেকে জেনে নিয়েছি, কালো, বেঁটে, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, পরিষ্কার দাড়ি গোঁফহীন মুখ। চোখে ধূর্ত চাউনি। বাকি তিনজনকে দেখেই বোঝা যায় তারা স্থানীয়। তাদের গোবেচারী গ্রাম্য সরলতা সেটাই জানান দিচ্ছে। হরিপাল থানার অফিসার বললেন, "ওরা তিনজনই মৎস্যজীবী।' ফেলুকে গম্ভীরভাবে বললাম, "ফেলু, এগিয়ে আয়।" ফেলুই উত্তর দিল, "এখানে ফেলু নামে কেউ নেই।" বললাম, "ঠিক আছে, ফেলু নেই, মোহিনীমোহন মিত্র তো আছে, তাকেই বলছি।" ফেলুই আবার বলল, "না, ওই নামেও কেউ নেই।" রাত আড়াইটা তিনটের সময় আর নাটক করতে ইচ্ছা করল না, একটু এগিয়ে ধাঁই করে মারলাম ফের তলপেটে এক গোঁত্তা। ফেলু, "ওরে বাবারে" বলে মাটিতে পড়ে গেল। নীহাররা ওকে টেনে তুলল। প্রদ্যুৎদা বললেন, "যা লুঙ্গিটা খুলে, ঘর থেকে জামা প্যান্ট পরে আয়।" ফেলু আর কোন কথা না বলে যে ঘরে তার স্ত্রী ও মেয়ে ছিল, সেখানে দেবনাথদাদের সঙ্গে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে সুড়সুড়িয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল। ওর স্ত্রী ও মেয়ের কান্না ভেসে আসছিল। আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল লালবাজারের উদ্দেশে।

ভোরবেলায় ফেলুকে লালবাজারে নিয়ে এসে শুনলাম নতুন খবর। একেবারে চমক। বেহালার ভানু বসু স্বীকার করেছে, হেনাবাবু গত দোসরা নভেম্বর, শনিবার সকালবেলায় তার বাড়িতে একটা ট্যাক্সি করে আসেন এবং একটা ঘিয়ে রঙের টিনের বাক্স ও একটা বাদামি রঙের চামড়ার সুটকেস তার ঘরে রাখেন। ভানুবাবু সেগুলো ভয়ে তার বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে অস্বীকার করে, কারণ সে হেনাবাবুকে ভালভাবেই চিনত। সে জানত হেনাবাবু কোনও মহাভারত বা রামায়ণ সেগুলোর মধ্যে রাখেননি। হেনাবাবু প্রায় জোর করে বাক্সদুটো রেখে চলে যান এবং পরে এসে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। হেনাবাবু চলে গেলে ভানু বসু বাক্স দুটো হাত দিয়ে তুলে তাঁর ভেতর কি থাকতে পারে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করে, দেখে টিনের বাক্সটা বেশ ভারি। সেদিনই সন্ধে নামার পর ভানু বসু টিনের বাক্সটা

নিয়ে গিয়ে তার বাড়ির পাশের একটা পুকুরে ফেলে দেয়। চামড়ার সুটকেসটারও একই দশা করার জন্য যখন ঘরে ফিরে সেটা নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করেছে, ঠিক সেসময় উদয় হন হেনাবাবু—তিনি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, "কি রে, এটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?" ভানুবাবু বলে, "আমার বাড়ি থেকে বিদেয় করতে, এখন তুই এসে গেছিস, নিয়ে যা।" হেনাবাবু ভানুবাবুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেন, "তোর এই পরিণতি হবে আশা করতে পারিনি, সামান্য দুটো বাক্স রাখতে এখন ভয় পাস, অথচ একদিন বিপ্লব করতে গিয়েছিলি!" ভানুবাবু উত্তরে বলে, "ও সব নিয়ে আলোচনার সময় আমার নেই, আমি এখন পুরোপুরি সংসারী, কোনও ঝামেলাতে জড়াতে চাই না।" হেনাবাবু চামড়ার সুটকেসটা ঝট করে ভানুবাবুর হাত থেকে নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে আস্তে বললেন, "কাপুরুষ।" ভানুবাবু বলল, "যা ইচ্ছে ভাবতে পারিস, এখন তুই যা।" হেনাবাবু' বললেন, "যাচ্ছি, তোকে আর বলতে হবে না, টিনের বাক্সটা দে।" ভানুবাবুর শরীর এবার কঠিন হয়ে গেল, কারণ সেই বাক্সটা ইতিমধ্যেই পুকুরে ফেলে দিয়েছে। সে বাধ্য হয়ে একটা মিথ্যা কথা বলল, "সেটা আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়েছি, সে ওটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।" ভানুবাবুর উত্তর শুনে হেনাবাবু প্রায় আর্তনাদ করার মতো বলে উঠলেন, "কী? জানিস ওটাতে কী ছিল? আমি কোনও কথা শুনব না, কালকে আসব, কোন বন্ধুকে দিয়েছিলি, আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবি, আমি দেখব, সে কোথায় ফেলেছে।" হেনাবাবু ভানুবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করে চামড়ার সুটকেসটা নিয়ে রাতের অন্ধকারে মিশে যান।

পরদিন হেনাবাবু রাত ন'টায় ভানু বসুর বাড়িতে আবার হাজির টিনের বাক্সের খোঁজে। ভানু বসু ইচ্ছে করেই বাড়ি ছিল না, তার স্ত্রী বলে দেয় তাদের বাড়িতে যেন আর কোনওদিন হেনাবাবু না আসেন। হেনাবাবু ফিরে যান, আর কোনওদিন টিনের বাক্সের খোঁজে যাননি।

টিনের বাক্সে কী আছে? ভানুবাবু জানে না। খোলেনি। এখন আমাদের দেখাতে রাজি হয়েছে কোন পুকুরে কোনখানে সেটা ফেলেছে। আমরা একটা বিরাট দল নিয়ে বেহালার দিকে রওয়ানা দিলাম। দেবীবাবু, শম্ভু দাস সরকার, মনাদা, কুণ্ডুবাবু, আমি দু তিনজন ডুবুরী ও ফটোগ্রাফার নিয়ে ভোরবেলা বেহালার পঞ্চাননতলার সেই পুকুরপাড়ে হাজির। বেহালা থানাতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

পুকুরটার পুব ও উত্তর পাড়ে সরু সরু গলি, পশ্চিমপাড়ে গাছগাছালিতে ভরা। আর চারদিকে নিম্নমধ্যবিত্তের বাড়ি। পুব উত্তরপাড়ে একটা বটগাছ, আর সেই বটগাছের গোড়ায় খোলা আকাশের নিচে একটা বাঁধানো চাতালের ওপর কটা পাথর, সেইটাই পঞ্চাননতলার পঞ্চানন। অন্য একটা পঞ্চানন মন্দির অবশ্যই আছে, সেটা পাড়ার সামনে, বেহালার মূল রাস্তা ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর।

পুকুরটার সঙ্গে সূর্যের বোধহয় বহুদিন ধরে আড়ি, দেখাসাক্ষাৎ বিশেষ হয় না। জলটাও অন্ধকার। বোঝা যায়, চারদিকের বাড়ির থালাবাসন পরিষ্কার করার কাজ ছাড়া ওই পুকুরে কিছুই হয় না।

ভানুবাবু আমাদের পুকুরের পশ্চিমপাড়ে নিয়ে গেল দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে, তারপর একটা ছোট আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখাল পুকুরের ঠিক কোন জায়গায় সে টিনের বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলেছে। ডুবুরি তিতার সাহানী পুকুরে নেমে গেল। আমরা সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। যে জায়গাটা ভানুবাবু দেখিয়েছে, সেটা পাড় থেকে খুব দূরে নয়। হাত আট দশ হবে। সাহানী নেমে সেই জায়গায় ডুব দিয়ে হাতড়ে যাচ্ছে, উপস্থিত সবারই দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। আমরা ছাড়াও পাড়ার বহু লোক সেখানে কৌতূহল মেটাতে ভিড় করেছে। সাহানীর পায়ে বোধ হয় কিছু একটা ঠেকেছে, সে ইশারা করে আমাদের দিকে হাত নেড়ে সেটা বোঝাতে চাইল, তারপর চট করে জলের নিচে হারিয়ে গেল।

জলের নিচ থেকে কাদা ঘাঁটার বুদবুদ উঠছে। সাহানীকে দেখা যাচ্ছে না। বুদবুদগুলো পুকুরের আট দশ হাত দূর থেকে পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। বোঝা যাচ্ছে, সাহানী কিছু

একটা জিনিস জলের নিচে টেনে পাড়ের দিকে আনছে। বুদবুদের মিছিল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। চার পাঁচ হাত দূরে মিছিলটা দাঁড়িয়ে গেল। সাহানী জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াল। ওর মাথা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে ভেজা মুখে। হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে, পেয়েছি।" সে আবার ডুব দিল, আবার বুদবুদ, আমাদের দিকে আসছে। এবার একেবারে হাত খানেক দূরে। কনস্টেবল সত্য নেমে গিয়ে, সাহানীকে সাহায্য করল, দুজনে মিলে তুলে নিয়ে এল সেই জিনিসটা।

দেখলাম, হ্যাঁ, সেটা সত্যিই একটা টিনের বাক্স, তবে সেটা যে ঘিয়ে রঙের ছিল তা বোঝার কোনও উপায় নেই, কাদায় পুরো মাখামাখি। বাক্সের সামনে একটা হ্যাজবোল্ট। তার সঙ্গে ঝুলছে একটা লোহার তালা। বাক্সের চারদিকে গেঁড়ি, শামুক আটকে আছে। সাহানী আর সত্য মিলে পুকুরের জল দিয়ে বাক্সটা ধুতে লাগল। কাদা একটু একটু করে পরিষ্কার হতে টিনের ঘিয়ে রঙের ছিটেফোঁটা আভাস পেলাম। কাদা ছাড়িয়ে বাক্সটা পাড়ে তোলা হল।

পুকুরপাড়েই বাক্সের তালা ভেঙে সেটা খুলে ফেলা হল। ওপরে একটা বন্ধ ফোলিও ব্যাগ, তার চেনটা এক টানে খুলে ফেললাম। দু'টো রিভলবার, একটা কালো, একটা নিকেল করা। গুলি ভরা। ফোলিওর নিচে একটা স্টেনগান, চার টুকরো করে খোলা, স্টেনগানের তলায় প্রচুর গুলি। এই স্টেনগান আর রিভলবারই সদর স্ট্রিটের ডাকাতিতে বাপি, রতনরা ব্যবহার করেছে। তারপর হেনাবাবু সেগুলো পরিতোষের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিয়ে ট্যাঁকশালের এক কোয়ার্টারে রাখতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেহালায় ভানু বসুর নিশ্চিন্ত আস্তানায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাদের স্থান হয়নি।

রিভলবার, স্টেনগান উদ্ধার করে লালবাজারের দিকে ফেরার পথে ভাবলাম, ভানুবাবু যদি না বলত যে টিনের বাক্সটা সে কোথায় ফেলেছেন তবে আমরা কোনওদিন জানতামও না, এবং অস্ত্রগুলো উদ্ধারও হতো না। অস্ত্রগুলো ওই বাক্সের মধ্যে আরামে ঘুমিয়ে একসময় কাদার তলায় বাক্সসুদ্ধ চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত। এভাবে কত কোটি টাকার জিনিস যে আমাদের দেশের নদনদী নালায় হারিয়ে গেছে তার কোনও হিসাব নেই। কী সংস্কারের বশে যে আমাদের দেশে মানুষ নদনদীতে পয়সা ছুঁড়ে ফেলে তা বোঝা দুঃসাধ্য। ফুল ছুঁড়ে ফেললে তাও বোঝা যায়, পুজো দিচ্ছে, কিন্তু পয়সা দেওয়ার কী অর্থ? নদনদীগুলো কি সেই পয়সা কুড়িয়ে বাজার থেকে ফুল বেলপাতা কিনে এনে নিজের পুজো নিজেই দেবে? কবে যে এই কুসংস্কার আমাদের দেশ থেকে যাবে কে জানে?

সদর স্ট্রিট ডাকাতির আসামীদের মধ্যে গ্রেফতার এড়িয়ে পলাতক বাকি শুধু দুজন। হেনাবাবু ও পরিতোষ।

মার্চ মাসে আমরা মামলার জন্য আদালতে চার্জশিট দাখিল করলাম। জ্যোতিরিন্দ্র লাহিড়ী দক্ষিণ কলকাতার গলফ ক্লাব রোডের একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত। ডাকাতির খুব সামান্য টাকা সে তার কাছে রেখেও ছিল, সেই সূত্রে সেই মেয়েটি ও তার মার লালবাজারে আগমন। এই সুযোগটা আমরা নিলাম। মেয়েটিকে প্রায় প্রতিদিনই লাহিড়ীর সঙ্গে লালবাজারে দেখা করতে দিলাম। শুধু দেখা করতেই নয়, আমরা তাদের ছোট্ট একটা ঘরও ছেড়ে দিতাম। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লাহিড়ীকে আমরা রাজসাক্ষী করলাম। লাহিড়ী তার দলের সঙ্গে যেমন 'বিশ্বাসঘাতকতা' করল, পরবর্তীকালে সে মুক্তি পাওয়ার পর ওই মেয়েটার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে তাকে বিয়ে না করে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসল।

ভানু বসু সাক্ষী দিল। মামলা চলাকালীন পরিতোষকে একদিন বিকেলে হঠাৎই লেনিন সরণী চৌরঙ্গির মোড়ে গ্রেফতার করল আমাদের অফিসার সমীর গঙ্গোপাধ্যায়।

সদর স্ট্রিট ডাকাতির কিনারা করতে পারলেও পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ডাকাতির কোনও সূত্র আমরা পাইনি। অন্যদিকে উনসত্তরের দোসরা এপ্রিল মাঝেরহাট সেতুর কাছে ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের নিউ আলিপুর শাখায় আবার সশস্ত্র ডাকাতি হয়ে গেল।

ডাকাতরা এখানেও ডাকাতি করার পর একটা কালো' অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে পালিয়েছে। কে করল এই ডাকাতি? হেনাবাবু? না অন্য কোনও দল? যারা পার্ক স্ট্রিটের পোস্ট অফিসে ডাকাতি করেছে, তারা? হেনাবাবু গ্রেফতার এড়িয়ে ছুটছেন। তাঁকে ধরবার জন্য আমাদের দল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দিচ্ছে। গুয়াহাটির কুমারপাড়ায় বি আর ফুকন রোডের বাড়িতে গিয়ে শুধু তাঁর মা ও বোনের সাক্ষাৎ পেয়ে আমাদের দল ফিরে এসেছে।

নিউ আলিপুরের ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে একটা দুর্ধর্ষ পরিকল্পনার ছাপ দেখতে পাওয়া গেল। আর সেই ডাকাতদলের এক সদারজীর পাগড়ি নিউ আলিপুর থানার দিকের এক গলির ভেতর থেকে উদ্ধার হল। কে এই সর্দার? খোঁজ শুরু হল তার। কেবল সিং নামে এক সর্দারজী ছিল পরিচিত ডাকাত, সে হাইওয়েতে ডাকাতি করে বেড়াত। সে কি হাইওয়ের ডাকাতি ছেড়ে এখন ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে শুরু করেছে? ডাকাতদের চরিত্র অনুযায়ী তেমন হওয়ার কথা নয়। হঠাৎ করে পরিচিত ছক বা মোডাস অপারেন্ডি পাল্টে অন্য সুরে তানপুরা বাঁধবে না। আর কেবল সিংয়ের মতো হাইওয়ের উগ্র ডাকাত, ঠাণ্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র করে ব্যাঙ্ক ডাকাতি না করারই সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু 'কিন্তুও' তো হতে পারে। ওকে ধরতে পারলে অন্য সর্দারজী ডাকাতের খবরও পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং খোঁজ শুরু হল কেবল সিংয়ের। কেবল সিংয়ের রাজত্ব ছিল রানিগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্যন্ত জি টি রোডের ওপর। এই খবরই তো যথেষ্ট নয়, বিশাল এক রাস্তা, সেখানে কোনও এক জায়গায় সে চুপ করে বসে থাকবে আর আমরা যাব, ধরে নিয়ে আসব, তা তো নয়। নির্দিষ্ট খবর আনতে হবে কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে।

নিউ আলিপুরের ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে দোসরা এপ্রিল, আমরা ছ'তারিখ সন্ধেবেলা দেবীবাবুর এক পুরনো 'মাধ্যমের কাছ থেকে খবর পেলাম, কেবল সিং রানিগঞ্জের পাঞ্জাবী মোড়ের একটা হোটেলে আছে। তবে আর বসে থাকা কেন? চল যাই, কেবলকে পাকড়াই। ঠিক হল, আমি, তপেনদা আর কনস্টেবল বিপ্লব, কামেশ্বর ও নাগেশ মিশ্র যাব। তপেনদা তার কিছুদিন আগে ইন্টালি থানা থেকে বদলি হয়ে আমাদের ডাকাতি দমন শাখার ওসি হিসাবে লালবাজারে এসেছেন। কামেশ্বরকে দলে নেওয়ার কারণ, সেই একমাত্র কেবল সিংকে চেনে। আর নাগেশ মিশ্রকে নিলাম, যেহেতু সে ভাল গাড়ি চালায় ও গাড়ি মেরামতির টুকটাক কাজও জানে।

আরও ঠিক হল, আমরা আমাদের গাড়ি নিয়ে যাব না, অন্য একটা অপরিচিত গাড়ি নিয়ে পর্যটকদের মতো যাব। কেবল পুরনো ডাকাত, লালবাজারের গাড়িগুলো সে চিনতে পারে, তাই আগের থেকে এই সাবধানতা। আমি বেলেঘাটার ব্যবসায়ী রামগোপাল দাসের একটা অস্টিন গাড়ি ঠিক করলাম। রামগোপাল দাস একটা খুনের মামলার অভিযোগকারী ছিল, সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব। আমি তখনও মার্ডার সেকশনেই আছি।

সাত তারিখ সকালে আমরা লালবাজার থেকে রওয়ানা দিলাম। কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলায় এলেই আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হাওড়া পার হয়ে দিল্লি রোড ধরতেই বুঝলাম চৈত্র শেষের ধূ ধূ প্রান্তরে আসন্ন নতুন বছরে পা দেওয়ার গন্ধ। আগের দিন রাতে কালবৈশাখী ঝড়ের এলোমেলো তাণ্ডবের চিহ্ন রাস্তার ধারের গাছগাছড়ায়।

আমাদের অস্টিন গাড়ির গতি বেশি নয়, নাগেশ চালাচ্ছেও আস্তে। রাস্তার দু'পাশে ঝিঙ্গে, উচ্ছে গাছে ঝুলছে ছোট ছোট হলুদ ফুল, নাম জানা, অজানা হরেক রকম পাখি সে সব ক্ষেতে টুকটুক করে উড়ছে, নাচছে, গান গাইছে। গত রাতের ঝড়ে যে তাদের ঘরবাড়ি আশপাশের গাছগুলো থেকে উড়ে কোথায় চলে গিয়েছে, তা নিয়ে তাদের বিশেষ চিন্তা নেই। যত চিন্তা আমাদের, এই মনুষ্য জীবের! এই জীবের ভেতরই যত হানাহানি, খুন, ডাকাতি, দখল, বেদখল! এই জীবের ভেতরেই যত অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, হিংসার দাপট!

সময় যত পার হচ্ছে, গরম তত বাড়ছে। গতরাতের ঝড়বৃষ্টির ঠাণ্ডার রেশ ফিকে হয়ে

যাচ্ছে। দুপুরবেলা আমরা বর্ধমান শহরে ঢোকার কিছুটা আগে গাড়ি দাঁড় করালাম একটা চটির সামনে। পেটে কিছু খাদ্য রপ্তানি করার প্রয়োজন। গাড়ি দাঁড় করিয়ে নাগেশ গাড়ির বনেট খুলে দিল। ঠাণ্ডা হবে। আমরাও ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য খাবার দিতে বলে সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়লাম।

সন্ধেবেলা আমরা পৌঁছে গেলাম রানিগঞ্জের পাঞ্জাবী মোড়ে। 'মাধ্যম' এসে ফিসফিসিয়ে জানিয়ে গেল কোন হোটেলে কেবল ঘাঁটি গেড়েছে। আমরাও সেই হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। কেবল হোটেলে নেই, সেটা 'মাধ্যমই' জানিয়ে গেছে, সুতরাং তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কেবল আমাদের চেনে না, একমাত্র কামেশ্বরকে চিনলেও চিনতে পারে। আর ওকে যে আমরা ধরতে এসেছি সেটা সে আন্দাজ করতে পারে শুধু কামেশ্বরকে দেখলেই, তাই কামেশ্বরকে আমরা একটু আলাদা আলাদা রাখছি। তিনতলার ছাদের একটা ছোট ঘরে কেবল আছে। আমরা দোতলার দুটো ঘর ভাড়া নিলাম। বিপ্লবকে পাঠালাম তিন তলাটা ঘুরে দেখে আসতে।

সে ঘুরে এসে বলল, "স্যার, তিনতলায় মাত্র দুটো ঘর, বাকিটা ফাঁকা ছাদ, ঘর দুটোই বন্ধ, দরজায় তালা দেওয়া।"

কামেশ্বরকে আমাদের সঙ্গে হোটেলে রাখিনি। সে হোটেলের বাইরে জনতার সঙ্গে মিশে গেছে। আসানসোল, রানিগঞ্জ, অণ্ডাল অঞ্চলে কামেশ্বরের প্রচুর জান পয়চান লোক আছে। ওকে বলে দিয়েছি, সে যেন তার লোকজনকে বলে, সে ছুটিতে এসেছে এক কয়লা ব্যবসায়ীকে নিয়ে। প্রয়োজনে তপেনদাকে ব্যবসায়ী সাজিয়ে দেবে। তপেনদার গোলগাল সুন্দর চেহারা, হাতে সবসময় পাইপ ধরা, সেটা মাঝে মাঝে মুখে দিয়ে টান মেরে টুকটুক করে ধোঁয়া ছাড়ে। বড় কয়লার ব্যবসায়ী হিসাবে দারুণ মানিয়ে যাবে। আর বাকি আমাদের পরিচয় ওর কর্মচারী। কামেশ্বর বাইরে থেকে খেয়াল রাখবে হোটেলে কেবল সিং ঢুকল কি ঢুকল না। 'মাধ্যম' তো আছেই, সে লুকিয়ে থাকবে।

সারাদিনের ক্লান্তি ধুয়ে নিলাম। হোটেলটা ছোট। লোকজনও সব আশেপাশের নিত্যদিনের অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া আগন্তুক। হোটেল থেকে আমরা বার হতে পারছি না। কখন কেবল হোটেলে আসবে আর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব, তার প্রতীক্ষায় একটু একটু করে রাত হেলে পড়ছে। অথচ চোখের পাতা দুটো এক করে আমাদের বিছানায় হেলে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অবুঝের মতো আচরণের মাঝে, সতর্ক শিরায় টানটান জাগরণ। ঘরের দরজা দুটো ভেজান। যে কোনও মুহূর্তে বার্তা আসতে পারে, দূত যেন ফিরে না যায় তাই এই নিশি জাগরণ।

কাক ডাকা ভোরে 'মাধ্যম' এল আমাদের কাছে নিরাশ করা বার্তা নিয়ে। কেবল গভীর রাতে রানিগঞ্জ থেকে কয়লার লরি ধরে পালিয়েছে। লরির যাত্রাপথ কলকাতামুখী। কেবল কি কিছু অনুমান করেছে, সে কি জেনেছে আমাদের আগমনের খবর এবং কি উদ্দেশ্যে আমাদের হোটেলে উপস্থিতি? 'মাধ্যমের কথায় তা পরিষ্কার করে বোঝা গেল না। আমরা আবার জি টি রোডে নামার জন্য তৈরি হলাম। হোটেলের পয়সাকড়ি মিটিয়ে যখন আমরা আমাদের 'রথে' চড়ে বসলাম, তখন কাকেরা ভোরের ডাক শেষে এখানে ওখানে হানা দিচ্ছে প্রাতরাশ সারবার জন্য। নির্দেশমতো নাগেশ মিশ্র গাড়ি চালাচ্ছে ধীরে। আমাদের দৃষ্টি পথের দুধারে। গাড়ির সামনের আসনে বসে কামেশ্বর একবার এদিক আর একবার ওদিক দেখছে, কারণ কেবলকে একমাত্র সেই-ই চেনে। আর আমরা যে কোনও সর্দারজী দেখলেই কামেশ্বরকে বলছি, "কামেশ্বর।" সে সেই সর্দারজীকে দেখে আমাদের বলছে, "এ নয় স্যার।"

মনে মনে এক একবার ভাবছি, · এভাবে কি কেবলকে পাব? কিন্তু উপায় বা কী? হাল ছাড়া যাবে না। ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ডাকাতির রহস্য যদি উদ্ধার করতে পারি, সেই আশায় বুক বেঁধে আমাদের ছোটা। কিন্তু এত আস্তে ছোটা যে রাস্তার সবরকমের গাড়িই আমাদের 'অস্টিন রথকে' তাচ্ছিল্য করে ব্যঙ্গের আওয়াজ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওয়ারিয়ার কাছে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে চারিদিকে ধুলোবালির খুশি মতো উড়ানের মাঝে আমরা খানিক 'কাজের' জন্য একটা চটিতে দাঁড়ালাম। আমাদের তো কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করা নেই, যেখানে গেলে কেবল সিংকে পাব। যেখানে সেখানে তাকে পেতে পারি, এখানেও পেতে পারি। আবার চলতে চলতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেও তাকে না পেতে পারি।

চটিটার পেছনে একটা বড় পাতকূয়া আছে। আমরা এক এক করে সেখানে স্নানের কাজটা সেরে ফেললাম। বাকি ভোজনের কাজটাও সেরে আবার আমাদের গরুর গাড়ির গতিতে দৌড় শুরু। দুর্গাপুর, বিরাট শিল্পনগরী। ডাঃ বিধান রায় স্বপ্নের সন্তান। এখানেও কেবল সিং, কয়লার গাড়ি থেকে নেমে আশেপাশে হারিয়ে যেতে পারে। আমরা তাই ঠিক করলাম দুর্গাপুরটা একটু ভাল করে চক্কর মেরে নেব।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ভিরিঙ্গি মোড় থেকে জি টি রোড ছেড়ে বাঁ দিকে ঢুকে গেলাম বেনাচিতির দিকে। বেনাচিতি দুর্গাপুরের 'নিউ 'মার্কেট' অঞ্চল, অনেক সর্দার সেখানে দোকান বা অন্য ব্যবসায় যুক্ত। সে দিকে খেয়াল রেখে আমাদের চোখের দৃষ্টির পরিচালনা।

দুর্গাপুরের চারদিকে চক্কর দিতে দিতে আটই নভেম্বরের দিন শেষ হয়ে সন্ধে নেমে এসেছে। আমরা আবার জি টি রোড ধরে পুব দিকে চলেছি। পানাগড়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা ঘাঁটি। এখানে জি টি রোডের ওপর ভিড় কম। সেনাবাহিনীর বাতিল গাড়ির স্তূপ ছড়িয়ে আছে। এখানেও একটা চটিতে আমাদের অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা। পানাগড় ছাড়িয়ে শক্তিগড়। আমাদের যেন অকাজের মধ্যে কাজ। অকাজের ভাঁজে ভাঁজে কাজ। তাই শক্তিগড়েও দাঁড়িয়ে সেখানকার বিখ্যাত বড় বড় ল্যাংচা খেলাম। কিন্তু যার দেখা পাওয়ার আশায় আমাদের পাঁচ জোড়া চোখের ক্লান্তিহীন চালনা, তার দেখা কই?

কেবল সিং হাইওয়ের ডাকাত, আজ এখানে, কাল ওখানে। চারিদিকে ওর গতিবিধি, আস্তানা। সে কি আর আমাদের জন্য যাযাবরত্ব ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় নিশ্চিন্তে বসে থাকবে? সে এ ডালে সে ডালে উড়ে বেড়াবে আর টাকা ফুরিয়ে গেলে ডাকাতি করবে। এই-ই তার জীবনবোধ!

রাতে আমরা বর্ধমান শহরের এক হোটেলে ঠাঁই নিলাম। তারপর জানা আসামির খোঁজে নানা অজানা জায়গায় জায়গায় উঁকি দিয়ে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু অযথাই আমাদের ঢোড়াঢুড়ি।

সকালে বেরিয়ে পড়লাম। আবার সেই একই গতিতে চলা কলকাতামুখী। আশাহীন ব্যর্থ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখা শুধু দূর অদূরে। বর্ধমান জেলা ছেড়ে ঢুকে পড়লাম হুগলি জেলায়। বালি বোঝাই লরির আনাগোনা ও রাস্তার দুধারে তাদের দাঁড়িয়ে থাকা থেকে বুঝলাম পাণ্ডুয়া এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ কামেশ্বর রাস্তার ধারের চটির সামনে একটা খাটিয়াতে বসা এক সর্দারজীকে দেখে চিৎকার করে উঠল, "কেবল সিং, কেবল সিং।" কামেশ্বরের চিৎকারে আমরা জি টি রোডের দক্ষিণদিকে চটির সামনে সর্দারজীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সর্দারজীও কামেশ্বরের চিৎকার শুনে একবার আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে হাতের চায়ের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ে চটির ভেতর দিকে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে পালাল।

ওই সর্দারজীকে যে কামেশ্বর ঠিক চিনেছে তা সর্দারজীর পালানো দেখেই আমরা বুঝে ফেলেছি। কামেশ্বরের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নাগেশ মিশ্রও চটির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দাঁড়ানোটার শুধু অপেক্ষা, গাড়ির সামনের আসন থেকে কামেশ্বর ও বিপ্লব, পেছন থেকে আমি ও তপেনদা নেমে পড়ে দিলাম দৌড় সেই চটির ভেতর দিয়ে একই রাস্তায়। চটির পেছন থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ধানক্ষেত। ধান কাটা সারা। মাঠে পড়ে আছে শুধু ধানগাছের নাড়াগুলো। সাবধানে না ছুটলে ওই সব নাড়াতে পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে, তার ওপর বৃষ্টিতে মাটি পিছল। মাঠে এদিক ওদিক বেশ ক'জন কৃষক চাষের কাজ

করছে।

কেবল সিং প্রাণভয়ে তীরবেগে ছুটছে। দেখতে পাচ্ছি, ওর হাতে একটা খোলা রিভলবার। মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দেখছে। আমরাও আমাদের রিভলবার বার করে হাতে নিয়েছি।

ছুটছি। ওর সঙ্গে কখনও আমাদের দূরত্ব কমছে, কখনও বাড়ছে। কিন্তু তপেনদার সঙ্গে আমার আর বিপ্লবের দূরত্ব ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তপেনদা আর কামেশ্বর পিছিয়ে পড়ছে। কৃষকেরা প্রথমে কাজ ফেলে অবাক হয়ে আমাদের দৌড় দেখছিল, হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম, "ডাকাত, ডাকাত, ওকে ধর।" বিপ্লবও চিৎকার করে বলে উঠল, "ডাকাত, ডাকাত।" ব্যস, কৃষকেরা কাজ ফেলে হইহই করে আমাদের সঙ্গে কেবল সিংকে তাড়া করতে লাগল। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যাচ্ছি, এক এক লাফে আলগুলো ডিঙিয়ে যাচ্ছি। কি করে ওইভাবে ডিঙিয়ে যাচ্ছি, তা তখন ভাবার সময় নেই। একটাই লক্ষ্য, কেবলকে ধরা। কত কিলোমিটার ছুটছি জানি না, ছুটছিই ছুটছি। মাঠের কৃষকদের হইচইয়ের আওয়াজে আশেপাশের গ্রামের বেশ কিছু লোকও জুটে আমাদের সঙ্গী হয়ে গেছে।

আমাদের বাঁদিকে জি টি রোডের ধারে একটা বিরাট বালির পাহাড়। সেই পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে তপেনদা ও কামেশ্বর। কৃষকেরা যে ভাবে কেবল সিংকে তাড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন জঙ্গলে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ঢেঁড়াবাদকের দল পশু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শিকারীর কাছে।

ওপরে চৈত্র শেষের উজ্জ্বল রোদ। তার মধ্যে তিন চার কিলোমিটার ওইরকম মাঠে ছোটা, কাদায় কাদায় পায়ের জুতোর ওজন ভারি হয়ে সেটা বয়ে চলার অযোগ্য। আমাদের দমের ভাণ্ডার হালকা হয়ে আসছে। শুধু আমাদের নয়, কেবল সিংয়ের দমও হালকা হয়ে আসছে। তার গতি কমে গেছে। ফুটবল খেলা ছাড়ার পর এতখানি একসঙ্গে ছুটিনি। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি আমরা সেই চটির কাছ থেকে। সেখান দিয়ে কালনা-কাটোয়া রাস্তা জি টি রোডকে কেটে দক্ষিণ উত্তর বরাবর ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

সেই রাস্তা পার হতে গিয়ে কেবল সিং পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সে আবার উঠে দৌড় দেওয়ার আগেই তিন চারজন কৃষক তার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরল। বিপ্লবও শুয়ে পড়েছে কেবল সিংয়ের ওপর, কেবল সিংয়ের হাতে খোলা রিভলবার, সে চেষ্টা করছে গুলি করতে। আমি ঝট করে ওর রিভলবার ধরা ডান হাতটা পা দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে রিভলবারটা হাত থেকে কেড়ে নিলাম।

কৃষকরা ইতিমধ্যে তাদের কোমরের গামছা খুলে কেবল সিংকে পিছমোড়া করে তার হাত বেঁধে ফেলেছে। কেবল সিং হাঁপাচ্ছে, অন্যেরাও হাঁপাচ্ছে, তবে কৃষকরা একটু কম। রিভলবারটা হাতে নিয়ে দেখে ফেলেছি, সেটার ছ'টা ঘরে ছ'টাই গুলি আছে, কিন্তু লক হয়ে যাওয়াতে সে ট্রিগার টিপে গুলি করার চেষ্টা করলেও গুলি বার হয়নি। কেবল সিংয়ের আর পালানোর পথ নেই, তাকে ঘিরে রয়েছে প্রায় শ'খানেক কৃষক পাহারাদার। প্রায় মিনিট পাঁচ সাত পর আমাদের ওখানে এসে পৌঁছল তপেনদা ও কামেশ্বর। কামেশ্বরের মুখ ও সারা গায়ে কাদা মাখা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, একবার নয়, অন্তত বার দুয়েক সে আছাড় খেয়েছে।

কালনা-কাটোয়া রাস্তার ওপর দুটো সাইকেল রিক্সা দাঁড় করিয়েছি। কৃষকদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি, খুব বেশি দূরে নয় পাণ্ডুয়া থানা। একটা রিক্সায় কেবল সিংকে তুলে বসালাম। তার দুপাশে রিক্সার ওপর দাঁড়াল বিপ্লব ও কামেশ্বর। আমি আর তপেনদা সেই রিক্সার পেছনে অন্য একটা রিক্সায় চড়ে পাণ্ডুয়া থানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের চারপাশে ঘিরে চলেছে কৃষকদের বিশাল মিছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে লরির পর লরি। তপেনদা রিক্সায় বসে পাইপটা বার করে পাইপে ভরা তামাকটা ধরিয়ে আরামে মাঝেমধ্যে টান দিয়ে হাওয়ায় ছেড়ে দিচ্ছে ধোঁয়া। কেবল সিংকে গ্রেফতার করে খুব খুশি।

মিনিট সাত আট চলার পর আচমকা কিছু যুবক হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের রিক্সার কাছে এসে বলল, "স্যার, স্যার, আর একটা ডাকাত আমরা ধরেছি, ওকে আমাদের ক্লাব ঘরে আটকে রেখেছি।”

প্রশ্ন করলাম, “আর একটা ডাকাত?” ওরা সমস্বরে বলল, “হ্যাঁ, স্যার, চলুন না, দেখবেন।” আমি আর তপেনদা তো ওদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমরা ধরতে এসেছি শুধু একটা ডাকাত কেবল সিংকে। তাকে ধরেছি। আবার বোনাস হিসাবে আর একটা ডাকাত পাণ্ডুয়ার যুবকরা কোথা থেকে আমাদের ধরে দিল? তপেনদার হাতে কেবল সিংয়ের রিভলবারটা দিয়ে বললাম, “আপনি এগিয়ে যান, আমি ব্যাপারটা দেখে আসছি।”

রিক্সা থেকে নেমে যুবকদের বললাম, “চল দেখি, তোমরা কোন ডাকাতকে ধরেছ।” তারা হইহই করে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল তাদের ক্লাব ঘরের দিকে। আমারও প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে, একবার ভাবছি, কেবল সিংয়ের কোনও দোসর হবে হয়ত, সে বোধহয় কেবল সিংকে আমাদের তাড়া খাওয়া দেখে, নিজে আমাদের চোখ এড়িয়ে পালাতে গিয়ে যুবকদের হাতে ধরা পড়েছে, আবার ভাবছি, স্থানীয় কোন ডাকাতও হতে পারে, যাকে এই যুবকরা চেনে। তাকে এই সুযোগে ধরে ফেলে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

ক্লাব ঘরে যেখানে ডাকাতটাকে ওরা বেঁধে রেখেছে, সেই ঘরে আমাকে নিয়ে ঢুকল। একযোগে বলে উঠল, “ওই দেখুন ডাকাত!” আমি তো ডাকাতটাকে দেখে একেবারে থ। এ যে আমাদের নাগেশ মিশ্র। দেখেই বুঝলাম, নাগেশকে ওরা শুধু ধরেইনি, ভাল করে উত্তম মধ্যম দিয়েছে। ওর মুখের চারদিক ফোলা ফোলা। ঠোঁটের পাশে রক্তের দাগ। আমাকে দেখেই নাগেশ কেঁদে ফেলে বলল, “এসেছেন স্যার, আমাকে বাঁচান।”

আমি কী বলব, এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি যে হব তা বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারিনি। আমি কোনমতে তাড়াতাড়ি নাগেশকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য জোরে বলে উঠলাম, “আরে এ তো আমাদের লালবাজারের কনস্টেবল, ওই তো আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে। ও ডাকাত নয়।”

যুবকরা বোধহয় নিজেদের কর্মের জন্য কিছুটা লজ্জা পেল, দ্রুত নাগেশের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল। ছাড়া পেয়ে নাগেশ একটা লোককে দেখিয়ে বলল, “ইনি না থাকলে আমি আজ মরেই যেতাম, ওরা যখন আমাকে ধরে মারছিল, আমি বারবার বলেছি, আরে আমি ডাকাত না, পুলিশ, ডাকাত ধরতে এসেছি, আমাদের দলের অন্যরা এগিয়ে গেছে। ওরা কোনও কথা শুনল না।” তারপর আবার সেই লোকটিকে দেখিয়ে বলল, “ইনিই ওদের কোনওমতে থামিয়ে ক্লাব ঘরে নিয়ে এসেছেন।”

নাগেশ মিশ্রকে ক্লাব ঘর থেকে নিয়ে এসে রিক্সায় চড়ে পাণ্ডুয়া থানার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নাগেশের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে বুঝলাম, কেবলকে আমরা যখন তাড়া করছি তখন মোটাসোটা নাগেশ ও গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাদের পেছন পেছন ছুটতে শুরু করেছিল, কিন্তু সে আস্তে আস্তে দৌঁড়নোর ফলে তার সঙ্গে আমাদের বিশাল দূরত্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ওই যুবকরা ওকে দেখে ডাকাত ধরার উত্তেজনায় ওকে ধরে, ওর কোনও কথাই ওরা শোনে না, নিজেরা বিশেষ কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য তখন ওরা আনন্দে আত্মহারা।

দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পাণ্ডুয়া থানা থেকে আমরা লালবাজারে টেলিফোন মারফৎ কেবল সিংয়ের গ্রেফতারের খবর পাঠালাম। প্রায় আড়াই দিন পর লালবাজারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হল।

বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ লালবাজার থেকে পাণ্ডুয়া থানায় দুটো গাড়িতে বেশ বড় ফোর্স নিয়ে হাজির হলেন তখনকার যুগ্ম কমিশনার কল্যাণ চক্রবর্তী ও দেবী রায়। কেবল সিংকে নিয়ে আমরা এবার চললাম কলকাতার দিকে। লালবাজারে কেবল সিংয়ের ওপর দিয়ে যা ঝড় বয়ে গেল, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই ঝড়ের প্রসব হল,

ক্রিস্টোফার রোডের এক বাড়ি থেকে কেবল সিংয়ের লুকিয়ে রাখা একটা স্টেনগান। কিন্তু হেনাবাবুর কোনও খবর ওর কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

হেনাবাবুর খবর কিংবা পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ডাকাতির কোনও খবর নেই। এদিকে মেদিনীপুর জেলার শালবনিতে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেল। ডাকাতি হল ডিগ্রি স্যানেটরিয়ামের টাকা ও রাণিগঞ্জের একটা ব্যাঙ্কেও। সেই সব ডাকাতিতে হেনাবাবুর অংশ গ্রহণের অভিযোগ আমাদের কাছে এল। ডিগ্রি স্যানেটরিয়ামের টাকা লুঠের সময় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী যা পাওয়া গেল, তাতে বোঝা গেল, যে লোকটা ডাকাতির সময় রাস্তার ওপর পরপর দুটো গ্রেনেড ছুঁড়ে রাস্তায় বিরাট গর্ত বানিয়ে ফেলেছিল, সে আর কেউ নয়, হেনাবাবু নিজে।

এসব খবরের মধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার, হেনাবাবু কলকাতা ছেড়ে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছেন। এবং তাঁর সঙ্গে আছে তাঁর হাওড়া গোষ্ঠীর ছেলেরা।

এদিকে কলকাতা গোষ্ঠীর ছেলেদের সদর স্ট্রিট ডাকাতির মামলায় সাজা হয়ে গেল, কারও পাঁচ বছর, কারও বা আট কিংবা দশ বছর করে। শুধু রাজসাক্ষী হওয়ার সুবাদে লাহিড়ী ছাড়া পেয়ে গেল।

বালিতে রাজকুমারের বাড়ি। উনসত্তরের মে মাসের এক বৃহস্পতিবার সকালে ওর পাড়ার একটা ছেলে রাজকুমারকে বলল, "দাদা, গতরাতে আমার বাড়ির কাছে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।" রাজকুমার প্রশ্ন করল, "কি অদ্ভুত ঘটনা?" ছেলেটি বলল, "রাত তখন একটা দেড়টা, একটা কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়ি আমাদের গলিতে থামে। সেই গাড়ির থেকে নামে আমাদের পাড়ার অমিয় গুপ্ত আর একটা গাল ভাঙা, রোগা, মাঝারি উচ্চতার মাঝবয়সী লোক। "সে পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরেছিল। তার সারা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল। তারপর তারা গাড়ির ডিকি খুলে পরপর চারটে কাঠের বাক্স বার করে অমিয় গুপ্তের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে অমিয়ের সঙ্গে সেই মাঝবয়সী লোকটাও রাতে থাকে। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার অন্যখানে চলে যায়।"

ছেলেটার খবর শুনে রাজকুমারের কপালে ভাঁজ পড়ল। কারণ সে অমিয় গুপ্তের খড়ের ছাউনি দেওয়া কুটিরে রাত একটা দেড়টার সময় গাড়িতে করে এসে চারটে পেটি নামানোর কোনও যুক্তি খুঁজে পেল না। আর যে লোকটার বিবরণ শুনল সেটা অনেকটা হেনাবাবুর চেহারার মতো। রাজকুমার অমিয় গুপ্তকে চেনে, ওর ডাকনাম কুলি। কুলি, বকসার। পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারী, বকসিংয়ের জন্য ভারতীয় অলিম্পিকের প্রস্তুতি ক্যাম্পে ও ডাক পেয়েছিল। এমনিতে সে সৎ, কিন্তু অসম্ভব গোঁয়ার প্রকৃতির। রাজকুমার চিন্তা করতে লাগল, কুলির সঙ্গে হেনাবাবুর যোগাযোগ কী করে হতে পারে? হঠাৎ তার মনে পড়ল, উত্তরপাড়ায় আর সি পি আই পার্টির একটা সংগঠন আছে। সেখানে দমদম-বসিরহাট মামলার এক প্রাক্তন বন্দি, যিনি হেনাবাবুর বন্ধু ছিলেন, ওই অঞ্চলে একটা ক্লাব চালান আর কুলিকে সে দেখেছে সেই ক্লাবে যাতায়াত করতে। রাজকমার ভাবল, সেই যাতায়াতের মাধ্যমে হেনাবাবুর সঙ্গে কুলির যোগাযোগ হতে পারে।

রাজকুমার এই ঘটনার কথা বৃহস্পতিবারই দেবীবাবুকে বলল। রাজকুমারের কথায় তিনি গুরুত্ব দিলেন না। শুধু বললেন, "ঠিক আছে মাস্টার, "দেখছি।" রাজকুমার কিছুটা হতোদ্যম হয়ে শুক্র, শনিবার কাটিয়ে দিল। রবিবার দুপুরবেলা দেবীবাবু তপেনদা ও আশিসদাকে বালিতে পাঠালেন রাজকুমারকে ওর বাড়ি থেকে অফিসে তুলে আনতে।

লালবাজারে দেবীবাবু রাজকুমারকে বলল, "মাস্টার, তোমার খবর ঠিক, ওই অঞ্চলে হেনাবাবু আজকাল যাতায়াত করছে, অমিয়র বাড়িতে দু একদিন রাতও কাটিয়েছে।" তারপর দেবীবাবু রাজকুমারকে পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী বালি ও উত্তরপাড়ায় নজরদারি বাড়িয়ে দিতে বললেন। রাজকুমার এবার তার পাড়ার ক'টা ছেলেকে দিয়ে বিভিন্ন খোঁজখবর শুরু করল। দেবীবাবু হেনাবাবুর এক সঙ্গীর খোঁজ করতে তাকে বলেছিলেন। খোঁজ পাওয়া গেল,

সেই লোকটা উত্তরপাড়ার গৌরি সিনেমা হলের কাছে থাকে। সে ফুটবল খেলত আর ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে চাকরি করত। কিন্তু চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ইস্তফা দিয়েছে। অন্যদিকে উত্তরপাড়ার আর সি পি আই পার্টি অফিসে কে কে আসছে, যাচ্ছে, তারও তালিকা প্রতিদিন তৈরি হতে লাগল এবং সেসব লোকের গতিবিধির সূত্র ধরে হেনাবাবুর খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা শুরু হল।

কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়িটারও খবর পাওয়া গেল। সেটা দীপক সিনেমা হলের কাছে সরকারি আবাসনের একটা গলিতে দেখতে পাওয়া গেল। সেখানে একটা দীঘি আছে, সেই দীঘির দক্ষিণ পুব কোণে গাড়িটা থাকে এবং শিবু কংসবণিক নামে ওই কলোনির একটা ছেলে ওই গাড়িটাতে গাড়ি চালানো শেখে। আমাদের দল সেটার ওপর নজর রাখতে শুরু করল। প্রথমেই একদিন দুপুরে ওই গাড়ির চারটে চাকাই ফুটো করে দেওয়া হল, যাতে চট করে গাড়ি নিয়ে কেউ পালাতে না পারে।

আগস্ট মাসে খবর এল, হেনাবাবু হাওড়ার পার্বতী সিনেমা হলের পাশে হালদারপাড়া লেনে একটা ঘর ভাড়া করে আছেন। ওই অঞ্চলেই হেনাবাবুর আর এক সাকরেদ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। খবর পাওয়ার পরদিন সুভাষ দত্ত, মনাদা সহ আমাদের এক বিশাল দল রাত একটার সময় হালদারপাড়া লেনের ওই গলিতে হানা দিল। গলির ভেতর একটা একতলা বাড়ির ছোট একটা ঘর, যেটা চিহ্নিত করা হয়েছে হেনাবাবুর আস্তানা হিসাবে, সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের দল যখন বড় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে গলির মুখে পৌঁছে বিভিন্ন স্থানে নিজেদের পোজিশন নিচ্ছে, নিশুত রাতে টর্চের আলো, জুতোর আওয়াজ, রাতের পরিবেশকে করে তুলেছে ভারি, ঠিক সেই সময় ওই বাড়ির রাস্তার দিকের পুরনো নিচু প্রাচীর টপকে দুটো কালো ছায়া গলির উত্তর দিক ধরে গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পালানোর আগে একটা কালো ছায়া দক্ষিণ দিকে গলির মুখে দাঁড়ানো মনাদার পায়ের সামনে রিভলবার থেকে দুটো গুলি করল। পরিবেশ সেই গুলির শব্দে আরও ভারি হয়ে উঠল। কালো ছায়া দুটো এত দ্রুত অন্ধকারে মিশে গেল যে তাদের আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদের গুলির জবাবে আমাদের দল পাল্টা গুলি চালাতে গেলে মনাদা হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিল।

এবার সেই ঘরটায় তল্লাশি করা হল। ঘরের ভেতর পাওয়া গেল একটা সাইকেল, একটা বর্ষাতি, গামছা ও একজোড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি ও পায়জামা। সেগুলো নিয়ে আমাদের দল ব্যর্থ হয়ে রাত তিনটে নাগাদ লালবাজারে ফিরে এল। ওই দু'টো কালো ছায়ার একজন যে হেনাবাবুই, তা পালানো, গুলি চালানো ও ঘর তল্লাশি করেই বোঝা গিয়েছিল।

কিন্তু, কোথায় যেতে পারে? হাওড়া শহর থেকে বালি উত্তরপাড়া বেশি দূর নয়। পরদিন রাত দু'টো তিনটের সময় আমাদের এক বাহিনী হেনাবাবুর গোপন সূত্র ধরে বালি এবং উত্তরপাড়ায় হানা দিয়ে অমিয় গুপ্ত সমেত আরও চারজনকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এল। শিবু কংসবণিককে সেই রাতে তার বাড়িতে পাওয়া গেল না। লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপে তখনও কেবল সিং বন্দি। লক আপে কেবল সিংয়ের সঙ্গে অমিয় গুপ্তের দেখা হল। সে অমিয় গুপ্তকে পরামর্শ দিল, "মারের চোটে যখন একটা না একটা কিছু স্বীকার করতেই হবে, তখন হেনাদার কথা না বলে ন্যাশনাল গ্রিভলেজ ব্যাঙ্কের ডাকাতির কথা বলে দাও।" কিন্তু তা কি হয়? আমরা ওর কাছে খুঁজছি হেনাবাবুকে। ন্যাশনাল গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ডাকাতদেরও অবশ্যই খুঁজছি, কিন্তু যেটা স্বীকার করবে সেটা তো বাস্তবের সঙ্গে মিলতে হবে। মনগড়া কথা বলে বিভ্রান্ত করা যায় ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক। আর অমিয় গুপ্তের এত বুদ্ধি ছিল না যে, আমাদের মিথ্যা বলে বিভ্রান্তিতে ফেলে একেবারে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে।

পরদিনই অমিয় স্বীকার করল হেনাবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। সে বলল, "রানিগঞ্জের ডাকাতির পর আমি হেনাদার কাছে কিছু টাকা চাই। হেনাদা আমাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, এখন বাড়ি যা, পরে যোগাযোগ করে নেব। তারপর একদিন

সকালে বাড়িতে এসে ডেকে নিয়ে গেল শেওড়াফুলি, সেখানে একটা বাড়িতে সারাদিন ছিলাম। রাতে গাড়িতে চারটে কাঠের বাক্স তুলে আমার বাড়িতে আসে, সেদিন রাতে আমার সঙ্গে থাকে। সকালে আবার একটা ট্যাক্সিতে বাক্সগুলো তুলে নিয়ে চলে যায়। তারপর থেকে হেনাদার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই।"

অমিয় লালবাজারে থাকাকালীনই শিবুকে বালি থেকে গ্রেফতার করে আনা হল, কিন্তু ওর সঙ্গে ডাকাতিগুলোর কোনও সম্পর্ক না থাকাতে ওকে ছেড়ে দেওয়া হল।

এদিকে হেনাবাবুর খোঁজ আমরা পাচ্ছি না। দোসরা সেপ্টেম্বর সন্ধেবেলা আমাদের দফতরে খবর এল, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাট থানা এলাকায় একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ছিনতাই হয়েছে। খবরটা ছোট, কিন্তু আমাদের চিন্তার কারণ হল। আবার ওই গাড়িতে চড়ে কোনও ডাকাতদল কোনও ডাকাতি করবে কিনা। আমরা খোঁজ করে সেই ড্রাইভারকে পরদিনই ধরে জানতে পারলাম, কী ভাবে গাড়িটা ছিনতাই হল। তার মুখ থেকে ছিনতাইকারীদের চেহারার যে বিবরণ পাওয়া গেল, তাতে মনে হল, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হেনাবাবুর দলেরই সোমনাথ। চব্বিশ বছর বয়সী সোমনাথের চেহারাটা ছিল রোগা, লম্বা, ফর্সা এবং টিকালো নাকের ডগাটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা। সেই বিবরণ শুনে আমাদের আরও চিন্তা বাড়ল। কারণ তার একটাই অর্থ দাঁড়ায়, হেনাবাবু আবার একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করেছেন।

কোনখানে কবে ডাকাতিটা হতে পারে, সেই খবরের সন্ধানে আমাদের দফতর তোলপাড়। আমাদের যার যেখানে সূত্র ছিল, তাদের সক্রিয় করা হল। তিন তারিখ সন্ধেবেলাতেই মনাদার এক সূত্র থেকে খবর এল, হেনাবাবুরা পাঁচ সেপ্টেম্বর আনোয়ার শাহ রোডের ঊষা কোম্পানির ক্যাশ ভ্যান লুঠ করবে। কোম্পানি তাদের শ্রমিকদের মাইনে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে যখন কারখানার দিকে যাবে, সেই সময় বালিগঞ্জ অঞ্চলে ওই ক্যাশ ভ্যান আটকে ডাকাতি করা হবে।

এই খবর পাওয়ার পর চার তারিখ ভোরবেলাতেই দেবীবাবু ঊষা কোম্পানির অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা পরিকল্পনা করলেন। ঠিক হল, চার তারিখেই অর্থাৎ হেনাবাবুর পরিকল্পনার একদিন আগেই কোম্পানি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে কারখানায় নিয়ে যাবে, এবং যথারীতি একইভাবে পাঁচ তারিখেও কোম্পানি ভ্যান নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবে ও ফিরবে। কিন্তু ক্যাশ ভ্যানের ট্রাঙ্কে সেদিন কোনও টাকাই থাকবে না। কথা অনুযায়ী, সেদিনই কোম্পানি টাকা তুলল এবং আমরা সাদা পোশাকে একটা গাড়িতে চড়ে তাদের ভ্যানের পেছন পেছন পাহারা দিয়ে নিরাপদে কারখানা পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম।

পরদিন পাঁচ সেপ্টেম্বর। ঊষা কোম্পানির ক্যাশ ভ্যান লুঠ করার নির্দিষ্ট দিন। সকাল থেকে আমাদের দফতরে ব্যস্ততা। দেবীবাবু অফিসার ও কনস্টেবলের ছোট ছোট দল করে এক এক দলকে এক এক জায়গায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করলেন। ক্যাশ ভ্যানে ড্রাইভার হিসেবে থাকবে শুধু কোম্পানির নিজস্ব লোক, বাকি সব লোক আমাদের। সেখানে চারজন সাদা পোশাকের কনস্টেবলকে পাঠানো হল। যখন হেনাবাবুরা ভ্যান আক্রমণ করবেন, ওরাও তাদের রিভলবার বার করে পাল্টা আক্রমণ করবে। তাছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে কারখানা পর্যন্ত অন্য টহলদার বাহিনী তো থাকছেই।

একটা গাড়িতে আমি, রবি কর, আশিষদা ও রাজকুমার গেলাম গড়িয়াহাট-রাসবিহারী অ্যাভিনিউ অঞ্চলে, যে অঞ্চলে হেনাবাবু ডাকাতিটা করার পরিকল্পনা করেছেন বলে আমাদের কাছে খবর।

তপেনদা, সুধাংশু সাহা ও কনস্টেবল ভক্তি চক্রবর্তী আর বঙ্কিম বসু গেল বেলেঘাটায়। কারণ আরও একটা খবর এসেছিল যে হেনাবাবুকে ক'দিন ধরে বেলেঘাটা অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে তিনি কোনও ঘাঁটি গেড়েছেন, কিন্তু কোন বাড়িতে তা আমরা নির্দিষ্ট

করতে পারিনি। এমনকি ওই খবরটার যথার্থতারও প্রমাণ পাইনি। তবু সেই খবরকে গুরুত্ব দিয়েই দেবীবাবু তপেনদাদের সেখানে পাঠালেন। খবর যদি সত্যিই হয়, তবে হেনাবাবুরা ওই অঞ্চল থেকে ডাকাতির অভিযানে যাবেন। অভিযান শুরুর আগেই তাদের সেখানেই মোকাবিলা করা যাবে। দেবীবাবু নিজে লালাজারের কন্ট্রোল রুমে বসে সব দলের সঙ্গে ওয়ারলেসে যোগাযোগ রাখবেন।

এক এক করে সব দল সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ লালবাজার থেকে বেরিয়ে যে যার নির্দিষ্ট দিকে চলে গেল। আমরাও আমাদের গাড়ি নিয়ে গড়িয়াহাটের দিকে চললাম।

দুপুর একটা থেকে আমরা গড়িয়াহাট রোড ধরে টহল দিতে শুরু করলাম। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত একবার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, আবার ফিরে আসছি। ক্যাশ ভ্যান ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে আস্তে আস্তে ওই অঞ্চল দিয়ে দক্ষিণে আনোয়ার শাহ রোডের দিকে যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আড়াইটে তিনটে নাগাদ ভ্যানের যাওয়ার কথা। বারবার গাড়ি নিয়ে একই রাস্তায় চলাফেরা করলে হেনাবাবুদের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আমরা তাই মাঝে মধ্যে রাস্তার এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি, কিংবা স্রেফ আড্ডা মারার ভান করে নজর রেখে যাচ্ছি। এক দেড় ঘণ্টা এভাবে কেটে গেল।

বেলা আড়াইটে। রাস্তায় গাড়ি কিছুটা কম। আমরা আরও সজাগ হলাম কারণ এবার ক্যাশ ভ্যান আসার সময় হয়েছে। আমাদের গাড়ি ছুটল। যে কোনও জায়গা থেকে গুলি গোলার আওয়াজ শুনলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব।

বেলেঘাটায় তপেনদারা তখন গাড়ি রেখে হেঁটে টহল দিচ্ছেন। গাড়ি করে ঘুরে তো আর সব পথচারীর দিকে নজর রাখা যায় না। আর এমন কোনও নির্দিষ্ট স্থান নেই যেখানে হেনাবাবুরা আসবেন বলে জানা আছে। দু'টো আড়াইটে বেজে যাওয়ার পর তপেনদারা ধরেই নিয়েছেন, বেলেঘাটায় হেনাবাবুদের ধরা যাবে না। কারণ ডাকাতি করতে হলে তাদের ক্যাশ ভ্যানের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী দুটার অনেকটা আগেই বালিগঞ্জ অঞ্চলে পৌঁছে যেতে হবে। তপেনদারা গা এলিয়ে তবু এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন।

নারকেলডাঙ্গা মেন রোড ও ষষ্টিতলার মোড়ের কাছে তাঁরা হাঁটছেন। তখন তিনটে বাজেনি। মিনিট দশেক বাকি। হঠাৎ চমক। হেনাবাবু এক যুবকের সঙ্গে গল্প করতে করতে উল্টোদিক থেকে আসছেন। ওঁদের সঙ্গে হাত পঁচিশ-তিরিশ দূরত্ব। হেনাবাবুও তপেনদাদের দেখে ফেলেছেন। ওরা দু'জন না দেখার ভান করে দ্রুত রাস্তাটা পার হয়ে উল্টো দিকে গিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। তপেনদারাও ওদের পেছনে ছুটতে শুরু করলেন।

ওদের পিছু নিতে দেখে কোমর থেকে হেনাবাবুরা দুজনেই পিস্তল বার করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলেন। তপেনদারা চিৎকার করে আশেপাশের লোকজন ও পথচারীদের বলতে লাগলেন, “ডাকাত, ডাকাত, পাকড়াও ওদের।” বেশ কিছুটা ছোটার পর একজন সাইকেল আরোহীকে ধরে হেনাবাবু ও তার সঙ্গী জোর করে কেড়ে নিলেন তার সাইকেল, তারপর হেনাবাবু সাইকেলের সামনের রডে বসলেন আর সঙ্গী সাইকেল চালিয়ে আরও দ্রুত ওখান থেকে পালানোর চেষ্টা করল। হেনাবাবুর হাতে খোলা পিস্তল। সঙ্গী তার কোমরে গুঁজে নিয়েছে নিজের পিস্তলটা। তপেনদারা ছোটা থামাননি। তাঁদের সঙ্গে জুটে গেছে আশেপাশের বেশ কিছু লোক, তারাও হইহই করে ছুটছে। হেনাবাবুর সঙ্গীর চেহারা দেখে তপেনদারা মোটামুটি আন্দাজ করেছেন, সে হচ্ছে সোমনাথ। তার অর্থ, সেও এই অঞ্চলে অপরিচিত। কারণ সে হাওড়ার ছেলে। বেলেঘাটার লোকজন যে তাঁদের দুজনকে চেনেন না, সেটা তাঁদের আচরণ দেখেই তপেনদারা বুঝে গেছেন। বোঝা গেল, সোমনাথও ওই অঞ্চল চেনে না। ওরা ঢুকে পড়ল রেললাইনের ধারে সরু গলি মহেশ বারিক লেনে।

তপেনদারা যখন হেনাবাবুদের তাড়া করছেন, আমরা তখন গড়িয়াহাট মোড়ে। ওয়ারলেসে দেবীবাবুর নির্দেশ এল, “রাশ টু মহেশ বারিক লেন, বেলেঘাটা, এনকাউন্টার ইজ গোয়িং অন দেয়ার বিটউইন তপেন এণ্ড হেনা।” দেবীবাবুর নির্দেশ পেয়েই, এতক্ষণ

আমাদের টিমে চলা গাড়ি দ্রুত ছুটতে শুরু করল মহেশ বারিক লেনের উদ্দেশে।

বেলেঘাটায় তখন অন্য নাটক। হেনাবাবুর সাইকেল যেদিকে চলছিল তার উল্টোদিক থেকে বেশ কিছু লোক চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এসে ওদের সাইকেল ধরে ফেলেছে। হেনাবাবুরা বিপদ বুঝে সাইকেল ফেলে দিয়ে আবার ছুটতে শুরু করলেন। আবার তাঁরা পিস্তল থেকে শুরু করলেন গুলি ছোঁড়া।

রেললাইনের পাশে একটা খোলা মাঠে বছর চোদ্দ পনেরোর বিজয় রাই নিজের আনন্দে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে একবার হইচইয়ের দিকে ফিরে আবার ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে ঠুনকি দিয়ে দিয়ে সুতো ছাড়তে শুরু করল।

মহেশ বারিক লেনে তখন জনতার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন হেনাবাবু ও সোমনাথ। একটা গুলি এসে লাগল বিজয়ের বুকে। আচমকা প্রচণ্ড ঝাটকায় তার হাত থেকে ছুটে গেল সুতো। ঘুড়িটা তার ওস্তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে টলমল করতে করতে উড়ে যেতে লাগল অনিশ্চিতের উদ্দেশে। তার ওস্তাদ বিজয়ও টলতে টলতে পড়ে গেল মাটিতে। অনিশ্চিত নয়, নিশ্চিত, শেষ।

জনতা আরও ক্ষেপে গেল। তারা পিস্তল উপেক্ষা করে ধেয়ে এল হেনাবাবু ও সোমনাথের দিকে। হাতের সামনে যে যা পেল তাই দিয়ে ওদের মারতে লাগল। ইঁট, পাথরের বৃষ্টি ঝরতে লাগল তাদের মাথায়, বুকে, পেটে। অনেকে তাদের মারতে লাগল লাঠি দিয়ে। তপেনদা ছুটে এসে জনতার হাত থেকে হেনাবাবুদের বাঁচাতে গেলেন। জনতার রোষ তাঁদের ওপরও পড়তে লাগল কিল, ঘুষি, চড়, ইঁটের আঘাত হয়ে। ইতিমধ্যে জনতার মাঝে আরও একজনের বুকে গুলি লেগেছে, সে পড়ে আছে রাস্তার ওপর। দু'দুটো মৃত্যু চোখের সামনে দেখে জনতা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে তপেনদারা তাদের থামায় কোন সাধ্য?

হেনাবাবু ও সোমনাথ পড়ে গেছে রাস্তার ধারে নর্দমার পাশে। বঙ্কিম ও ভক্তি মার খেতে খেতেও হেনাবাবুর শরীর আগলে রাখার চেষ্টা করছে। তপেনদা আড়াল করেছেন সোমনাথকে। সুধাংশুবাবু চিৎকার করে বলে চলেছেন, "ওদের এভাবে মারবেন না, আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, আমরা পুলিশ, আমরা ওদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাব।"

বেকার সুধাংশুবাবুর অনুরোধ। যেখানে পাড়ার লোকের দুটো লাশ চোখের সামনে, সেখানে ওই রকম নিরামিষ কথা শুনতে যাবে কে? নারকেলডাঙ্গা থানার একজন অ্যাসিসট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও একজন কনস্টেবল নারকেলডাঙ্গা মেন রোড দিয়ে যাচ্ছিল, তারা ওই গণ্ডগোল শুনে এগিয়ে গেল মহেশ বারিক লেনের দিকে। জনতার কাছে তারা পৌঁছতেই জনতা তাদের তাড়া করল, তারা পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল।

অন্যদিকে আমাদের গাড়ি ছুটছে উর্ধ্বগতিতে। এত জোরে ছুটছে যে গড়িয়াহাট রোড পার হয়ে পার্ক সার্কাস পেরিয়ে সি. আই. টি. রোড ধরে কনভেন্ট রোড পৌঁছতে আমাদের লাগল মাত্র মিনিট দশ। আমাদের ওই পাগলের মতো গাড়ি ছোটানোর কারণ আমরা জানি, হেনাবাবু চট করে খালি হাতে ঘোরাফেরা করেন না। সঙ্গে একটা না একটা আগ্নেয়াস্ত্র থাকবেই। সেখানে আমাদের দলের সঙ্গে গুলি বিনিময় হলে যে কোনও পক্ষের লোকের সেই গুলি লাগতে পারে।

আমাদের মহেশ বারিক লেনে পৌঁছতে লাগল মিনিট পনেরো ষোল। অসম্ভব ভিড়। সেই ভিড়ের দৃষ্টি একই জায়গায় আটকে আছে। সেই ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু ভেতরে কী হয়েছে তা আমরা

জানি না। জনতার চিৎকারে কিছু বোঝাও মুশকিল। শুধু ডাকাত ডাকাত আওয়াজ ছাড়া কিছু নেই। কোনমতে আমরা চারজন ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে পড়লাম বললে ভুল হবে, "সরুন, সরুন, আমরা লালবাজারের পুলিশ" চিৎকার করতে করতে, গালাগালির অবিশ্রান্ত ধারা হজমের সঙ্গে কুস্তির কসরৎ সহযোগে যখন ঢুকলাম, দেখি তপেনদা নর্দমার ধারে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন, তার নিচে একটা লোক। তপেনদার থেকে

হাত পাঁচেক দূরে একইরকমভাবে শুয়ে আছে ভক্তি ও বঙ্কিম।

রাজকুমার ছুটে গিয়ে তপেনদাকে টেনে তুলল। নিচে যে লোকটা শুয়ে আছে সে সোমনাথ। সারা গায়ে কাদা মাখা, মারের চোটে অজ্ঞান। বঙ্কিমকে চেনা দায়। রক্তমাখা, হাঁপাচ্ছে। তারা দুজন হেনাবাবুকে আগলে রেখেছিল। অচৈতন্য হেনাবাবু শুয়ে আছেন। মাথা, নাক, মুখ, দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, সারা শরীর রক্তমাখা। শরীরের রক্তাক্ত জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন। দু'দুটো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পিস্তল, সেগুলোও রক্তমাখা। সে দুটো যে হেনাবাবুদের, তা আর আমাদের বলে দিতে হল না। কারণ আমাদের দল ওই ধরনের পিস্তল ব্যবহার করে না। আমরা পৌঁছনোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ডিসি (নর্থ) প্রকাশ ভট্টাচার্য বিরাট বাহিনী নিয়ে হাজির। এতে আমাদের সুবিধা হল। তিনি জনতাকে সরিয়ে দিতে লাগলেন। হেনাবাবু ও সোমনাথকে তুলে ছুটলাম আমাদের গাড়ির দিকে। ওদের দুজনকে গাড়িতে তুলে আমাদের বসার আর জায়গা নেই। রাজকুমার একা ওদের নিয়ে ছুটল সোজা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

ডিসি (নর্থ) চলে গেলেন বিজয়দের খোঁজ নিতে। আমরা তপেনদাদের নিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুলে দিলাম। গাড়ি চলল লালবাজারের দিকে। আমরা ট্যাক্সি ধরে চলে এলাম মেডিক্যাল কলেজ, সেখানে ইতিমধ্যে রাজকুমার ভর্তি করিয়ে দিয়েছে হেনাবাবু ও সোমনাথকে।

সন্ধেবেলা কমিশনার পি.কে সেন ও দেবীবাবু গেলেন হাসপাতালে হেনাবাবুদের দেখতে। অন্য এক দল গেছে বেলেঘাটায় হেনাবাবু যে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন, তা তল্লাশি করতে। সেই ঘরের ঠিকানা আমরা পেয়ে গেছি, হেনাবাবুর ছেঁড়া জামার পকেট থেকে পাওয়া কিছু কাগজপত্তর থেকে। সেই ঘরে পাওয়া গেল একটা কার্বাইন, কিছু গুলি, পাঞ্জাবি, পায়জামা।

গভীর রাতে খবর এল, হেনাবাবুর চেতনা আর কোনদিন ফিরবে না। হেনাবাবুর ডাক নাম ছিল ঠাণ্ডা। সেই নামের সঙ্গে মিলে গেল তাঁর শরীর, যা ঠাণ্ডা হয়ে পোস্ট মর্টেমে যাওয়ার অপেক্ষায় মেডিক্যাল কলেজের ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকে গেল। শেষ হয়ে গেল এক যাযাবর চরিত্রের সন্ত্রাসবাদীর জীবন, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উচ্চমার্গীয় থাকলেও রাজনৈতিক পরিপক্বতা ও মতাদর্শের ভিত ছিল একেবারেই সাদাসিধা, কাঁচা এবং বৈপরীত্যে ভরা দিশাহীন।

কিছুতেই বোঝা যায় না, নিজেকে একজন কট্টর মার্কসবাদী হিসাবে দাবি করে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য ডাকাতির উদ্দেশ্য ঘোষণা করে, কেন তিনি তার রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিপরীত শিবিরের নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন শুধু নয়, তাদের আনুকূল্যে পাওয়ার চেষ্টা করতেন।

তিনি অক্টোবরের তিন তারিখে গুয়াহাটি থেকে সুশানকে চিঠিতে লিখলেন, সুশান, তোমাদের পাড়ার পুজোয় শ্রী অতুল্য ঘোষকে প্রেসিডেন্ট করবার কথাটা ভোলাদার সঙ্গে আলোচনা করবে।...যদি ভোলাদা মনে করেন আমার অতুল্যদার সঙ্গে কথা বলার দরকার আছে, আমাকে যেন টেলিগ্রাম করেন।- - ইতি হেনাদা।

হেনাবাবুর কিসের তাগিদ ছিল অতুল্য ঘোষকে জড়ানোর? বোঝা যায় না। তবে একটা জিনিস বোঝা যায়, তিনি রাজনৈতিক দিশাহীনতায় ভুগছিলেন। তাই একদিকে মার্কসবাদী অন্যদিকে কালীবিশ্বাসী। একদিকে ডাকাতি, অন্যদিকে অতুল্য ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জন্যই অকালে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।

তিনি যখন তপেনদাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং দৌড়তে শুরু করেছিলেন, তখন কেন তিনি হঠাৎই পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে গেলেন? এই গুলি ছোঁড়াটাই তাঁর জীবনে সর্বনাশ হয়ে দেখা দিল। তপেনদারা তো প্রথমে গুলি ছোঁড়েননি তার দিকে লক্ষ্য করে। তিনিই ছুঁড়েছিলেন, এবং সেই গুলি ছোঁড়ার ফলে তপেনদাদের "ডাকাত, ডাকাত" চিৎকারের

বিশ্বস্ততা তৈরি হয়ে গেল। গুলি ছোঁড়ার পরিণতিতে দুটো প্রাণ ঝরে গেল। জনতা তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এবং যে ওষুধ প্রয়োগ করে তপেনদারা হেনাবাবুদের ধরতে চেয়েছিলেন, সেই ওষুধের প্রয়োগের মাত্রা হেনাবাবু নিজের হাতে আরও বেশি করে দিলেন। ফলে তপেনদারা যখন সেই ওষুধ ফেরত নিতে গেলেন, জনতা আর তাদের কথায় কর্ণপাত করল না।

যদি হেনাবাবু গুলি না ছুঁড়তেন, তবে কী হত? হয় তিনি তপেনদাদের হাতে গ্রেফতার হতেন অথবা পালিয়ে যেতে সমর্থ হতেন। অকালে জীবনটা হারাতেন না। ওই ঘিঞ্জি গলিতে কী ভেবে তিনি পিস্তল বার করতে গেলেন? তিনি কি ভেবেছিলেন তাঁর পিস্তলের গুলির ভয়ে তপেনদারা পালিয়ে যাবেন? এই ভাবনাটাই তো ভুল। এই সিদ্ধান্তের পেছনেও তাঁর চিন্তার দৈন্যতা ফুটে উঠেছে। কারণ এই চিন্তার মধ্যে বাস্তববোধের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, তিনি গ্রেফতার এড়িয়ে পালাতে চেয়েছিলেন ঠিকই, এমন কি তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে পিস্তল বার করেছিলেন তাও সত্যি, কিন্তু অপরিচিত এলাকায় সে পিস্তলের গুলির পরিণতি কী হতে পারে তা তিনি চিন্তাও করেননি। যেমন চিন্তা করেননি একটার পর একটা ডাকাতি করে কী করবেন? সংগঠন গড়ে তোলা ও সেই সংগঠনকে রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো দক্ষতাও তিনি দেখাতে পারেননি। তিনি যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলতেন, তাও কখনও পরিষ্কার করে বোঝাতে পারেননি। কোন পথে তিনি সশস্ত্র বিপ্লব করবেন, সেই সম্পর্কেও তাঁর ধারণার বা চিন্তার কোন প্রামাণ্য দলিল আমাদের হাতে আসেনি। তিনি চিন না সোভিয়েত, কোন পন্থী ছিলেন তাও পরিষ্কার নয়। বলা যেতে পারে, তিনি কিছুটা চে গেভেরার মতো ভবঘুরে। যদিও চে গেভেরার রোমান্টিকতাই হেনাবাবুর মধ্যে ছিল, কিন্তু চে'র মতো রাজনৈতিক চিন্তা ও সেই রাজনীতির দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার কোনও সংগ্রাম তাঁর মধ্যে ছিল না। একটা দেশের সশস্ত্র সংগ্রামের যে প্রধান শক্তি, সেই কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার ও সংগঠন গড়ে তোলার কোনও চেষ্টাও তাঁকে করতে আমরা দেখিনি। তিনি ডাকাতির টাকাগুলো নিয়ে কী করেছিলেন তার কোনও হদিসও আমরা পাইনি। অথচ তিনি যে সেই টাকা ব্যক্তিস্বার্থে খরচ করেননি তাও নিশ্চিত। গুয়াহাটির কুমারপাড়ায় বি আর ফুকন রোডে তাঁর বাড়িতে খুবই দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটাতেন তাঁর মা ও বোন। ডাকাতির ছিটেফোঁটা টাকাও তাঁদের জন্য হেনাবাবু খরচ করেননি। অর্থাৎ তিনি যেসব গুপ্তস্থানে লুণ্ঠিত টাকা রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর 'স্থানের অধিকর্তা' সেই টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

হেনাবাবু মারা গেলেও সোমনাথ বেঁচে গেল। মহেশ বারিক লেনের ঘটনায় সোমনাথের একটা পা ভেঙে গিয়েছিল। সেই পা সারিয়ে সোমনাথ বছর চারেক জেলে কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল হেনাবাবুর সবরকমের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের যোগ কিংবা বিয়োগ ফলের অংক।

হেনাবাবু মারা যাওয়ার অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল আর এক যোগ কিংবা বিয়োগ অংকের খেলা। যা সত্তরের প্রথম থেকে ক্রমাগত উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়তে লাগল পশ্চিমবঙ্গের বুকে। প্রসব যন্ত্রণার সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি দাঁড়াল সেই কাল।

যে ভ্রূণের সঞ্চার সাতষট্টিতে নকশালবাড়ির মাটিতে হয়েছিল, তা বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাত ধরে লালিত হয়ে বড় হতে হতে উনসত্তরের পয়লা মে শহীদ মিনারে ঘোষিত হয়ে ঠিক এক বছর পর সত্তরের মে মাসের এগারো তারিখে বেহালায় সি.পি.আই.(এম.এল) পার্টির প্রথম গোপন কংগ্রেসের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হল সে।

সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে যা দেখা যায়নি, এখানে তা দেখা গেল। এই কংগ্রেস থেকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক চারু মজুমদারকে পার্টির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একক কর্তৃত্ব দেওয়া হল। লেনিনকে কী সোভিয়েত পার্টিতে কিংবা মাও সে তুঙকে কি চিনা কমিউনিস্ট পার্টিতে এইভাবে একক কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল? অর্থাৎ কর্তার নীতির বিরোধিতার অর্থ পার্টি থেকে বহিষ্কার এবং প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে খতম। কিন্তু সি.পি.আই.(এম. এল)-এর জন্মলগ্নের ঘোষিত নীতিতেই রয়ে গেল একনায়কতন্ত্রের বীজ। অবশ্যই সুশীতল রায়চৌধুরী, সত্যনারায়ণ সিং সহ বেশ কয়েকজন এইভাবে একক কর্তৃত্বের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সরোজ দত্তের প্রবল সমর্থনে ও সৌরেন বসু, কানু সান্যাল, সুনীতি ঘোষ, অসীম চট্টোপাধ্যায়, নাগভূষণ পট্টনায়েকের মৌনতায় সুশীতল রায়চৌধুরীদের বিরোধিতা টিকল না। ফলস্বরূপ, ভূমিষ্ঠ সন্তানের জনক হিসাবে চারুবাবু কর্তৃত্ব শুরু করলেন এককভাবে।

পার্টি কংগ্রেসের যে কর্মসূচী নেওয়া হল, তা রূপায়ণের জন্য চারুবাবু যে পথের নির্দেশ দিলেন, তা হল 'শ্রেণীশত্রু খতমের' পথ। তিনি ওই কংগ্রেসেই বললেন, "শ্রেণীশত্রু খতম আমাদের একটা অস্ত্র যা কিনা বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীদের কাছে বিশাল বিপদ। আর আমাদের গৃহীত খতম যুদ্ধ আমাদের দু'ধরনের কাজের মধ্যে যোগসাধন করছে, একদিকে আমাদের দেশ ও জনগণকে মুক্ত করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটাচ্ছে।"

তিনি দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললেন, "ভারতের প্রতি কোণ অগ্নিগর্ভ এবং বিপ্লবের গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছে।" তাই তিনি প্রাচীন লেনিনীয় পথের পরিবর্তে মাওয়ের পথে যেতে বললেন, 'একমাত্র খতম অভিযান চালিয়েই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব।" যুদ্ধের কৌশল হিসাবে ঘোষণা করলেন, "গণসংগঠন নয়, একমাত্র গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েই জনগণকে জোটবদ্ধ করা যাবে।" তারপর সোজাসুজি বললেন, "চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চিনের পথ আমাদের পথ।"

পরিশেষে পার্টি কংগ্রেসের উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে 'গলা কাটার' নির্দেশ দিয়ে বললেন, "এই পথে চললে, সত্তরের দশকে আমাদের দেশ মুক্ত হবেই হবে।"

বেহালার কংগ্রেসের নীতিগ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়ে গেল নতুন করে খতম অভিযানের পালা। এবং যে অচলায়তন সমাজকে ভাঙার একটা প্রবল তাগিদ যুব সমাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা ঢুকে গেল 'শত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত করার' খুনী রাজনীতির গহ্বরে। অপরিপক্ক তরুণ তরুণীর মস্তিষ্কে সব কিছু ভাঙার নেশা এমনভাব গেঁথে গেল যে 'বুর্জোয়া শিক্ষা' ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার খেলায় তারা ভাঙতে লাগল সবরকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তারা প্রাচীন ও অতীতকে অস্বীকার করতে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল সব মনীষীর মূর্তি ও ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান।

যদিও নকশালদের পার্টি কংগ্রেসের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল চারুবাবুর খতম ও মূর্তি ভাঙার নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যকলাপ, কিন্তু ওই কংগ্রেসের পর তা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ

হতে লাগল।

এখনও যারা সেই খুন ও আত্মহননের রাজনীতির গুণকীর্তন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে ও প্রগতিশীলতার দাবি করে, তাদের কাছে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা জাগে, চারুবাবুর রাজনীতির ধারক বাহক কারা ছিল? তারা বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে আসা লোকজন ও তরুণ তরুণী নয় কি? চারুবাবুর রাজনীতি কি শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সামান্যতমও প্রভাব ফেলেছিল? যে অচলায়তন সমাজের বদলে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নের কথা বলা হয়েছিল তা কি ওই মুষ্টিমেয় তরুণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? অথচ ওই তরুণদের চারুবাবু মিথ্যা খবরের মাধ্যমে তাতিয়ে রাখতেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণ অগ্নিগর্ভ বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি প্রচার করতেন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের বিস্তৃত অঞ্চল মুক্ত, বিহারের চম্পারণ, মাগুরজানসহ বহু অঞ্চল নিজেদের দখলে, পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর, বীরভূমের গ্রামাঞ্চলের অংশবিশেষ "চারুবাবুর বাহিনীর হাতে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? না। ওইসব অঞ্চলে নকশালরা কিছু জোতদার এবং সরকারী কর্মচারীকে খুন করেছিল ঠিকই, কিন্তু 'মুক্তাঞ্চল' বলতে যা বোঝায় কোনদিনও তা হয়নি। কিছু ত্রাস সৃষ্টি করলেই কি এলাকা মুক্ত হয়ে যায়?

স্বপ্ন এক জিনিস আর বাস্তব অন্য। চারুবাবু নিজের গড়া স্বপ্নের সৌধে নিজের চৌহদ্দিতে বাস করে আকাশকুসুম কল্পনা করতেন। তাই তিনি মিথ্যা প্রচার ও ভ্রান্ত রাজনীতির আড়ালে 'খতমের' অভিযান চালিয়ে যেতে পার্টি কর্মীদের বললেন।

অবশ্য সব দায়িত্বই তাঁর ছিল না। প্রথমদিকে নকশালদের স্বপ্নের দৌড়ে চিনা কমিউনিস্ট পার্টিরও পরোক্ষ মদত ছিল। বেজিং রেডিও থেকে নকশালবাড়ির আন্দোলনের সপক্ষে বক্তব্য রাখা ছাড়াও চিনা পার্টির মুখপত্র 'পিকিং রিভিউয়ার আটষট্টি সালের বারো জুলাই সংখ্যায় নকশাল আন্দোলনকে ব্যাপক ছাড়পত্র দেয়। তাতে লেখা হল, "সাতষট্টি সালের শুরুতে ভারতের বুকে কালবৈশাখী ঝড়ের বজ্র নির্ঘোষ নিনাদিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কৃষক বিপ্লবের সঙ্গে মিলে নকশালবাড়ি ও দার্জিলিং জেলার অন্যান্য স্থানে সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছে।" এরপর নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসুদের তুলোধোনা করে নকশালদের সমর্থন করা হয়েছিল ওই নিবন্ধে।

নকশালবাড়ির কৃষকদের আন্দোলনকে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করার পর, চারুবাবু ভাবলেন, বোধহয় চিনা পার্টির পুরোপুরি সহযোগিতা পেয়ে যাবেন। তাই তিনি লিখে ফেললেন, 'যিনি অনেক বই পড়েছেন তাঁর সঙ্গে শুধু রেডবুক পড়েই আলোচনা করা যেতে পারে। চারুবাবু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে তুঙের মতবাদের একেবারে ছোট্ট সারাংশ করে নকশাল তরুণ তরুণীদের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। চিন পার্টির ওই রেডবুক নকশালদের কাছে বেদবাণীর মতো হয়ে গেল। ফলে 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস' এই বিশ্বাস জন্মে গেল তাদের মনে। আর সেই বন্দুকের নল দিয়ে কতগুলো অপরিণত, অতি উৎসাহী তরুণ-তরুণী মারফৎ ইতিহাসের চাকাকে একা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন চারুবাবু।

নকশালদের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের আগেই চারুবাবু 'গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সংমিশ্রণের' একটা সরবৎ বানিয়ে কমীদের গিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে, তাদের কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির আগেই তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে স্কুল-কলেজে আক্রমণ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে এখানে সেখানে খুন করা শুরু করে দিয়েছিল।

সত্তরের চোদ্দই জানুয়ারি দুপুর দু'টো নাগাদ চল্লিশ পঞ্চাশ জন নকশাল প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকে তছনছ করে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ফটো দুটো ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল।

ফেব্রুয়ারির আঠার তারিখে বিপ্লবী হালিমের নেতৃত্বে একদল নকশাল বালিগঞ্জের বিজ্ঞান কলেজে বাংলা এম এ পরীক্ষা চলার সময় হলে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের থেকে প্রশ্নপত্র কেড়ে নিয়ে সেগুলো পুড়িয়ে, পরীক্ষার্থীদের হল থেকে বার করে দিল। চব্বিশ তারিখ দুপুরে

প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নকশালপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে, অন্যান্য মতাবলম্বী ছাত্রদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ হল।

মার্চের দু তারিখে আবার বারো পনেরো জন নকশাল ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের অফিসে ঢুকে আসবাবপত্র, ফটো ভেঙে চুরমার করে চলে গেল। মার্চ মাস জুড়ে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে চলল নকশাল ছাত্রদের তাণ্ডব।

এপ্রিলের সতের তারিখ দুপুর বারোটা নাগাদ ময়ূরভঞ্জ স্ট্রিটের জ্ঞানচন্দ্র পলিটেকনিকে জনা পনেরো নকশাল যুবক, প্রিন্সিপ্যালের অফিসে ঢুকে টেলিফোনের তার ছিঁড়ে, অফিসের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে, লাইব্রেরিতে গিয়ে সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় আগুন দিয়ে, গান্ধীজীর ছবি পুড়িয়ে স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল।

বিশে এপ্রিল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুপুরবেলা গোটা কুড়ি নকশাল প্রিন্সিপ্যালের অফিস ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে রাস্তায় এসে তিনটে সরকারি বাসে আগুন লাগিয়ে দিল। এর ঠিক দু'দিন আগে তারা মহাত্মা গান্ধী রোড ও সূর্য সেন স্ট্রিটের মোড়ে একটা ট্রামে আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়েছিল।

একুশ তারিখ বিকেল চারটের সময় পার্ক ইন্সটিটিউটে দশ জন নকশাল ছাত্র ঢুকে প্রধান শিক্ষকের অফিসের একই হাল করল।

তেইশে এপ্রিল বিকেলবেলা নকশাল ছাত্ররা বেঙ্গল ভেটেরনারি কলেজের অফিসে বোমা নিয়ে আক্রমণ করে অফিসের কাগজপত্র, আসবাব জ্বালিয়ে দিল। দুজন সাধারণ ছাত্রও বোমার আঘাতে আহত হল। সেইদিনই নীলরতন সরকার হাপাতালের নকশাল ছাত্ররা হাসপাতাল বন্ধ রেখে হরতাল পালন করল, বিভিন্ন স্কুল কলেজে পুলিশী পাহারার বন্দোবস্তের প্রতিবাদে।

সাতাশ তারিখ দুপুর দু'টো নাগাদ দশ পনেরো জন নকশাল আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকে চেয়ার, টেবিল, দেওয়াল ঘড়ি ভেঙে, জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে কলেজের ছাদে লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল।

আঠাশ তারিখে তিন চারজন নকশাল দুপুরবেলা শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিসে ঢুকে স্লোগান দিতে দিতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে গান্ধীজী ও নেহেরুর ফটো ছিঁড়ে দিয়ে পালাল।

তিরিশে এপ্রিল সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ক্রিস্টোফার রোডের পাঁচকড়ি রাধারাণি আদর্শ বিদ্যালয়ে কুড়ি পঁচিশজন নকশাল ঢুকে প্রধান শিক্ষকের ঘরের সব ভেঙেচুরে, স্কুল বাড়ির দোতলায় একটা লাল পতাকা উড়িয়ে চলে গেল।

দোসরা মে রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের কেশব একাডেমিতে নকশাল ও অন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। সেদিনই দুপুরবেলা রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের জয়পুরিয়া কলেজে পনেরো কুড়িজন নকশাল প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকে সব কিছু ভেঙে দিল।

চার তারিখে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গোটা পনেবো নকশাল ছাত্র আর জি কর হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ডে ঢুকে হাওড়ার শিবপুর নিবাসী নারায়ণ চন্দ্র দে নামে বোমার আঘাতে আহত এক রোগীকে ছুরি মেরে পালাল।

পাঁচ মে সকালে এন্টালি একাডেমিতে, সাত মে সন্ধেবেলা সিটি কলেজ অফ কমার্সে, আট মে দুপুরে বঙ্গবাসী কলেজে ও আশুতোষ কলেজে একই কায়দায় নকশালরা হামলা করে ভাঙচুর করল।

এগুলো সবই নকশালদের প্রথম পার্টি কংগ্রেস সমাপ্ত হওয়ার আগের 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' নমুনা মাত্র। 'কংগ্রেস' শেষ হওয়ার পর যা আরও ব্যাপক ও তুমুলভাবে হয়েছিল।

কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনও স্কুল কলেজ ছিল না যা কিনা চারুবাবুর দলের 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' ধ্বংসাত্মক থাবা থেকে রক্ষা পেয়েছে। ফলে, যে সব ছাত্রছাত্রী

চারুবাবুর ডাকে 'বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ছেড়ে চারুবাবুর দলে যোগ দিয়েছিল শুধু তাদেরই পড়াশুনা নষ্ট হল না, অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও শিক্ষায় ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটল। নকশালদের ক্রমাগত হামলার জন্য স্কুল কলেজের প্রশাসন একেবারে ভেঙে পড়ল। শিক্ষা ব্যবস্থায় চলে এল চরম অরাজকতা। পরীক্ষায় নকল করাটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে জলভাত হয়ে গেল। পরীক্ষা হলের পরিদর্শকরা ভয়ে চোখ বুজে থাকতেন। এই প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি দেখা দিয়েছিল বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর সালের কংগ্রেসী শাসনে।নকশালদের 'কংগ্রেসের' আগেই খুন হয়ে গিয়েছিল কাশীপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রশান্ত সেন নিয়োগী, মেদিনীপুরের ডেবরা, গোপীবল্লভপুরের বেশ কিছু ভূস্বামী। অর্থাৎ "গণতান্ত্রিক বিপ্লবের" নামে চারুবাবুর মস্তিষ্কজাত সন্তান 'গলা কাটার সন্ত্রাস' ওদের কংগ্রেসের ঘোষিত রণকৌশল আগেই একটু একটু প্রয়োগ শুরু হয়েছিল।

মার্চ মাসের সাত তারিখ দুপুর বারোটা নাগাদ কসবার পুরনো মস্তান দেবা দত্তকে কলেজ স্ট্রিটে ধরল নকশাল প্রদীপ ধর ও চন্দন বসাকরা। তাকে তারা টানতে টানতে নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সি কলেজের ভেতর। তারপর ছাদে। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশালদের অবাধ গতি। ছুটির দিন হোক বা না হোক তাদের বাধা দেওয়ার দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারে না। দেবাকে বেঁধে রেখে প্রদীপরা প্রথম আলোচনা করল দেবাকে তারা সেখানেই খুন করে দেবে নাকি তাদের কসবার 'কমরেড' শ্যামল ভট্টাচার্যকে খবর পাঠিয়ে ব্যবস্থা নেবে। ঠিক হল, শ্যামলকে ওরা খবর দেবে এবং শ্যামলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নিতাই ও তারক ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল কসবায় শ্যামলকে খবর দিতে।

দেবা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাদে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। দেবা বহুদিনের ঘুঘু মস্তান, এই পরিস্থিতিতে কোনদিন পড়েনি। সে কিছুদিন আগে শ্যামল, শম্ভু, মনা, রানার তাড়া খেয়ে কসবা ছেড়ে পালিয়ে এসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের একটা বাড়িতে থাকতে শুরু করেছে। সেখান থেকে সকালে কলেজ স্ট্রিটে এসেছিল তার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে। কিন্তু রাস্তাতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় প্রদীপদের। প্রদীপরা যে তাকে চিনে ফেলবে সেটা দেবা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ভাবলে সে এই বোকামিটা করত না। আসলে কসবায় সি পি এম ও নকশালদের এলাকা দখলের লড়াইয়ের দু'মুখো চাপে সে পিছু হঠে কসবা ছাড়তে বাধ্য হয়।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে শ্যামলকে নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাদে হাজির নিতাইরা। শ্যামল তার 'শ্রেণীশত্রু' দেবাকে দেখে আনন্দে প্রদীপকে জড়িয়ে ধরে লাফিয়ে উঠল। বেঁটে, গোলগাল চেহারার শ্যামল এমনিতে কথা বলে কম। সে প্রদীপকে ছেড়ে, দেবার কাছে গিয়ে মুখ থেকে শুধু একবার 'শালা' শব্দ বার করে ডান পায়ে পরপর মারল দেবার পেটে বুকে কটা লাথি। দেবা কঁকিয়ে উঠে শুয়ে রইল।

চন্দন শ্যামলকে প্রশ্ন করল, 'একে কি এখানেই খতম করে দিবি?"

শ্যামলের চোখ চকচক করছে, সে মাথা নেড়ে বলল, "না, একে কসবায় নিয়ে গিয়ে সাবাড় করব। তাহলে ওখানে আমাদের পার্টির আরও জোর বেড়ে যাবে। কসবার লোকেরা দেবাকে ঘৃণা করে, ওকে খতম করতে দেখলে তারা আমাদের দিকে চলে আসবে।" প্রদীপ বলল, "ঠিক আছে, তবে তাই কর।" রোগা, মাঝারি উচ্চতার তরুণ প্রদীপ আবার ছিল তাত্ত্বিক নেতা। কিন্তু ধনী ডাক্তারের একমাত্র ছেলে কালো, রোগা, বোমা বানানোর সময় দুর্ঘটনায় বাঁ হাতের কব্জির থেকে পাঞ্জা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া চন্দন অত আবার তত্ত্ব-ফত্ত্ব বুঝতো না, তার কাছে হিরোইজমটা প্রধান ছিল।

প্রদীপ শ্যামলকে প্রশ্ন করল, "কী করে অতদূর নিয়ে যাবি?" শ্যামল দৃঢ়ভাবে বলল, "ট্যাক্সিতে।" তারক একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল।

শ্যামল দেবার পায়ের বাঁধন খুলে দিল। প্রদীপরা দেবাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল ট্যাক্সি

পর্যন্ত। দেবার সামনেই শ্যামলরা দেবার শেষ গতির কথা আলোচনা করছে। দেবা জানে তাকে শ্যামল কসবা নিয়ে যাচ্ছে জবাই করার জন্য। দেবা একবার কাতর কণ্ঠে শ্যামলকে বলল, "শ্যামল, আমায় ছেড়ে দে, আমি আর কসবায় যাব না।" শ্যামল দেবার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ডানহাত চালিয়ে দিল দেবার মুখ লক্ষ্য করে। নাক আর ঠোঁট ফেটে গলগল করে ঝরতে লাগল রক্ত। দেবা চুপ। ট্যাক্সিতে পেছনের সিটে ঠেলে তুলে দিল দেবাকে। শ্যামল, প্রদীপ, তারকরা দেবার পাশে। পেছন মোড়া করে বাঁধা দেবার হাত।

শ্যামলের নির্দেশে ট্যাক্সি ছুটল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও কলুটোলা স্ট্রিটের সংযোগস্থলের কাছে ট্যাক্সিটা রাস্তায় জ্যামের জন্য আটকে গেল। কেউ কিছু বোঝার আগেই ড্রাইভার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে তারস্বরে "ডাকাত, ডাকাত" বলে চিৎকার করতে করতে দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। ড্রাইভারের চিৎকারে আশেপাশের পথচারী ও অন্যান্য গাড়ির আরোহীর দৃষ্টি ওর ট্যাক্সির দিকে নিবদ্ধ হতে শ্যামলরা হতচকিত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। একা দেবা গাড়িতে বসে রইল।

দেবা দেখল পালিয়ে যাওয়ার এই সুযোগ। ট্যাক্সির সিটে সে ঘষে ঘষে ডান দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পা রেখেছে, শ্যামল দূর থেকে সেটা দেখে যেই বুঝল তার 'শ্রেণীশত্রু' পালিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারকের হাতের কিটব্যাগের চেন খুলে তার থেকে বার করে আনল বোমা। দুজনে মিলে এলোপাথাড়ি ছুড়তে শুরু করল বোমা। প্রদীপ, চন্দনরাও ব্যাগ থেকে বোমা তুলে দেবাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে পালিয়ে গেল। বোমার আওয়াজে সাধারণ লোক যে যেদিকে পারে ছুটতে শুরু করেছে আর তখন ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গিয়ে সমস্ত রাস্তায় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ধোঁয়া খানিকটা হাল্কা হলে দেখা গেল, দেবা ছাড়াও আটজন সাধারণ পথচারী ও এক ঠেলাচালক রাস্তায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

দেবার হাতের বাঁধন অদ্ভুতভাবে খুলে গেছে। তার ডানহাতটা কনুইয়ের ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁ হাতের বাঁধনের সঙ্গে ঝুলছে। রক্তাক্ত দেহের সঙ্গে হাতের কাটা অংশের মাংসপিণ্ডটা দগদগে ঘায়ের মতো বীভৎস দেখাচ্ছে। সেখান থেকে গলগল করে ঝরছে রক্ত। দেবা তবু ছুটছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে।

একজন ট্রাফিক কনস্টেবল কাছেই ছিল। বোমার আওয়াজ থেমে যাওয়ার পর সে ও আরও ক'জন সাধারণ মানুষ আহত ব্যক্তিদের তুলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিতে গিয়ে দেখল, ঠেলাচালকের মাথায় বোমা ফেটে সে সেখানেই নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর একজন লোক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা গেলেন। বাকিদের তারা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করে দিল। ভর্তি হওয়ার ক'ঘণ্টা পর মারা গেলেন আরও একজন। যে তিনজন শ্যামল ও প্রদীপদের বোমার আঘাতে মারা গেলেন তাঁরা জানতেও পারলেন না কী 'মহান' দায়িত্ব তাঁরা পালন করে গেলেন! চারুবাবুর বিপ্লবের চাকার তলায় বলিদান দিয়ে তাঁরা 'ভারতবর্ষের মুক্তির' জন্য আত্মত্যাগ করলেন! নকশালরা বলে থাকে, "বিরাট কাজে এরকম দু'চারটে অঘটন, মৃত্যু ঘটতেই পারে, তা এমন কিছু দোষের নয়।" তর্কের খাতিরে নয় ধরে নিচ্ছি 'দোষের নয়', কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় দেবার 'বাঁচা-মরার' ওপর কি ভারতবর্ষের বিপ্লবের অগ্রগতি নির্ভর করছিল? দেবা কে যে তাকে খুন করতে পারলেই 'মুক্তির' পথ এগিয়ে আসবে? এরকম হাজার হাজার দেবা ভারতবর্ষের প্রতি কোণে প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে। অথচ এক দেবা দত্তকে খুন করার জন্য চারুবাবুর দলের কর্মীরা পাগলের মতো বোমা ছুঁড়ে তিনজন সাধারণ লোককে খুন করে ফেলল। কী জবাব আছে তাদের কাছে?

হাসপাতালে দেবা বেঁচে গেল। একটা হাত বাদ যাওয়াতে তার নাম হয়ে গেল 'হাতকাটা দেবা'। তার কাছ থেকেই আমরা জানতে পারলাম প্রদীপ, তারক, শ্যামলদের নাম। শুরু হল খোঁজ। সত্তর সালের মার্চ মাস। তখনও নকশালদের খুনখারাপির দাপট ব্যাপকভাবে শুরু

হয়নি। ওদের বিপ্লব স্কুল-কলেজ পোড়ানো, মূর্তি ভাঙা, পোস্ট অফিস ও সরকারি কার্যালয় তছনছ, ট্রাম বাসে আগুন লাগানোর মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। তবু আমরা প্রদীপদের হদিশ পাচ্ছি না। কোথায় আত্মগোপন করে আছে কে জানে?

জুলাই মাসে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ক'জন নকশাল। তারা ওই অঞ্চলেরই একটা বাড়িতে সন্ধেবেলায় মিটিং করছিল। অফিসার সুজিত সান্যাল ফোর্স নিয়ে সেই বাড়ি ঘিরে তাদের গ্রেফতার করে থানায় এনে লক আপে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমরা সেই খবর পাওয়ার পর ওই নকশালদের নিয়ে এলাম লালবাজারে। সেই দলের মধ্যে আশ্চর্যভাবে পেয়ে গেলাম নকশাল নেতা নিশীথ ভট্টাচার্যকে। তিনি ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। নিশীথবাবুর স্বীকারোক্তি আদায় করতে আমাদের কোনও পরিশ্রমই করতে হল না। এরপরও যতবারই তাঁকে আমরা গ্রেফতার করেছি, তিনি গড়গড়িয়ে সব কিছু বলে দিয়েছেন। এ রকম আসামীই পুলিশের কাম্য। ঝামেলা কম। নিশীথবাবুর কাছ থেকেই প্রথম সি.পি.আই (এম.এল) পার্টির কাজের পদ্ধতি, কে কোন দায়িত্বে আছে এবং কীভাবে সেই সব দায়িত্ব তারা পালন করছে বিস্তারিতভাবে জানতে পারলাম। তিনি মলোটভ ককটেল বোমা বানানোর শিক্ষাটা নকশাল ছেলেদের হাতেকলমে শিখিয়েছেন। যে বোমা ছুঁড়ে নকশালরা ট্রামে বাসে আগুন ধরাত। নিশীথবাবুর কাছ থেকে খবর পেয়েই পাইকপাড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে আনলাম অধ্যাপক বিদ্যুৎ দত্তকে।

নিশীথবাবুর খবরের মধ্যে ছিল আরও চমক। তিনি মধ্য কলকাতার নকশাল নেতা হওয়ার ফলে অনেক খোঁজও তাঁর কাছে ছিল। সেই খোঁজের মধ্যে ছিল প্রদীপ। তিনি সেই খোঁজ দিলেন। আমি, উমাশংকর লাহিড়ী কিছু ফোর্স নিয়ে ছুটলাম সেই খোঁজকে বাস্তবে রূপ দিতে। মাঝ রাতে ঘিরে ফেললাম রাজাবাজারের ভেতর নিউ রয়েল সিনেমা হল সংলগ্ন ক্যালকাটা হোস্টেল। ধাক্কাধাক্কি দিয়ে দরজা খোলাতে যাচ্ছি, একটা ছেলে দোতলা থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গেল। কিন্তু দেখতে পেলাম, লাফ দিয়ে সে আর উঠতে পারছে না। কাছে গিয়ে বোঝা গেল একটা পা ভেঙেছে। হ্যাঁ, সেই প্রদীপ ধর। হস্টেল তল্লাশি করে পেলাম আরও আটজন নকশাল তরুণকে ধরে নিয়ে এলাম।

প্রদীপকে গ্রেফতার করতে পারলেও অন্যদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

এমন কি প্রদীপও তাদের খবর দিতে পারল না। কী আর করার আছে, অপেক্ষা করা ছাড়া? মাস দুয়েক পর শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের যৌথ অভিযান হল। ওই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নকশালদের একটা ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল। কলেজের হস্টেলের ছাত্রদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। বাইরের নকশালরাও সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকত। কলকাতার অনেক নকশাল বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে সেখানে চলে যেত। আমাদের সেই যৌথ অভিযানে ধরা পড়ল বেশ ক'জন নকশাল ছাত্র। তার মধ্যেই পেলাম চন্দনকে।

ক'দিন পর তারকও আমাদের জালে ধরা পড়ল। কিন্তু শ্যামলকে পাওয়া যাচ্ছে না। শ্যামল কসবার ছেলে, কসবাই তার রণক্ষেত্র। কসবা আবার আমাদের কলকাতা পুলিশের এলাকার বাইরে, তাই প্রতিদিনের খবরাখবরও আমাদের কাছে আসে না।

সে সময় উত্তর ও মধ্য কলকাতা নকশাল আন্দোলনের ঢেউয়ে তোলপাড় হলেও দক্ষিণ কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চল, যেমন যাদবপুর, কসবা ও বেহালাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। ওইসব অঞ্চলের নকশালরা কলকাতা পুলিশের এলাকায় হাঙ্গামা ও সংঘর্ষে লিপ্ত তো হতই, এমনকি বালিগঞ্জ থানা এলাকায় যত নকশাল হানা হয়েছে তার অধিকাংশই কসবা ও যাদবপুরের এলাকার নকশালদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে।

কসবায় শ্যামলের সঙ্গে ছিল মনা, রানা, তারা, শম্ভু, খেও এরকম কতগুলো বিশ বাইশ বছরের ছেলে। এদের একটাই কাজ ছিল। অ্যাকশান। প্রায় প্রতিদিনই এদের সঙ্গে

সি.পি.আই (এম) ছেলেদের রথতলা, রাসডাঙা এলাকার দখল নিয়ে বোমাবাজি হত। বোমাবাজি ছাড়া এদের অন্য কাজ ছিল স্কুল কলেজে হাঙ্গামা ও মূর্তি ভাঙা। 'বিপ্লবের' জন্য কিছু একটা করা চাই তো! কসবা এলাকা ছেড়ে এরা বালিগঞ্জ এলাকাতেও 'বিপ্লবের পতাকা' ওড়াতে চলে আসত।

সত্তরের জুলাই মাসের প্রথম দিনে বালিগঞ্জের গোলপার্ক পোস্ট অফিসে কসবার নকশালরা দুপুর দু'টো নাগাদ ঢুকে সবকিছু তছনছ করে টেলিফোনের তার ছিঁড়ে, পোস্টকার্ড, খাম ও অন্যান্য কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে একটা লাল পতাকা উড়িয়ে চলে গেল।

চার তারিখে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর একেবারে পুবপ্রান্তে সত্যভামা ইনস্টিটিউটে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ নকশালরা ঢুকে বোমা ছুঁড়ে প্রধান শিক্ষকের অফিসের চেয়ার টেবিল উল্টে পাল্টে ফেলে দিয়ে, স্কুলের মাথায় লাল পতাকা উড়িয়ে পালাল।

ন'তারিখ দুপুর দেড়টার সময় ফার্ন রোডের জগবন্ধু ইনস্টিটিউটে ঢুকে জাতীয় নেতাদের ছবি ভেঙে, স্কুলবাড়ির ছাদে লাল পতাকা উড়িয়ে দিল।

তের তারিখে বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান পার্কের পরিবার পরিকল্পনার অফিসে কসবার নকশালরা ঢুকে ভাঙচুর করে, আগুন ধরিয়ে, বোমা মেরে চলে গেল।

ওই জুলাই মাসেরই কুড়ি তারিখে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ গরচা রোডের দক্ষিণ কলকাতা আর্য বিদ্যালয়ে সবে যখন ক্লাস শুরু হয়েছে, তখন কসবার নকশালরা ঢুকে পড়ল। সোজা চলে গেল প্রধান শিক্ষকের চেম্বারে। 'নকশাল স্লোগান' দিতে দিতে তছনছ করে দিয়ে স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফাইল জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর স্কুলের কোষাধ্যক্ষকে ছুরি দেখিয়ে তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে মোট ছিয়াশি টাকা নিয়ে ওরা চলে গেল।

একুশ তারিখে দুপুর একটার সময় বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে সরকারি বাস গুমটিতে নকশালরা আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালাল।

বাইশ তারিখে রাত্রিবেলা বন্ডেল রোডের পরিবার পরিকল্পনার অফিসে ঢুকে বোতল বোতল অ্যাসিড কাগজপত্রের ওপর ঢেলে বোমা ফাটিয়ে উধাও। তেইশ তারিখে বিকেলবেলা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও গড়িয়াহাট রোডের সংযোগস্থলে একটা পুলিশ চৌকির ওপর নকশালরা বোমা মারল। তিনজন কনস্টেবল আহত হয়ে চলে গেল হাসপাতালে।

এরকম প্রতিদিনই কসবার নকশালরা বালিগঞ্জের ফার্ন রোড ও কাকুলিয়ার নকশালদের সঙ্গে মিলে কোনও না কোনও ঘটনা ঘটাতে লাগল। যেমন ফার্ন রোডেরই জগবন্ধু ইনস্টিটিউটে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির ওপর আক্রমণ, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইনস্টিটিউটে পেট্রল বোমা নিয়ে হানা, জুলাই মাসেই কসবার খেও, শম্ভুর নেতৃত্বে নকশাল নকুল হালদার, বিমল ঘোষ গোলপার্কের স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিকে প্রথমে আলকাতরা দিয়ে মাখিয়ে তারপর ভাঙল।

যারা এখনও চারুবাবুর 'খতমের রাজনীতির' ওকালতি করে পত্রপত্রিকায় লিখে, গলা ফাটিয়ে বাজার মাৎ করেন, তাঁরা এইসব কাজের কী ব্যাখ্যা দেবেন? স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিংবা স্যার আশুতোষ কী এমন 'ভারত বিরোধী কাজ করেছিলেন যার জন্য তাঁদের মূর্তির অঙ্গচ্ছেদ করে মুখে কালী দিয়ে সেগুলো রাস্তায় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে তাঁদের অপমান করা হল? চারুবাবুর রাজনীতির মহাপণ্ডিত ওকালতরা, যাঁরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে সৎ ও সাচ্চা দেখেন না, তাঁরা খুব বেশি হলে হয়ত বলবেন, 'ও সব একটু আধটু ভুল হয়ে গিয়েছিল।' অর্থাৎ পোস্ট অফিস, পরিবার পরিকল্পনার দফতর, বই কাগজ পোড়ানো, স্বামীজী কিংবা নেতাজীর মূর্তি ভাঙা সবই 'একটু' ভুল! আর বাকি সব সঠিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছিল! পুলিশ, হোমগার্ড, অন্য রাজনীতির লোক খুন করা ইত্যাদি সঠিক পদক্ষেপ! আর এই খুনের রাজনীতির যারা বিরোধিতা করছে তারা 'শ্রেণীশত্রু',

'সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর', ইত্যাদি- সুতরাং তাকে খতম কর।

কসবায় প্রতিদিন সি.পি.আই.(এম)-এর ছেলেদের সঙ্গে নকশালদের বোমাবাজি হতে হতে নকশালরা পূর্বাশা সিনেমার দিকের এলাকায় আশ্রয় নিল। কিন্তু 'মুক্তাঞ্চলের নেশায় কসবার নকশালরা একদিন বন্ডেল, হালতু দিয়ে বোমা মারতে মারতে রথতলার দিকে এগিয়ে এল। সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডার গৌরের শরীরে ঢুকে গেল নকশালদের ছোঁড়া বোমার সিপ্লন্টার আর সি.পি.আই (এম)-এর দলের ছেলেদের ছোঁড়া রিভলবারের গুলি সরাসরি লাগল মনার বুকে। মনাকে নকশাল ছেলেরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা গেল।

রাসডাঙার বদলে শ্যামল, শম্ভুরা কাকুলিয়ার পঞ্চাননতলায় খেওদের আস্তানায় ঘাঁটি গাড়ল। সেখানে তারা নতুন করে আবার 'কসবা দখলের' পরিকল্পনার সঙ্গে স্কুল, কলেজের ওপর হামলা ও মূর্তি ভাঙার 'কাজ' চালিয়ে যেতে লাগল।

ঠিক করল, যেভাবেই হোক রথতলা তারা দখলে আনবে। দখলে আনতে দরকার আরও মজবুত অস্ত্রাগার। ফলে তারা কসবার তালতলা অঞ্চলের কালোয়ার, ওয়াগন ব্রেকার, মাছের আড়তদার ও চোলাই মদের ঠেকের মালিকদের ওপর চাঁদার হার বাড়িয়ে দিল। সেইসব টাকা নিয়ে তেঁতুল, বিশে, রিঙ্কু ও মন্টুলি চলে গেল দুর্গাপুর। দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারের এক গোপন জায়গা থেকে গানপাউডার ও পানাগড় থেকে বোমার মশলা কিনে নিয়ে এল।

কুমোরপাড়া বস্তিতে থাকত শম্ভু। সেখানে সে একরাতে পাইপগান দেখিয়ে বস্তির একটা মেয়েকে ধর্ষণ করল। কিন্তু ভয়ে, না সেই মেয়েটি, না বস্তির অন্য বাসিন্দারা শত্রুকে কেউ কিছু বলতে পারল না। যদিও ভেতরে ভেতরে তুষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতেই লাগল শম্ভুদের বিরুদ্ধে। শম্ভুর মধ্যে কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, সে তার দলবল নিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরতে লাগল। কারণ তারা তো চারুবাবুর লোক!

দুর্গাপুর ও পানাগড় থেকে আনা বোমার মশলা দিয়ে বানানো হল প্রচুর পরিমাণে বোমা। শিয়ালদহ- ডায়মন্ড হারবার রেললাইনের পুবদিকের খাটালগুলোতে রাত কাটাতে ও বোমা তৈরি করে মজুত করতে লাগল তারা।

বোমা তৈরি সম্পূর্ণ হলে, রথতলা দখল করার জন্য সি.পি.আই (এম) দলের ছেলেদের ওপর বোমা, পাইপগান নিয়ে একদিন সন্ধেবেলায় শ্যামল, তারা, শম্ভু, সুজিত, চাঁদুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা আক্রমণে সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডাররা পিছু হটতে বাধ্য হল।

রথতলা কিছুটা নকশালদের 'দখলে' এল, কিন্তু শম্ভুর পেটে গুলি লাগল। সে কুমোরপাড়া বস্তিতে সেই অবস্থায় কসবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল।

সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে টক্কর দিতে দিতে নকশালরা 'মুক্তাঞ্চল' গড়ার স্বপ্ন দেখলেও 'মুক্তাঞ্চলের' অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। সারাদিন সারারাত দু'পক্ষের দৌড়াদৌড়ি, বোমাবাজি, পুলিশের হানা, স্কুল কলেজের দরজা বন্ধ, কোন নাগরিকের ভাল লাগে? সারারাত বোমাতঙ্কে ছুটন্ত গরম শিশের সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যে কী করে কাটে জীবন? কিন্তু তার মাঝেই মানুষকে সংসার সাজাতে হয়, ঘুমোতে হয়, স্বপ্ন দেখতে হয়, জন্ম-মৃত্যুর সুখ-দুঃখের দোলাচলে ভাসতে হয়। মানুষের লজ্জা এখানে, অহংকারও এখানেই!

রথতলায় নকশালরা আক্রমণ করল আমাদের কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর শৈলেন বিশ্বাসকে। ছুরি, ভোজালির প্রচুর কোপ খেয়ে সে রাস্তায় কিছুটা ছুটে গিয়ে পড়ে গেল। নকশালরা ভাবল, মৃত্যু। না, সে বহুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে ফিরে এল গিয়ে, কিন্তু বেশি দিন বাঁচতে পারল না, আবার ওই রথতলাতেই নকশালদের হাতে খুন হল।

একাত্তরের জুন মাসের এক রাতে আমরা কসবায় হানা দিলাম। অন্ধকার রাতে ঘুরে ঘুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনও নকশালের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। রাত প্রায় দু'টো আড়াইটের সময় যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার উদ্যোগ করছি, তখন হঠাৎ দেখি একটা কালো, ছোট্টখাট্টো লোক একটা বাড়ির বারান্দায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে। এত রাতে ওই

লোকটা এখানে কী করছে? জেগেই ছিল। ডাকলাম। সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল। রোগা, বেঁটে লোকটা সামনে আসতেই প্রশ্ন করলাম, "অ্যাই, তুই এখানে কী করছিস?" "ঘুমোচ্ছিলাম বাবু" লোকটা বলল। "কোথায় ঘুমোচ্ছিলি? জেগে বসেছিলি তো," ধমক দিয়ে বললাম। প্রশ্ন করলাম, "শ্যামলরা কোথায়?" লোকটা বলল, "চিনি না বাবু।" আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল রবি কর। সে লোকটাকে টেনে নিয়ে বলল, "চিনিস না?

চেনাচ্ছি তোকে।" এই কথা বলেই চোখের পলকে লোকটাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার ধারের পুকুরের মাঝখানে।

রবির কাণ্ড দেখে উপস্থিত আমরা সবাই বোকা বনে গেলাম। রবিটা এরকমই ছিল। ওর চরিত্রের এদিকটা আমরা ভাল করেই জানতাম। একবার আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মাতলা নদীর ধারে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। সেখানে সে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, নিজের সার্ভিস রিভলবার বার করে পরপর দুটো কুকুরকে গুলি করে দিল। গুলির আওয়াজ শুনে আমরা সচকিত হয়ে ওর কাছে ছুটে গেলাম, আমি আর দীপক ওর হাত থেকে কেড়ে নিলাম রিভলবার। কুকুর দু'টোই মারা গেছে। তাতেই কি শান্তি? কুকুরের মালিক ওখানকার ধীবররা ছুটে এসে আমাদের ওপর চড়াও। টাকা পয়সা দিয়ে অনেক কষ্টে ওদের শান্ত করতে হল।

রবি সেই লোকটাকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আমরা কিছুটা ভয় পেয়ে পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা সাঁতার জানে তো? জানে। সে আস্তে আস্তে সাঁতরে পারের দিকে এগিয়ে এলে আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

রাস্তায় উঠে এলে বললাম, 'তোর নাম কি?" ছোট্ট মতো লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বলল, "সুকুমার দাস।" "কী করিস?" জানতে চাইলাম। "বাজারে ফুল বিক্রি করি।" "নকশালরা কোথায় বল? না বললে আবার জলে ফেলে দেব," জোরে বলে উঠলাম। লোকটা কাতর গলায় বলে উঠল, "জানি না বাবু, তবে।" "তবে কী?" জানতে চাইলাম। "ওদের একটা ঘাঁটি চিনি।" লোকটা কোনওমতে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, "কোনদিকে? আমাদের নিয়ে চল।"

সুকুমারকে আমরা ধরেছিলাম কাকুলিয়ার কাছে। এবার সে আমাদের নিয়ে চলল নকশালদের একটা ঘাঁটি চেনাতে। অন্ধকারে এ গলি ও গলি ঘুরে আমরা যাচ্ছি। আমাদের দলে প্রায় পনেরো জন সশস্ত্র লোক, একটা ভ্যান ও একটা জিপে চড়ে চলেছি। যে কোনও সময় নকশালরা বোমা, গ্রেনেড ছুঁড়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারে, তেমন মুহূর্তের জন্য আমরা সতর্ক। ওই রকম আক্রমণের মুখে আমরা ইতিমধ্যেই বহুবার বহু জায়গায় পড়েছি। লড়াই করে বেঁচে ফিরেও এসেছি। এ ছাড়া আর কী উপায় আছে? নিজেদের মৃত্যুভয় থাকলে তো আর অন্য মানুষের মৃত্যু বন্ধ করা যাবে না। দলে যে সব আর্মড গার্ড আছে তারাও প্রত্যেকে এই ধরনের হানাতে অভ্যস্ত। তারা সবাই আমাদের দলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যেতে প্রস্তুত।

এমনকী আমাদের দলের সঙ্গে রেড করতে যাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করত তারা।

জিপে আমাদের সঙ্গে বসে আছে খর্বকায় সুকুমার। ওর সারা শরীর ভেজা। রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এক একবার ভাবছি, ও আমাদের কোনও ফাঁদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না তো? যেখানে নকশালরা ঘাপটি মেরে বসে আছে আমাদের গাড়ি দু'টোর ওপর আক্রমণ করার জন্য। না, তেমন কোনও সম্ভাবনা বাস্তববুদ্ধিতে পাচ্ছি না, কারণ ওরা তো আর জানত না আমরা হানা দিতে আসব। তবু আমরা সজাগ।

সুকুমার আমাদের নিয়ে এল কসবার একেবারে শেষ প্রান্তে। ওখান থেকে বর্তমান ইস্টার্ন বাইপাসের দূরত্ব বেশি দূরে নয়। এলাকাটা একেবারে গ্রাম্য। কতগুলো কুকুর অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গাড়ির পেছন পেছন ফেউয়ের মত লেগে আছে। ওদের চিৎকারে

নির্জন জায়গাটার নীরবতা ভঙ্গ হলো ।

সুকুমার জিপ থেকে একটা বাড়ি দেখাল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে বাড়িটার দূরত্ব বেশিদূর নয়। বাড়ি ও আমাদের মাঝখানে একটা পুকুর। বাড়িটা অন্ধকার, এবং অসম্পূর্ণ। দেখেই বোঝা যায় ওই বাড়িতে বাড়ির মালিক থাকেন না। নকশালরা ঘাঁটি গেড়েছে অনায়াসেই। সুকুমারকে প্রশ্ন করলাম, “ওই বাড়িতে ক'জন থাকে?” সুকুমার বলল, “জানি না, তবে আসে যায় সবসময়। থাকে খুব কম।”

বললাম, “চল।” আমরা সুকুমারকে সামনে রেখে সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগলাম ওই একতলা অসম্পূর্ণ পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে। মিনিট তিনেকের মধ্যে আমরা বাড়িটার কাছে পৌঁছে গেলাম। সুকুমার যেভাবে আমাদের প্রদর্শকের কাজটা করল, তাতেই মালুম ওর সঙ্গে নকশালদের যোগাযোগ আছে। সে যতই ‘চিনি না, জানি না' বলুক, আমরা ওর কথায় আর ভুলছি না। এখন ওর থেকে আমাদের কাজ আদায় করে নিতে হবে। আমরা বাড়িটা ঘিরে ফেললাম।

সুকুমার ওই বাড়িটার ভেতর যেভাবে ঢুকে গেল, তাতে পরিষ্কার তার ওই বাড়িতে যাতায়াত আছে। গোটা তিনেক ঘর। আমাদের বড় বড় টর্চের আলো ঘরগুলোর কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে ছিটকে বাইরের খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ছে। বাড়িটায় কেউ নেই। দু একটা বাদুড় ছাদের এখানে ওখানে ঝুলছিল, আমাদের হঠাৎ আগমনে ওরা চমকে উঠে এদিক ওদিক ডানা ঝাপটাতে লাগল।

সুকুমার বাড়িটার শেষ ঘরটায় আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে ঘরের এক কোণায় চটের বস্তা চাপা একটা ছোট ঢিপি দেখিয়ে বলল, “স্যার, ওখানে বোমা রাখা আছে।” সুকুমার এখন বাবু' থেকে 'স্যার' সম্বোধন করতে শুরু করেছে। এটা আনুগত্যের লক্ষণ। ভাল। বললাম, “বস্তাটা সরা।” টর্চের আলো বস্তার ওপর। সুকুমার বস্তাটা আলগোছে সরাতেই দেখলাম, ওর কথা সত্যি, প্রচুর বোমা। কী করি? বললাম, দু'টো করে বাইরে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ভেজা।

সুকুমার নির্দেশ পালন করতে শুরু করল। বোমাগুলো জলে ভিজিয়ে ওদেরই বস্তায় পুরে ভ্যানে তুলে দিলাম। বোমার মশলাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেল। এরপর হঠাৎই সুকুমার দূরে মাঠের মধ্যে একটা খড়ের গাদা দেখিয়ে বলল, “স্যার, ওই খড়ের গাদায় আরও মাল আছে।” জিজ্ঞেস করলাম, “কী মাল?” বলল, “গাদা কামান।” এবার ওকে নিয়ে চললাম ওই খড়ের গাদার দিকে। বললাম, “বের কর।” সুকুমার খড়ের গাদা থেকে টান মেরে খড়ের আঁটি বার করতে লাগল। ওর কাজ দেখেই বুঝে গেছি, সবই ও জানে। কতগুলো আঁটি টানতেই একটা কালো মতো জিনিস ঝপাস করে নিচে রাখা খড়ের আঁটিতে পড়ল। সুকুমার বলল, “স্যার, এটাই গাদা কামান।” দেখলাম, পাঁচ ছ' ইঞ্চি ব্যাসের মোটা লোহার হাত দেড়েকের নল, নলটার একদিক খোলা, অন্যদিক লোহার পাত দিয়ে বন্ধ। মাঝখানে একটা ছোট ফুটো। ওই ফুটো দিয়েই ডেটনেটরের তার বেরিয়ে আসে। ওই দিকটাতেই দেশি গান পাউডার মাছের জালের শিশের কাঠি সমেত ঠেসে দেওয়া হয়। তারপর ডেটনেটরের তার ব্যাটারির সঙ্গে লাগলেই বিকট শব্দে গান পাউডার ফেটে কামান থেকে কাঠিগুলো বুলেটের মতো নলটার মুখ দিয়ে ছোটে।

দেখতে দেখতে সুকুমার আমাদের ক'জন কনস্টেবলকে নিয়ে খড় সরিয়ে ছ'টা গাদা কামান ও একটা দোনলা বন্দুক বার করে ফেলল। সুকুমারই বলল, দোনলা বন্দুকটা মাদুরদহের দিকের এক ভেড়ির মালিকের বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল সুজিত, তারা, শ্যামলরা।

সুকুমারকে নিয়ে আমরা লালবাজারে ফিরে এলাম। লালবাজারে এসে সুকুমার স্বীকার করল, সে শ্যামলদের সঙ্গেই নকশাল রাজনীতি করত। ওই রাজনীতি সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাও ছিল না। শুধু 'ভাল লাগত' এই জন্যই সে ওদের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ওর

বিরুদ্ধে কোনও মামলা না করে ওকে আমরা লালবাজারে রেখে দিলাম। ওকে আমাদের দরকার, কসবার রাস্তাঘাট চেনানোর জন্য। আর একটা বিশেষ গুণ ওর আছে দেখলাম, সেটা হচ্ছে, সে গন্ধ শুঁকে বলতে পারে কোনখানে বোমা রাখা আছে। ওর এই বিশেষ গুণটা আমাদের দরকার, যখন অভিযানে যাব, তখন ও সঙ্গে থাকলে কোথায় বোমা রাখা আছে সেটা আগাম আমাদের জানাতে পারবে। লালবাজারে আনার পর সুকুমারের নাম দিলাম চিংলু। দড়কচামারা শরীরটা নিয়ে সে চিংড়ি মাছের মতো ছটফট করত বলে, হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে ওর ওই নাম বেরিয়ে গেল। এবং ওই নামেই সে পরিচিত হয়ে গেল।

চিংলুর দেওয়া খবরের সূত্র ধরে আমরা কাকুলিয়ার পঞ্চাননতলার নকশাল খেওকে গোলপার্কের কাছে এক পেট্রল পাম্প থেকে গ্রেফতার করলাম। খেও কসবার নকশালদের অ্যাকশন গ্রুপের সদস্য ছিল। তার কাছ থেকে বেশ কিছু খবর জানতে পারলাম। সেই জানার সূত্র ধরে আর এক নকশাল মন্টুলিকে ধরলাম।

মন্টুলিকে ধরার দিন দুই আগে একটা ঘটনা ঘটল। রাত্রিবেলা কসবার থেকে আনা যে বোমাগুলো লালবাজারে আমাদের বিভাগের ঘরে বালতির জলে চুবিয়ে রেখেছিলাম, তার মধ্যে একটা সকেট বোমা প্রচণ্ড জোরে ফাটল। বোমা ফাটার আওয়াজে সমস্ত লালবাজার কেঁপে উঠল। রাতে ওই ঘরে কেউ ছিল না, তাই আমাদের কারও আঘাত লাগল না।

মন্টুলি জানাল তার অন্য কমরেডরা কোথায় আস্তানা গেড়েছে। যেদিন মন্টুলি বলল, সেদিনই আমরা সেই আস্তানা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলাম। মন্টুলি আমাদের জানিয়েছিল, সেই আস্তানায় দিনের বেলায় কাউকেই পাওয়া যাবে না। তারা দিনের বেলা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে থাকে বা 'কাজ' করে। কিন্তু রাতে যদি তাদের কোনও ‘আক্রমণের’ কথা না থাকে, তবে সেই আস্তানাতেই সবাই থাকে। পালা করে ক'জন ঘুমোয় আর ক'জন জেগে পাহারা দেয়। মন্টুলির কথা অনুযায়ী জায়গাটা কসবা ছাড়িয়ে কালিকাপুরের এক গ্রামের ভেতর। সেখানে বর্ষাকালে গাড়ি ঘোড়া তো দূরের কথা, হেঁটে যাওয়াও খুবই কষ্টসাধ্য।

কী করা যাবে? খবর পাওয়ার পর তো আর দুর্গম জায়গা ভেবে না গিয়ে পারব না। ওরা তো আর আমাদের জন্য খোলা মাঠে বসে থাকবে না! তাই দুঃসাধ্য বলে আমাদের কিছু নেই। আমরা জানতাম, কসবার নকশালদের ওই দলটাকে গ্রেফতার করতে পারলে শুধু কসবা অঞ্চলটাকেই ঠাণ্ডা করা যাবে না, উপরন্তু বালিগঞ্জ এলাকাতেও হামলা কিছুটা স্তিমিত হবে। সুতরাং ওই দলটাকে গ্রেফতার করাটা জরুরী।

আমাদের দল ঠিক হল। আমি, রবি, উমাশংকর, দীপক, শচী, অরুণ ও বেশ ক'জন কনস্টেবল রাত এগারোটা নাগাদ বোসপুকুরের কাছে গাড়ি থেকে নামলাম।

ভরা বর্ষা। সন্ধে থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পায়ে গামবুট, গায়ে বর্ষাতি। সঙ্গে মন্টুলি। সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। রাসডাঙায় পৌঁছে মন্টুলি আমাদের কটা বাড়ি দেখিয়ে দিল। আমরা হানা দিলাম, কিন্তু কাউকে পেলাম না। মন্টুলিকে জিজ্ঞেস করলাম, “কিরে মন্টুলি, ফালতু কথা বলে আমাদের খাটাচ্ছিস না তো?” সে বলল, “না স্যার, দেখে নিলাম ওরা এসব বাড়িতে আছে না কি।”

ওই বাড়িগুলো তল্লাসি করতে করতে রাত গড়িয়ে সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। বললাম, “এবার কোন দিকে যেতে হবে?” বলল, “কালিকাপুরের দিকে।” তখন বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে এসেছে। আমরা জমাট অন্ধকার ঠেলে, বৃষ্টি সরিয়ে এগিয়ে চলেছি। দুধারে ধানক্ষেত, সরু সরু আল, সেটাই আমাদের হাঁটার পথ। ধানক্ষেতগুলো জলে টইটম্বুর। সেই জলের ভেতর থেকে সোনা ব্যাঙ ভেসে ভেসে ক্রমাগত কোরাস ডেকে যাচ্ছে। আর টর্চের আলো গায়ে পড়লেই টুপ করে ডুব দিয়ে জলের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে। মাঠের জলের ওপর বৃষ্টির ঝপঝপ পতনের শব্দ ছাড়া ওরাই একমাত্র এ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব জানাচ্ছে।

সরু পিছল আলের ওপর আমরা একজন একজন করে সার বেঁধে দক্ষিণমুখী চলেছি। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর আর আল নেই। সেখানে আলগুলো জলের তলায় হারিয়ে গেছে। আমরা সবাই মাথার ওপর দুহাত দিয়ে রাইফেল তুলে রেখেছি, যাতে জল ঢুকে না যায়। মন্টুলিকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, "কিরে, ঠিক নিয়ে যাচ্ছিস তো?"

আধঘণ্টা পর বৃষ্টির মুষলধারা কিছুটা কমল। জলের মধ্যে আমাদের হাঁটার ছলাৎ ছলাৎ শব্দের জন্য দুচারটে ব্যাঙ ভয় পেয়ে এদিক ওদিক লাফিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে আত্মগোপন করল। কোথা দিয়ে হাঁটছি, অন্ধকারে জলের তলায় কোথায় পা পড়ছে, কিছুই জানি না। গামবুটের ভেতর জল ঢুকে গিয়ে এত ওজন বাড়িয়ে দিয়েছে যে পা তুলে তুলে হাঁটাও অসাধ্য হয়ে গেছে। পেছন থেকে একটা টর্চের আলো ফেলে জলের রাস্তাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, আলো জ্বাললেই আমাদের বিশাল বিশাল ছায়াগুলো জলের ওপর পড়ে একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করে অন্ধকার জলে মিশে যাচ্ছে।

প্রায় এক কিলোমিটার ওইভাবে হাঁটার পর মন্টুলি বলল, "এসে গেছি।" দেখলাম, "সামনে একটা কালো বনের মতো।" বুঝলাম, ওটা বন নয়, একটা গ্রামের শেষপ্রান্ত। গ্রামের গাছপালাগুলো অন্ধকারে মিশে জঙ্গলের মতো লাগছে। সামনেই একটা বাঁশঝাড়। মন্টুলি সেই বাঁশঝাড়টা বাঁপাশে রেখে সামনের একটা উঁচু জায়গায় উঠল। আমরাও জল থেকে উঁচু মাটিতে উঠে দাঁড়ালাম। কারও মুখ কেউ দেখতে পাচ্ছি না। আন্দাজে নিচু স্বরে আমরা কথা বলে যাচ্ছি। মন্টুলি আমাদের টর্চ জ্বালতে নিষেধ করেছে, কারণ নকশালদের পাহারাদাররা তাহলে সজাগ হয়ে যাবে। ওরা উল্টোদিক দিয়ে পালাবে অথবা এলোপাথাড়ি গুলিগোলা ছুঁড়বে।

মন্টুলি গ্রামের পথে আমাদের কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে একটা টালির চাল দেওয়া বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওই বাড়ির বারান্দায় দু'তিনজন পাহারায় থাকবে, বাকিরা ঘরের ভেতর।" বাড়িটার চারপাশে প্রচুর বড় বড় গাছ। চারপাশে ঝোপঝাড়, বাড়ির সামনে ছোট একটা উঠোন, উঠোনের উত্তরদিকে একটা পুকুর।

বৃষ্টি কিন্তু একবারও থামেনি। কখনও অঝোরে, কখনও টিপটিপ, আকাশ ফুটো হয়ে ঝরেই চলেছে। সেই বৃষ্টি ঝরার আওয়াজে আমাদের সুবিধা হল, আমাদের হাঁটার শব্দ বৃষ্টির আওয়াজে চাপা পড়ে যেতে লাগল।

রাত দেড়টা। আমরা বাড়ির চারপাশে অন্ধকারে মিশে গেছি। ঘাপটি মেরে বাড়ির পেছনদিক দিয়ে বারান্দার দুপাশে আমরা এগিয়ে দেখলাম, বারান্দায় তিনজন কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে। বৃষ্টিতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা, তাই পাহারাদাররা ঘুমে কাতর। এবার একসঙ্গে আমরা দুপাশ দিয়ে লাফিয়ে বারান্দায় উঠে গেলাম। ঘুমন্ত তিনজনকে ধরতে আমাদের কোনও অসুবিধাই হল না। আমাদের চিৎকার চেঁচামেচি ও ওদের তিনজনের ছটফটানির আওয়াজে ঘরের ভেতরের বাকিরা জেগে গেছে বুঝলাম। কনস্টেবল বাগচী টর্চ জ্বালাতে গিয়ে তার রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল বসিয়ে দিতে অন্ধকার ফুঁড়ে গুলি ছুটে বেরিয়ে গেল টালির চাল ফুটো করে। ঝরঝর করে কটা টালি খসে পড়ল বারান্দায়। রাইফেলের গুলির আওয়াজে আশেপাশের অন্ধকার গাছগুলোতে ভিজতে থাকা পাখিরা ধড়ফড়িয়ে উঠে তাদের ভিজে পাখা ঝাপটাতে লাগল।

ঘরের দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমি, শচী, উমাশংকর, দীপক দ্রুত ঢুকে গেছি ঘরে। টর্চের তীব্র আলোয় দেখলাম, ঘরের কোণায় শাড়ি পরে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা। বাকিরা ঘুমোচ্ছিল, আমাদের অতর্কিত আক্রমণে ঘুমচোখে কিছু বোঝার আগেই কী করবে ভেবে না পেয়ে অপ্রস্তুত, এলোমেলো, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বোবা। ঘরের ছাদে কটা টালি নেই। কিন্তু বৃষ্টির রাতের ফাঁকা ছাদ দিয়ে যে পরিমাণ জল ঘরে পড়ার কথা তা মাটির মেঝেতে নেই। অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগেই টালি সরানো হয়েছে এবং সেই ফাঁক দিয়ে ছাদে উঠে কেউ পালিয়েছে।

ঘরের মধ্যে যে চারজন তরুণ নকশাল ছিল, তার মধ্যে একজন শ্যামল। মহিলাটিও নিশ্চয়ই নকশাল, নয়ত এদের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাবে কেন? শচী তার সামনে গিয়ে বলল, "ঘোমটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কী হবে, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।" মহিলাটি কোনও উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শচী বলল, "আরে কথাটা কি কানে গেল না?" মহিলা তবু অনড়। বিরক্ত হয়ে শচী ওর হাত ধরে টেনে বলল, "চল।" হাত ধরে টানতেই মহিলার ঘোমটা খসে গেল। টর্চের আলোয় মহিলার মুখ দেখে আমাদের কৌতুক। গোঁফদাড়িওয়ালা একটা ছেলে। মহিলা সেজে আমাদের ধন্ধে ফেলে বাঁচতে চেয়েছিল।

শচী ওকে বলল, "শাড়িটা খোল।" ছেলেটা শাড়িটা খুলল। শাড়ির তলায় জামাপ্যান্ট পরাই ছিল। বেরিয়ে এল। পাঁচজনকে নিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় এসে বাকি তিনজনের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললাম, "ঘরের টালি সরিয়ে কেউ পালিয়েছে, দেখ তো কোথায়।" টর্চ জ্বেলে দেখলাম, বাড়ির ছাদের ওপর থেকেই ধরা যায় একটা বিশাল তেঁতুল গাছ। বৃষ্টিতে ভিজে গাছের ডালগুলো ভারী হয়ে আরও নিচে নেমে ছাদের দু'তিন হাত দূর থেকে ঝুলছে। তেঁতুল গাছের পাতা এত ঘন যে টর্চের আলো ভেদ করে গাছের ভেতরদিকটা দেখা যাচ্ছে না। টালি সরিয়ে যেই পালাবে, তাকেই ওই তেঁতুলগাছের সাহায্যে যে পালাতে হবে সেটা একটা বাচ্চাও বুঝবে। কিন্তু বিশাল তেঁতুল গাছের চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া অসংখ্য শাখায় কোথায় যে পলাতক হারিয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে না। গাছটার ডাল শুধু বাড়ির ছাদে নয়, উঠোন ছাড়িয়ে চলে গেছে। একদিকে পুকুরের মাঝখানে অন্যদিকে বাড়িটার পেছন দিকের বাগানে।

তেঁতুল গাছটায় আলো ফেলে পলাতক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মনে পড়ল, ছোটবেলায় তেঁতুল গাছে ডাইনীর গল্প শুনে কি ভীষণই না ভয় পেতাম। আর এখন সত্যিই একটা তেঁতুল গাছে সেই ডাইনীই খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোথায় সেই ডাইনী? তবে কি গাছ থেকে নেমে আমাদের ফোর্সের চোখে ধুলো দিয়ে' অন্ধকারের গায়ে মিশে নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে?

তিন চারটে টর্চের আলো একসঙ্গে, তেঁতুল গাছের ওপর ফেলে আমাদের বারো তেরো জোড়া চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবু দেখা নেই তার। হঠাৎ একটা কালো স্তূপ দেখে শচী চিৎকার করে উঠল, "এই মাল নেমে আয়, নয়ত গুলি করব।" তেঁতুল গাছটার যে ডালটা পুকুরের দিকে ঝুলে আছে, কালো স্তূপটা সেই ডালে ছিল। অনেকটা ভাম যেমনভাবে থাকে, তেমনভাবে। শচীর চিৎকারে স্তূপটা নড়ে উঠে পুকুরে ঝাঁপ দিল। একটা ছেলে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল কনস্টেবল দীননাথ। সে ছেলেটাকে ধরতে তাড়াহুড়ো করে পুকুরে ঝাঁপ দিতে গিয়ে একটা ঝামেলা বাধাল। নিজের রিভলবারটা ঠিক মতো রাখার জন্য কোমরে গুঁজতে গিয়ে আর অসাবধানতায় তার বাঁহাতের মধ্যমাটা ট্রিগারের লকে পড়ে গিয়ে কেটে গেল। তবু সে সেটা কোনওমতে ছাড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিল।

দুটো টর্চের আলো পুকুরের জলে সেই ছেলেটা ও দীননাথকে অনুসরণ করছে। ছেলেটার পালানোর আর পথ নেই। সে সেটা বুঝে গেছে। সে সাঁতরে পারে উঠে এল। দীননাথও উঠে এল। তার আঙুল দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

নকশালদের সেই ঘরটা তল্লাশি করে দীপক ও. উমাশংকর পেল আটটা পাইপগান, ক'টা ভোজালি, ছুরি ও তিনটে বল্লম আর নকশালদের পত্রপত্রিকা। মোট ন'জনকে গ্রেফতার করে যখন আমরা ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছি, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। এবার আর আমরা ওই জলা ধানজমি দিয়ে যাব না। ওটা ছিল ওই ঘাঁটিতে পৌঁছনোর পেছনের রাস্তা। ওখান দিয়ে যে আমরা আসতে পারি, তা ওরা ধারণাই করতে পারেনি। ওদের নজর ছিল ডাঙার দিকটায়। ডাঙার দিকটায় একটু দূরে মন্টুলিকে নিয়ে দু'জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে আগে পাঠিয়ে দিতে হবে।

শচী মন্টুলিকে নিয়ে হাঁটা দিল। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ও দীননাথ। ওর আঙুল দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে, সারা শরীর ভেজা। আমরা একটু পরে রওয়ানা দেব।

যে ছেলেটা জলে ঝাঁপিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল, সে ভেজা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। জিজ্ঞেস করলাম, "তোর নাম কী?" মিনমিনিয়ে বলল, "তারা।" বললাম, "অনেক বিপ্লব তো করেছিস, এখন কাঁপছিস, শোন, ওই ঘরে আর তোর জামাপ্যান্ট আছে?" ঘাড় নামিয়ে বলল, "আছে।" "যা, ভেজা কাপড় ছেড়ে ওখান থেকে অন্য জামাপ্যান্ট পরে আয়।" আমার নির্দেশে একজন কনস্টেবল ওকে নিয়ে ওই ঘরে ঢুকে গেল।

আমাদেরও প্রত্যেকের শরীর ভেজা। কারও অর্ধেক, কারও তার চেয়েও বেশি। নিচের দিকটা তো কারও শুকনো নেই। শুকনো নেই চুল, মুখ, হাত। তবু বন্দি ন'জনকে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ ওই বাড়িতে অপেক্ষা করব। মন্টুলিকে নিয়ে শচীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে, যাতে বাকিরা না জানতে পারে আমাদের 'গাইড' কে ছিল।

কিন্তু শুধু শুধু মশার কামড় খেয়ে তো দাঁড়িয়ে থাকব না। তাই কাজ শুরু করে দিলাম। প্রথমেই ধৃত ন'জনের নাম জানতে হবে। যে ছেলেটা মহিলা সেজে আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছিল তার নাম রানা। দেবা দত্ত খুনের চেষ্টার আসামি শ্যামল। বাকিদের নাম সুজিত, চাঁদু, সহ। রবিও ওদের কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই দিয়ে দিল।

শচীরা এগিয়ে যাওয়ার প্রায় আধঘণ্টা পর আমরাও রওয়ানা দিলাম। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে। তবে গাছগুলো থেকে হাওয়ার দুলুনিতে পাতার জল ঝরে ঝরে পড়ছে। নকশাল ন'জনকে মাঝখানে রেখে আমরা হাঁটছি। রাসডাঙায় যখন পৌঁছলাম রাস্তায় লোকজনের হাঁটাচলা শুরু হয়ে গেছে। তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের দিকে। আশ্চর্য হয়ে দেখছে আমরা শ্যামলদের ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

আমরা যত এগোচ্ছি তত ভিড় বাড়ছে। মনে হচ্ছে প্রত্যেকের চোখেই খুশির ঝলক। কিছুক্ষণ পর আমরা কটা শাঁখের আওয়াজ পেলাম। একসঙ্গে শাঁখের আওয়াজ কী জন্য? ভাবলাম, কোনও বিয়ে বাড়ির গায়ে হলুদের জন্য কলসী ভরতে হয়ত মেয়েরা যাচ্ছে। কিন্তু একটু খেয়াল করতেই ভুল ভাঙল, কারণ শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে কোনও উলুধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না। তার মানে ওই আওয়াজ বিয়ে বাড়ির শাঁখের নয়।

তবে কি নকশালদের ধরে নিয়ে যাচ্ছি বলে ওদের গুপ্তচর শঙ্খধ্বনি দিয়ে তাদের সংগঠনের বাকিদের কোনও সংকেত দিচ্ছে, যাতে ওরা আমাদের আক্রমণ করে বন্দিদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে? আমরা তাই সতর্ক হয়ে গেলাম। আমাদের মিছিলের ওপর যখন তখন যেখান সেখান থেকে বোমা পড়তে পারে। তবে বোমা পড়লে বন্দি ন'জনের গায়েও বোমার আঘাত লাগবে, এমনভাবেই ওদের আমরা ধরে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বর্মের কাজ করবে ওদের কমরেডরাই। শঙ্খধ্বনি থেমে গেল। আমাদের গতি কিন্তু মন্থর।

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের মিছিলের সামনে এসে চিৎকার করে আমাদের উদ্দেশে বললেন, "ওফ এতদিনে বাঁচলাম, এতদিন কোথায় ছিলেন?" তারপর নকশালদের দেখিয়ে বললেন, "এদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।' পাশ থেকে অন্য এক ভদ্রলোক বললেন, "এদের ছাড়বেন না।" একথা শুনে মিছিল দেখতে আসা কৌতূহলী জনতা সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদের ছাড়বেন না।"

যে দিক থেকে শঙ্খধ্বনি আসছিল, আমরা তার কাছাকাছি এলে আবার শুরু হয়ে গেল শাঁখের কোরাস। আমাদের সচকিত করে কুমোরপাড়ার কাছে সেই কোরাসে অংশগ্রহণকারী মহিলারা একেবারে রাস্তায় এসে হাজির। তারা বেশ কিছু ফুলের পাপড়ি মিছিলের ওপর ছিটিয়ে দিল। না; নকশালদের ওপর নয়, মিছিলের বাকি অংশ অর্থাৎ আমাদের ওপর। এরকম গণসম্বর্ধনা আমরা কোন জায়গায় পাইনি, আশাও করিনি। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবিশ্বাস ও কারণে-অকারণে কটূক্তি কিংবা গালাগালি শুনতে হয়েছে।

এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার। চারুবাবুর গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সৈনিকদের কাজকর্মের ঠেলায় সাধারণ মানুষ এতই 'অভিভূত' যে সেইসব সৈনিকদের গ্রেফতারে উল্লসিত হয়ে তারা শঙ্খধ্বনি সহযোগে ফুলের পাপড়ি ছড়াচ্ছে।

প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়েছিল। একটা মিষ্টির খাবার দোকান দেখে সেখানে জল খেতে ঢুকলাম। আমাকে দেখে দীপকও ঢুকল। দোকানদার আমাদের জল দেবেন কি, প্রথমেই আমাদের সন্দেশ দিয়ে বললেন, "আগে এটা খান, তারপর জল দিচ্ছি, আপনারা আজ যা কাজ করেছেন, ভাবা যায় না।" তিনি শুধু আমাদের দুজনের হাতেই সন্দেশ দিয়ে থামলেন না, দোকানের শোকেস থেকে সন্দেশের পুরো ট্রে বার করে এনে আমাদের বাকি বাহিনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নিন, নিন, এগুলো খান, আমি জল এনে দিচ্ছি।" দোকানদারের কাণ্ড দেখে উমাশংকর বলল, "না-না।" আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা বলে উঠল, "না-না কেন? নিন।" একজন বললেন, "আরে আমি নয়ত পয়সা দেব, তবু আজ আপনারা আমাদের এখান থেকে মিষ্টিমুখ করে যান, আজ থেকে আমরা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোব।"

জনতার দাবীতে আমাদের ওখানে মিষ্টিমুখ করতেই হল। আমাদের ওইভাবে অভ্যর্থনা জানাতে দেখে শ্যামলরা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কি দেখছে, বিপ্লবের কি পরিণতি? জনগণের কি প্রতিক্রিয়া? বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, বৃষ্টিতে ভেজা, রাতজাগা শরীরে তৃষ্ণার্ত গলায় সবাই ঢকঢক করে জল ঢালল। বন্দিরাও ক'জন ঢালল। জলপান শেষে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।

আমাদের মিছিলের সঙ্গে চলেছে বেশ কিছু লোক। যত আমরা গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ততই নকশালদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উক্তি শুনতে পাচ্ছি। আর আমাদের প্রতি বাহবা।

ভ্যানের সামনে এসে মিছিল থামল। একে একে রানা, তারা, শ্যামলদের তুলে দিলাম ভ্যানে। জনতা দাবী তুলল, "এদের সহজে ছাড়বেন না।"

আমরা হেসে বললাম, "ঠিক আছে।" ভ্যান চলতে শুরু করল লালবাজারের উদ্দেশে।

ভ্যানে উঠেও আমার বিহ্বলতা কাটেনি। এইভাবে দাবী জানানো কিংবা অভ্যর্থনার ঘোর কি চট করে যায়? মনে হচ্ছিল, আমরা নকশালদের নয়, কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের বা গ্রাম্য ডাকাতদের দলকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

আইনের চোখে সব খুন, ডাকাতি বা হাঙ্গামা এক হলেও আমরা কিন্তু নকশালদের হাতে খুন, ডাকাতি বা অন্য সমস্ত কাজগুলোকে অন্য চোখেই দেখতাম। কিন্তু কসবা, বেলেঘাটা ও অন্যান্য কিছু কিছু অঞ্চলে নকশালরা নিজেদের কর্মপদ্ধতির জন্যই সেই সীমারেখা ভেঙে জনসাধারণের চোখে সব দুষ্কৃতীকে এক করে দিয়েছিল। যে জনগণের 'মুক্তির' জন্য তাদের জীবনপণ সংগ্রাম, সেই জনগণই তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কেন? তার মূল কারণ একটাই। তা হল, চারুবাবুর দেওয়া ভুল রণনীতি ও পদ্ধতি। দ্বিতীয় কারণও একটা ছিল, সেই ভুল নীতির ফলে ভুল পথে পরিচালিত নকশাল তরুণ-তরুণীদের একসঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের খিচুড়ি বদহজম হয়ে গিয়েছিল।

সত্তরের সেই সময়টায় 'ভারতবর্ষের প্রতিটা কোণ অগ্নিগর্ভ, সেটা চারুবাবু কী দেখে ভেবেছিলেন? ভারতবর্ষ বিপ্লবের জন্য গর্ভযন্ত্রণায় কতটা ছটফট করছে, সেটাও কি যন্ত্রের দ্বারা তিনি পরিমাপ করেছিলেন? কি এমন গণ উত্তাল হয়েছিল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে বিপ্লবের নামে 'খতমের রাস্তায়' নকশাল তরুণ-তরুণীদের নামিয়ে দিলেন?

নকশালবাড়িতে সে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, তেমন কৃষক আন্দোলন, এমনকি তার চেয়েও অনেক বড় আকারের আন্দোলন তার অনেক আগেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছিল। তখনও কিন্তু কেউ বলেননি ভারতবর্ষ বিপ্লবের গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছে। 'বিপ্লবীয় পরিস্থিতি' বলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় লেনিনের থিওরিতে, সত্তরের সেই সময় কি সেরকম ছিল? নাকি সবটাই কল্পনা দিয়ে তৈরি কিংবা মনগড়া!

সরাসরি একটা প্রশ্ন জাগে। ভারতবর্ষের মতো একটা সমস্যাসঙ্কুল, বিচিত্র এবং ভাষাগত, প্রাদেশিকতাগত, সাংস্কৃতিকগত বিভিন্ন বিভাজনে বিভক্ত দেশে চারুবাবু ও তাঁর

দলের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল কি যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন? এককথায় বলা যায়, 'না।'

সুতরাং পরিণতি যা দেখার চোখের সামনেই দেখছি। কসবার জনসাধারণ তাঁদের দাবী নিয়ে আমাদের ফুল দিয়ে যেভাবে অভ্যর্থনা করলেন, সেটা চারুবাবুদের সেই ভুল সিদ্ধান্ত ও পথের ফসল।

কিন্তু ইদি আমিনের মতো একনায়কতন্ত্রী রাজনৈতিক নেতাদের তো কোনও ভুল সিদ্ধান্ত হয়না। ভুল সব অন্যদের, যারা তার বিরোধিতা করবে। তেমন বিরোধিতা করেছিল অনেকেই। পরিণতিও অনেকেই হাতে নাতে পেয়ে গিয়েছে।

উত্তর কলকাতায় নকশাল নেতা দীপঙ্কর সেনগুপ্ত তেমন একজন। গলাকাটার রাজনীতির বিরোধিতা করার ফল পেয়েছে। বিরোধিতা করার পরেই সে বুঝে গিয়েছিল, তার জীবন সংশয়। চারুবাবুর 'আদর্শ বিপ্লবীরা' তাকে বাঁচতে দেবে না। কারণ তাদের চোখে সে এখন 'শ্রেণীশত্রু' এবং তার রক্তে হাত রঞ্জিত তাদের করতেই হবে।

সে নিজে একজন ফেরার নকশাল। আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু তার আত্মগোপন করার সব আস্তানাই তার পুরনো কমরেডরা জানে। একাত্তরের বিশে জানুয়ারির গভীর রাতে তেমনই এক আস্তানায় এল তারা। আলোচনার নাম করে তাকে ডেকে নিয়ে গেল কাশীপুরের কেদারনাথ দাস লেনে। তারপর একটান, দু'টান। ছুরির। পেটে বুকে পরপর পড়তে লাগল। তার জীবনীশক্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণশক্তিও শেষ হয়ে আসছিল। সে ক্ষীণভাবে শুনতে লাগল, "কুত্তার বাচ্চা, শালা, শ্রদ্ধেয় নেতাকে অশ্রদ্ধা করা, মর শালা, মর।"

সারা শরীরে অসংখ্য ছুরির আঘাত নিয়ে সে পড়ে গেল রাস্তায়। তার রক্তে তার কমরেডদের হাত রঞ্জিত হয়েছে, তারা খুশি। তারা তাকে লাথি মেরে আরও 'ঘৃণা' প্রকাশ করে চলে গেল।

একুশ তারিখ ভোরবেলায় কাশীপুর থানায় খবর এল। 'একটা ক্ষতবিক্ষত, রক্তমাখা যুবক রাস্তায় পড়ে আছে।' থানা থেকে ছুটল পুলিশ, ভর্তি করানো হল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে, কিন্তু দীপঙ্কর বাঁচল না।

ঠিক একই পরিণতি হয়েছিল জোড়াবাগান ও কুমোরটুলির নকশাল কুশাল রায়চৌধুরীর। সেও চারুবাবুর রাজনৈতিক বিরোধিতা করার সাহস দেখিয়েছিল। সে ভেবেছিল, 'কর্তৃত্বের' বিরুদ্ধে না বললেও রাজনৈতিক প্রশ্ন সে পার্টিতে তুলতেই পারে। নিয়ম অনুযায়ী নিশ্চয়ই তুলতে পারে। কিন্তু সে বহুদিন ওই পার্টিতে থেকেও কি বুঝতে পারেনি, চারুবাবুর 'হাতে গড়া পার্টিতে ওইরকম কোনও নিয়ম বাস্তবে নেই। কুশাল নিজেও অনেক 'খতম' অভিযান ও সংঘর্ষে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু 'গলাকাটার রাজনীতির' অসারতা ও পরিসমাপ্তির ভয়ঙ্কর দিক তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল নিশ্চয়ই। তাই যে প্রশ্ন তার মনে জেগেছিল, তা কমরেডদের বলে দিয়েছিল। এই বলে দেওয়াটা 'কাল' হল। তারা ভাবল, 'কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার সাহস কোথা থেকে পেল কুশাল?" সুতরাং সে 'শ্রেণীশত্রু'। কুণালকে তারা তাড়া করল।

কুণাল জোড়াসাঁকোর হরিপদ দত্ত লেনে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিল। কিন্তু খবর চলে গেল তার একসময়ের সহযোদ্ধাদের কাছে। তারা কুণাল বধের জন্য প্রস্তুত হল।

একাত্তরের জুলাই মাসের ন' তারিখের বৃষ্টিঝরা গভীর রাতে তারা হরিপদ দত্ত লেনের সেই বাড়িতে এল। বাড়ির লোকেদের ভয় দেখিয়ে কুণালকে বার করল এবং তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে নিয়ে গেল খানিকটা। তারপর রিভলবারের গুলি। নৈঃশব্দ ভেঙ্গে খানখান। কুণাল বুক চেপে আছড়ে পড়ল কাদায় থৈ থৈ করা রাস্তায়। তারপর দু'বার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে শান্ত হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। শত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়ে 'কর্তার খাঁটি বিপ্লবীরা' অন্ধকারে হরিপদ দত্ত লেন ছেড়ে চলে গেল।

তাদের মুখ দেখলে মনে হবে, ভারতবর্ষের বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য কুণালকে হত্যা করাটা জরুরী ছিল। যেমন একান্ত দরকার ছিল দীপঙ্করকে খুন করা কিংবা ভবানীপুরের হরিশ চ্যাটার্জি রোডের গোপাল জানাকে পরবর্তীকালে কিন্তু কোনও তথাকথিত প্রগতিশীলদের প্রশ্ন তুলতে শুনিনি, কী কারণে দীপঙ্কর, কুণাল, গোপাল বা কমল সান্যালদের চারুবাবুর লোকেরা খুন করেছিল? এই সব খুন করে তারা বিপ্লবে কতটা অগ্রগতি এনেছে? দীপঙ্কররা কী ধরনের শ্রেণীশত্রু ছিল? প্রগতিশীলেরা জানে এসব প্রশ্ন করা যায় না। কারণ এই ধরনের প্রশ্ন করলে আর প্রগতিশীল থাকা যায় না! তারা জানে, যে ঝাণ্ডা উড়িয়ে তারা প্রগতিশীল থাকছে, তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা কঠিন।

কেন প্রশ্ন তোলা যায় না, কী কারণ এবং কারা অন্তঃপার্টি সংঘর্ষের জন্য দায়ী? বিশেষ করে যার ফলস্বরূপ বহু যুবক অযথা অকারণে প্রাণ দিয়েছে।

সত্তর একাত্তরে নকশাল ও সি.পি.আই (এম)-এর অনেক ছেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দিয়েছে নিজেরা পরস্পরের মধ্যে খুনোখুনি করে। এই ব্যাপারটাতেই নেতারা আশ্চর্যরকম নীরব। 'বিপ্লব কোন পথে, এটা নির্ধারণ করতে এত রক্তক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল?" একপক্ষ ঘোষণা করল 'শ্রেণীশত্রু', অন্যপক্ষের, নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত পাল্টা উস্কানি দিয়ে বললেন, "পুলিশের বুলেটে কি নিরোধ লাগানো আছে?"

যারা এইসব অবাঞ্ছিত হানাহানি ও সংঘর্ষ বন্ধ করতে পারত, তারা যদি খুনের বদলা খুনের রাজনীতির কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করতে পারে, তবে তার কি পরিণতি হয়, সেটা পশ্চিমবাংলার বুকে সাধারণ মানুষ দেখেছেন। আর সেই রক্ত ঝরানোর জন্য দায়ী কোন পার্টি নয়? প্রত্যেকেই কম-বেশী দায়ী। প্রত্যেকেই সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে খুনোখুনি করেছে। তার মধ্য দিয়েই উত্থান হয়েছিল কংগ্রেসের বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরের রাজ ও সেই রাজের হিংস্র সৈনিকদের।

পরে, সেইসব পার্টির কর্তাব্যক্তিরাই ওই খুনোখুনির জন্য একমাত্র পুলিশকে দায়ী করে কত মায়াকান্না কেঁদেছেন। মায়াকান্নার আগে 'এলাকা দখলের' লড়াইগুলো তাঁরা থামাননি কেন? কেন তাঁরা ক্বচিৎ কদাচিৎ বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটা তথাকথিত 'শান্তি মিছিল' করে দায়িত্ব সেরেছেন? তাঁরা বলবেন, "ওরা মারলে, আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব?" তাহলে ভেবে দেখা উচিত, পুলিশকে যদি মারে তখন পুলিশও কি চুপচাপ খুন হতে দেবে নিজেদের? প্রতিকার করবে না? খুনীদের ধরবে না? নাকি খুনীরা 'মহান দায়িত্বে খুন' করছে বলে তাদের ছেড়ে দেবে?

অন্তঃপার্টি কলহ ও সংঘর্ষের জন্য দায়ী পার্টির নেতারা এর কী জবাব দেবেন? কেন দীপঙ্কর, কুণালরা খুন হল?

কেন এন্টালির মনমোহন বিশ্বাস, চিৎপুরের প্রণব গুহ, বেচু হালদার, টালিগঞ্জের রতন পাল, জোড়াবাগানের শংকর দাস কিংবা বেলেঘাটার কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলকান্তি ঘোষ, সুলতান মুন্সি ও ভানু হাজরা খুন হল? কাদের অন্ধ বিশ্বাসের হঠকারী সিদ্ধান্তে? আমরা কি সেই সব 'দেশসেবকদের' চিনি না? চিনি। মুখোশের আড়ালে তাঁরাই তো আমাদের শাসনকর্তা কিংবা তাঁদের দোসর।

একাত্তরের তেরো ফেব্রুয়ারি রাত ন'টা নাগাদ, শীতের বিদায়ী হাওয়ার মাঝে এন্টালির ডি সি দে রোডের ভেতর সি.পি.আই (এম)-এর শ্রমিক নেতা মনমোহন বিশ্বাস তার ক'জন সহকর্মীকে নিয়ে ভোটের প্রচারের জন্য দেওয়াল লিখছিল, তার হাতে ধরা ছিল একটা লাল পতাকা। এমন সময় মুখ ঢেকে পাঁচজন ছেলে তাদের দিকে এগিয়ে এসে মনমোহনকে লক্ষ্য করে মারল পরপর তিনটে বোমা। প্রথম বোমাটাই মনমোহনের বুকে লেগেছিল। সে পড়ে গেল। দ্বিতীয়, তৃতীয় বোমাগুলো রাস্তায় পড়ে থাকা তার শরীরের আশেপাশে পড়ল। মনমোহন স্থির। তার হাতে তখনও আলগাভাবে ধরা লাল পতাকা। আততায়ী পাঁচজন শ্রদ্ধেয়

নেতা জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল।

একাত্তরেরই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় চিৎপুর এলাকায় নর্দার্ন অ্যাভিনিউ ও শ্রীনাথ মুখার্জি লেনের সংযোগস্থলে দুই যুযুধান দল মুখোমুখি দাঁড়াল। দু'পক্ষই 'বিপ্লবে' বিশ্বাসী। এবং সেটা ত্বরান্বিত করতে চায়। সুতরাং তারা কি আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখ দেখবে? তাহলে তো ভারতবর্ষের বিপ্লব পিছিয়ে যাবে! অযথা দেরি করে লাভ কি? শুরু হল, একে অন্যকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া, পাইপগান দিয়ে একের পর এক গুলি বর্ষণ। মুহুর্মুহুঃ বোমাবৃষ্টির আওয়াজে আতঙ্কিত বাজারমুখী বা বাজারফেরত মানুষজন যে যেদিকে পারল ব্যাগ, সব্জি ফেলে পালাতে লাগল। তারা জানে তাদের 'মুক্তির পথ পরিষ্কার করতে দু'দলের মুক্তিযোদ্ধারা ভোরবেলাতেই যুদ্ধ শুরু করেছে।

প্রায় আধঘণ্টা যুদ্ধ হল। রণক্ষেত্র ফাঁকা। তখন সকাল সাতটা। চিৎপুর থানা থেকে যখন পুলিশ পৌঁছল, দেখল, দুই যুবকের দেহ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। দু'জনেই মৃত। একজন বেচু হালদার। অন্যজন প্রণব গুহ। বেচু সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডার ছিল। কিন্তু ঘটনার মাস তিনেক আগে সি.পি.আই (এম)-এর অন্য এক গোষ্ঠীর সঙ্গে তার মতবিরোধের ফলে সে নকশালদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কাশীপুরের নকশালদের সঙ্গে মিশতে শুরু কর। কিন্তু শুধু মিশলেই তো আর 'কাজ' হবে না। তার পুরনো দলের সঙ্গে বোঝাপড়াও তো করতে হবে। সেই বোঝাপড়া করতেই সে প্রণবদের নিয়ে নর্দার্ন এ্যাভিনিউতে এসেছিল। সেখানে সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডাররা আগের থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তারাও আর বেচুকে সহ্য করতে পারছিল না। কলকাঠি নেড়ে বেচুকে নিজেদের এলাকায় যুদ্ধের জন্য টেনে এনেছিল। আর তারই পরিণতিতে যুদ্ধশেষে বেচু ও প্রণবের মৃত্যু!

এর আগের দিন পঁচিশ তারিখে দুপুরবেলা জোড়াবাগানের বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটে শুরু হয়ে গেল নকশাল ও সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডারদের মধ্যে লড়াই। দু'পক্ষই ছুঁড়তে শুরু করল বোমা। অঝোরধারায় পড়তে লাগল। বোমার আওয়াজ ছাড়া আর সব কিছু স্তব্ধ। কারণ বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি তো শান্তির জন্য! শান্তির দূতেদের যুদ্ধের দাপটে ঘরে ঘরে নাগরিকরা কেঁপে চলেছে।

জোড়াবাগান থানার একটা টহলদারী ভ্যান বোমার আওয়াজ শুনে এগিয়ে গেল বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটের যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধ স্থগিত রেখে দু'পক্ষই পালাল। কিন্তু পালাতে পারল না শংকর নামে একটি ছেলে। বাচ্চা ছেলে শংকর সি.পি.আই (এম)-এর কর্মী। বোমার আঘাতে তার শরীরের নিচের দিকটা হাঁ হয়ে আছে। হাসপাতালে মারা গেল। জলধর নামে আর একটি ছেলে পথে যুদ্ধের মাঝে পড়ে গিয়েছিল। সে কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নয়, হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গেল।

ওই দিনেই টালিগঞ্জের সুইস পার্কের কাছে শান্তি পল্লীতে সকাল দশটা নাগাদ শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের বোমাবাজি। পুলিশ গিয়ে পড়ল সেই বোমাবাজির মাঝখানে। এবার দুদলের ছেলেরাই নিজেদের যুদ্ধ সাময়িক বন্ধ রেখে, পুলিশকে 'উচিত শিক্ষা দিতে' আক্রমণ করল আমাদের বাহিনীকে। গুলি চলল। লাগল রতন পালের পেটে। রতনকে পাঠানো হল হাসপাতালে, বিকেলে মারা গেল।

জানুয়ারির ছাব্বিশ তারিখ। প্রজাতন্ত্র দিবসের শীতের সকাল। কুয়াশা ঠেলে গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেলেঘাটায় তার বাড়ির কাছে রাসমণি বাজারে বাজার করতে গেল। বাজার সারা হলে সে থলি হাতে ফেরার পথ ধরল।

কিন্তু তার আর বাড়ি ফেরা হল না। ছ'জন নকশাল তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল রাসমণি বাজারের পাশে খালের ধারে। হাতের থলিটা একটানে তার থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল একজন। পালং শাক, ফুলকপি, সব ছড়িয়ে পড়ল খালের জলে। কিরণ অনেকক্ষণ

আগে থেকেই বুঝে গেছে কি হতে যাচ্ছে। সে একদিকে নকশালদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য গায়ের জোর দিয়ে ছটফট করছে, অন্যদিকে চিৎকার করে চলেছে, "বাঁচান, আমাকে বাঁচান" বলে। কিন্তু কে বাঁচাবে? সবাই ওর দিকে একবার তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ত্রস্ত পায়ে সরে যাচ্ছে। বেলেঘাটায় তখন নকশালদের বিরুদ্ধে কিছু বলবে এত দুঃসাহস কার? সেই সাহস দেখানোর পরিণতি যে অকালে নিজের মৃত্যুকে সাদরে ডেকে আনা, তা প্রত্যেকেই জানে।

কিরণের বুকের ওপর পাইপগানের গুলির আওয়াজ। কিরণ টাল খেতে খেতে খালের পারে পড়ে গেল। এবার পরপর তিনটে বোমা। কিরণের শরীরের বিভিন্ন অংশ এদিকে ওদিক ছিটকে পড়ল। প্রাণহীন কিরণকে চেনা দায়। সে শুয়ে রইল। বাজার থেকে কেনা সব্জি রান্না করে আর এই জীবনে খাওয়া হবে না। তার দোষ সে সি.পি.আই (এম)-এর সক্রিয় সমর্থক ছিল।

জানুয়ারিরই সাত তারিখে কিরণের দুই সঙ্গী জোড়ামন্দিরের নস্কর লজের উল্টোদিকে মসজিদের কাছে খুন হয়ে গিয়েছিল।

ভোরবেলা রাস্তায় রাস্তায় দৈনিক পত্রিকার হকাররা বাড়ি বাড়ি পত্রিকা বিলি করছে। কনকনে ঠাণ্ডা। কুয়াশায় ঢাকা রাস্তায় মাফলার, আলোয়ানে মুখ ঢেকে পথচারীদের চলাফেরায় তাদের চেনা মুশকিল। মসজিদের পাশে নকশাল নেতা আশিস তার পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

সি.পি.আই (এম) কর্মী চাউলপট্টির সুলতান মুন্সি, ভানু হাজরা প্রতিদিনের মতো তাদের পার্টির দৈনিক বাংলা পত্রিকা 'গণশক্তি' বেলেঘাটা মেন রোডের একটা দরমার বোর্ডে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে এসেছে। রোজই সেই পত্রিকা পার্টির কিছু লোক ও তাদের সমর্থকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভানু নিচে বসে আঠা লাগাচ্ছে। সুলতান আঠা লাগানো কাগজ একটার পর একটা বোর্ডে লাগাচ্ছে। হঠাৎ আশিসরা বেরিয়ে এসে ভোজালি, ছুরি নিয়ে তাদের ওপর চড়াও। প্রথমেই সুলতানের পেটে, একজন ঢুকিয়ে দিল ছুরি। আশিস ভানুর চুলের মুঠি ধরে তার গলাটা আকাশের দিকে তুলে বসিয়ে দিল ভোজালি। এক কোপেই ভানুর কণ্ঠনালী দু'ফাঁক। সে শুয়ে পড়ল। সুলতান পরপর ছুরির আঘাত খেয়ে কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। সুলতানের কাতরানো শেষ করতে আশিস এবার বসিয়ে দিল তার গলাতেও ভোজালির কোপ। সুলতানের যন্ত্রণা চিরদিনের মতো শেষ।

ভানু ও সুলতানকে খুন করে নকশালরা বীরদর্পে যখন পালাল, তখনও কুয়াশা ভেদ করে ভালভাবে সূর্যের আলো ফোটেনি।

সাতদিন পর রাতে বেলেঘাটা থানার অফিসার দুলাল দাস বেশ বড় ফোর্স নিয়ে চাউলপট্টিতে গিয়েছে খানাতল্লাশি করতে। রাস্তায় ওদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল আশিসের। আশিস বোমা ছুঁড়ে পালানোর চেষ্টা করল। পারল না। দুলালের রিভলবার ও সঙ্গের কনস্টেবলদের রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। আশিস রাস্তায় পড়ে গেল। আর নড়ল না।

ফেব্রুয়ারির সাত তারিখ। সন্ধেবেলা। পঁচিশ বছরের যুবক উৎপল ঘোষ বাড়ি ফিরছে। সি.আই.টি রোডের একটা ফ্ল্যাটে সে তার পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে থাকে। সে সি.পি.আই (এম)এর সমর্থক। পাড়ায় সে জনপ্রিয়, বুলবুলকে চেনে না এমন কেউ নেই।

সি.আই.টি ফ্ল্যাট এলাকার 'এ' ব্লকের সামনে যেই সে এসেছে, আচম্বিতে ছ'জন নকশাল যুবক তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করল। পাইপ গানের গুলি লাগল তার পিঠে। 'মাগো' চিৎকার করে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উল্টে নিল তার শরীর। তারপর পর পর কটা ছুরির ফলা ঢুকে গেল তার পেটে। 'মা', 'মা' চিৎকার আশেপাশের অনেকে শুনেছে।

কিন্তু না, কেউ ছুটে এল না। ফ্ল্যাটের খোলা জানালাগুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল।

বুলবুল শুয়ে রইল। নকশালরা স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল। বুলবুলের আর্তনাদ

থেমে গেছে, আর কোনদিন সে কথা বলতে পারবে না। পৃথিবীকে সুন্দর করার যে স্বপ্ন সে দেখেছিল সেই স্বপ্নও আর দেখবে না। তার স্বপ্ন দেখার অধিকার অন্যেরা কেড়ে নিল, কারণ তার 'স্বপ্ন' নাকি ভুলে ভরা, 'বিপ্লবী নয়, প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী'। যারা তাকে সেই স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাদের গায়ে কিন্তু কোনও আঁচড় লাগল না।

সত্তর একাত্তর সালের বেলেঘাটা একটা সত্যিই বিভীষিকা। বেলেঘাটার বিশাল অঞ্চল জুড়ে চলেছে একদিকে নকশালদের দাপট, অন্যদিকে সি.পি.আই (এম)-এর প্রতিরোধের নামে নকশালদের সঙ্গে দিনরাত সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে বেলেঘাটার কোনও এলাকা বাদ ছিল না। চাউলপট্টি, রাসমণিবাজার, চিংড়িঘাটা, জোড়ামন্দির, অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন থেকে সি.আই.টি বিল্ডিং ছাড়িয়ে বালুর চর, কোনও এলাকা বাদ ছিল না।

সাতষট্টি সালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্থান হওয়ার পর বেলেঘাটা এলাকায়, সি.পি.আই (এম) পার্টি ছেড়ে নকশালবাড়ির আন্দোলনের সমর্থনে বহু সি.পি.আই (এম) কর্মী ও সমর্থক বেরিয়ে এল। কে জি বসুর শালা তালপুকুর রোডের নিরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিল সেই সি.পি.আই (এম) থেকে আলাদা হওয়া দলের নেতা। তার সঙ্গে ছিল তালপুকুরেরই শান্টু, খোকা এবং হরমোহন ঘোষ লেনের সুভাষ দে ও শামু মিত্র। পরবর্তীকালের এক কংগ্রেস এম এল এও ওদের সঙ্গে আর এস পি পার্টি ছেড়ে যোগ দিয়েছিল এবং গুরুদাস কলেজে সে অন্য নকশালদের নিয়ে হানা দিয়েছিল।

অন্যান্য অঞ্চলের মতো সত্তর সালে বেলেঘাটাতেও স্কুল কলেজ পোড়ান, বিমানবন্দরমুখী বা কলকাতাগামী প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ, আমেরিকান এক্সপোর্ট লাইন, থাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন, অন্যান্য বিদেশী ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স করপোরেশনের গাড়ির ওপর হামলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব বিদেশীদের ওপর হামলার জন্য কলকাতার প্রচণ্ড দুর্নাম হয়ে গিয়েছিল, পর্যটকদের যাতায়াতে বিপদ হতে আমাদেরও কাজ অনেক বেড়ে গেল।

কিন্তু চারুবাবুর অনুগামীদের সশস্ত্র বিপ্লব ওই সব 'নিরামিষ হামলাতে আবদ্ধ রইল না। একদিকে সি.পি.আই (এম) পার্টির কর্মীদের তাড়িয়ে এলাকা দখলের জন্য শুরু করল সংঘর্ষ অন্যদিকে পুলিশের ওপর হামলা। এইসব হামলার চোটে সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল।

সত্তরের মাঝামাঝি থেকেই কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের মতো বেলেঘাটাতেও নকশাল আন্দোলন রক্তমুখী হয়ে রক্তাক্ত পথ ধরল।

তবে সেই রক্তাক্ত পথ আরও লাল, আরও রক্তে পিচ্ছিল করতে আমাদেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল। আর সেই ভূমিকার নায়ক ছিলেন তখনকার কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি সি অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

সেটা ছিল সত্তর দশকের নভেম্বরের উনিশ তারিখের রাত। সেই রাতের অভিযানের আগের থেকেই অবশ্য নকশালরা উস্কানি দিচ্ছিল। সেই রাতের ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দু'মাস আগের দিন, সকাল সাড়ে ন'টার সময় বেলেঘাটা থানার ও সি গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অবিনাশ শাসমল লেনের বাড়ি থেকে প্রতিদিনের মতো সুভাষ সরোবরে স্নান করতে গেছেন। বহুকালের অভ্যাস মতো খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে ভাল করে পুরো শরীর অবগাহন করে সরোবরের দক্ষিণ ঘাট দিয়ে পারে উঠেছেন কি ওঠেননি, ঘাটের পাশের গাছের আড়াল থেকে তিন নকশাল যুবক পাইপগান দিয়ে তাঁকে পরপর দুটো গুলি করল। গৌরাঙ্গদার কাঁধে গুলি লাগতে তিনি ঘাটে আছড়ে পড়ে গেলেন। নকশালরা পালাল। হঠাৎই পাইপগানের গুলির আওয়াজে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সরোবরের চারধারের গাছগাছালি থেকে ঘর-বাঁধা পাখির দল চিৎকার করে করে উড়ে পালাল, আর তাদের সঙ্গে পালাল স্নান করতে বা বেড়াতে আসা মানুষ।

গৌরাঙ্গদা ঘাটের ওপর পড়ে আছেন। রক্ত ঝরছে কাঁধ থেকে। তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কোনওমতে ডাকলেন দু'জন ভ্রমণকারীকে। তাঁরাই গৌরাঙ্গদাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। সেখানে প্রায় মাস তিনেক থাকার পর গৌরাঙ্গদা বাড়ি ফিরে এলেন।

ছয়'ই নভেম্বর, সকাল নটা। স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবল অনিল কৃষ্ণ দত্ত অফিসে আসার জন্য রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন দিয়ে হেঁটে আসছে। তাকে ঘিরে ধরল নকশাল যুবকরা। ওদের প্রত্যেককেই অনিল চিনত। পাড়ার ছেলে, তাই ভয় না পেয়ে প্রশ্ন করল, "কিরে, তোদের কি চাই?" কোটনি খোকন বলল, "তোর গলা।" অনিল তবু বলল, 'ইয়ারকি মারিস না, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।" "আমাদেরও দেরি হয়ে যাচ্ছে" বলে একজন তার পেটে সোজা ঢুকিয়ে দিল ছুরি। অনিল পেট চেপে পালাতে গেল, পারল না। বলতে লাগল, "মারিস না, মারিস না। আমি তো তোদের কিছু করিনি।" কে কার কথা শোনে? ওরা উন্মত্তের মতো একের পর এক ছুরির ফলা ওর শরীরের চারদিকে বসাতে লাগল। অনিল শেষ। আর কোনওদিন সে অফিসে আসতে পারবে না!

এর ঠিক তের দিন পর উনিশ তারিখ, সেই সকাল ন'টা। অফিস যাত্রী নিয়ে বাসের আনাগোনা বিবেকানন্দ রোডের ওপর। বেলেঘাটার রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে ট্রাফিক সামলাচ্ছে আমাদের ট্রাফিক দফতরের কনস্টেবল নিরোদবিহারী সাহা। তার দৃষ্টি রাস্তার ওপর। একবার একদিকের গাড়ি ছাড়ছে, একবার অন্যদিকের। তার হাতের ইশারায় গাড়ির চলাচল। প্রতিদিনের মতো সে সেই কাজেই আবদ্ধ। সে জানেই না ওই সকালে, ব্যস্ত সময়ের মাঝে তার দিকে এগিয়ে আসছে অবিনাশ ব্যানার্জী লেনের নকশাল কমল দে, প্রদীপ দাস, মন্টু মাইতি ও রাধা মাধব দত্ত গার্ডেন লেনের অশোক ও নিত্য ঘোষ এবং কলকাতা পুলিশের সেকেন্ড ব্যাটিলিয়নের সিপাই গৌরাঙ্গ রায় চৌধুরী। সে সরোজ দত্তের 'পুলিশের প্রতি আবেদন' নামক নিবন্ধ পড়ে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাদের কারও কাঁধে কাপড়ের ঝোলা, কারও বা হাতে ঝুলছে কিট ব্যাগ। একজনের হাতে একটা খবরের কাগজ মোড়ক ।

আজকের সকালের অভিযানের ব্যাপারে গত দু'দিন ধরে ওরা আলোচনা করেছে। নেতৃত্বের থেকে ওদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওরা খুশি। ওদেরও পরীক্ষা আজ। শত্রুর রক্তে হাত রাঙালে পার্টিতে ওদের গুরুত্ব বেড়ে যাবে। 'শ্রদ্ধেয় নেতা' তাদের শিখিয়েছে, 'শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানই শ্রেণী সংগ্রাম'। আজ তাই তারা শ্রেণীশত্রু খতম করে, 'ভারতবর্ষের মুক্তিফৌজের অংশীদার' হতে যাচ্ছে।

রাস্তার মাঝখানে ওই নকশাল ছ'জন যুবক দৃঢ় পায়ে ট্রাফিক কনস্টেবল নিরোধের দিকে এগিয়ে এল। তাকে ওরা ঘিরে ধরেছে। রাস্তার এদিক ওদিক দিয়ে গাড়ি চলছে। সেদিকে ওদের খেয়াল নেই। প্রদীপের হাতের কাগজের মোড়ক থেকে বার হল একটা ভোজালি। অন্যদের কিট ব্যাগ ও কাপড়ের ঝোলা থেকে ছুরি ও ভোজালি।

নিরোধ কিছু বোঝার আগেই অশোকের ছুরি ঢুকে গেল তার পেটে। 'ও মা' বলে পেট ধরে রাস্তায় বসে পড়ার আগেই প্রদীপের ভোজালির কোপ তার ঘাড়ে। মাথাটা ঝুলে গেল। সে শুয়ে পড়ল। আরও ক'টা ছুরির ফলা তার শরীরের এদিক ওদিক এফোঁড় ওফোঁড় করে ক্ষান্ত হল। সে স্থির। নকশালরা উঠে দাঁড়াল। চারপাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। তারই মাঝে সি.পি.আই (এম) পার্টির সমর্থক বামাপদ কর্মকার ওদের দেখে লুকিয়ে পালাতে গেল। নিত্য তাকে চেনে। সে আরও একটা 'শ্রেণীশত্রুকে হাতের কাছে পেয়ে উল্লসিত হয়ে তাকে ছুটে গিয়ে ধরল। এবং চোখের পলকে তার পেটে ঢুকিয়ে দিল হাতের খোলা দশ বার ইঞ্চি লম্বা ছুরিটা।

নিত্যর সঙ্গীরা বাকি কাজ সেরে ফেলে যখন 'শ্রদ্ধেয় নেতা জিন্দাবাদ', 'চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে সেখান থেকে সরে পড়ল তখন সকালের বয়স মাত্র ন'টা দশ। ভয়ে রাস্তা ফাঁকা। বাস যাত্রীরাও বাস থেকে নেমে ছুটে পালিয়ে গেছে। গাড়ির চালকেরা

গাড়ি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ছুট।

ফাঁকা রাস্তার ওপর পড়ে আছে শুধু দু'টো মৃতদেহ। যাদের প্রাণের বিনিময়ে 'ভারতের বিপ্লব' এগিয়ে গেল চারুবাবুর 'হাত' ধরে।

নভেম্বর মাসের চার তারিখ। সকাল সাড়ে ন'টা। অবিনাশ ব্যানার্জী লেনে দেশবন্ধু বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রীরা ক্লাস করছে। হঠাৎ একটা ক্লাসে কমল, প্রদীপের নেতৃত্বে দশ বারো জনের একটা নকশাল দলের সেখানে ঝড়ের গতিতে আগমন। ছাত্রীরা প্রথমে ভ্যাবাচেকা, তারপর ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁপছে। ক্লাসের শিক্ষিকা সি.পি.আই (এম) নেতা কে জি বসুর স্ত্রী পারুল বসু পড়াচ্ছিলেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নকশালদের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরা গলায় বললেন, "কি চাই তোমাদের?"

কমল দে বলল, "তোকে।" তারপর আর কথা নয়, সোজা একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিল পারুলদেবীর ডান দিকের বুকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে ভিজতে লাগল তাঁর পরনের শাড়ি, ব্লাউজ। তিনি টলতে টলতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর।

এরপর কমলের সঙ্গীরা একটা কাঁচি বার করে পারুলদেবীর চুল ধরে কচকচ করে কাটতে শুরু করল। মিনিট পাঁচেক ধরে চুল কেটে তাঁকে ন্যাড়া করে কমল তার দলবল নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। পারুলদেবী তার ভাই নিরঞ্জনের হাতে তৈরি করা 'বিপ্লবীদের' হাতে ছুরি খেয়ে ন্যাড়া মাথায় ওখানে পড়ে রইলেন। হতভম্ব ছাত্রীরা কি করবে ভেবে না পেয়ে হইচই করে ক্লাস ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে স্কুলের অফিসের দিকে গেল।

কমলদের সন্ধানে আমাদের বিভিন্ন দল এদিক ওদিক খুঁজতে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা খানেক পর সি.আই.টি রোড ও বেলেঘাটা মেন রোডের সংযোগস্থলে আমাদের এ.সি. নর্থ সুবার্বের জিপে ও কে.সরকার লেনের মোড়ে ডি.সি নর্থের গাড়ির ওপর নকশালরা বোমা মারল। গাড়ি দুটোর ক্ষতি হলেও তাঁরা বেঁচে গেলেন।

সেদিন সন্ধেবেলা চাউলপট্টির কাছে সি.পি.আই (এম)-এর পার্টি অফিসের সামনে ওই পার্টির নেতা রাম চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করে নকশালরা বোমা ছুড়ল। বোমা তাঁর শরীরে লাগল না। লাগল প্রদীপ সরকার নামে একটা বাচ্চা ছেলের গায়ে। প্রদীপের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সে কোনও রাজনীতি করে না। রাজনীতি করার বয়সও তার হয়নি। তবু ভারতের 'অগ্রগতির' জন্য রাজনীতির দলাদলিতে সে চিরদিনের জন্য বিদায় নিল।

ওইদিনই রাত্রিবেলা বেলেঘাটা থানার ও সি অনিল ঘোষ দস্তিদার ফোর্স নিয়ে একটা খবরের ভিত্তিতে চাউলপট্টিতে নকশালদের ধরতে গেলেন। নকশালরা ওদের ওপর বোমা নিয়ে আক্রমণ করল। অনিলবাবুরা পাল্টা গুলি ছুঁড়লেন। গুলিতে বিপ্লব নামে এক তরুণ নকশাল ছেলে মারা গেল।

রক্ত ঝরানোর ঘটনা বেলেঘাটায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটতে লাগল। কলকাতার অন্য এলাকাতেও তাদের কার্যকলাপ একই কদমে এগিয়ে চলেছে।

পনেরোই নভেম্বর সকালবেলা সুভাষ সরোবরের পারে একটা অপরিচিত লোকের মৃতদেহ গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেল। সেই মৃতদেহের পাশে একটা বড় কাগজে বাংলায় লেখা ঘোষণাপত্রও পাওয়া গেল। তাতে লেখা, "কমরেড মুরারী হত্যার বদলা নিচ্ছি—নেব – সি.পি.আই.(এম. এল)।"

এরপর এল উনিশে নভেম্বরের সেই রাত। তার মাঝে অবশ্য ঘটে গেছে আরও অনেক আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ঘটনা। নকশালরা মিউজিয়ামের সামনে, তালতলায়, বড়তলায়, শ্যামপুকুরে পুলিশ দলের ওপর বোমাবাজি করে গেছে। সেইসব বোমাবাজিতে আহত হয়ে ক'জন হাসপাতালে, ক'জন বা ছুটি নিয়ে বাড়িতে।

কলকাতা সহ বেলেঘাটায় প্রতিদিন নকশালদের বিভিন্ন আক্রমণের জন্য আমাদের বড় সাহেবদের ঘুম চলে গিয়েছিল। কি ভাবে ওইসব আক্রমণ মোকাবিলা করা যায় তার চিন্তায়

স্বভাবতই ছিল অস্থির। তারা এই নিয়ে মিটিংয়ের পর মিটিং করতেই লাগল। সে সব আলোচনায় কি সিদ্ধান্ত হল, তা আমাদের জানান হল না। আমরা নিচু তলার অফিসাররা প্রায় অন্ধকারে থেকে তাঁদের হুকুম তামিল করতে লাগলাম।

অবশেষে সেই উনিশে নভেম্বর সকালে আমাদের বলা হল, "কোনও এক বিশেষ অভিযানে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে।" বড় সাহেবদের নির্দেশ পেয়ে আমরা তো প্রস্তুত থাকবই। তা ছাড়া বিরাট এক ফোর্সকেও অভিযানের জন্য আটকে রাখা হল।

রাত এগারটা নাগাদ আমাদের অভিযান শুরু হল। তখন আমরা জানতে পারলাম এই বিরাট বাহিনী নিয়ে আমরা যাচ্ছি বেলেঘাটায় খানাতল্লাশি করে নকশালদের ধরতে।

সাড়ে এগারটা নাগাদ আমরা বেলেঘাটায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে পৌঁছে ঠিক হল, পুরোবাহিনী দুটো দলে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে যাবে। একদল লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের নকশাল প্রতিরোধ শাখার অফিসাররা একটা ফোর্স নিয়ে চাউলপট্টি, রামমণি বাজারের দিকে যাবে। অন্যদল, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা যাবে সি.আই.টি বিল্ডিংয়ের দিকে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি, উমাশংকর, শচী, সমীর একটা বেশ বড় বাহিনী নিয়ে রাসমণি বাজারের দিকে চললাম। এদিকে, আমাদের গোয়েন্দা দফতরের প্রধান দেবীবাবু চলে গেলেন অরুণবাবুর সঙ্গে সি.আই.টি বিল্ডিংয়ের দিকে। আমরা আমাদের দল নিয়ে রওয়ানা দিলাম।

চাউলপট্টি, রাসমণিবাজার এলাকা পুরো অন্ধকার। দোকানপাট সব স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ। রাস্তায় কোনও লোকজন নেই। আমাদেরও নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা নেই। হাতড়ে বেড়াতে হবে। নকশালদের ঘাঁটি এলাকাগুলো মোটামুটি আমরা জানি। তাই আমরা ঠিক করলাম, যেখানে যতটা পারি খুঁজে দেখব। আমরা শুরু করলাম, চাউলপট্টি রোড, সুরা ইস্ট রোড, গগন সরকার লেনে তল্লাশি। চাউলপট্টিতে তখন নকশালদের নেতা অসীম চৌধুরীকে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজছি। খুঁজছি রানা সাহা, আশিষদের। বেশ কটা বাড়িতে আমরা গেলাম, কিন্তু ওদের কাউকে পেলাম না। এলাকাটা মোটামুটি ঘিরে রেখেছি। ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়লে, চট করে পালাতে পারবে না।

হঠাৎ রাত একটা নাগাদ চাউলপট্টি রোড ও গগন সরকার লেনের সংযোগস্থলে পরপর দুটো বিশাল বোমা ফাটার আওয়াজ। নকশালরা গগন সরকার লেনের ভেতর থেকে আমাদের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসেছে। আমাদের হাতের রিভলবার ও কনস্টেবলদের রাইফেল গর্জে উঠল। অন্ধকারে তিনটে ছায়ামূর্তি গগন সরকার লেনের ভেতরে ছুটে পালাল। আমরাও ক'জন তাদের পেছন ছুটলাম, কিন্তু তারা কোথায় মিলিয়ে গেল। আমরা ধরতে পারলাম না।

বোমার আওয়াজে ও আমাদের গুলির শব্দে চারপাশটা গরম হয়ে গেল। গলির ভেতর আমাদের ছোটাছুটির জন্য এমনিতেই এলাকার বাসিন্দারা ভীত। নিশ্চিত তারা প্রত্যেকেই নিদ্রাহীন, যদিও কোনও বাড়ি থেকেই আলোর ছিটেফোঁটা রশ্মিও বার হচ্ছে না যে বোঝা যাবে, বাড়ির ভেতর কেউ জেগে আছেন। একটা বাড়ির পাশে আমি আর উমাশংকর দাঁড়িয়েছিলাম। শচীরা একটু দূরে। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

ওই একতলা বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ একটা শিশু জোরে কেঁদে উঠল। শুনতে পেলাম, তার মা শিশুকে থাবড়া দিয়ে দিয়ে শান্ত করার জন্য ভয় দেখাতে বলছে, "ঘুমাও, ঘুমাও, নয়ত পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে।" উমাশংকরও শুনেছে কথাটা, তাই সে একবার আমার দিকে ফিরে তাকাল।

ওকে ইশারায় চুপ করে থাকতে বললাম। ভাবলাম, 'ওই শিশুর মা এখন থেকেই শিশুর মনে পুলিশাতঙ্ক ধরিয়ে দিচ্ছে। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই কি তাই, আমরা কি ওই নির্বোধ শিশুদের ওপর কোনও রকম অত্যাচার করব? তা তো নয়, আমরা বরং ওই

শিশুদের ভবিষ্যতের পথকে পরিষ্কার করতে এসেছি এক অন্ধবিশ্বাসী সন্ত্রাসবাদী দলের তথাকথিত বিপ্লবীদের হাত থেকে।' চাউলপট্টির বস্তি থেকে ক'টা ছেলেকে নকশাল সন্দেহে ধরে ভ্যানে তুলে দিলাম। ঘেরাওয়ের মধ্যে থেকে ওরা কেউ পালাতে পারেনি। বিভিন্ন বাড়িতে সুবোধ বালকের মতো লুকিয়ে ছিল।

রাত দুটো। আমরা চাউলপট্টি ছেড়ে রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেনের দিকে চললাম। ওখানে রয়েছে নকশালের আর একটা বড় ঘাঁটি।

ওদিকে সি.আই.টি বিল্ডিংয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারদের নিয়ে অরুণবাবুরা কি করছে কে জানে। আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে যতদূর খবর ছিল সি.আই.টি বিল্ডিংয়ে নকশালদের কোনও বড় ঘাঁটি কিংবা নেতা নেই। নকশাল হিসাবে যারা আছে তারা সব ছোটখাট সমর্থক আর সদ্য সি.পি.আই (এম) থেকে বেরিয়ে আসা নকশালদের কিছু ঘনিষ্ঠ কর্মী, যারা এখনও কোনও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি আর তাদের কারও বিরুদ্ধে কোনও গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারি হয়নি। কিন্তু স্পেশাল ব্রাঞ্চের হাতে আমাদের অজানাও তো কিছু খবর থাকতে পারে, কারণ ওরা রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েই একমাত্র কাজ করে। বিশেষ খবর তাদের কাছে থাকতেই পারে।

রাত আড়াইটায় আমরা রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেনে ঢুকেই নকশালদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলাম। ওখানে অশোক, নিত্য, খোকন, কোটনি খোকনদের এলোপাতাড়ি বোমাবাজির মুখে আমরা কিছুটা পিছু হটে অপেক্ষা করলাম ওদের বোমার মজুত ফুরিয়ে আসার। মিনিট আট দশ ক্রমাগত বোমা ফাটার পর আমরা পাল্টা গুলি চালালাম। ওরাও বোমা ও পাইপগান দিয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

আধঘণ্টা কেটে গেল। তিনটে। আমাদের গুলির বিনিময়ে ওদের বোমা আর উড়ে আসছে না। ভাবলাম, নকশালরা, বোধ হয় রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে। আমরা এবার বাড়ি বাড়ি ওদের খোঁজ করতে শুরু করব। আস্তে আস্তে আমরা গলির ভেতর ঢুকতে শুরু করলাম। আমার আন্দাজই ঠিক, ওরা পালিয়ে গেছে। তল্লাশি শুরু করার মুখে দূর থেকে কিছু গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কোন দিক থেকে তা ঠাহর করতে পারার আগেই তা মিলিয়ে গেল। তা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে আমরা তল্লাশিতে মন দিলাম। কারণ সেইসব রাতে গুলি গোলার আওয়াজ না শোনাটাই আশ্চর্যের ছিল।

চারটের সময় তল্লাশি শেষ করলাম। এখানে তেমন কাউকে পেলাম না। তবু তিনজন নকশাল সমর্থক যুবককে ধরেছি। এবার লালবাজার ফিরে যাব। বেলেঘাটা মেন রোডে আমাদের সঙ্গে মূল বাহিনীর সাক্ষাৎ হল।

দেখলাম অরুণবাবুর ফর্সা মুখে খুবই উল্লসিত ভাব। সেদিক দিয়ে দেবীবাবুর মুখে কোনও খুশির রেশ নেই। যদিও দেবীবাবুর মুখ দেখে চট করে বোঝা যায় না তিনি বিষণ্ণ না খুশি কোন মানসিক অবস্থায় আছেন। তবে বহু দিন তাঁর সঙ্গে কাজ করার ফলে আমরা তাঁর ভাবটা অনেকটাই বুঝতে পারি। তাই তাঁকে দেখে মনে হল, তিনি যেন কিছুটা বিষণ্ণ। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "কী রুণু, তোমরা ক'জনকে ধরলে?" হতাশ গলায় বললাম, "তেমন কাউকে পাইনি। সব চুনোপুঁটি।" তিনি বিস্মিত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কি, তোমাদের দিক থেকে তো প্রচণ্ড আওয়াজ আমরা পেয়েছি, তবে কি কেউ মরেছে?" এবারও আমি হতাশ হয়ে বললাম, "না স্যার, মরেনি কেউ।" আমি চট করে ওদের সঙ্গে যে সব ভ্যান ও গাড়ি ছিল সেগুলোকে এক নজরে দেখে নিয়ে বললাম, "আপনারা তো কাউকে ধরতে পারেননি দেখছি।" তিনি বললেন, "সে ঝামেলা হয়ে গেছে। ছ'জন এনকাউন্টারে মারা গেছে, পরে শুনো।" পুরো বাহিনী লালবাজারের দিকে রওয়ানা দিল।

জিপে করে লালবাজারের দিকে ফিরতে ফিরতে আমরা লালবাজারের নকশাল প্রতিরোধ শাখার অফিসাররা কিছুতেই চিন্তা করে পেলাম না, সি.আই.টি বিল্ডিংয়ে কোন

এমন উগ্র নকশাল নেতার সাক্ষাৎ পেলেন যে সে এতবড় বাহিনীর ওপর হামলা করতে সাহস পেল। এবং তার পরিণতিতে ছ'জন নকশাল মারা গেল। আমরা আমাদের অজ্ঞতার জন্য চুপচাপ অন্ধকার হাতড়াতে লাগলাম। একদিকে আবার ভাবলাম, স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা আমাদের এই ব্যাপারে টেক্কা দিয়ে হারিয়ে দিল। অন্যদিকে ভাবলাম, তেমন কোনও সংঘর্ষের আওয়াজ তো আমরা পাইনি, যে যুদ্ধের শেষে, এতগুলো প্রাণ যেতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে লালবাজার ফিরে এলাম।

তারপর শুনলাম। সব শুনলাম। কলকাতা পুলিশের ইতিহাসের একটা লজ্জার, একটা মারাত্মক ভুলের কাহিনী।

অরুণবাবুর নেতৃত্বে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা ফোর্স দিয়ে সি.আই.টি বিল্ডিংয়ের পুরো এলাকাটা প্রথমে ঘিরে ফেলে এক এক করে বিল্ডিংয়ের ঘরে হানা দিতে থাকে। কিন্তু কোনও নকশাল ছেলেকেই তারা প্রথমে পায় না। এভাবে ঘণ্টা খানেক চলার পর অরুণবাবু মাথা নেড়ে নেড়ে অফিসারদের বলতে থাকেন, "আমার কাছে খবর আছে, তোমরা পাবেই পাবে।" বাছবিচার ছাড়া চলতে লাগল ফ্ল্যাটগুলোতে তল্লাশি। তার মধ্যে যে কোনও যুবককেই তারা পাচ্ছে, বার করে এনে তাকে সেখানেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কোনও রকম অসংলগ্ন কিংবা সন্দেহ হলেই তাকে অরুণবাবুর নির্দেশে গ্রেফতার করে ভ্যানে বসিয়ে দিচ্ছে। প্রায় পাঁচশ ফ্ল্যাটে ওরা দ্রুতগতিতে তল্লাশি চালিয়ে ধরল বেশ কিছু যুবককে।

তল্লাশি শেষ করে অরুণবাবু সেই ধৃত যুবকদের থেকে ছ''জনকে নিয়ে চলল সি.আই.টি বিল্ডিংয়ের পূর্ব দিকের প্রান্তে বালুর চরের দিকে। তারপর ওই ছ'জনকে ভ্যান থেকে নামিয়ে দিল।

এবং সংঘর্ষ হল! সংঘর্ষে ছ'জনই মারা গেল। যে সব যুবক মারা গেল ওই অলোক, অশোক, সাবুদের পরিচিতি যতটুকু আমাদের কাছে ছিল তা হচ্ছে, এরা কেউ নকশালদের অ্যাকশান গ্রুপে ছিল না। তারা সি.পি.আই (এম)-এর পার্টি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে সদ্য সদ্য নকশালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। এমন কী কেউ কেউ রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন করবে কি করবে না সেই বিষয়েও দ্বিধায় ছিল। ওই অপরাধেই তারা মারা গেল।

হ্যাঁ, কোনও সংঘর্ষই বালুর চরে হয়নি। সংঘর্ষই যদি হত তবে ওইসব সদ্য নকশাল হওয়া ছেলেদের কাছ থেকে কিছু না কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হত। কিন্তু একটা পাইপগানও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। তবে কি তারা খালি হাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ওই বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ করেছিল? তারা এত নির্বোধ ছিল এটা ভাবার কোনও অবকাশ নেই।

অরুণবাবুদের এই হটকারী কাজের ফল হল সুদূরপ্রসারী। একদিকে নকশালরা পুলিশের ওপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ খুন করতে শুরু করল। অন্যদিকে সমগ্র দেশে কলকাতা পুলিশের ওপর ধিক্কার বর্ষিত হতে থাকল। জনসাধারণের চোখে কলকাতা পুলিশের সম্মান প্রচণ্ডভাবে নিচে নেমে গেল। এই ঘটনা এতটাই গুরুত্ব পেল যে নয়াদিল্লী থেকে ন'জন পার্লামেন্ট সদস্যের দল সরেজমিনে 'বেলেঘাটায় তদন্তে এলেন।

সেই দলে ছিলেন, জ্যোতির্ময় বসু, ভি কে কৃষ্ণমেনন, হীরেন মুখোপাধ্যায়, অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, সুহৃদরঞ্জন মল্লিক চৌধুরী, শিবচন্দ্র ঝা, সনিল গঙ্গোপাধ্যায়, বকর আলি মির্জা ও বদরুদ্দোজা। তাঁরা তাঁদের বিবরণ পার্লামেন্টে জমা দেন। কিন্তু নকশাল আন্দোলনের প্রখর গতিতে সেই সব বিবরণ চাপা পড়ে যায়। অরুণবাবু অবশ্য এর কিছু দিন পরই স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে যান। কিন্তু তাঁর কৃতকর্মের ফল আমরা লালবাজারের গোয়েন্দা দফতর পদে পদে টের পেলাম। কারণ সাধারণ মানুষ তো আর স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও গোয়েন্দা দফতর আলাদা করে কিছু বোঝে না। তাই সব ঝড় আমাদের ওপরেই আছড়ে পড়তে লাগল।

প্রশ্ন, এর আগে কি নকশালরা পুলিশ ও অন্যান্য লোককে খুন করেনি? করেছে। ওই

বছরেই তেসরা জুনের সন্ধে সাতটার সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে অখিল মিস্ত্রি লেনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের নজরদারি বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর অমিতাভ সিংহ রায় যথারীতি অন্যদিনের মতো অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিল। সে ভাবতেই পারেনি তার জন্য অপেক্ষা করছে অন্য খেলা। সে গলিতে ঢুকতেই রবীন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কাঞ্চন ও অশোক চক্রবর্তী সহ নকশাল যুবকরা তার ওপর ছুরি, ভোজালি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরপর ঢুকিয়ে দিল ছুরির ফলা। অমিতাভ এত অপ্রস্তুত ছিল যে, সঙ্গে থাকা রিভলবারও বার করতে পারল না। তলপেটে, বুকে, গলায় ছুরির আঘাত খেয়ে সে অখিল মিস্ত্রি লেনের বৃষ্টিভেজা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। নকশালরা তার রিভলবার নিয়ে পালিয়ে গেল। অমিতাভর বাড়ির লোকজন ছুটে যখন ওখানে এসেছেন ততক্ষণে সব শেষ।

এসব ঘটনা দগদগে ঘায়ের মতো আমাদের বাহিনীর অনেকের মনের মধ্যে ছিল। তারই বহিপ্রকাশ কি হল বেলেঘাটার ওই ঘটনায়? কিন্তু সেটা কেন হবে উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল অফিসারদের উপস্থিতিতে?

হত্যার বদলা হত্যার সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিশ্বাসীরা এই ঘটনায় আরও ক্ষেপে গিয়ে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বিভিন্ন লোকের রক্ত ঝরাতে। কেমন সেই পাগলামি তার চিত্র দিতে মূলত বেলেঘাটা ও অন্যান্য অঞ্চলের অল্প ক'টা ঘটনার কথা বলছি। বিস্তারিত ঘটনার রূপ তুলে এনে সাজালে সেই ইতিহাস, পড়ে নকশালরাও হয়ত লজ্জা পেয়ে যাবে।

বিশ তারিখ ভোরবেলায় বিবেকানন্দ রোড ও সুধীর চ্যাটার্জী স্ট্রিটের সংযোগস্থলে কাপড় ব্যবসায়ী জগদীশ প্রসাদ পোদ্দার যখন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে, নকশালরা তাকে ভোজালি ও লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করল। তার মাথা ফাটিয়ে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে চলে গেল। জগদীশকে হাসপাতালে পাঠান হল কিন্তু সে বাঁচল না।

সেদিন সন্ধেবেলায় শ্যামপুকুরের তেলিপাড়া লেনে পুলিশের দলের ওপর বোমা নিয়ে আক্রমণ করে দু'জন কনস্টেবলকে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল করে চলে গেল।

রাত আটটায় দক্ষিণ কলকাতার দ্বারকানাথ ঘোষ লেনে এস.আই.বি. অফিসের একজন সহকারী কর্মচারীর ওপর রড দিয়ে মেরে, বোমা ফাটিয়ে তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল।

বাইশ তারিখ সকালে বেলগাছিয়ায় কেন্দ্রীয় দুগ্ধপ্রকল্পের অতিরিক্ত কমিশনারকে ছুরি বোমায় আহত করে নকশালরা পালাল।

বড়তলার রামচন্দ্র ঘোষ লেনে ও যাদু পণ্ডিত রোডে নকশাল ও সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডারদের মধ্যে বিকেলবেলা লাগল তুমুল যুদ্ধ। পুলিশ সেই সংঘর্ষ বন্ধ করতে গিয়ে গুলি করল। মারা গেল একজন সংঘর্ষকারী।

রাজাবাগানে ওই একই ঘটনার চিত্রনাট্য অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেটা বন্ধ করতে একই ব্যবস্থার ফলে মারা গেল এক নকশাল যুবক ও এক সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডার ও একজন সাধারণ নাগরিক।

যাদবপুরের বিনয় সোম এসেছিলেন বেলেঘাটা মেন রোডে এক আত্মীয়ের বাড়িতে, রাতে বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকারে তাঁকে ধরল নকশালরা। পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে কেটে দিল তাঁর কণ্ঠনালী। বিনয়বাবু আর উঠলেন না। গলায় ছুরির পোচ খেয়ে রক্তে স্নান করে শুয়ে রইলেন রাস্তার ওপর।

বেলেঘাটার বালুর চরের ঘটনার পর রক্ত ঝরানোর স্রোতটা বেড়ে যেতে আমাদেরও দিন রাত পায়ে চাকা লাগিয়ে খালি ছোটা ছাড়া আর কোনও কাজ রইল না। সারা কলকাতা জুড়ে নকশালদের তাণ্ডবে এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কাজগুলো ছোট হয়ে গেল।

ছুটতেও হয় অতি সাবধানে, সতর্ক হয়ে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক দুপুরে রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেনে গেলাম নকশালদের ধরতে। গলির মুখেই আমাদের জিপের ওপর পড়ল পরপর দুটো বোমা। আশেপাশে আরও কতগুলো। বোমার আঘাতে জিপের ড্রাইভার স্টিয়ারিও ঠিক রাখতে পারল না। মারল এক বাড়ির প্রাচীরে ধাক্কা। আবার বোমা, দু'জন

কনস্টেবল আহত। পেছনে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতর। আমরা ফিরে এলাম।

পরদিন ছিল সতেরই ডিসেম্বর, সকালবেলা, বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলের পেছনে একটা খোলা মাঠে অল্পবয়সী ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তালতলা থানার সঙ্গে যুক্ত হোমগার্ড দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও খেলছে। শীতের সকালের রোদ গায়ে মেখে কেউ ব্যাট করছে, কেউ বোলিং, কেউ বা ফিল্ডিং, বাকিরা দর্শক এবং ব্যাটিং দলের খেলোয়াড়। মাঠে প্রায় চল্লিশ জন ছেলে।

এরমধ্যে নকশাল মদন, সোনা, নিত্যরা ঢুকে পড়ল মাঠে। তাদের ওইভাবে ঢুকে পড়তে দেখে সবাই প্রথমে আশ্চর্য হয়ে প্রতিবাদ করতে যাবার আগেই সবাই নিশ্চুপ। তারা অসহায়ের মতো দেখতে লাগল তাদের চোখের সামনে কি ঘটে যাচ্ছে।

দেবব্রত ফিল্ডিং করছিল। মাঠের যে দিকটায় সে ছিল, সেদিক দিয়েই নকশালরা একযোগে ছুটে এসে ওর দু'টো হাত দু'দিক দিয়ে টেনে ধরে এবং কোনও সুযোগ না দিয়ে ওর পেট লক্ষ্য করে চালিয়ে দেয় লকলকে ছুরির ডগা। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে খেলার মাঠে। দেবব্রত চিৎকার করে উঠে হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাতে গেলে নিত্যরা তাকে ল্যাং মেরে ফেলে তার ওপর চেপে বসে মারতে থাকে আরও ছুরির আঘাত। দেবব্রত মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর কোনওদিনও তার ক্রিকেট খেলা হবে না।

নকশালদের ওই কাণ্ড দেখে ভয়ে মাঠ থেকে অনেকেই পালিয়ে গেল। ক'জন ওই দৃশ্য দেখে এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তাদের নড়াচড়ার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। নকশালরা 'স্লোগান' দিতে দিতে যখন মাঠ ছেড়ে চলে গেল তারও অনেকক্ষণ পর ওদের সম্বিৎ ফিরে এল।

গরীব ঘরের ছেলে, হোমগার্ড দেবব্রত তার রক্তে ভেজা মাঠে শুয়ে আছে। সে জানতেও পারল না কি তার দোষ? কেন সে শ্রেণীশত্রু, বা কোন শ্রেণীর সে শত্রু? তার রক্তে হাত ধুয়ে ভারতবর্ষের বিপ্লব কতটা এগিয়ে গেল, তাও সে জানতে পারল না।

এর ক'দিন পর নকশাল সদস্য মদন ও তার সঙ্গীরা সি.আই.টি স্কিমের মধ্যে ছুরি মারল ব্যবসায়ী সুধাংশু মোহন চক্রবর্তীকে। তার দোষ তিনি তাদের দাবি মতো টাকা দেননি। নকশালদের কথা না শুনলে যে ‘শাস্তি' পেতে হয় তা বোধহয় তিনি জানতেন না। তার ফল তাঁকে ভোগ করতে হল।

দশই ডিসেম্বর সুরেন সরকার রোডে একই কারণে আরেক ব্যবসায়ী নকশালদের ছুরির ঘায়েলে মারা গেলেন।

এমন কোনও দিন ছিল না, যে দিন লালবাজারে আমাদের কাছে বেলেঘাটার কোনও না কোনও ঘটনার কথা আমরা শুনতে পেতাম না। সেটা হয় স্কুল, কলেজ, বা পোস্ট অফিস পোড়ানো কিংবা সি.পি.আই (এম) পার্টির সঙ্গে সংঘর্ষ বা কোনও খুনের ঘটনা। নিরঞ্জনের নেতৃত্বে তালপুকুরের শান্টু বা ভাটিখানা বস্তির মদন সোমরা কিছু একটা ঘটনা ঘটাবেই।

একাত্তরে পৃথিবী প্রবেশ করল। নকশাল আন্দোলনের জোয়ার আরও তীব্র হল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষও বাড়তে লাগল। কলকাতার চারদিকে ওই সব ঘটনার ঘনঘটায় আমাদেরও তাল সামলান দায় হয়ে উঠেছিল। পুলিশ খুনের ঘটনায় আমাদের মধ্যেও এক শ্রেণীর কর্মীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তারা নকশালদের মোকাবিলায় যেতে ভয় পেত, এমন কী অনেকে বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে বাধ্য হয়ে লালবাজার কিংবা ব্যারাকেই দিন কাটাতে লাগল।

সতেরই জানুয়ারি, সকালবেলায় বেলেঘাটার সুরা ইস্ট রোডে সাত আটজন নকশাল আবার আমাদের গোয়েন্দা দফতরের রঞ্জিত দে নামে একজন কনস্টেবলকে ছুরি মেরে মেরে খুন করে তার সঙ্গে থাকা পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলবার ও গুলি নিয়ে পালাল।

তেসরা ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে খবর এল অবিনাশ ব্যানার্জী লেনের একটা বাড়িতে রাতে নকশালরা মিটিং করবে। আমরা ঠিক করলাম, ওই মিটিং চলার সময় আমরা হানা

দিয়ে ওদের গ্রেফতার করব।

রাত সাড়ে আটটার সময় আমি, উমাশংকর, শচী দুই ভ্যানে ফোর্স নিয়ে রওয়ানা দিলাম বেলেঘাটার উদ্দেশে। বেলেঘাটা থানার থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল দুলাল দাস ও আরও দুজন অফিসার সমেত বেশ ক'জন কনস্টেবল।

দশটার সময় আমরা যখন অবিনাশ ব্যানার্জী লেন ও অবিনাশ শাসমল রোড ঘিরে ফেললাম, তখনও নকশালরা জানে না আমরা তাদের ঘিরে ফেলেছি। এলাকাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। নকশালরা রাস্তার সব আলোই যেমন নিভিয়ে রাখে, তেমনই রেখেছে। কোন বাড়িটাই মিটিং চলছে, তা আমরা জানি না। সেটা আগে আমাদের জানতে হবে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম তীব্র একটা হুইসেলের আওয়াজ। অনেকটা আমাদের হুইসেলের মতো। কিন্তু আমাদের নয়, তা আমরা সবাই ভালভাবে জানি। কারণ আমরা ওইরকম হুইসেল ব্যবহার করে নকশালদের আগের থেকে সতর্ক করে দিই না। হুইসেলের আওয়াজ অন্ধকার রাতে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই তীব্র আলোর ঝলকানি দিয়ে ফেটে উঠল বোমা। হুইসেলের আওয়াজটা যে নকশালদের পাহারাদারের সেটা বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল। বোমার পর বোমা ফাটার আওয়াজের মধ্যে দেখতে পেলাম বেলেঘাটা থানার দু'জন অফিসারের শরীরে বোমার টুকরো লাগাতে তারা গলির মধ্যে পড়ে গেল। তখন আমাদের লালবাজারের ফোর্সটা ওদের থেকে প্রায় একশ মিটার দূরে।

নকশালরা আমাদের ফাঁদে আটকে যেতেই ওরা মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে এসে অবিনাশ ব্যানার্জী লেন থেকে বার হতে গিয়ে বোমা ও পাইপগান নিয়ে আক্রমণ করে আমাদের হটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের বেষ্টনীর যেখানটায় ওরা আক্রমণ করেছে সেখানটায় বেলেঘাটা থানার অফিসার তাদের কনস্টেবলরা ছিল।

বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলাল ও কনস্টেবলদের রাইফেল একসঙ্গে নকশালদের দিকে তাক করে গর্জে ওঠে। নকশালরা তাতেও না দমে ক্রমাগত বোমা মারতে মারতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। আমরাও পেছন থেকে ওদের দিকে ছুটতে থাকি। কিন্তু আমরা ওদের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই নকশালরা বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

না, প্রত্যেকে পালাতে পারেনি। দু'জন রাস্তায় শুয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে রাইফেলের গুলি বুকের ভেতর দিয়ে ঢুকে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তারা চলে গেছে। অবিনাশ ব্যানার্জী লেন থেকে নকশালরা পালিয়ে যখন দেখল তাদের দু'জন কমরেড সঙ্গে নেই, মারা গেছে, তখন ওরা উন্মত্ত হয়ে আই ডি হাসপাতালের সামনে পঁয়ত্রিশ নম্বর রুটের একটা চলন্ত স্টেট বাসের ওপর মারল বোমা। ড্রাইভার টাল সামলে কোনও মতে পালালেও বাসের ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোয় আহত হল দু'জন যাত্রী।

আমরা সেদিনের অভিযান সেখানেই স্তগিত রেখে ফিরে এলাম। দুই নকশালের মৃতদেহ ও আহত দুই অফিসারকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্য আমরা বেলেঘাটা থানায় নামিয়ে লালবাজারে যখন পৌঁছালাম তখন রাত একটা।

পরদিন ভোরবেলাতেই মন্টু মাইতি, কমল, প্রদীপরা তাদের কমরেড হারানোর শোধ নিতে ওই পঁয়ত্রিশ নম্বর রুটেরই অন্য একটা স্টেট বাস অবিনাশ ব্যানার্জী রোড ও হেমচন্দ্র নস্কর রোডের মোড়ে দাঁড় করাল। তারপর সব যাত্রীদের পাইপগান দেখিয়ে নামিয়ে দিয়ে বাসের সিটে পেট্রল ঢেলে দিয়ে জ্বালিয়ে দিল আগুন। ভোরবেলাতেই পোড়া বাসের ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার। দমকলের গাড়ি যখন সেখানে পৌঁছাল তখন ওই বাসের আর অবশিষ্ট কিচ্ছু নেই।

বেলেঘাটার নকশালদের আক্রমণের অত্যাচারে ওখানকার স্কুল কলেজগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, অনেক লোক নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেল।

দশ তারিখ সাড়ে চারটের সময় রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেনে ওরা আবার পুলিশের জিপে বোমা মারল। পাঁচটার সময় বেলেঘাটা মেন রোড ও খোদাগঞ্জ রোডের সংযোগস্থলে

সি.আর.পির একটা টহলদারি গাড়ির ওপর আবার মারল বোমা, সি.আর.পির জোয়ানরা চালাল পাল্টা গুলি। তাতে মারা গেল একজন নকশাল সমর্থক। ওই সি.আর.পির গুলি চালানোয রাখাল ঘোষ লেনে তিন সি.পি.আই (এম) -এর ক্যাডার মারা গেল। পঞ্চু ও অন্য দু'জন কৌতূহলে সেদিন সন্ধেবেলা সি.আর.পির টহলদারি গাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। তাতেই তাদের প্রাণ গেল।

পনেরো তারিখে আমাদের লালবাজারের এক দল অফিসার রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেনে নকশালদের আড্ডায় হানা দেওয়ার জন্য বিকেলবেলা সেখানে হাজির। দলে আমি ছাড়া আছে সুনেত্র ঘোষ, শচী, উমাশংকর, দেবনাথদা ও জুনিয়ার অফিসার বিমান ঘোষ, সুকমল রক্ষিত, ব্রজেশ্বর ভট্টাচার্য, পরিমল, অশোক মালাকার।

ফাল্গুন মাসের বসন্তের বাতাস তখন পৃথিবীর চারদিকে বহে গেলেও তা অনুভব করার কোনও সুযোগই সত্তর একাত্তরে আমাদের ছিল না। শুধু আমাদের কেন কলকাতার কোনও নাগরিকেরই হয়তো ছিল না।

রাধামাধব গার্ডেন লেন আমরা ঘিরে ফেলেছি। মাঝখানে নকশালরা জালে পড়ে জাল ছিঁড়ে পালানোর চেষ্টায় প্রথমেই গলির এদিক ওদিক থেকে আমাদের দিকে গ্রেনেড ও সকেট বোমা ফেলতে শুরু করল।

বসন্তের গা ভাসানো ফুরফুরে বাতাস বারুদের গন্ধে থমকে গিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল। একটা পুকুরপাড়ের এদিক ওদিক আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমার কাছেই ছিল বিমান ঘোষ। দুজনের মাঝখানে এসে পড়ল একটা সকেট বোমা, ফাটল না। বিমান ভাবল ওটা একটা পাথরের টুকরো, সেটা সে ফুটবলের মতো একটা শট দিয়ে পুকুরের জলে ফেলতে গেল। আমি টেনে ধরে নিলাম, ওর আর শট মারা হল না। সকেট বোমাটা নিজের থেকেই বিস্ফোরিত হয়ে চারদিক একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল।

চোখ খুলে দেখলাম, বেঁচে আছি। বিমানও বেঁচে আছে। কিছু দূরে একটা গুলির আওয়াজ। আমাদেরই কারও একজনের খোলা রিভলবার থেকে সেটা বেরিয়েছে। একটা ছেলে হাত দশেক দূরে চিৎ হয়ে পড়ল। তার হাতে একটা গ্রেনেড। সেটা সে সুনেত্র ঘোষের দিকে ছুঁড়তে চেয়েছিল। পেছন থেকে শচী গুলি করেছে। সাঁড়াশির মতো ওদের আমরা চেপে ধরেছি। বেষ্টনীর একদিক থেকে গুলি করতে করতে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছি। সে দিকে আমাদের লোকেরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে। সেখানে গেলেই ফাঁদে আটকে যাবে। আর একটা ছেলে। সেও ছুটে এসে শচীদের দিকে তাক করে গ্রেনেড ছুঁড়তে যাচ্ছে। গুলি করলাম। পিঠে লাগল। পড়ে গেল। তারও হাতে শক্ত করে গ্রেনেড ধরা। ছেলেদুটো জীবিত কি মৃত তা দেখার জন্য শচী ওদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আমি বাধ্য হয়ে চিৎকার করে তাকে নিষেধ করলাম। আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম সেখান থেকে আমার অবস্থান আমি নকশালদের জানাতে চাইনি। কিন্তু শচীকে ওইভাবে এগিয়ে যেতে দেখে আমি আমার অবস্থান নকশালদের কাছে প্রকাশ করে ফেললাম। আমার ভয় হয়েছিল, শচীকে ওই ভাবে ওদের কাছে আসতে দেখে। নকশালরা হাতের গ্রেনেড তাকে ছুঁড়ে মারতে পারে। তারা জীবিত না মৃত দূর থেকে তো কিছুই বোঝা যায়নি।

এরপর শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। আমি নকশালদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'টো বোমা ছুঁড়ে আমাকে নকশালরা অভ্যর্থনা করল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বাঁচলাম। নকশালদের সঙ্গে আমাদের যতগুলো সংঘর্ষ হয়েছে ওই যুদ্ধটা তার মধ্যে অন্যতম। ওরা আমাদের দিকে গলি ঘুপচি থেকে বোমা, গ্রেনেড, মলটভ ককটেল একের পর এক ছুঁড়েই চলেছে, আর আমরাও চালাচ্ছি গুলি। কোন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোমা ছুঁড়ে কোনখানে যে ওদের এক একজন হারিয়ে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একটাই সুবিধা, অন্ধকার পুরোপুরি নামেনি, ফলে ওদের পালাতে যেমন আমরা দেখছি, ওরাও আমাদের দেখতে পাচ্ছে। আমরাও আড়াল নিয়ে লড়াই চালাচ্ছি।

ওইরকম একটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বিকেলবেলা ওই যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা করুণ। ঘণ্টাখানেকের ওপর চলল আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ। অন্ধকার নেমে এসেছে। নকশালদের আক্রমণও থেমে গেছে, আমরা এক এক করে আমাদের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের দু'জন কনস্টেবল আহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু নকশালদের দুজন যুবক ওই সংঘর্ষে আমাদের হাতে মারা গেছে। আর গুরুতর আহত তিনজন। তাদের দেহগুলো তুলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম।

লালবাজারে ফিরে এসে শুনলাম, রাইফেল রোডের নকশাল সুবল দাস দলবল নিয়ে বিকেল বেলা কড়োয়া থানার সামনে দু'টো হোমগার্ডকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে পালিয়েছে। দরগা রোডে ডাঃ এম.কে পালকে ছুরি চালিয়ে, লোহার রড দিয়ে মেরে চলে গেছে। তাছাড়া, আরও, আরও বহু খবর প্রতিদিনের মতোই।

উনিশে ফেব্রুয়ারি বিকেলবেলা চাউলপট্টি রোডে বেলেঘাটা থানার এক হোমগার্ডকে নকশালরা কুপিয়ে খুন করল। কুড়ি তারিখে রাত আটটার সময় নকশালদের দু'টো দল দু'দিকে গেল। একটা দল গেল ইস্ট কুলিয়া রোডের দিকে। অন্যদল, সি.আই.টি স্কিমে। সি.আই.টি স্কিমের ফ্ল্যাটে ডাঃ মিহিরকুমার দত্তের ফ্ল্যাটে ঢুকে তার মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে তার থেকে তার দু'নলা বন্দুকটা নিয়ে চলে এল। আর ইস্ট কুলিয়া রোডের দল সি.পি.আই (এম)-এর কর্মী প্রশান্ত চক্রবর্তীকে প্রথমে ছুরি মেরে তারপর পাইপগান দিয়ে গুলি করে রাস্তায় ফেলে পালাল।

একুশ তারিখ রাতে ওই চাউলপট্টিতেই নকশালরা খুন করল পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে একজন কাগজ কুড়ানীওয়ালাকে।

বাইশ তারিখে সন্ধেবেলা নকশাল নেতা অসীম চৌধুরীকে নিয়ে বেলেঘাটা থানার একদল পুলিশ চাউলপট্টিতে গেল অন্য এক নকশালকে চিনে নেওয়ার জন্য। জিপের পেছন থেকে ওর সঙ্গে নামল দু'জন কনস্টেবল। অসীম চাউলপট্টির রোডের ভেতর নেমেই একজন কনস্টেবলকে জাপটে ধরে রিভলবার কাড়তে গেল। পাশে দাঁড়ান কনস্টেবল ওকে ছাড়াতে গিয়ে গুলি করে বসল। গুলি একেবারে ঢুকে গেল অসীমের বুকে। অসীমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা গেল।

আঠাশ তারিখ সকালবেলা মারা গেল অবিনাশ ব্যানার্জী লেনের নকশাল নেতা প্রদীপ দাস। সে দিন চাউলপট্টি রোডে নকশাল ও সি.পি.আই (এম)-এর দলের সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ। পাইপগান, বোমা, ছুরির ঝলকানিতে সকালবেলাতেই চাউলপট্টিতে উঠল ঝংকার। চাউলপট্টির লোক অবশ্য এ ব্যাপারে বছর দুই ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা আর এসব ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামায় না। সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলেই বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে কখন শেষ হবে যুদ্ধের আওয়াজ। সেই আওয়াজ শেষ হলেই আতঙ্কিত হয়ে খবর নিতে থাকে তাদের বাড়ির লোক বেঁচে আছে কি না।

সেদিন সংঘর্ষ শেষ হলে দেখা গেল সাত নম্বর চাউলপট্টি রোডের বাড়ির সামনে রক্তাক্ত বিক্ষত হয়ে পড়ে আছে প্রদীপ ও একজন সি.পি.আই (এম)-এর কর্মী। চাউলপট্টির সবাই দেখেই বুঝল, কারও দেহে প্রাণের আর চিহ্ন নেই। মৃতদেহ দুটো পড়েই রইল, ভয়ে কেউ ধরল না। তারা পাশ দিয়ে হেঁটে যে যার কাজে চলে গেল। নিজের জীবনের বাঁচার তাগিদ তাদের কাছে অনেক বেশি। তাই তারা রোজ রোজ এত খুন দেখে আর বিচলিত হয় না।

বিচলিত হয় একমাত্র তারাই, যাদের বাড়ির লোক মারা গেল। তাদের কাছেও হত্যার লীলাক্ষেত্রে নিজের বাড়ির লোক হারানোর শোক প্রকাশটা তো আর অস্বাভাবিক নয়।

বেলেঘাটা থেকে মানিকতলার দূরত্ব খুব বেশি নয়। মার্চের ন' তারিখে মানিকতলার মুরারীপুকুর রোডে সকাল সাড়ে দশটার সময় নকশালদের আট দশজনের একটা দল আমাদের কনস্টেবল অনিল চক্রবর্তীকে ঘিরে ধরল। অনিলের সঙ্গে ছিল তার ভাগ্নে। অনিল

পলকের মধ্যে বুঝে গেছে কি হতে যাচ্ছে, সে পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে নকশালরা ধরে বুকে বসিয়ে দিল ছুরি। ছুরিটা এত জোরে গেঁথে গেল যে তারা সেটা আর টেনে তুলতে পারল না। অনিলের ভাগ্নে নকশালদের আটকাতে গিয়ে পিঠের ওপর খেল এক ভোজালির কোপ, সেও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। নকশালরা অনিলের শরীর লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে ওখান থেকে পালাল। অনিল মারা গেল।

ন' তারিখেই বেলেঘাটা মেন রোডে সি.পি.আই (এম) সমর্থক দীনেশ দে-কে নকশালরা রাত দশটার সময় ধরল। দীনেশ লাগাল ছুট। নকশালরা তার পিঠের দিকে টিপ করে ছুঁড়ল বোমা। দীনেশের গায়ে বোমাটা লাগল না কিন্তু সেটা তার পায়ের সামনে বিকট শব্দে ফাটতে দীনেশ পড়ে গেল। দীনেশ পড়ে গিয়ে উঠল। এবার তাড়াতাড়ি আবার ছুটে পালাতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে তার শত্রুদের দেখতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে পড়ল আর একটা বোমা। দীনেশের আর ওঠার শক্তি রইল না। তার বুক পুরোপুরি ছত্রাকার। দীনেশ আর নড়ল না।

ক'দিন পর দুপুরবেলা বাহান্ন নম্বর চাউলপট্টি রোডে নকশালরা বাড়ির গিন্নি সুহাসিনী বসুকে ছুরি মেরে খুন করল। কি জন্য তাঁকে ওরা করল, আমরা তা বুঝলাম না।

সাতাশ তারিখে রাত একটার সময় লতাফত হোসেন রোডে নকশালদের একটা দল সিদ্ধার্থ বসু রায়ের বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতে লাগল। সিদ্ধার্থবাবু সদর দরজা খোলার পর তারা সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে ঢুকে টাকা চাইল। তিনি ও তাঁর পরিচারিকা মণি পাল টাকা দিতে অস্বীকার করলেন। একজন নকশাল মণির তলপেটে চালিয়ে দিল খোলা ছুরি। তারপর সিদ্ধার্থবাবুকে পাইপগান দিয়ে গুলি করে তারা ধীরে ধীরে চলে গেল।

আঠাশ তারিখে বিকেল সাড়ে তিনটের সময় চাউলপট্টি রোডে নকশালরা সি.পি.আই (এম) কর্মী সুনীল মণ্ডল ও রঞ্জিত কুমার দে-কে ঘিরে ফেলল। প্রথমে শুরু হল ধস্তাধস্তি। কিন্তু সেটা কতক্ষণ? সুনীলের পেটে প্রথমে ঢুকে গেল নকশালদের অব্যর্থ ছুরির ফলা। তারপর রঞ্জিতের বুকে। দু'জনের পেট আর বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরল, চাউলপট্টির রক্তমাখা রাস্তা আরও রক্তে স্নান করতে লাগল। নকশালরা ওদের দুজনের দিকে ছুঁড়ে দিল পরপর দু'টো বোমা। সুনীল ও রঞ্জিতের শরীর দু'বার আছড়ে পড়ে নিস্তেজ হয়ে গেল।

পরদিন নকশালরা আরও একটা নারকীয় কাণ্ড ঘটাল। বেলেঘাটা সংলগ্ন নারকেলডাঙা থানা এলাকায় সাহেবাগান রেলওয়ে কোয়ার্টারের ভেতর দক্ষিণ প্রদেশীয় দুজন মাঝবয়সী সাধু দুপুর বারোটা নাগাদ ঘুরছিল। হয়ত তাদের কোনও পরিচিত লোক ওই রেলওয়ে কোয়ার্টারে ছিল, যার খোঁজে তারা সেখানে যায়। তারা বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এটা নকশালদের চোখে পড়ে গেল। তারা ভাবল, ওই সাধু দু'জন বোধহয় পুলিশের গুপ্তচর, সাধু সেজে তাদের খোঁজ করছে। তাদের "বিপ্লবী চিন্তা' দ্রুত খেলে গেল! দশ বারো জন নকশাল সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। ওরা গিয়ে সাধু দু'জনকে ঘিরে ধরল। প্রশ্ন করল, "এখানে কী করছিস?" সাধু দু'জনের মধ্যে একজনের নাম ছিল রামচন্দ্রণ। রামচন্দ্রণ ও তার সঙ্গী ওদের বাংলা কথা কিছুই বুঝতে পারল না, একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। নকশালরা ধমকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী দেখছিলি?" না, ওরা কিছুই বুঝতে পারল না। নকশালদের একজন বলে উঠল, "শালারা ঢপ মারছে। ফালতু সময় নষ্ট করছে।"

ব্যস্, নিমেষে আক্রমণ। প্রথমে রামচন্দ্রণের সঙ্গীর শরীরের ওপর চলতে লাগল ছুরি খেলার কেরামতি। তারপর রামচন্দ্রণের ওপর। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার চিৎকার শুনে কোয়ার্টারের এদিক ওদিক থেকে লোকজন, উঁকিঝুঁকি দিল। কিন্তু কী হচ্ছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তারা দরজা জানালা ঝপাঝপ বন্ধ করে কোটরে ঢুকে গেল। ছুরির পর ছুরির আঘাত খেয়ে রক্তভেজা আলখাল্লা নিয়ে একজন সাধু পড়ে গিয়ে ওখানেই মারা গেল।

এবার নকশালরা রামচন্দ্রণকে টানতে টানতে নিয়ে গেল কোয়ার্টারের ভেতরের একটা পুকুরের পশ্চিমপাড়ে। সেখানে ওকেও ছুরির আঘাতের পর পাইপগান দিয়ে গুলি করল। রামচন্দ্রণ ছুরি ও গুলির স্বাদ নিয়ে পুকুরপাড়ে শুয়ে পড়ল। নকশালরা 'বিপ্লবের পতাকা' তুলে চারুবাবুর জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল।

খবর পেয়ে আমরা গেলাম। রামচন্দ্রণের সঙ্গী আগেই মারা গিয়েছে। রামচন্দ্রণকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করালাম। বাঁচল না। সেদিন রাতেই সে মারা গেল।

রামচন্দ্রণদের মৃত্যুতে আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল, অপরিচিত লোকজনের কাছে নকশালরা কতটা বিভীষিকাময় করে তুলেছিল কলকাতা শহরকে। চারুবাবু বিপ্লবের সাইরেন বাজানোর পর সেই সাইরেনের পোঁ ধরে একাত্তর সালে যারা এখানে ওখানে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা এমনই সব 'বিপ্লবী' যে তাদের বুদ্ধিতে এটুকু কুলল না, দুপুরবেলা অচেনা, অজানা জায়গায় গিয়ে কোনও গুপ্তচর তাদের অনির্দিষ্টভাবে খুঁজে বেড়াবে না। পুলিশ এত বোকা নয়। পুলিশ গুপ্তচর তাকেই করে যাকে কেউ সন্দেহই করবে না। সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে সংগঠনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সে খবর দেবে। কিন্তু খুন করার ব্ল্যাঙ্ক চেক পেয়ে ওইসব নকশালদের মগজে হত্যার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই তাদের অতি সাধারণ বাস্তব বোধগুলোও সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

শুধু কে কটা খুন করে 'বড় বিপ্লবী" হবে, সেই প্রতিযোগিতায় নিজেদের মধ্যে মত্ত ছিল তারা। তাদের পত্রিকা 'দেশব্রতী'তে খতমের খবরটা গুরুত্ব সহকারে ছাপানোর জন্য নেশা ধরে গিয়েছিল তাদের। 'সাধু' খুন হওয়ার ঘটনাটাও 'পুলিশের দুই দালাল বিপ্লবীদের হাতে খতম' হিসাবে নকশালদের ভেতর প্রশংসিত হয়েছিল।

বেলেঘাটায় আমাদের অভিযান বেড়ে গেল। নকশালরাও একটু একটু করে পিছু হটতে লাগল। কিন্তু ওরা একদম চুপচাপ বসে গেল না। যেখানে যাকে পেল তাকেই মারতে লাগল।

কাদাপাড়ার মোড়ে শুকতারা সিনেমার সামনে সি.পি.আই (এম) নেতা গোবিন্দ গুহকে সোনা ও তার সঙ্গীরা মিলে বোমা মারল। গোবিন্দবাবুর হাতের আঙ্গুল উড়ে গেল। তিনি ছুটে পালিয়ে বেঁচে গেলেন। আক্রমণ হল মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা সুহৃদ মল্লিক চৌধুরীর ওপর। কেউ অবশ্য প্রাণে মরলেন না।

এর ক'দিন পর কংগ্রেস সদস্য প্রণব ঘোষের গলা কেটে খুন করল তারা, তাঁর বাড়ির সামনেই। সেদিন সন্ধেবেলাতেই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডে সি.পি.আই (এম)-এর সমর্থক কাশীনাথ ভট্টাচার্যকে পাইপগান ও বোমা দিয়ে আক্রমণ করল নকশালরা। দোসরা মের সেই রাতে আমরা হানা দিলাম আবার সেই রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেনে।

রাত একটা। আমাদের আর নকশালদের খুঁজতে হল না। ওরাই আক্রমণ করল। তার জবাবে আমাদের গুলি। বোমার জবাবে গুলি। রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে সেই বোমা গুলির আওয়াজ কখনও হচ্ছে তীব্র, কখনও কম। কিন্তু বিরতি নেই। দু'চারটে আর্তনাদ। কোন পক্ষের লোকের থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না৷

ধুপধাপ বুটের আওয়াজ আমাদের ফোর্সের। নকশালদের ছোটাছুটির শব্দ। শেষ দেড় বছর ধরে গলির চেনা পরিবেশ।

এক ঘণ্টা পর আমরা এগিয়ে গেলাম। বোমা থেমে গেছে। অন্ধকারে একটা মানুষ শুয়ে কাতরাচ্ছে। টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, একটা ছেলে, গুলি লেগেছে। সঙ্গী জানাল, "এ নকশাল নেতা অশোক।" পাঠালাম ভ্যানে। আর একটু এগিয়ে, একই ভাবে আরও একজন। সে নিত্য ঘোষ। দু'জনকেই আমরা খুঁজছি। অনেক খুনের ফেরারি আসামি। দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করালাম। একজনও বাঁচল না। ওই মাসেই বেঙ্গল পটারিজ শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হরি চট্টোপাধ্যায়কে নকশালরা বোমা মেরে খুন করে দিল।

জুন মাসে আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেল অবিনাশ ব্যানার্জি লেনের নকশাল কমল

দে। এর ক'দিন পর নকশালরা প্রতিশোধ নিল ছাত্র পরিষদের নেতা তাপস বসুকে খুন করে। বারোয়ারিতলা রোডে সন্ধেবেলায় তাকে ধরে পাইপগান ও বন্দুক থেকে গুলি করে তারা পালাল। তাপসকে ভর্তি করানো হল মাড়োয়ারি হাসপাতালে। সেখানেই সে মারা গেল।

জুন মাসেই বেলেঘাটা থানার পুলিশের সঙ্গে এক রাতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো ইস্ট কুলিয়া রোডের বস্তিতে। সেখানে মারা গেল দুই নকশাল তরুণ। খুন ও পাল্টা খুনের রক্তভেজা রাজনীতির ময়দান বেলেঘাটাকে আমরা একের পর এক অভিযানের পরিষ্কার করলে কি হবে, বাহাত্তরেই শুরু হয়ে গেল আর এক রক্তের খেলা। এবার ময়দানে কংগ্রেস ও সি.পি.আই (এম)-এর সদস্যরা।

বেলেঘাটায় সি.পি.আই (এম)-এর জঙ্গী সদস্য ও বহু সংঘর্ষের নায়ক মন্টু সান্যাল নকশাল হামলা থেকে বাঁচলেও রাসমণি বাজারের কাছে কংগ্রেসীরা তাকে বোমা ছুঁড়ে মারল। বোমায় তার বাঁ চোখ ও বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল উড়ে গেল। সে স্টেনগান দিয়ে গুলি করতে করতে পালাল। ওই পার্টির অনিল দাসকে আঠাশ নম্বর বস্তিতে কংগ্রেসীরা রাতের অন্ধকারে ধরে চোখ উপড়ে খুন করে দক্ষিণ বেলেঘাটার খালের ধারে ফেলে রেখে চলে গেল। খুনের রাজনীতির অঙ্গনে সে আর এক খেলা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্ষমতার লড়াইয়ে পৃথিবীর ইতিহাস প্রচুর রক্ত দেখেছে। রক্ত ঝরার পর এক সম্রাট যায়, আর এক সম্রাট আসে।

নকশালদের অলক্ষ্যের সম্রাট ক্ষমতার জন্য অসম লড়াইয়ে অনেক রক্ত ঝরিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তাতে কি, এতদিন চুপ করে থাকা আর এক উপোসী বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুনভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য। শুরু হল আবার এক রক্তঝরা অধ্যায়।

কিন্তু সত্তর একাত্তরের ওই রক্তবন্যার জন্য কে দায়ী নয়? প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে সেই রক্তের দাগ। কারও হাতে কম, কারও হাতে বেশি।

একাত্তরের একত্রিশে মে। দুপুরবেলা আমার মামাতো ভাই খোকন লালবাজারে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওকে কেমন উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি রে কী ব্যাপার, তুই এখানে?" সে বলল, "দাদা, গতকাল থেকে ভুলুর কোনও খবর নেই!" ভুলু মানে প্রদীপ নিয়োগী, আমার সবচেয়ে ছোট মামাতো ভাই। বললাম, "সে কি?" খোকন বলল, "হ্যাঁ, গতকাল সকালে ওর এক বন্ধুর মায়ের শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে কোন্নগর যায়, আজ এখন পর্যন্ত ফেরেনি, মা ভীষণ চিন্তা করছে, তাই খবরটা দিতে এলাম।" ওর কথা শুনে ভাবলাম, ছেলে ছোকরাদের ব্যাপার, বাড়ির লোকজন যে চিন্তা করছে, তা না ভেবেই বন্ধুবান্ধব মিলে রাতে কোথায় আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিয়েছে। এবয়সে আমিও দু একবার ওই রকম করেছি। বললাম, "মামীমাকে বলবি চিন্তা না করতে, আমি খোঁজ নিচ্ছি।" খোকন চলে গেল।

মামীমা আমাকে খুব ভালবাসতেন। হাওড়ার বেনারস রোডে ওদের বাড়িতেই আমি প্রথম কোচবিহার থেকে এসে উঠি। বহুদিন ছিলাম। ভুলু তখন খুবই ছোট। দুরন্তপনায় সারা বাড়ি মাত করে রাখত। সেই দুরন্তপনারই আর একটা নিদর্শন, কাউকে আগাম না জানিয়ে রাতে বাড়ি না ফেরা।

সেই সময় নকশাল আন্দোলন এত তুঙ্গে যে আমাদের এক মুহূর্তও সময় নেই অন্যদিকে মন দেওয়ার। তাছাড়া ভুলু কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় যে রাজনৈতিক খুনোখুনির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। তাই ওর বাড়ি না ফেরাটার ওপর বিশেষ কোনও গুরুত্ব না দিয়ে আমি গোলাবাড়ি ও উত্তরপাড়া থানায় ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম শুধু।

তার আগের দিন রাতে জোড়াসাঁকোর সিমলা স্ট্রিট ও রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে নকশালদের সঙ্গে সি.পি.আই (এম) পার্টির সদস্যদের তুমুল সংঘর্ষ হয়ে গেছে। কেউ মারা না গেলেও উত্তেজনা চরমে, এবং যখন তখন আবার বোমার বর্ষা শুরু হয়ে যাবে এমন খবর আমাদের কাছে আছে। সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তাছাড়া কাশীপুরের ডি গুপ্ত লেনে একটা নকশাল ছেলে উত্তর কলকাতার ডি সি সাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে। সেই নিয়ে কাশীপুরেও রয়েছে নকশালদের হঠাৎ কোনও আক্রমণের আশঙ্কা। ওরা ইতিমধ্যেই গোপাল বসু লেনে পুলিশ চৌকির ওপর বোমা ফেলে হামলা করে গেছে এবং চৌকির কনস্টেবলরা রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে তার জবাব দিতে তারা পালিয়েছে।

এইসব সম্ভাব্য হামলা আমরা কী ভাবে মোকাবিলা করব তার একটা ছক করে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়ে ক'জন জুনিয়ার অফিসারকে এদিকে ওদিকে পাঠাতে পাঠাতে সন্ধে হয়ে গেল। রাত নামা মানেই আমাদের কাছে আসন্ন যুদ্ধের হাতছানি। বোমা, গুলির ধারার মধ্যে নিজেদের নিক্ষেপ করা। সেই নিক্ষেপের ক্ষেত্রটা কোন এলাকায় হবে তাও অনিশ্চিত। হয়ত সেটা হবে সিঁথি কিংবা কাশীপুর অঞ্চল, কিংবা বেলেঘাটা বা টালিগঞ্জ। আমরা কেউ জানি না। যেখান থেকে ডাক আসবে সেখানেই আমাদের ছুটে যেতে হবে। কে ডাকে আমাদের, কে? তার জন্য অপেক্ষা।

কিন্তু সেদিন সন্ধে হতে না হতেই বোমা। খবরের। আমাদের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সাব ইন্সপেক্টর সুশীলকুমার বসুকে নকশালরা পাইপগানের গুলি ও ছুরি মেরে নিউ আলিপুর থানার অধীন দুর্গাপুর লেনে খুন করে চলে গেছে।

ছুটলাম। জানলাম সুশীল ওর বাড়ির কাছের একটা মুদি দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনে বাড়ি ফিরছিল। সে সময় সাত আটজন নকশাল ছেলে দুর্গাপুর লেনের চব্বিশের বি বাড়ির সামনে তাকে ঘিরে ধরে প্রথমে পাইপগান দিয়ে গুলি ছোঁড়ে। গুলি তার বুকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে রাস্তায় বসে পড়ে। হাত থেকে খসে পড়ে জিনিসপত্র। এরপর

নকশালরা তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর চেপে বসে তলপেটে ও তার আশেপাশে পরপর ছুরি মারতে থাকে। প্রতিবার মারের সময় সুশীল একবার করে অন্তত চিৎকার করছিল। একসময় সেই চিৎকারও থেমে যায়। নকশালরা পালায়। ততক্ষণে আশেপাশের সব বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। রাস্তার লোকজন ফাঁকা। চলাচল স্তব্ধ।

নিউ আলিপুর থানার পুলিশ যখন এল, দেখল, রাস্তার মাঝখানে সুশীলের দেহ রক্তের থমকে যাওয়া জোয়ারের মধ্যে পড়ে আছে। সুশীলের তলপেটের নাড়িভুড়ি সব ওপরে। দু'চারটে রাস্তার কুকুর সেদিকে তাকিয়ে বসে আছে, কী করবে তারা ভেবে পাচ্ছে না। নিয়মমাফিক তারা তবু সুশীলের দেহ নিয়ে ছুটল শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে। অযথা ছোটা। সুশীল অনেক আগেই মারা গেছে।

নিউ আলিপুরের থানার অফিসাররা ওই খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একটা ছেলেকে ধরে রেখেছেন। দেখলাম। দেখে মনে হল না সে নকশালদের অ্যাকশান গোষ্ঠীর সদস্য। তবু তাকে নিয়ে দুর্গাপুর লেনের খুনের ওই জায়গাটা সরেজমিনে দেখে লালবাজারে যখন ফিরে এলাম, তখন রাত দশটা। ধৃত আসামিকে জেরা করে কিছু পাওয়া যায় কি না তা দেখতে হবে, তাছাড়া দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের খবরের উৎস মুখের সঙ্গে যোগাযোগ করে খুনিদের পরিচয় ও গতিবিধির কথা জানার চেষ্টা করতে হবে।

এসব করতে করতে আমি ভুলুর নিখোঁজ হওয়ার খবরটা বেমালুম ভুলে গেছি। সে বাড়ি ফিরল কি ফিরল না সেই খবরটা নিতেও ভুলে গেলাম। অন্যদিকে আসামিকে জেরা করে কিছুই পেলাম না।

রাত এগারটার সময় শচীকে সঙ্গে নিয়ে দু'জনে একটা গাড়িতে করে প্রথমে গেলাম কালীঘাট। তারপর চেতলা। চেতলার থেকে বেহালার রায় বাহাদুর রোডের দু'টো জায়গায়। সুশীল হত্যার খবরের সূত্র জানতে রায় বাহাদুর রোড থেকে বি এল সাহা রোডে। সত্তর একাত্তর সালে বেহালার ওইসব জায়গা ছিল গনগনে আঁচের মতো। একটু এপাশ ওপাশ হলেই সেই আঁচের মধ্যে পতন এবং অবধারিত মৃত্যু। যেখানেই যাও, টালি নালার এপাশ ওপাশ থেকে সেই আঁচের তাপ পাওয়া যাবে বোমার বিরতিহীন আওয়াজে আওয়াজে। সেই আওয়াজের মধ্যে শোনা যাবে নকশালদের সগর্ব ঘোষণা, "আমরা আছি, আমরা আছি"। সি.পি.আই (এম)-এর ছেলেরাও পিছিয়ে নেই, তারাও একই কায়দায় নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয় আর আমরা কিছুটা অসহায়। দু'পক্ষেরই শত্রু। ওদের 'বিপ্লবের পথের বাধা। তাই যে কোনও পক্ষেরই বোমা আমাদের দিকে ছুটে আসতে পারে। মরার আগে জানতে পারব না, কার ছোঁড়া বোমায় মরলাম, সেটা নকশালদের না সি.পি.আই (এম) পার্টির ক্যাডারদের। অবশ্য তা জেনে লাভও নেই, কারণ নকশালদের হাতে, না সি.পি.আই (এম)-এর ছেলেদের হাতে, কোনটা বেশি গৌরবের মরা, সেটা আমি জানি না।

রাত দুটোয় লালবাজারে ফিরে কোয়ার্টারে গেলাম। অনেকদিন বাদে রাতে আর কোনখানে হানা দিতে যাব না। জানি, আগামিকাল সকালে সি.পি ও ডি.সি সাহেব যখন শুনবেন, কাউকে রাতে আমি গ্রেফতার করতে পারিনি, তখন তাঁরা মুখ ব্যাজার করে চেম্বারে ঢুকে যাবেন। যাক, আমার কিছু যায় আসে না। ঠিক করলাম, একটু বিশ্রাম করব। আগামিকাল আবার সি.পি.আই (এম)-এর ডাকে কলকাতা বন্ধ। অর্থাৎ বিশ্রামহীন দিন যাবে।

পয়লা জুন। শরীরটা ঘুমিয়ে তরতাজা। সকালেই অফিসে পৌঁছে গেলাম। বনধে আমাদের বিশেষ ডিউটি। গণ্ডগোল হলেই ছুটে গিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। সবাইকে তটস্থ হয়ে থাকতে হবে।

আমার হঠাৎ মামাতো ভাইয়ের কথা মনে হতেই কনস্টেবল শচীনকে ডেকে, মামা বাড়ির ঠিকানাটা লিখে তাকে ভুলুর খবরটা আনতে পাঠালাম।

জানি, ওকে আজ অনেক কষ্টে যাতায়াত করতে হবে। তবু মনটা আনচান করছে, খবরটা জরুরি।

লালবাজারের সেন্ট্রাল লক আপে তখন প্রতিদিনই কম করে বিশ তিরিশ জন বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মামলার নকশাল থাকত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা, আদালতে পাঠানো, আদালত থেকে ফিরিয়ে আনা, এসব একটা রুটিন ব্যাপার ছিল। বনধের দিন হলেও কাজগুলো আমাদের করতেই হবে।

শচীনকে হাওড়ায় পাঠিয়ে আমি এক এক করে সেই রুটিন কাজ নিয়ে পড়লাম। এর মধ্যে সবচেয়ে জরুরি সুশীল হত্যার খুনিদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা। চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

সূত্র না পেলে আমাদের অবস্থাটা অনেকটা হয় গ্রামাঞ্চলের সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো, যারা শীতশেষে পুকুর নালার কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে মাছ খোঁজে। কখনও পায়, কখনও পায় না, কিন্তু খোঁজার বিরাম নেই।

এরকম খুঁজতে খুঁজতেই খড়দা থেকে পেয়েছি অমিতাভ সিংহ রায় হত্যার আসামি রবীন চক্রবর্তীকে। পেয়েছি অন্য দুই আসামী অশোক চক্রবর্তী ও কাঞ্চন চৌধুরীকে। কাঞ্চন আবার সদর স্ট্রিট ডাকাতি মামলার আসামি মন্টুর ছোট ভাই। মন্টু সাজা খাটছে জেলে, ভাই কাঞ্চনও অমিতাভ খুনের আসামি হয়ে জেল হাজতে।

দুপুর একটা নাগাদ হাওড়ার মামা বাড়ি থেকে ফিরে এল শচীন। জিজ্ঞেস করলাম, “খবর কী?” সে জানাল, “না স্যার, কোনও খবর নেই, আপনার ভাই বাড়ি ফেরেনি।” শুনে আমার কপালে বোধহয় ভাঁজ পড়েছিল, সেটা দেখে সে বলল, “স্যার আপনার ভাইয়ের দুই বন্ধু বিশ্ব ও পঙ্কজও ফেরেনি।” জিজ্ঞেস করলাম, “আর কিছু জানতে পেরেছিস?” বলল, “না স্যার, মামীমা খুব কান্নাকাটি করছেন।” ওকে আর কি বলব, বললাম, আছে যা।” গোলাবাড়ি ও উত্তরপাড়া থানায় খবর দিয়েছি, তারাও কোনও খবর দেয় নি। কোনও খবর পেলে নিশ্চয় দিত। আবার সেই কাদা ঘাটতে হবে। কিন্তু জলের তল কোথায়? কোথা থেকে শুরু করব? ঠিক করলাম, সন্ধেবেলা বেনারস রোডে মামা বাড়ি গিয়ে ওখান থেকেই তদন্ত শুরু করব। খোকনকে নিয়ে যাব ভুলুর বন্ধুদের বাড়ি। হঠাৎ ওরা কোথায় হারিয়ে গেল, কোথায় ওরা কার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, এগুলো আগে জানতে হবে। তারপর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মধ্যে আমার যেসব পরিচিত বন্ধু আছেন, তাঁদের সাহায্যে ওদের খোঁজ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিলাম। এখন সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু সব কিছু তো আর আমার হাতের মধ্যে নেই। বিকেলবেলাতেই খবর এল। রবীন্দ্র সরণী ও দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিটের মোড়ে সি.পি.আই (এম)-এর ছেলেদের সঙ্গে নকশালদের তুমুল বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছুটতে হল। আমরা পৌঁছতেই দু'দল দুদিকে পালাল। ফিরে এলাম। ফিরে এসে শুনলাম উত্তরপাড়া থানা থেকে আমার খোঁজে ফোন এসেছিল।

ঝট করে আবার ভুলুর কথা মনে হয়ে গেল। আমি উত্তরপাড়া থানায় ফোন করলাম। থানা থেকে বলা হল, আমি যেন যত তাড়াতাড়ি পারি সেখানে পৌঁছে যাই। এতদিন পুলিশে চাকরি করছি, খবরটার মধ্যে এমন একটা চটজলদি ডাক ছিল, আমার বুকের ভেতর মোচড় মেরে ধকধক করে উঠল। যে কোন ব্যাপারেই মানুষের মন আগে 'কু' ডাকে। আমার ভেতরে কেন একটা তেমন 'ডাক' দিল বুঝলাম না। ব্যাপারটা যাই হোক, আগে দেখি, তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। দেরি না করে আমি একটা গাড়ি নিয়ে উত্তরপাড়া থানার দিকে চললাম।

সাড়ে সাতটার সময় উত্তরপাড়া থানায় পৌঁছে এক জুনিয়ার অফিসারের কাছে নিজের পরিচয় দিতে সে আমাকে ওসি'র ঘরে নিয়ে গেল। তিনি আমায় বসতে বলে, ঘরের অন্য লোকেদের একটু বাইরে যেতে বললেন। তারপর জানালেন, “রুণবাবু, আজ সকালে আমরা কোন্নগরে একটা গণকবর থেকে ক'টা ছেলের লাশ উদ্ধার করেছি, জানি না, তার মধ্যে আপনার ভাই—!” ওসি'র কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দে কী হতে লাগল

জানি না। আমি তার পরবর্তী কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছি না। তিনি কিন্তু বলেই চলেছেন, "ভগবান করুন, তার মধ্যে যেন আপনার ভাই না থাকে, তবে ছেলেগুলো সব হাওড়ার, একটাও কোন্নগরের নয়। আমি আপনার মামাবাড়িতেও খবর পাঠিয়েছি, আইডেনটিফিকেশনের জন্য। আপনি এসে গেছেন, আমি একটু নিশ্চিন্ত।"

ওঁর কথাগুলো যেন আমি খুব দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাওয়া চিন্তাকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। ভুলুর মুখটা চোখের সামনে ভাসছে। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তাও বুঝতে পারছি না।

তবু কোনমতে মন শক্ত করে প্রশ্ন করলাম, "গণকবর বলছেন, কিন্তু কটা মৃতদেহ পেয়েছেন?" তিনি বললেন, "এখন পর্যন্ত ন'টা। এখনও আশেপাশে অনুসন্ধান চলছে, জানি না আরও পাওয়া গেল কিনা, আমিও ওখানে ছিলাম, কিন্তু পরবর্তী সব ব্যবস্থার জন্য আমাকে থানায় চলে আসতে হল। লাশগুলো একটু পরেই থানায় চলে আসবে, তারপর আইডেনটিফিকেশন হয়ে গেলে পোস্ট মর্টেমে পাঠিয়ে দেব।"

তাঁর কথা অর্ধেক মাথায় ঢুকিয়ে কোনওমতে জানতে চাইলাম, "ছেলেগুলোর বয়স কত?" ওসি আমার দিকে তাকিয়ে কী বুঝলেন জানি না, সারাদিনের উদ্বেগের জন্যই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক এতক্ষণের একনাগাড়ে কথা বলাটা একটু থামিয়ে বললেন, "ছেলেগুলোর বয়স বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, জামাকাপড় দেখে মনে হচ্ছে সবাই ভদ্রবাড়ির ছেলে।" আমার পুলিশি মন হঠাৎ জেগে উঠে প্রশ্ন করল, "জামাকাপড় দেখে কেন, চেহারা দেখে কিছু মনে হচ্ছে না?" তিনি ওই প্রশ্ন শুনে খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কি করে বুঝব বলুন, শালারা কিছু রেখেছে নাকি, অ্যাসিড ছড়িয়ে নুন আর চুন দিয়ে তাড়াতাড়ি যাতে পচে যায় তার ব্যবস্থা করে গেছে। মুণ্ডুগুলো ধড় থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে, এত বীভৎস ব্যাপার বাপের জন্মে শুনিনি।"

আমার আর কিছু জানার নেই, এখন শুধু অপেক্ষা। মৃতদেহ দেখে কার কী পরিচয় সেটা চিহ্নিত করা। আশা আমি ছাড়ছি না, মনে মনে ভাবছি ওই দেহগুলোর মধ্যে ভুলুর দেহ থাকবে না। ওসিকে বললাম, "আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।" তিনি বললেন, "কেন, আপনি এখানেই বসুন না।" ওঁকে আমি কী করে বোঝাব যে আমার কিছুই ভাল লাগছে না। কোনও জায়গায় আমি এখন স্থির হয়ে বসতে পারব না, যতক্ষণ না ওই ন'টা লাশের চেহারা দেখি।

ভীষণ আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আপনি আপনার কাজ করুন, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।" বেরিয়ে এসে দেখলাম, বাইরে প্রচুর লোক, উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে ওই কোন্নগরের গণহত্যার ব্যাপারে। বোঝাই যায়, তারা সবাই তাদের বাড়ির নিখোঁজ ছেলের সন্ধান করতে এসেছে এবং আমি ঠিক জানি প্রত্যেকেরই মনের আশা আমার মতো। তারাও আশা করছে, ওই লাশগুলোর মধ্যে তার বাড়ির ছেলেটা থাকবে না। '

ভিড় ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এল খোকন। আমিও ওকে দেখেছি। উদভ্রান্ত, উৎকণ্ঠিত, উসকো খুসকো চেহারা নিয়ে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ওর অবস্থাটা বুঝি। সব কথাই সে শুনেছে। ঘটনার মধ্যে একটা মিলও খুঁজে পাচ্ছে। ভুলু কোন্নগরেই সেদিন গিয়েছিল। আর পুলিশের অনুমান অনুযায়ী দিন দুই আগে ওই ছেলেগুলোকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যেদিন থেকে ভুলুরা নিখোঁজ।

লালবাজারের মার্ডার সেকশনে চাকরি করার সুবাদে এবং সত্তর সাল থেকে নকশালদের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু মৃত্যু আমি দেখেছি, আত্মরক্ষার্থে, অনিচ্ছায় বহু মৃত্যু আমার হাত দিয়েও হয়েছে, তাই আমার ভেতর সেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর মানসিক দৃঢ়তা জন্মে গেছে। কিন্তু খোকনের মধ্যে তা হতে পারেনি, পারেও না। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর এই মিছিল কোথা থেকে দেখবে? সত্যিই যদি ওই ন'টা লাশের মধ্যে একটা লাশ ভুলুর হয়, তবে তা দেখে খোকন সহ্য করতে পারবে না।

আমি সেই কথাই ভেবে খোকনকে বললাম, “তুই বাড়ি চলে যা। যা করার আমি করব। আমি তোদের বাড়ি যাচ্ছি।” সে একটু দোনামনা করল। আমি ওকে জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খোকন চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর দেহগুলো একটা লরিতে করে নিয়ে এসে থানার সামনে দাঁড়াল দু'জন অফিসার। এবার দেহগুলো নামাবে। সবার বাড়ির লোকজন উদগ্রীব। কী দেখবে, কাকে দেখবে?

আমার অবস্থাও অন্য সবার মতো। দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে লরির আশেপাশে প্রচণ্ড ভিড় জমে গেল। থানা থেকে বাইরের সব আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। লরির পেছনদিক থেকে একটা লাশ নামান হল। শুধু দেহটা। মাথাটা নেই। একটা চটের ব্যাগ নামাল একজন। ব্যাগ থেকে বার করা হল একটা কাটা মাথা। মাথাটা সেই কাটা দেহের মাথার জায়গায় জুড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজে চারদিক ফালাফালা। বুকফাটা সেই চিৎকার আমাদের সভ্যতার আলো চিরে জানান দিচ্ছে আমাদের প্রকৃত জান্তব রূপ। যে ছেলেটার মৃতদেহ চোখের সামনে দেখছি, তাকে খুনিরা যা করেছে, তা জন্তুরা ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করার পর অ্যাসিড দিয়ে, চুন দিয়ে মুখটা পুড়িয়ে দিয়েছে, ফলে দাঁতের পুরো পাটিটা হাঁ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। গাল থেকে মাংস খসে গিয়ে একটা বিরাট অন্ধকার। তবু সালকিয়ার অসিতকুমার দাসের নিজের লোকেরা তাকে চিনতে পেরেছে।

এবার একইভাবে আর একটা দেহকে নামান হল। ধড়-মাথা সাজানো হল। ব্যস, আমার হাত পা ঠাণ্ডা। মাথা ঘুরছে। চিনে গেছি আমি ভুলুকে। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন উত্তরপাড়া থানার ও সি। তিনি আমার দিকে তাকাতেই কোনমতে অস্ফুট স্বরে বললাম, “ওর ভাল, নাম প্রদীপ নিয়োগী, যাকে আমি তিনদিন ধরে খুঁজছি।” ওসি ভদ্রলোক আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমার ডান হাত চেপে ধরলেন। কী সান্ত্বনা, কাকে বোঝাব? তবু ওসিকে বললাম, “ও কিন্তু কোনও রাজনীতি করত না। কেন এমন হল, সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু এখন আপনাদের।”

একইভাবে নামল হাওড়ার সীতারাম বসু লেনের বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়ের মৃতদেহ। খুনিরা একই অবস্থা করে ছেড়েছে। বোঝা যায়, 'একটা প্রচণ্ড ধারালো অস্ত্র দিয়ে ‘বলি' দেওয়ার ঢঙে ওদের খুন করা হয়েছে।

নামানো হল পঞ্চাননতলার মৃণাল ঘোষ ও পঙ্কজ শীলের দেহ, গোলাবাড়ির বিশু মুখোপাধ্যায়কে। হাওড়ারই ব্যানার্জি, বাগান লেনের সুকুমার রায়, উত্তর ব্যাঁটরার বিমান বড়াল ও লেকটাউনের কাছে ভি আই পি রোডের তরুণ বসুর দেহও একইরকম বিকৃত অবস্থায়, ধড় থেকে ছিন্ন মাথাগুলো আলাদা আলাদাভাবে নামান হল। তরুণ ছাড়া প্রত্যেকেই হাওড়ার ছেলে। তরুণও একসময় হাওড়ায় থাকত, সেই সূত্রে অন্যদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

না, আর এ দৃশ্য দেখা যায় না। আমি আস্তে সেখান থেকে সরে এলাম। তিনদিনের পচা মৃতদেহগুলো থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে বাতাস অসম্ভব ভারি করে দিয়েছে। তার সঙ্গে প্রায় দু'তিনশ মানুষের কান্নার রোলে পরিবেশ সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে।

আমি কাঁদছি না। আমাকে কাঁদতে নেই। মনে মনে বলছি, “তুমি না পুলিশ অফিসার, কান্না তোমাকে মানায় না। যা কাঁদবার সেটা বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে, নিভৃতে।” আমাকে হাওড়ার বেনারস রোডের মামাবাড়ি যেতে হবে। সেখানে বাড়ির লোকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ওসিকে বললাম, “পোস্ট মর্টেম শেষ হয়ে ডেডবডি পেতে পেতে কাল কতক্ষণ লাগবে?” তিনি চিন্তা করে বললেন, “দুপুর তো হয়ে যাবেই, তবু আপনি আসার আগে একবার ফোন করে জেনে নেবেন। আমি আপনাকেই প্রথম ছাড়ার ব্যবস্থা করব।”

ওঁর কথা শুনে মনে মনে হাসি পেল। এখন প্রথম আর দ্বিতীয়, কী হবে ওসব ভেবে? জীবনের পাঁচ মিনিট এদিক আর ওদিক হলে তার গুরুত্ব আছে।। জীবনটাই যেখানে নেই, তখন লাশটা হাতে ক'মিনিট আগে পেলাম কি পেলাম না তার হিসেব করে কী হবে? ওসিকে

মুখে বললাম, "ঠিক আছে, আমি ফোন করেই আসব।"

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওই পরিবেশ থেকে বাইরে এসে একটু হাল্কা লাগছে। কলকাতা বন্ধের দিন। তার আঁচড় হাওড়াতেও পড়েছে। রাস্তা কিছুটা ফাঁকা। মামার বাড়ি যত এগিয়ে আসছে, চিন্তাও তত বাড়ছে। কি বলব আমি মামীমাকে? এই খবর কি বলা যায়? তবু এই পৃথিবীতে বলতে হয়!

ঠিক করলাম, মামীমাকে নয়, খোকনকে বলব। কিন্তু আমি পৌঁছলেই যদি মামীমা সামনে আসেন, তখন কী হবে? এইসব চিন্তা করতে করতে আমি পৌঁছে গেলাম ওখানে। গাড়ির আওয়াজ পেতেই দৌড়ে এল খোকন। আমি ইচ্ছে করেই গাড়ি থেকে নামলাম না। খোকন গাড়ির সামনে দাঁড়াতেই কোনও মতে অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম, "কাল ময়না তদন্তের পর লাশ আমাদের হাতে দেবে, তোকে যেতে হবে না, আমি নিয়ে আসব।" আমার এই কথা শোনার পর খোকনের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করলাম না। জানি, ওটা দেখলে আমিও ভেঙে পড়ব। যে বাঁধ তুলে আমি এতক্ষণ আমার বুককে বেঁধে রেখেছি, তা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গিয়ে বন্যায় ভাসবে। তাই গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

লালবাজারের দিকে ফিরতে ফিরতে ভাবছি, পশ্চিমবাংলার রক্ত ঝরার ইতিহাসে এটা আর একটা লজ্জাজনক অধ্যায় হিসাবে জ্বলজ্বল করবে। যে লজ্জা কেউ কোনওদিন মুছে ফেলতে পারবে না। যেমনভাবে দগদগে ঘায়ের মতো জ্বলজ্বল করছে ডায়মন্ড হারবার ও বারাসাতে ক'মাস আগে ঘটে যাওয়া কতগুলো যুবক হত্যার ঘটনা। বারাসাতে যে আট যুবকের মৃতদেহ যশোহর রোডের ওপর পাওয়া গিয়েছিল, তারা ছিল আড়িয়াদহের। কানাই ভট্টাচার্য, সমীর মিত্র, গণেশ ঘটক, যতীন দাস, শংকর চট্টোপাধ্যায়, তরুণ দাস, সমরেন্দ্র দত্ত ও স্বপন পালের গায়ে তবু নকশালপন্থীর দাগ ছিল। তাদের কারা কোথায় কী কারণে খুন করে বেলগাছিয়ার দুগ্ধ প্রকল্পের ভ্যানে চাপিয়ে রাতের গভীর অন্ধকারে ওখানে ফেলে দিয়ে এসেছিল তা এখনও রহস্যাবৃত। কিন্তু এই নয় যুবকের কেউ দুষ্কৃতী বা সমাজবিরোধী দলে ছিল না। তবে কেন তাদের ওইভাবে খুন করে বিকৃত করে পুঁতে দেওয়া হল, তার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

যে রাজনৈতিক দলাদলির হাঙ্গামা ও ভারতবর্ষের 'মুক্তির' জন্য রক্তক্ষরণ চারদিকে চলছে, তার কোনটার সঙ্গেই তো এরা যুক্ত ছিল না। তবে কেন এদের হত্যা করা হল? ভুলু ও তার বন্ধু কেউ কোন দলে ছিল না। তার অর্থ তারা জানত না তাদের জীবনের কোনওরকম আশঙ্কা থাকতে পারে বা তাদের এমন কোনও শত্রু আছে যারা তাদের প্রাণ নিয়ে নেওয়ার জন্য কোন্নগরে ওত পেতে আছে। যদি তারা সামান্যতম আন্দাজও করত, তবে নিশ্চিতভাবে হাওড়া থেকে ওইভাবে অরক্ষিত হয়ে কোন্নগর যেত না। জানলে দল বেঁধে ওইভাবে প্রাণ দেওয়ার জন্য কেন যাবে?

বনধের রাতে হাওড়া থেকে লালবাজারে ফিরতে বেশিক্ষণ লাগল না। লালবাজারে এসে শুনলাম, শ্যামপুকুর থানার রবীন্দ্র সরণীর যে সংঘর্ষ আমরা থামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, আমরা চলে আসার পর সেটা আবার শুরু হয়েছিল। তবে একটু সরে গিয়ে। এবার রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটের মোড়ে। তাছাড়া কাশীপুরের রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী লেনে নকশালরা টহলদারি পুলিশের ওপর বোমা ছুঁড়ে পালিয়েছে। তাছাড়া বন্ধের দিন মোটামুটি শান্ত। বরং অন্যদিন এর চেয়ে বেশি গণ্ডগোল হয়।

দু'বছর ধরে এত সংঘর্ষের খবর পেয়েছি আর তার মোকাবিলা করেছি যে, এসব খবরে আর সামান্যতম উত্তেজিতও হই না। আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। আর যে দৃশ্য আমি উত্তরপাড়া থানায় দেখে এসেছি, তারপর এসব খবর এতই নগণ্য যে এগুলোকে আমি কোনও খবর বলেই আদৌ ভাবতে পারছি না। আমি আমাদের গোয়েন্দা দফতরে ফিরে আসার আগেই সেখানে কোন্নগরের গণহত্যার খবর হেড কোয়ার্টার মারফত পৌঁছে গেছে।

কিন্তু সেই মৃত যুবকদের মধ্যে একজন যে আমারই মামাতো ভাই, তা কেউ জানত না। সেটা আমার কাছ থেকে অন্যেরা জানল। শুনে দেবনাথদা, দীপক আমাকে আমার কোয়ার্টারে চলে যেতে বলল। কিন্তু আমি গেলাম না। কারণ বাড়িতে ফিরে গেলে আমাকে আরও একাকীত্ব গ্রাস করবে। শোক আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তার চেয়ে আমাদের ব্যস্ত দফতরে অনেকের মধ্যে মিশে ভুলুকে ভুলে থাকতে পারব।

পরদিন দুপুরের মধ্যেই উত্তরপাড়া থানায় পৌঁছে গেছি। ফোন টোন করিনি। কী হবে? জানি তো ন'টা দেহ পোস্টমর্টেম করে বের করতে কত সময় লাগবে। সমস্তরকম কাগজপত্র সইসাবুদ করে আমরা ন'টি যুবকের বীভৎস দেহ যখন হাতে পেলাম তখন বিকেল।

ভুলু সহ বিশ্ব ও পঙ্কজদের দেহগুলো একটা লরিতে চাপিয়ে আমরা সালকিয়ার দিকে চললাম। সালকিয়ার বাঁধাঘাট শ্মশান। এক এক করে প্রত্যেকের দেহ নামান হল। পর পর সাজান হল ন'টা চিতা। আগুন। দাউ দাউ করে ন'টা চিতা একসঙ্গে জ্বলছে। নয় যুবক পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। রাত আটটার মধ্যে ওদের দেহগুলো ছাই।

কান্না। কত কান্না এক সঙ্গে ঝরতে পারে? শ্মশানের অদূরে বয়ে যাওয়া গঙ্গা যদি বলত আমার একটা দোসর চাই, তবে ওই নয় যুবকের বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধব তাদের কান্নার জল দিয়ে বোধহয় গঙ্গার একটা দোসর বানিয়ে দিতে পারত।

কেন? এবার ঠিক করলাম, কেন এই গণহত্যা, তার উত্তর একটা খুঁজে বার করতেই হবে। একটাই মুশকিল। ওটা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এলাকার মধ্যে, আর দৈনন্দিন তদন্তের জন্য আমার পক্ষে একটু বেশি দূরত্বে। তাছাড়া, আমাদের কলকাতা পুলিশের প্রতিদিনের কাজের ফাঁকে আমাকে অনুসন্ধান করে জানতে হবে এই মৃত্যুর পশ্চাদপট। কীভাবে, সেটা মোটামুটি ঠিক করে ফিরে এলাম।

তিরিশে মে, যেদিন থেকে ভুলুরা নিখোঁজ, তার ঠিক চারদিন আগে কোন্নগরের নবগ্রামের ছেলে দেবু ভুলুর কাছে আসে। দেবু সাদা থান ও সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে ছিল। গলায় ধরা বাঁধা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার গুরুদশা চলছে। ভুলুর সঙ্গে দেবুর পরিচয় হয় সালকিয়ায় পঙ্কজের দোকানে। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব। দেবুরা কোন্নগর নবগ্রামে যাওয়ার আগে শিবপুরে থাকত। তাই হাওড়ায় তার বহু বন্ধু

দেবু ভুলুকে বলল, “মা'র কাজ, রোববার। তুই দুপুরে যাস।” ভুলু উত্তরে সম্মতি জানিয়ে বলল, “নিশ্চয়ই যাব। আর কে কে যাবে?” দেবু ভুলুকে জানাল, “সবাই যাবে, বিশু, পঙ্কজদা, অসিত, সবাই।”

দেবু দাঁড়াল না। চলে গেল। তাড়া আছে। ভুলু এরপর সালকিয়ায় তরুণ দল ক্লাবে গিয়ে বাকি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলল। গোলাবাড়ির বিশু, সীতারাম বসু লেনের বিশ্বদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবাই মিলে ঠিক করল ওরা সবাই একসঙ্গে ট্রেনে চড়ে কোন্নগর যাবে।

কথামতো ওরা ন'জন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কোন্নগর স্টেশনে নামল। ওদের মুশকিল হচ্ছে, ওরা কেউ দেবুর নবগ্রামের বাড়ি চেনে না। তাই কীভাবে যেতে হবে তা বিভিন্ন লোকের কাছে জানতে চাইল ওরা।

সেদিন কোন্নগরে ছিল সি.পি.আই (এম)-এর যুব সংগঠন ডেমোক্রেটিক ইউথ ফেডারেশনের সম্মেলন। ওই কারণে স্বাভাবিকভাবেই স্টেশন চত্বর ও তার বাইরে ডি ওয়াই এফ সদস্যদের জঙ্গি উপস্থিতি ছিল। ভুলুরা একে ওকে যখন ঠিকানা জিজ্ঞেস করছে, তখন থেকেই ওদের ক'জন অনুসরণ করছিল, তা ওরা খেয়াল করেনি। খেয়াল করার কোনও হেতুও ছিল না। ওরা বন্ধুর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে। ওদিকে খেয়ালই বা করবে কেন? যারা চোর তাদেরই নজর থাকে বোঁচকাবুঁচকির দিকে। ওরা চোরও ছিল না, 'বিপ্লবী' ও ছিল না, সুতরাং কেউ নজর করছে কি করছে না সেসব দেখার কথা ওদের মাথাতেই আসেনি। ওরা অনেকটা বেড়াতে আসার ঢঙে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ডুবে ছিল। সব বিশ বাইশ বয়সের তরুণ। তারুণ্যের উচ্ছলতা ওদের চলনে, বলনে, এমন কি তারা যে তাদের এক বন্ধুর মায়ের শ্রাদ্ধবাসরে যাচ্ছে, সেটা যে একটা শোকের আসর, সেবিষয়েও তারা মনোযোগী ছিল না। ওই বয়সী ছেলেরা থাকেও না। ওটা ওই বয়সেরই ধর্ম।

কিন্তু তাদের অনুসরণকারীদের মাথায় ছিল অন্য চিন্তা। ভুলুদের আগমনে তাদের ভেতর এমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে তাদের মনে হয়েছিল, এরা তাদের কিছু একটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

নবগ্রামের ভেতরের দিকে ভুলুদের দল যখন পৌঁছল, তখন এক স্থানীয় যুবক তাদের কাছে এসে জানতে চাইল, “তোমরা কি দেবুর বাড়ির খোঁজ করছ?” ভুলুরা ক'জন একসঙ্গে বলে উঠল, “হ্যাঁ।” যুবকটি বলল, “আমার সঙ্গে এস্।” ভুলুরা ভাবল, যাক এতক্ষণে তাহলে ঠিক পথপ্রদর্শক পাওয়া গেছে। তারা সেই যুবকের পেছন পেছন যেতে লাগল। ভুলুদের মধ্যে পঙ্কজ কিছুটা বড়। সে সেই যুবককে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল, “আপনার কী নাম ভাই?” যুবকটি উত্তর দিল, “বুলান চক্রবর্তী।” বুলান এবার পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইল, “তোমরা কোথা থেকে এসেছ?” পঙ্কজই উত্তর দিল, “আমরা হাওড়া থেকে এসেছি, দেবুর মা'র শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে। ” বুলান ওদের দলের দিকে একবার আলতো করে চোখ বুলিয়ে আস্তে বলল, “ও।”

দেবুর বাড়ির সামনে এসে বুলান বলল, “এটা দেবুদের বাড়ি।” বাড়ি দেখে তো ভুলুদের দলের সবাই অবাক। কারণ ওই বাড়িতে অনুষ্ঠানের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোনও লোকজনও। সমস্ত বাড়ি একেবারে চুপচাপ। ওরা ভেবে পেল না, শ্রাদ্ধবাসরে আসার জন্য

যেখানে হাওড়ায় গিয়ে দেবু তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে, সেখানে অন্য আরও অনেক নেই? এমন তো হওয়ার কথা নয়। বুলানই এগিয়ে গিয়ে বাড়ির বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ল। ভুলুরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে দরজা খুলে একজন সত্তর পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঁকি মারলেন। তিনি বুলানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, "কী চাই?" বুলান তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভুলুদের দলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "দাদু, দেখুন তো এদের চিনতে পারেন কি না? এরা বলছে, এরা সবাই দেবুর বন্ধু।"

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবার এগিয়ে এসে ভুলুদের দলের প্রত্যেকের দিকে ভাল করে দেখে মাথা নেড়ে বললেন, "না, চিনি না, দেখিনি।" .

ভুলুরা ভদ্রলোককে বলল, "দাদু, আজ দেবুর মা'র শ্রাদ্ধ, দেবু আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল, তাই এসেছি।" ভদ্রলোক বললেন, "সে তো কলকাতায় হচ্ছে, তোমরা এখানে কেন এসেছ?"

হতাশ হয়ে ভুলুদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "ও"। ওরা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বুলানই ওদের মুশকিল আসান করল। বলল, "এতদূর এসেছ তোমরা, না খেয়ে ফিরে যাবে কি, আমাদের কনভেনশন হচ্ছে, খাবার দাবারও আছে। চল, তোমাদের আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। তোমাদের ঘোরাও হবে, খাওয়াও হবে।"

বুলানের কথায় ভুলুরা আশ্বস্ত হল। ওরা ওর পেছন পেছন দল বেঁধে চলল। বুলান ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। বুলান যে সি.পি.আই (এম)-এর একনিষ্ঠ কর্মী তা ভুলুরা জেনে গেছে। রাস্তায় যেতে যেতে বুলান অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলল। বুলান যখন অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলছে, ভুলুরা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। গলার স্বর তখন একেবারে নিচু পর্দায়। ভুলুরা ভাবল, পার্টির ব্যাপার, তাই ওদের বুলান কিছু জানাতে চাইছে না।

নবগ্রাম ছেড়ে ওরা আরও পশ্চিমদিকে চলল। গ্রামের দিকে। দুপুরবেলা চড়া রোদের মধ্যে ওরা হেঁটে যাচ্ছে। ভুলুরা হাওড়া শহরের ছেলে। চারদিকে ইট পাথরের দেওয়াল। প্রাচীন, জীর্ণ। শহরে থেকে অভ্যস্ত। গ্রামের দিকে এসে ওরা খুশি। মনের আনন্দে বুলানের দেওয়া দু'জন গাইডের সঙ্গে চলেছে। বুলান ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে অন্যখানে গেছে। বলে গেছে, সব ব্যবস্থা করে সে ভুলুদের কাছে আসবে।

ভুলুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। গ্রামের দিকে যেতে যেতে যতরকম গাছ দেখছে একেক জন, সে প্রশ্ন করছে, কোন গাছটা কি? ওদের মধ্যে বেশির ভাগ ছেলেই ভুল উত্তর দিচ্ছে, আর সেইসব উত্তর শুনে কোন্নগরের ছেলে দুটো হেসে হেসে খুন। এগারোটা ছেলের হাসি মশকরার আওয়াজ শুনে গ্রামের লোকেরা ওদের দিকে ফিরে ফিরে দেখছে। সেদিকে কারও খেয়াল নেই।

মাথার ওপরের জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদের মতো ওদের তেজ। মাঠপ্রান্তরে বয়ে যাওয়া দখিনা বাতাসের মতো ওদের উচ্ছ্বাস। বন্ধুর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে, তার বদলে অন্যের আতিথেয়তা গ্রহণ, ঘুরে বেড়ানোর আস্বাদে মশগুল হওয়া ওই বয়সেই সম্ভব।

প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ হাঁটার পর ওরা একটা ছোট্ট প্রাইমারি স্কুলের উঠোনে এসে হাজির। রোববার স্কুল বন্ধ। প্রাইমারি স্কুল বলতে মাঝারি মাপের দু'টো টালির চালের ঘর। ঘরের সামনে লম্বা একটা বারান্দা। বুলানের চেলা দুটোও সি.পি.আই (এম) পার্টির কর্মী। ওরা ভুলুদের স্কুল বারান্দায় উঠে বসতে বলল। ভুলুরা এবার একটু ছায়ার আশ্রয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে বসে ঘাম মুছতে শুরু করল।

ভুলুরা জেনে গেছে, ওই গ্রামের নাম কানাইপুর। ওখান দিয়ে একসময় বয়ে যেত খরস্রোতা সরস্বতী নদী। এখন মজে গিয়ে শুকনো। বর্ষার সময় কোনও কোনও জায়গায় থাকে কিছুটা তিরতিরে জল। তাতে সরস্বতীর কিছুই বোঝা যায় না।

ওরা পৌঁছনোর মিনিট কুড়ি পর বুলান বিরাট একটা দল নিয়ে সেখানে হাজির। সঙ্গে

খাবার দাবার। বুলানরা ওদের খেতে দিল। ওরা স্কুল বাড়ির বারান্দায় বসে গেল। বহুক্ষণ ভুলুরা অভুক্ত ছিল। ওদের দম না ফেলে খাওয়া দেখলেই বোঝা যায়, খিদেয় ওদের পেট জ্বলছিল। খাওয়া যখন শেষ হল, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়ে প্রায় বিকেল। লম্বা হয়ে গেছে গাছের ছায়া।

খাওয়ার পর বুলানদের নেতা পরেশ সিংহ ভুলুদের অনেক প্রশ্ন করল। ওরা কোথা থেকে এসেছে থেকে শুরু করে দেবুর সঙ্গে ওদের কিসের সম্পর্ক, সবরকম প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে লাগল। ভুলুরা সহজভাবে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল।

ঘণ্টাখানেক প্রশ্নপাঠের পর পরেশ ওদের বলল, তোমরা স্কুল ঘর দু'টোয় একটু বিশ্রাম কর। আমরা ঘুরে আসছি।" পঙ্কজ বলল, "না, তার আর দরকার হবে না, আমরা এখনই রওয়ানা দেব, নয়ত আমাদের ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।" পরেশের দলের ছেলেরা স্কুলের ঘর দু'টোর তালা খুলে ফেলল। পরেশ এবার নিচু স্বরে কঠিন গলায় বলল, "আমি যা বলছি, তাই কর। তোমাদের জামাই আদর করে এমনি খাওয়ানো হয়নি।" পঙ্কজ একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। বুলান বলল, "আরে, তোমাদের তো বিশ্রাম নিতে বলা হচ্ছে, তাতে আপত্তির কি আছে, ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়।"

ভুলুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরেশরা প্রায় জোর করে ওদের দু'দলে ভাগ করে দুটো ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। ওরা বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ল কেউ, কেউ বা বসে রইল। তবে ঘুমোল না কেউই ঘরের জানালা দিয়ে দেখল, পরেশের ছেলেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এখানে ওখানে বসে আছে, তাদের দু'একজনের হাতে লাঠি। সেই সব লোকগুলো মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ঘর দুটোর দিকে দেখছে।

গাছের ছায়া দীর্ঘ হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে ভুলুরা আটকে আছে। ওরা বাইরের লোককে ডাক দিয়ে জল চাইছে, ওরা জল দিচ্ছে, কিন্তু যখন প্রশ্ন করছে কখন ওদের ছাড়া হবে, পরেশের লোকেরা উত্তর দিচ্ছে, "পরেশদা জানে।" পঙ্কজ একসময় চিৎকার করে ওদের কাছে জানতে চাইল, " পরেশদা কখন আসবেন?" ওরাও উত্তর দিল, "জানি না।" পঙ্কজ তবু প্রশ্ন করল, "উনি কোথায়?" উত্তর দিল, "তাও জানি না। চিৎকার কোরো না।"

সন্ধে আর কতক্ষণ? রাতের দিকে অন্ধকার হাঁটতে লাগল। ঘর দুটোর ভেতর গুমোট গরমে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভুলুরা জানালার সামনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, কখন তাদের মুক্তিদাতা এসে তাদের মুক্তি দেবে। ওরা ভেবেও পাচ্ছে না, কী তাদের অপরাধ, কেনই বা তাদের এভাবে আটক রাখা হয়েছে বা তাদের নিয়ে পরেশ সিংহ বা তার শাকরেদ পাগলা প্রদীপ কী করবে। ভুলুরা পাহারাদারদের মধ্যে টুকরো টুকরো আলোচনায় যতটুকু বুঝেছে, তাতে ওদের মনে হচ্ছে, তাদের নিয়ে কী করা হবে সেই বিষয়ে সি.পি.আই (এম)-এর ওইসব নেতা ও কর্মীদের মধ্যে মিটিং হচ্ছে। সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে তাদের ভাগ্য।

অন্ধকার স্কুলঘর দুটোর জানালা ধরে যেভাবে ভুলুরা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে মনে হচ্ছে, বাজারের মুরগির মাংসের ব্যাপারীর খাঁচায় আটক এক ঝাঁক মুরগি। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে কখন তার গলা ধরে টান দেবে কশাই। ভুলুদের বলে দেওয়া হয়েছে, প্রাকৃতিক কাজ সব ঘরের মধ্যেই সারতে, কিংবা পেছনের জানালা ব্যবহার করতে। ওরা তাই করতে বাধ্য হচ্ছে। কোনও কাকুতি মিনতিতেও দরজা খোলানো যায়নি। এরকম ব্যবহারের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ তো ওরা খুঁজে পাচ্ছেই না, এমন কি ওরা এটাও বুঝতে পারছে না, দেবু কেন নেমন্তন্ন করে জানাল না, কোথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানটা হবে? কেন সে তাদের কোন্নগরের কথা বলল? এই পরিস্থিতির জন্য কি তাহলে দেবু দায়ী? সে কি জানত তারা কোন্নগরে এলে, সি.পি.আই (এম)-এর পার্টির এই লোকেরা তাদের ধরে আটকে দেবে?

ভুলুরা আর নতুন করে কিছু চিন্তা করছে না, সময়ের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দেখেছে স্কুল বাড়ির চারপাশে পাঁচ ছ'জনের এক একটা দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারাগুলো অন্ধকারে আর বোঝা যাচ্ছে না। শুধু যখন তারা বিড়ি কিংবা সিগারেট টানছে, তার জ্বলন্ত মাথা দেখে বোঝা যাচ্ছে তাদের উপস্থিতি।

রাত দশটা। স্কুলের উঠোনে আস্তে আস্তে লোক বাড়তে লাগল। পরেশ ও পাগলা ফিরে এসেছে। ওরা নিচুগলায় কথাবার্তা বলছে। সেইসব কথা ভুলুদের কানে কিছুই আসছে না। ওরা ঘুরে ঘুরে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলছে। বিভিন্ন লোকের হাতে বিভিন্নরকম অস্ত্র রয়েছে। কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে সড়কি, কারও হাতে রামদা বা শাবল কিংবা তরোয়াল জাতীয় কিছু।

ভুলুরা জানালার ফাঁক দিয়ে ওদের লক্ষ্য করছে, ওরা ভাবছে, এত অস্ত্রশস্ত্রের কিসের প্রয়োজনে? একবার ভাবছে, এখানে গ্রামের দিকে বোধহয় ডাকাত দলফল আছে, সাপখোপ আছে, তাই খালি হাতে অন্ধকারে কেউ ঘুরে বেড়ায় না। শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলার জন্য যা হোক কিছু একটা হাতে রাখে। অন্যদিকে ভাবছে, তারা কখন ছাড়া পাবে? কখন বাড়ি ফিরবে? বাড়ি ফিরতে না পারলে বাড়ির লোকেরা যে চিন্তায় অস্থির হয়ে যাবে, সেই আশঙ্কায়ও ভুলুরা চঞ্চল। কিন্তু ছাড়া পাওয়ার কোনও উপায় ওরা খুঁজে পাচ্ছে না। এভাবেই সময় চলে যাচ্ছে।

এগারটার সময় চারজন লোক পরেশের নেতৃত্বে উঠে এল স্কুল বাড়ির বারান্দায়। টর্চের আলো ফেলল। জানালার দিকে উঁকি দিয়ে আছে ভুলুরা। ওরা মিচকি হাসি দিয়ে পরেশদের মন ভোলানোর চেষ্টা করছে। বিশু বলল, "আমাদের এবার ছাড়বেন তো দাদা, বাড়িতে সবাই চিন্তা করছে।" পরেশের মুখটা কঠিন। সে শুধু বলল, "হ্যাঁ, ছাড়ব।"

টর্চের আলো পঙ্কজের মুখের ওপর আটকে গেল। পঙ্কজই ওদের মধ্যে বয়েসে বড়। পরেশ ওকে বলল, "তুই আয়, কথা আছে।" পরেশের কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গীরা ঘরের তালা খুলে শিকলটাও নামিয়ে দরজার কপাট ফাঁক করে পঙ্কজকে বার করে এনে আবার শিকল তুলে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

বারান্দা থেকে স্কুলের উঠোনে নেমে পঙ্কজের খুব ভাল লাগল। গুমোট গরমের মধ্যে এত ঘণ্টা সিদ্ধ হওয়ার পর বাইরের ফুরফুরে হাওয়ায় সে খানিকটা হাল্কা হয়ে নিল। পরেশ বলল, "চল।" পঙ্কজ জানতে চাইল, "কোথায়?" পাগলা পাশ থেকে উত্তর দিল, "গেলেই দেখতে পাবি।" ওরা পঙ্কজকে নিয়ে স্কুলের পেছন দিকে চলল। তারপর মজা সরস্বতী নদী পার করিয়ে একটা আমবাগানের পাশে ধানক্ষেতে নিয়ে দাঁড় করাল।

পঙ্কজ দেখল, কতগুলো লোক অন্ধকারের মধ্যে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। কেন এত রাতে মাটি খুঁড়ছে; পঙ্কজের তা বোধগম্য হল না। পঙ্কজের ব্যাপারটা কেমন ভৌতিক ভৌতিক লাগল, ভয়ে সে পাগলাকে বলল, "কি হচ্ছে?" পাগলা বলল, "দেখে যা, কোনও প্রশ্ন করবি না। শালা নকশাল করা ঘুচিয়ে দেব।" পঙ্কজ পাগলার ধমক খেয়ে মিইয়ে গিয়ে কোনওমতে সাহস সঞ্চয় করে জানতে চাইল, "কে নকশাল করে?" পরেশ বলল, "তোরা সব কটা।" পঙ্কজ ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, আমরা কেউ নকশাল করি না। কিছুই করি না।" অন্ধকার থেকে একজন বলে উঠল, "চুপ কর, বেশি বকবক করবি না। আমরা সব খোঁজ নিয়ে নিয়েছি।" পঙ্কজ অন্ধকারের মধ্যে বুলানকে দেখে পাগলাদের ছেড়ে ওকে বলল, "বিশ্বাস করুন বুলানবাবু, আমরা কেউ কোনও রাজনীতি করি না।" পঙ্কজের কথার কেউ কোনও উত্তর তো দিলই না, একসঙ্গে ওর কথায় অনেকেই হেসে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, "শালা, আমাদের পার্টির কমরেডদের খুন করা, এবার তোদের দেখাচ্ছি।" পঙ্কজকে ওরা এবার ঠেলে মাঠের একটু ভেতরে নিয়ে গেল, যেখানে একটা লোক মাটি খুঁড়ছিল। পঙ্কজ দেখল একটা গর্ত। হাত পাঁচেক লম্বা। হাত দুয়েক চওড়া। কতটা গভীর পঙ্কজ বুঝল না। পঙ্কজ কাছে এলে কোদালের শেষ মাটিটা পঙ্কজের

পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

পঙ্কজের চারপাশে পরেশদের চোদ্দ পনের জনের দল দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতেই অস্ত্র। পরেশ কিছু একটা বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজের পেছনে দাঁড়ানো পাগলার হাতের রামদা একবার আকাশের দিকে উঠে নেমে এল। পঙ্কজ একেবারে হাল্কা। তার ঘাড় থেকে মাথাটা খসে পড়লো ছড়ানো মাটিতে। এক কোপেই কাৎ। বাকি শরীরটাও পড়ল স্তূপ করে রাখা মাটির ওপর। পরেশ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “এই মালটাই নেতা ছিল।”

পঙ্কজের কাটা ধড় থেকে গলগল করে রক্ত ঝুরঝুরে মাটিতে পড়ে লাল রঙের কাদায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। দু'তিন মিনিট। পরেশের দলের দু'জন লোক পঙ্কজের দেহটাকে হাত পা ধরে তুলে গর্তে নামিয়ে দিল। একজন কাটা মাথাটাও ঘাড়ের কাছে ফেলে দিল। অন্ধকারে একটা লোক দু'টো চটের ব্যাগ নিয়ে এল। পরেশ সেই ব্যাগ থেকে একটা বোতল বার করে ছিপিটা খুলে তার থেকে হুড়হুড় করে তরল পঙ্কজের কাটা মুখের ও শরীরের ওপর ফেলতে লাগল। পঙ্কজের মুখটা সেই তরল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়তে লাগল।

মৃত পঙ্কজের সেই অ্যাসিড বর্ষণে কোনও অনুভূতিই হল না। সে এখন সব অনুভূতির অনেক ওপরে। অ্যাসিড ঢালা শেষ করে পরেশ এবার অন্য একটা ব্যাগ থেকে চুন নিয়ে পঙ্কজের শরীরের ওপর ছিটিয়ে দিল। অন্যদিকে পাগলারা পঙ্কজকে খুন করে ফিরে গেছে স্কুলে। সেখান থেকে অন্য একজনকে নিয়ে আসার জন্য।

পাগলারা এবার একইভাবে স্কুল থেকে বার করল বিশুকে। বিশু অনেকক্ষণ ধরে বাড়ি যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করছিল। পাগলা ওকে বলল, বিশুকে ঠেলতে ঠেলতে সরস্বতী নদী পার করিয়ে কানাইপুরের ওই ন'পাড়ার মাঠে নিয়ে এল। বিশু কুঁকড়ে আছে। গরমের মধ্যেও সে কাঁপছে। কোনমতে বলল, “পঙ্কজদা কই?” একজন বলে উঠল, “দেখতে পাবি।” বিশু অন্ধকারে কোনও কিছুই বুঝতে না পেরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ল।

বিশুকে পাগলারা চুল ধরে টেনে তুলতে গেল। বিশু এবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। পরেশ দাঁত খিচিয়ে বলে উঠল, “চুপ করা।” পাগলা বলে উঠল, “করাচ্ছি।” বিশু কাঁদতে কাঁদতে এর ওর দিকে তাকিয়ে বলছে, “আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাব। আমি আর পারছি না।” পরেশের নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বল্লম পেটের ডান দিকে ঢুকে গেল। যেন একটা শাবল নরম মাটিতে খচ করে নেমে গেল। বিশুর একটা আর্তনাদ। স্কুলবাড়ির থেকেও শোনা গেল। সেখানে পাহারাদাররা সেই চিৎকার শুনে এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বন্ধ ঘর দুটোয় ভুলুরা বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী। কোথা থেকে কিসের চিৎকার?

চিৎকার করে বিশু শুয়ে পড়তেই তার গলায় রামদার কোপ। দু ফাঁক। বিশু নিথর। তার বাড়ি যাওয়ার ছটফটানি শেষ। সে কানাইপুরের মাটিতে ঘুমনোর জন্য প্রস্তুত। একটা লোক বিশুর হাত দুটো ধরল, অন্য একজন পা দুটো। তাকে চ্যাংদোলা করে নামিয়ে দেওয়া হল পঙ্কজের দেহের ওপর একই গর্তে। বিশুর দেহ নামিয়ে পাগলারা আবার চলে গেল স্কুলের দিকে আর একজনকে আনতে। সবে তো দু'জন গেছে, আরও সাতজন স্কুল ঘরে বন্দি। তাড়াতাড়ি করতে হবে।

পাগলা প্রদীপ, টেকো, নিরাপদরা স্কুলের দিকে চলে গেলে, পরেশ প্রথমে অ্যাসিড, তারপর চুন, একই কায়দায় বিশুর কাটা মাথা, মুখের ওপর ও বাকি শরীরে ছড়িয়ে দিতে লাগল। বিশুর কাটা ধড়ের ওপর অ্যাসিড পড়ে পুড়ে পুড়ে কাঁচা মাংসের গন্ধমাখা ধোঁয়া ওপরে উঠতে লাগল। মুখ থেকে রক্তমাখা গ্যাঁজলা বেরিয়ে নিচে পঙ্কজের দেহে পড়তে লাগল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে দুজন শেষ। মাঠের মধ্যে আরও গর্ত খোঁড়া অব্যাহত। আরও সাতজন তো খাঁচায় আছে। পাগলা সেই সাতজন থেকে আরও একজনকে সরস্বতী নদী পার

করিয়ে আনছে। ছেলেটা পাগলাদের খালি বলছে, "আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি যাব, আমি বাড়ি যাব।" পাগলারা তার হাত দুটো ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে মাঠের দিকে নিয়ে আসছে। ছেলেটা তবু হাত ছাড়ানোর জন্য ছটফট করছে। বুলান, পাগলারা ওর কাণ্ড দেখে হাসছে। বুলান বলল, "আরে তোকে ছেড়ে দিলেও কি এখান থেকে যেতে পারবি? পারবি না। তাই চিৎকার বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে চল।" ছেলেটা তবু চিৎকার করছে মাঝে মধ্যে। কিন্তু পাগলারা রক্তের যে স্বাদ পেয়েছে, সেই নেশার ভয়াল উন্মাদনার জাল ছিঁড়ে ওই আঠারো বছরের ছেলেটা বেরিয়ে যাবে, তার সাধ্য কই?

এই ছেলেটাই আমার ভাই ভুলু। প্রদীপ নিয়োগী। তাকে পাগলারা নিয়ে এল পরেশের কাছে। পরেশ দাঁড়িয়ে আছে সেই একই গর্তের ধারে। ভুলুর ভয়ার্ত চোখ এদিক ওদিক পঙ্কজ ও বিশুকে খুঁজছে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। ভুলু তাই চারপাশের ছড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে একবার তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল, "পঙ্কজদা।" কোথায় পঙ্কজদা? সে তো চিরনিদ্রায় কবরে শুয়ে আছে। তার দেহের ওপর একই ভাবে শুয়ে আছে বিশুর মুণ্ডুহীন লাশ।

এভাবে কাটল মিনিট দু'তিন। ভুলুর অতিরিক্ত ছটফটানি দেখে পরেশের বিরক্তি ধরছিল। সে এক ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল ভুলুকে। ভুলু চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে অব্যর্থ নিশানায় তার গলায় পড়ল সড়কির টান। দুফাঁক। শেষ। তবু একটা বল্লমের ছুঁচলো মুখ একজন ঢুকিয়ে দিল তার বুকে। টেনে তুলে নিল। ভুলুর শরীরটা কেঁপে উঠে থেমে গেল। পরেশ হাতের ইশারা করল। অর্থাৎ আর প্রয়োজন নেই। ভুলুর দেহটা একই ভাবে শুইয়ে দিল বিশুর শরীরের ওপর।

পাগলারা চলে গেল চার নম্বর শিকার আনতে। পরেশ অ্যাসিডের বোতল তুলে নিল। ঢালল। তারপর চুন ছড়াল। না, এই গর্তে আর অন্য কারও জায়গা হবে না। পরেশ গম্ভীর গলায় তার পাশের কমরেডদের বলল, "বুজিয়ে দে।" তারা গর্তের ধারে জড়ো করে রাখা মাটি কোদাল দিয়ে টেনে টেনে গর্ত বোজাতে লাগল। মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ওরা মাটি ঠেসে দিল, যাতে কুকুর বা অন্য জন্তু এসে চট করে মাটি সরিয়ে লাশগুলো না বের করতে পারে।

চার নম্বর শিকার বিশ্বদেব। তাকেও একই পদ্ধতিতে খুন করে অন্য একটা নতুন গর্তে শুইয়ে দিয়ে লাশের ওপর অ্যাসিড ঢেলে দিল। তারপর একে একে আনা হল তরুণ, অসিত, মৃণাল, সুকুমার ও বিমান বড়ালকে। এবং তাদেরও পরেশ, পাগলারা গলা কেটে একই কায়দায় গর্তে চালান করে দিল।

স্কুল ঘর দুটো এবার ফাঁকা। সব শিকার শেষ। পরেশদের অনেক পরিশ্রম হয়েছে। রাত মাত্র একটা। তারা দল বেঁধে মাঠ ফাঁকা করে সরস্বতী নদী পার হয়ে ফিরে আসতে লাগল। দূর থেকে ক'টা কুকুরের ডাক আর পাগলাদের গলায় উল্লাসের প্রকাশ ছাড়া সারা চরাচর চুপ।

চুপ সরস্বতী নদী। সে অনেকদিন আগেই চুপ করে গিয়েছিল। রক্তের এ ধারা সে সহ্য করতে পারবে না বলেই বোধহয় স্বেচ্ছায় উচ্ছ্বাস বন্ধ করে বুকে মাটি চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কারণ সে জানত এত লজ্জা সে সইতে পারবে না।

ন'টা তরতাজা ছেলে কানাইপুরের মাঠে হারিয়ে গেল। পরেশদের 'বিপ্লবী প্রতিশোধে' 'বিপ্লব' এগিয়ে গেল দুর্বার গতিতে। সবচেয়ে বড় প্রহসন, যে পার্টি তার দু'দিন পর যাদবপুরের বিজয়গড়ে সি.আর.পি-র অত্যাচারের প্রতিবাদে 'বনধ' ডেকেছে, তাদেরই একনিষ্ঠ সদস্যরা ন'টা তরুণ, তাজা, নিরপরাধ ছেলেকে বিনা কারণে খুন করে তাদের দেহগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে নিশ্চিন্তে বিড়ি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে যে যার বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু সারারাত ঘুমোয়নি সেই ছেলেগুলোর বাড়ির লোকজন। তারা নিদ্রাহীন রাতে খালি

ভেবে গেছে, ছেলেগুলো দিনে কোন্নগরে বন্ধুর মায়ের শ্রাদ্ধে গিয়ে তারা কোথায় চলে গেল? ফিরল না কেন?

একত্রিশ তারিখে সকাল গড়িয়ে দুপুর চলে এল, কিন্তু ছেলেগুলোর কোনও হদিস বাড়ির লোকজন পেল না। তারা তো জানে না, ছেলেগুলো কোথায় শুয়ে আছে। তাই তারা কোনও পথ না পেয়ে বিভিন্ন থানায় বাড়ির ছেলের নিখোঁজের ব্যাপারে ডায়েরি করল। কিন্তু উত্তরপাড়া থানায় যখন নবগ্রামে ন'টা ছেলের হারিয়ে যাওয়ার খবর জানানো হল, তখন তারা সেই খবরকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়ে দিল, কোনও ডায়েরিই লিখল না। সন্ধে নাগাদ উত্তরপাড়া থানায় আবার খবর এল, কতগুলো ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই ছেলেগুলোর হারিয়ে যাওয়ার পেছনে নকশালদের হাত আছে। সেদিন রাতে উত্তরপাড়া থানা থেকে ওই অঞ্চলের নকশাল ছেলেদের বাড়িতে হানা দিল। কিন্তু দেখা গেল, তারা প্রত্যেকেই বাড়িতে আছে, এবং ওই রহস্য সম্পর্কে তারা কিছুই আলোকপাত করতে পারল না।

পয়লা জুন। রাজা নামে নবগ্রামের একটা অল্পবয়সী ছেলে সকালবেলা কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন এম এল এ অশোক ঘোষের বাড়িতে এল এবং নবগ্রাম ও কানাইপুরের ঘটনার কিছু কথা জানাল।

অশোকবাবু সব শুনে প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর নিজে উত্তরপাড়া থানায় গিয়ে তদন্ত করতে বিশেষভাবে চাপ দিলেন। উত্তরপাড়া থানা এবার নড়েচড়ে বসল। তারা দলবল নিয়ে কানাইপুরের দিকে সরস্বতী নদী পেরিয়ে সেই আমবাগানের পাশে মাঠে এসে দাঁড়াল। দেখল, কোনও কোনও জায়গার মাটি দু'একদিন আগে খোঁড়া হয়েছে, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

খবরের সত্যতা যাচাই করতে প্রথমেই তারা সেই রকম একটা জায়গার মাটি কোদাল দিয়ে সরাতে লাগল। ফুটখানেক মাটি সরাতেই একটা হাত। যে লোকটা মাটি কোদাল দিয়ে সরাচ্ছিল, সে থমকে গেল। থমকে গেল চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা থানার অফিসার ও অন্যান্য লোকজন। তারা পরস্পরের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। ওসি'র নির্দেশে আবার খোঁড়া শুরু হল। বেরিয়ে পড়ল এক তরুণের মৃতদেহ। সেটাই ভুলুর। ভুলুর দেহটা ওপরে তুলতেই বেরিয়ে পড়ল বিশুর লাশ, তারপর তার নিচে পঙ্কজের দেহ। এরপর একে একে বাকি ছ'জনের।

তারপর বহু চিৎকার, চেঁচামেচি, নেতাদের বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি। কিন্তু এই ঘটনায় কোনও বাংলা বনধ হল না। বিশেষ কোনও তদন্তকারী দল নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট থেকে এলেন না।

মামীমাকে হাওড়ার মেয়র তথা সি.পি.আই (এম) পার্টির নেতা স্বদেশ চক্রবর্তী ও সিটু নেতা উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে এসে বলে গেলেন, এই খুনের ঘটনার সঙ্গে তাঁদের পার্টির লোকজন জড়িত নন। তাঁদের পার্টির ভেতর তদন্ত করে এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কিন্তু বললেন না, কারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত। বলবেন কী করে? সত্য বলার সাহস আমাদের দেশের ক'টা রাজনৈতিক দলের নেতাদের আছে? সত্য বললে না তাঁরা নেতা থাকেন, না হয় তাঁদের প্রতিপত্তি! এই সত্যটা তাঁরা জানেন বলেই মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোর অভ্যেসটা প্রথমেই করায়ত্ব করে নেন। স্বদেশবাবুর ওই আশ্বাসে কী কোনদিন মামীমা ও আমার মামাতো ভাই বোনেদের কান্না থেমে যাবে? থেমে যাবে কী আমার হাহাকার? থামে না, থামতে পারে না। একটা বুকচেরা জ্বালা চিরদিন থেকেই যায়।

হ্যাঁ, এই খুনের ঘটনায় বহু লোক গ্রেফতার হয়েছিল। তার মধ্যে আদালত থেকে আঠারো জনের যাবজ্জীবন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই সি.পি.আই (এম) পার্টির লোক ছিল। ওই আঠারো জন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি কর্মসূচীর আওতায় পড়ে ছাড়া পেয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কোন্নগরে সি.পি.আই (এম) পার্টির লোকেরা ওই আঠারো জনকে ব্যান্ড বাজিয়ে মিছিল করে সম্বর্ধনা দিতে দিতে নিয়ে

যায়। কারণ তারা তো মহান কাজ করে বাড়ি ফিরছে!

আর ওই ন'টা তরুণের বাড়ির লোক আজও বুক চাপড়ে হাহাকার করছে। কে দেবে তাদের সান্ত্বনা?

সাজা তো হয়েছিল অমিতাভ সিংহ রায় খুনের আসামি অশোক ও কাঞ্চনেরও। কিন্তু ওই খুনের ষড়যন্ত্রকারী নিশীথ ভট্টাচার্য ও রবীন চক্রবর্তী খালাস পেয়ে গেল। অবশ্য অশোক ও কাঞ্চন 'বন্দিমুক্তির' আওতায় সাতাত্তর সালে ছাড়া পেয়ে যায়।

সাজা হয়েছিল কলুটোলার দেবা হত্যার প্রচেষ্টার আসামী শ্যামল, তারক, চন্দন ও প্রদীপের। তারাও ওইভাবে ছাড়া পেয়ে গেল। কসবার চিংলুর বিরুদ্ধে আমরা কোনও মামলা করিনি, সে আমাদের লালবাজারে থেকে আমাদের অনেক অভিযানের সঙ্গী হয়ে বোমা উদ্ধারে সাহায্য করেছিল। সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একদিন আমি দেবীবাবুকে বললাম, “স্যার, চিংলু আর কোথায় যাবে, ওকে আপনি এখানেই একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন।” দেবীবাবু হেসে উত্তর দিলেন, “ঠিক, ওর একটা ব্যবস্থা করতে হয়।” আমাদের এই কথাবার্তার মাস তিনেক পর দেবীবাবু চিংলুকে লালবাজারের অফিসের কার্পেট ও অন্যান্য আসবাবপত্র পরিষ্কার করার চাকরি করে দিলেন। চিংলু সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হয়ে গেল। সেই থেকে চিংলও লালবাজারেই আছে, অবশ্য সে সাফসুতরোর বদলে সারাদিন গোয়েন্দা দফতরের সবস্তরের কর্মচারীকে চা, জলখাবার দিতেই ব্যস্ত থাকে।

কসবায় ধৃত রানারা অনেক আগেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। রানা ছাড়া পেয়েই নকশাল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিল। বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরের কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনীর সদস্য হিসাবে কসবা ও তার আশেপাশের এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের ওপর প্রচুর অত্যাচার করল। সি.পি.আই (এম) পার্টির বহু সদস্যকে এলাকা ছাড়া করার কাজে ব্যস্ত ছিল সে।

সাতাত্তরে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় ফিরল, সি.পি.আই (এম) পার্টির লোকেরা রানাকে তাড়া করল। রানা কসবা ছেড়ে কংগ্রেসের চৌরঙ্গির অফিসে গোপনে আশ্রয় নিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর তার আগের পাঁচ বছরের প্রচণ্ড ক্ষমতাশীল কংগ্রেসী মাস্তানরা যে যার এলাকা ছেড়ে পালাতে লাগল।

রানাকে গ্রেফতার করার জন্য সরকার থেকে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। ডিসি ডিড়ি সফি সাহেব প্রায় প্রতিদিনই একবার করে রানার গ্রেফতারের ব্যাপারে কতদূর কী হল, দীপকের কাছে জানতে চাইতেন। রানা যে কংগ্রেসের সদর দফতরে আশ্রয় নিয়েছে, সে খবর দীপকের কাছে ছিল না। রানা শুধু সি.পি.আই (এম) পার্টির লোকেদের থেকেই পালিয়ে রইল না, আমাদের দফতরের লোকজন থেকেও পালিয়ে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ রানার বাবা মারা গেলেন। দীপক সেই সুযোগটা নিল। রানার বাবা মারা যাওয়ার পর দীপকের কাছে খবর এল, রানা কংগ্রেসের সদর দফতরে আশ্রয় নিয়েছে। রানা তার বাবা মার একই ছেলে। সুতরাং হিন্দুমতে রানাই তার বাবার শ্রাদ্ধ করবে। শ্রাদ্ধের আগের দিন রানা 'ঘাট কাজ' অর্থাৎ চুল দাড়ি ফেলে, ধরা ছেড়ে, 'শুদ্ধ' হবে। ওই ‘ঘাট কাজের জন্য রানা গঙ্গার ধারে যাবে।

দীপক রবি, সমীর, স্বদেশ, স্বরাজকে নিয়ে কটা গাড়িতে কংগ্রেসের সদর দফতরের চারপাশে ভোরবেলায় ওত পেতে বসে রইল। কারণ রানা যে ভোরবেলাতেই ‘ঘাট কাজটা চুপচাপ সেরে আসবে, এ ব্যাপারে মোটামুটি একটা অনুমান দীপকরা করেছিল।

দীপকদের অনুমানই ঠিক। রানা তার এক সঙ্গীকে নিয়ে গঙ্গার দিকে যাওয়ার জন্য ভোরবেলাতেই বের হল। এবং ওদের হাতে গ্রেফতার হল। রানাকে ওরা লালবাজারে নিয়ে এল। রানার গ্রেফতারে সফি সাহেব খুব খুশি হলেন।

পরদিন রানার বাবার শ্রাদ্ধ। রানা দীপকদের অনুরোধ করল ওই ‘কাজটা করার জন্য তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সফি সাহেব তো কিছুতেই রাজি নন, কিন্তু দীপকের

পীড়াপীড়িতে তিনি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রানাকে নিয়ে বিরাট এক পুলিশ বাহিনী তার কসবার বাড়িতে গেল, এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে রানাকে নিয়ে তারা ফিরে এল।

মাস ছয়েক পর রানা জামিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে কিন্তু কসবায় গেল না। সে সেই কংগ্রেসের অফিসেই থাকতে শুরু করল। কিন্তু সে প্রতিদিন বিকেলে ন'নম্বর সরকারি বাসে গোলপার্কে যেত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। আড্ডা শেষে রাতে আবার ফিরে আসত তার আশ্রয়স্থলে। গোলপার্কে গেলেও সি.পি.আই (এম)-এর স্বপনদের ভয়ে সে কসবায় যেত না। এভাবেই সে কয়েকমাস কাটিয়ে দিল।

একদিন বিকেলে সে প্রতিদিনের মতো ন'নম্বর দোতলা বাসের ওপরে উঠে সামনের দিকের একটা সিটে বসল। যাবে সেই গোলপার্কে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। ভবানীপুরের নর্দার্ন পার্কে চলছিল সি.পি.আই (এম) পার্টির যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফের সম্মেলন। ন'নম্বর বাসটা যখন ওই স্টপে এল, বাসে হুড়মুড়িয়ে উঠল সম্মেলন থেকে ফেরা বহু সি.পি.আই (এম) ক্যাডার। বাসের একতলা মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি, দোতলাতেও উঠল অনেকে। বাস ওই স্টপ ছাড়তেই একজন দেখে নিয়েছে, চিরশত্রু রানা দোতলার সামনের সিটে বসে আছে। তারপর ফিসফিস। কানে কানে একতলার সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডারদের কাছে পৌঁছে গেল সেই খবর। নিচ থেকে একইভাবে এল এক বার্তা। বাস যখন শরৎ বসু রোড ও সাদার্ন অ্যাভিনিউর মোড়ে দাঁড়াল, শুরু হল নির্দেশ অনুযায়ী কাজ।

সি.পি.আই (এম)-এর ক্যাডাররা বাস দাঁড় করিয়ে রানাকে টানতে টানতে রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে এল। বাস ছেড়ে দিল। ওরা একটা ট্যাক্সি ধরে রানাকে তাতে তুলে কসবার দিকে নিয়ে চলল।

বাসে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন রানার সহযাত্রী। তিনি রানাকে চিনতেনও না। তিনি সি.পি.আই (এম) ক্যাডারদের ওইরকম একটা কাণ্ড দেখে বাস থেকে নেমে সোজা চলে গেলেন টালিগঞ্জ থানায়। এবং থানায় গিয়ে পুরো ঘটনার ইজাহার লেখালেন।

কসবায় তখন সি.পি.আই (এম)-এর জঙ্গি বাহিনীর একচ্ছত্র অধিপতি ছিল স্বপন চক্রবর্তী। সে তো রানাকে দেখে উল্লাসে ডগমগ। একটা বাড়িতে তারা প্রথমে রানাকে আটকে রাখল। রানা অনেক কাকুতি মিনতি করে ওকে ছেড়ে দিতে বলল। ছাড়ল না। ছাড়বে কি? সামনে খাবার, ক্ষুধার্ত হায়না কি তা ছেড়ে চলে যাবে? রাত আটটার সময় তারা রানাকে নিয়ে গেল বোসপুকুরের মাঠে। সেখানে স্বপন তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে রানাকে ইঁট দিয়ে মুখ থেঁতলে, বুকের পাঁজরের হাড় গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভেঙে খুন করল। রানার চিৎকার এতক্ষণ বোসপুকুরের আশপাশের লোক শুনছিল। সেটা থেমে গেল।

রাত ন'টা নাগাদ স্বপনরা এল রানার বাড়ি। সেখানে থাকে রানার মা ও তিন বোন। স্বপন রানার বোনেদের বলল, "আজ একটা বড় কাজ করেছি, তাই ভালভাবে মস্তি করব, একশ টাকা দে।" তারা স্বপনকে প্রশ্ন করল, "কি বড় কাজ করেছিস রে, স্বপনদা?" "আগে টাকাটা দে, তারপর বলছি।" স্বপন খুশিতে হেসে উঠে বলল। ওরা স্বপনকে একশ টাকার একটা নোট দিল। স্বপনকে ওরা চটাতে চায় না। কসবায় থাকতে গেলে স্বপনদের কেউ চটাবে না। তাই যখন স্বপন 'কাজ' করে এসে টাকা চায়, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ পঁচিশ টাকা করে হাতে তুলে দেয়। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম, একেবারে একশ টাকা স্বপন চাইল। স্বপন একশ টাকা নিয়ে চলে যেতে যেতে হাসতে হাসতে ওদের বলল, "যা, বোসপুকুর মাঠে বড় কাজের নমুনাটা দেখে আয়, চিনতে হয়ত পারবি তোরা, না চিনলে বলিস, আমরা গিয়ে রানাকে চিনিয়ে দিয়ে আসব।"

স্বপনের কথা শুনে, ব্যাপারটা কী সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে রানার বোনেদের দু'এক মিনিট সময় লাগল। তারপর তীব্র চিৎকার করতে করতে তারা বোসপুকুরের দিকে দিল ছুট। তারা পৌছনোর আগেই সেখানে কসবা থানার পুলিশ এসে গেছে। পুলিশ যখন রানার লাশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তখন পৌঁছল, ওরা রানাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারল না। রানার মুখের

ওপর ইঁটের ঘা দিয়ে দিয়ে স্বপনরা এমন বিকৃত করে দিয়েছে যে, যে বোনেরা ওর সঙ্গে বড় হয়েছে, তারাই তাকে চিনতে পারল না। তারপর তারা জামাকাপড় দেখে ও হাত পা দেখে চিনল। কসবা থানার পুলিশ রানার লাশ নিয়ে চলে গেল।

কসবা থানার তৎপরতা দেখে এটা পরিষ্কার যে, রানা খুন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের খুনির লোকজনই খবর দিয়ে দিয়েছিল যাতে লাশ তারা তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে পারে এবং একটা খুনের মামলা রজু করে। রানাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশ এলাকায় আর খুন করা হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এলাকায়। কলকাতা পুলিশের তরফে যদি কিডন্যাপের অনুসন্ধান করতে করতে রানার খুন হওয়ার ঘটনা আবিষ্কার করে তবে তারাই ডমামলা নিতে পারবে। আর তার আগেই যদি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আওতায় কসবা থানা খুনের মামলা শুরু করে দেয়, তখন কলকাতা পুলিশ আর কিছু করতে পারবে না। কারণ একটা খুনের জন্য তো দু'টো মামলা হবে না।ন

স্বপনদের এই কায়দাই সফল হল। টালিগঞ্জ থানা থেকে কিডন্যাপের অনুসন্ধানও হয়েছিল। আমাদের বিভাগে রানার বোনেরা বহুবার এসে রানার হত্যা বিষয়ে তদন্ত ও মামলা যেন আমরা করি তার জন্য দরবার করছিল। কিন্তু তা তো হয় না। আইনের গণ্ডিতে আমরা অচল। ফলে হত্যাকারীরা পার পেয়ে গেল।

হাতকাটা দেবাও খুন হয়ে গেল। একটা হাত শ্যামলদের হাতে উড়ে যেতে দেবা চুপচাপ হয়ে যায় এবং বাহাত্তর সাল থেকে কসবায় ফিরে বাড়িতে থাকতে শুরু করে। সে একটা বাস বার করে সেই ব্যবসা নিয়ে থাকে আর বাড়ির কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারে।

যেদিন দেবা খুন হল সেদিনও সন্ধেবেলায় সে ওই দোকানে বসে গল্পগুজব করছিল। হঠাৎ সেখানে স্বপনদের আগমন এবং বোমার আক্রমণ। বোমার আঘাতে দেবা ছত্রখান হয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপনরা 'কাজ' করে চলে গেল। দেবার ভাই দেবাকে নিয়ে ছুটল রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে। দেবা নকশালদের বোমাতে বেঁচে গেলেও সি.পি.আই (এম)-এর বোমাতে বাঁচল না। বিপ্লব বোধহয় এবার কিছুটা এগিয়ে গেল!

বিপ্লবের অধিনায়করা বিপ্লবের নামে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। বিপ্লবের অগ্রগতি কতদূর হল একমাত্র তারাই জানে! হ্যাঁ, দুচারটে দেবা দত্ত খুন হয়ে গেলে দেশেব কিছু যায় আসে না। কিন্তু যেসব শিক্ষিত, ভদ্র তরুণ তাদের নির্দেশে রক্ত ঝরিয়ে জীবন দিয়ে চলে গেল, তাদের দায়িত্ব তারা কেন নিল না? বিপ্লবের দিকনির্দেশের জন্য পরস্পরের মধ্যে হানাহানি বাঁধিয়ে যারা পথ খুঁজেছিল, তারা এখন কি পথ খুঁজে পেয়েছে? তাদের মধ্যে দু'লাইনের লড়াইতে কে জিতল কে হারল তা তারাই জানে ৷ কিন্তু অনেকেই জানে না দু'লাইনেব লড়াইয়ের অন্ধকারে কী কী ঘটনা নিঃশব্দে ঘটে গেছে। যেমন জানে না, নকশালদের মধ্যে যখন দু'লাইনের তীব্র লড়াই চলছে, তখনই একাত্তরের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এক সন্ধ্যায় চারুবাবুর লাইনের সবচেয়ে বড় সমর্থক সরোজ দত্তকে শেষ দেখা গিয়েছিল দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীর সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার মিন্টো পার্ক থেকে বেরিয়ে রাজা বসন্ত রায় রোড পর্যন্ত। এরপর নভেম্বরে দেওঘরে দীপাঞ্জন ও অসীম চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে আমাদের হাতে গ্রেফতার হয়। অসীম প্রায় সাত বছর বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলে আটক থাকলেও দীপাঞ্জন তার উচ্চ ক্ষমতাসীন আত্মীয়দের দ্বারা সরকারকে প্রভাবিত করে মুক্তি পেয়ে সোজা চলে যায় বিদেশে। পেছনে পড়ে থাকে তার "বিপ্লব" এবং সহযোদ্ধাদের রক্ত।

বিপ্লবের বাঁশি বাজিয়ে দীপাঞ্জনের মতো অনেকেই মাঝপথে সহযোগীদের ছেড়ে চলে গেছে। হয়ত তারা ভেবেছে, তাদের 'বিপ্লব' শেষ! কিন্তু তাদের জন্য যারা মৃত্যুবরণ করল, তাদের দায়িত্ব নেবে কে? ইতিহাস কী বলে? চারুবাবু তাদের বলেছিলেন, "কোনও মৃত্যুই ব্যর্থ হয় না।" সেই কথাটাই অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, চারুবাবুর মতাদর্শের অনুগামী নকশালদের মৃত্যুও ব্যর্থ হয়নি! কারণ তারা আরও একবার ইতিহাসের সেই সত্যতা প্রমাণ

করে গেছে যে, সন্ত্রাসবাদ দ্বারা একটা দেশের সমাজকে পাল্টানো যায় না। বরং তা পাল্টানোর প্রক্রিয়াকে আরও পিছিয়ে দেয়। পুলিশি জীবনে কতরকম ঘাত-প্রতিঘাত আর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অজানা পথের সন্ধানে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের আবর্তে নিজেকে কেউ পারে আরও অভিজ্ঞ করে তুলতে, কেউ পারে না। জীবনযুদ্ধে হারা কিংবা জেতা নির্ভর করে অভিজ্ঞতা অর্জন ও তাকে সময় মতো প্রয়োগ করার দক্ষতার ওপর।

পুলিশি তদন্তের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনও কিছু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে তদন্তে পিছিয়ে পড়তে হবে।

আশির দশকের শেষ দিকে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেকগুলো নতুন নতুন ডাকাতির দল তৈরি হয়েছিল। তারা আমাদের কলকাতা অঞ্চল থেকে অন্যান্য এলাকাতেই বেশি ডাকাতি করে বেড়াত। তবে মাঝে মধ্যে কলকাতাতেও ডাকাতি করত।

এইসব ডাকাতদলগুলোকে আমরা গ্রেফতার করতে পারলেও, বহুদিন ধরে চুরাশি সালের ফেব্রুয়ারিতে সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউর ব্যাঙ্ক অফ বরোদাতে ডাকাতি করা দলের কোনও কিনারা করতে পারিনি। পারিনি পঁচাশির অক্টোবরে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের বাগবাজার ব্রাঞ্চের ডাকাতির কোনও হদিস করতে। পারিনি ছিয়াশি সালের সেপ্টেম্বরে মে ফেয়ার রোডের ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডাকাতির দলকে ধরতে।

অন্য দলগুলোকে ধরার যা কৃতিত্ব, তা এই ডাকাতিগুলোর কোনও কূলকিনারা করতে না পারার জন্য ধূলিসাৎ। সফি সাহেব তখন 'আমাদের ডিসি ডিডি। তিনি প্রতিদিনই আমাদের এই ডাকাতিগুলোর হদিস করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার ডাকাতির পর প্রায় চার বছর পার হয়ে যাচ্ছে, এমন কোনও সূত্র পাচ্ছি না যে ডাকাতদের চিহ্নিত করতে পারি। আরও দুটো ডাকাপর পর হয়ে গেছে, যার হদিস পাইনি।

চুল ছিঁড়ে ফেলার অবস্থা। কোন দিকে যাই, কোথায় পাই? ওই ডাকাতদের খবরের জন্য কলকাতা ও তি করতে পারে আর আশেপাশে পুরনো ডাকাতদের ধরে ধরে নিয়ে এসে সবরকমভাবে জেরাটেরা করেছি। কিন্তু বৃথা। একটা বিষয় নিশ্চিত, ডাকাতদলটা নতুন। এই নতুন দলটা এমন কোনও লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না যারা পেশাদার এবং ঘুঘু অপরাধী। পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক থাকলে আমরা তাদের পেয়ে যেতাম।

কারা এরা? ষাটের দশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব ডাকাতদল তৈরি হয়েছিল, তেমন কি? আমাদের চিন্তার মধ্যে তাও আছে। কিন্তু দ্বিধা। কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশে ডাকাতি করার মতো যে পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার প্রয়োজন, আশির দশকের মাঝখান থেকে তেমন কিছু ছিল না। আশির দশকে কলকাতায় যে ষোলটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে, তার বারোটার ডাকাতদলকে আমরা গ্রেফতার করেছি। একটা ক্ষেত্রেও কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাকাতি সংঘটিত হয়নি।

আমাদের ডাকাতি নিরোধক সেলের প্রত্যেক অফিসার ও কনস্টেবল ছিল কর্মঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত। যেখানে যা কিছু খবর পেত তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এসে জানাত। কনস্টেবল ধীরেন গুহঠাকুরতা ছিল দারুণ সক্রিয়। ধীরেনকে তার নামে লালবাজারে কেউ চিনত না। তার নাম হয়ে গিয়েছিল কালা ডিডি। কালো, রোগা, লম্বা কালা ডিডির চোখ সবসময়ই বিভিন্ন ধান্দায় ঘুরে বেড়াত। কান থাকত সজাগ আর মেছো বকের মতো ঘাড় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত । এমন কোনও এক কি দুনম্বরী জায়গা ছিল না যে তার নীরব গতিবিধি ছিল না। তা যে সব সময় আমাদের প্রয়োজনে তা একেবারেই নয়। ধূর্ত কালা ডিডির অসাধ্য কোনও কাজ ছিল না। সে ছোটখাটো অপরাধী থেকে শুরু করে বহুরকম লোকের থেকেই ভয় দেখিয়ে টাকা উসুল করে পকেটে নিঃশব্দে ঢুকিয়ে নিত। যে খবর আমাদের কানে অনেক সময়ই এসে পৌঁছত। কিন্তু ওর দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন না থাকাতে আমরা সেই সব ব্যাপারে কিছুটা চোখ বুজেই থাকতাম।

একবার উল্টোডাঙা দিয়ে ভোরবেলায় আমি গাড়ি নিয়ে ফিরছি, সঙ্গে রাজকুমারসহ আরও তিনজন অফিসার। দূর থেকে রাজকুমারই দেখে উল্টোডাঙা রেললাইনের পাশে একটা চটের বস্তার ওপর কালা ডিডি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে আরও গোটা তিনেক একইরকম

ভর্তি বস্তা। ওকে দেখেই রাজকুমার বলে উঠল, "আরে কালা ডিডি না? ওখানে কী করছে?" রাজকুমারের কথায় তার দৃষ্টি ধরে আমরাও ওকে দেখলাম। কালা ডিডি কিন্তু আমাদের দেখেনি। সে বস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যেমন এদিক ওদিক দেখছিল, তেমনই দেখে যাচ্ছে।

গাড়ি দাঁড় করালাম। গাড়ি থেকে রাজকুমার নেমে ওর দিকে এগিয়ে গেল। রাজকুমার কিছুটা হাঁটতেই কালা ডিডি ওকে দেখে ফেলে প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেল, বস্তা থেকে নেমে হাসতে হাসতে রাজকুমারের দিকে এগিয়ে এল। ওই ভোরবেলায় রাজকুমারকে ওখানে দেখতে পাবে তা কালা ডিডি ভাবতেই পারেনি, তাই প্রথমে একটু অবাক হয়েই সেটা সঙ্গে সঙ্গে সামলে, স্মার্টলি এগিয়ে আসতে থাকে। আমরা দূর থেকে দেখছি।

আরও খানিকটা আসার পর সে আমাদের দেখেও ফেলল। রাজকুমারের কাছে আসতেই, রাজকুমার ওকে প্রশ্ন করল, "ওখানে কি করছিলি?" কালা ডিডি একটুও না ঘাবড়িয়ে বলল, "এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম।" রাজকুমার এবার বলল, "চল, স্যার ডাকছে।" রাজকুমার কালা ডিডিকে নিয়ে আমার সামনে হাজির। আমি কিছু বলার আগেই রাজকুমার আমাকে বলল, "স্যার, ও না কি এমনি এমনি ওখানে দাঁড়িয়েছিল।" কালা ডিডি রাজকুমারের কথায় এই প্রথম একটু লজ্জা পেল। বললাম, "কি রে তোর কি ওখানে মর্নিং ওয়াক হচ্ছিল?" কালা ডিডি বলল, "না স্যার, পাহারা দিচ্ছিলাম। ওই মাল নিতে এলে, আমি একটা খবর পাব।"

ওর কথা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, "আর খবরের দরকার নেই, বাড়ি যা।" আমরা আর দাঁড়ালাম না, গাড়ি নিয়ে লালবাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। আমরা তো বুঝেই গেছি, কালা ডিডি ওখানে কী করছে। বুঝে গেছি, ওয়াগন ব্রেকারদের চোরাই বস্তার ওপর সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কখন ওরা এসে ওই বস্তাগুলো সরাবে, তখন সে তাদের থেকে টাকার ভাগ আদায় করবে।

এই কালা ডিডিই সাতাশি সালের মে মাসের মাঝামাঝি একদিন খবর আনল, উল্টোডাঙা ব্রিজের তলায় বিশুর চোলাই মদের ঠেকে দিন তিনেক আগে সকাল এগারটা নাগাদ ক'টা ছেলে মদ খেতে এসেছিল। তারা ওখানে মদ ও শোল মাছ পোড়া, মাংসের ছাঁটের চাট খেয়েছে। তারপর বিশুকে যখন মদ ও চাটের মোট দাম সাতাশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা দিতে যায়, তখন একটা ছেলে একটা একশ টাকার বাণ্ডিল বার করে তার থেকে একটা নোট বিশুকে দেয়। বিশু এতে আশ্চর্য হয়ে যায় কারণ চোলাই মদের দোকানে কেউ একশ টাকার নোটের বাণ্ডিল নিয়ে আসে না। তার অনেকগুলো কারণও আছে। প্রথমত, যারা চোলাই মদ খায় তারা গরিব রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, দিনমজুর ও বেকার ছেলে। তারা কেউ একসঙ্গে এত টাকা পায় না। তাছাড়া চোলাই মদের ঠেকে যখন তখন পুলিশ আবগারির লোকেরা হানা দিতে পারে। তখন তারা খদ্দেরদের ধরে নিয়ে গেলে তাদের পকেট থেকে যা টাকা পয়সা পাবে তা নিয়ে নেওয়ার একশ ভাগ আশঙ্কা থাকে। তাই ওই ছেলেটা এত টাকা নিয়ে আসায় বিশুর আশ্চর্য লেগেছে। সেই আশ্চর্য হওয়ার কথাই সে কালা ডিডিকে বলে, কালা ডিডিও এই অস্বাভাবিক ঘটনার কথা আমাদের জানায়। আমরা ওর খবরে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে ফেলে রাখলাম। কিন্তু আমরা ওই তিনটে ডাকাতির দলকে ধরার জন্য এতই উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলাম যে সব খবরের সূত্রকেই যাচাই করার জন্য তদন্ত করতাম। বিশু যখন কালা ডিডিকে খবরটা দিয়েছিল, তার ক'দিন আগেই সল্ট লেকের ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল। তার মানে ওই মাতালগুলোর সঙ্গে ওই ডাকাতির কোনও সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।

যেহেতু সল্ট লেক এলাকাটা আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না, তাই ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডাকাতি নিয়ে আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। তবু যদি ওই ব্যাপারে কিছু সূত্র পাই, তাহলে উল্টেপাল্টে দেখতে দোষ কী? আর সুতো ধরে ধরে আরও নতুন জায়গায় যে পৌঁছন যায়, তা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভালভাবেই জানি।

কালা ডিডিকে দিয়ে উল্টোডাঙা থেকে বিশুকে ডাকিয়ে আনলাম। বিশু তো আমাদের দফতরে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। বললাম, "তোর ভয় নেই, তোকে আমরা কিছু বলব না। যেমন চোলাই মদের ঠেক চালাচ্ছিস, তেমনই চালা। শুধু কালাকে যে কথাগুলো বলেছিস, সেগুলো আবার আমাদের বল।" বিশু এবার কাঁপতে কাঁপতে তোতলাতে তোতলাতে বলল, "স্যার, সেদিন ছিল রোববার। অন্যদিনের চাইতে রোববার সকালে ঠেকে একটু বেশি ভিড় হয়। ভোরবেলার বাজারে লোকজনের ভিড় কমে গেলেই ন'টা দশটা থেকে আস্তে আস্তে লোক আসতে শুরু করে। তাই শনিবার রাতেই আমি বেশি করে চাট বানিয়ে রাখি।" প্রশ্ন করলাম, "তুই মদও দিস, চাটও বিক্রি করিস একই সঙ্গে?" বিশু বলল, "হ্যাঁ স্যার, আমার ঠেকটা একটু ভেতরে, তাই ওখান থেকে মদ নিয়ে আর কেউ বাইরে গিয়ে চাট খেয়ে আসে না। ওখানেই মদ দিয়ে চাট খেতে খেতে সবাই নিজেদের মধ্যে গল্প করে।" ওকে থামিয়ে বললাম, "আমার এত জানার দরকার নেই। শুধু সেদিনের কথাটা বল।" বিশু তার লাল টকটকে চোখ নিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে ওর পাশে দাঁড়ান কালা ডিডিকে দেখল। কালা ডিডি ওকে বলল, "ভয় নেই, স্যারকে সব বল। যা আমায় বলেছিস।" কালা ডিডির কথায় ওর একটু সাহস হল কারণ কালা ওর থেকে মাসকাবারী নেয়।

বিশু বলল, "স্যার, সেদিন রোববার হলেও ভিড় বেশি ছিল না। মাত্র ছ'সাত জন ছিল। ওরাও খেয়ে চলে গেল। আমি ফাঁকাই বসে ছিলাম।" প্রশ্ন করলাম, "তখন ক'টা বাজে?" বলল, "এগারটা ফেগারটা হবে।" বললাম, "বলে যা।" বিশু ঢোক গিলে বলতে শুরু করল, "ওরা স্যার চারজন ছিল, এর মধ্যে দু'জন আমার ঠেকে মাঝেমধ্যে আসে।" জানতে চাইলাম, "তার মানে তুই ওই দুজনকে চিনিস?" বিশু মাথা নেড়ে বলল, "একজনকে ভালভাবে চিনি।" প্রশ্ন করলাম, "সেই ছেলেটা কোথায় থাকে?" বিশু জানাল, "আমাদের ওখানেই।" বললাম, "তারপর বল।" আবার সে বলতে শুরু করল, "চাট নিল শোল মাছ পোড়া, মাংসের ঝাল। "

খেতে খেতে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল, সবাই যেমন বলে। তবে সবাই চিৎকার করে বলে, আর ওরা কোন কথাই চিৎকার করে বলছিল না। আমি ভাবলাম, ভদ্রঘরের ছেলে, তাই ওরা অন্য লোকের মতো মাল খেয়ে জোরে জোরে কথা বলছে না।" এবার আমি জানতে চাইলাম, "ভদ্রঘরের ছেলে যে কী করে বুঝলি?" বিশুর ভয় অনেকটা কেটে গেছে। সে বেশ জোরগলাতেই বলল, "স্যার, জামাকাপড় সব ভাল পরেছিল, আর চেহারার মধ্যেও।" ওকে থামিয়ে বললাম, "ঠিক আছে, তারপর?"

বিশু আবার বলতে শুরু করল, "স্যার, ওরা মাঝেমাঝে এমন ফিসফিসিয়ে কথা বলছিল যে, আমিও কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি ছাড়া আর তখন কেউ ছিলও না। ওরা এমনভাবে কথা বলছিল যে আমি যেন শুনতে না পাই।" জানতে চাইলাম, "কোনও কথাই শুনতে পাসনি?" বিশু বলল, "না স্যার, শুধু খালি ওই কাজটা, এই কাজটা শুনতে পেয়েছি।" বললাম, "আর কী করছিল?" বিশু জানাল, "এই কাজটা ওই কাজটা যখন বলছিল, তখন হাতের ইশারায় একবার কলকাতার দিকে, একবার উল্টোডাঙা মোড়ের দিকে দেখাচ্ছিল।" বললাম, "ঠিক আছে, তারপর?" বিশু বলল, ঘণ্টাখানেক ছিল। তিন বোতল খেল। তারপর আমায় ওদের একজন বলল, কত হয়েছে? বললাম, সাতাশ টাকা পঁচাত্তর। এবার অন্য একটা ছেলে, যাকে আগে আমি দেখিনি, সে একটা একশ টাকার বাণ্ডিল বার করে তার থেকে একটা নোট আমায় দিল। আমি স্যার অবাক হয়ে গেলাম। আমার ঠেকে তো কেউ এত টাকা নিয়ে আসে না। আসবে কেন? তারা তো স্যার বারে টারে যায়।"

হাতের ইশারায় আমি বিশুকে থামিয়ে জানতে চাইলাম, "যে ছেলেটা তোর ওখানে থাকে, তার বাড়ি চিনিস?" বিশু মাথা বাঁ দিকে কাত করে বলল, "হ্যাঁ জানি। ওর নাম বিমলে।" বললাম, "ঠিক আছে, তুই ওর বাড়িটা ধীরেনকে এখনই গিয়ে চিনিয়ে দে। আর একটা কথা মনে রাখিস, বিমলেকে কিন্তু কোনও কথা জানাবি না। তবে কিন্তু তোর ঠেকও চালাতে দেব না।" বিশু দুহাতে কান ধরে মাথা নেড়ে বলল, "সেটা স্যার আমাকে বলতে

হবে? আপনার হাত থেকে যে আমি বাঁচতে পারব না, সেটা জানি স্যার।"

কালা ডিডি ওরফে ধীরেন ওকে নিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। একবার ভাবছি, দশ হাজার টাকার বাণ্ডিল নিয়ে ওই ছেলেগুলো চোলাই খেতে যাবে কেন? ওরা তো ভাল বারে গিয়ে ভাল মদ খেতে পারত। আবার ভাবছি, চোলাই খাওয়া যাদের অভ্যাস, শুনেছি তারা নাকি সেটা খেতেই বেশি পছন্দ করে। অর্থাৎ এদের হাতে হঠাৎ টাকা আসায় অভ্যাসের দাস হয়ে সেই চোলাই খেতেই এসেছে। আর একটা ব্যাপারও আছে, যাদের কাছে হঠাৎ টাকা আসে, তারা ওইভাবে টাকা প্রদর্শন করতে ভালবাসে। তারা নিজেদের গুরুত্ব অন্যের চোখে বাড়াতে আশেপাশের লোকেদের পকেটের টাকা দেখানোর লোভ সামলাতে পারে না। অর্থাৎ এদের পকেটে হঠাৎ অল্প পরিশ্রমে বেশি টাকা এসেছে। কিন্তু কোথা থেকে এই টাকাটা এসেছে? সেটা কি কোনও ডাকাতির টাকা? সেটাই দেখতে হবে।

কালা ডিডি সন্ধেবেলায় উল্টোডাঙা থেকে বিমলের বাড়ি চিনে ফিরে এল। সেদিনই রাতে আমি রাজকুমার, প্রতাপদের পাঠালাম সঙ্গে কালা ডিডি ও অন্যান্য কনস্টেবলদের একটা দল দিয়ে বিমলেকে ধরে নিয়ে আসার জন্য। রাজকুমাররা ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে বিমলেকে ধরে নিয়ে লালবাজারে ফিরে এল। চব্বিশ পঁচিশ বছরের রোগা পাতলা বিমলে যে গরিব ঘরের ছেলে, সেটা দেখেই বোঝা যায়। চোলাই খেয়ে খেয়ে রুক্ষ, চোয়াড়ে বিমলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে অভিব্যক্তিশূন্য। বললাম, "যা জিজ্ঞেস করব তা সোজাসুজি বলবি, নাকি তোকে ঝোলাতে হবে?" বিমলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না না, আপনি যা জানতে চাইবেন, আমি সব সত্যি বলব।" -

ওকে প্রথমেই ধসিয়ে দেওয়ার জন্য গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "চোলাই খাস?" বিমলে মাথা নেড়ে মুখ নিচু করে অস্ফুট গলায় বলল, "হ্যাঁ।" "বিশুর ঠেকে যাস?" জিজ্ঞেস করলাম। বিমলে এবারও আগের বারের মতো বলল, "হ্যাঁ।" এবার হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার মতো গলায় বললাম, "দিন পনের আগে বিশুর ঠেকে সকালবেলা আরও তিনজনের সঙ্গে মদ খেতে গিয়েছিলি?" বিমলে একটু চিন্তা করে বলল, "হ্যাঁ।" বললাম, "বাকি তিনজন কে কে ছিল?" বিমলে তাদের নাম বলল। এবার আমি সোজাসুজি জানতে চাইলাম, "সেদিন কে তোদের মদের দাম দিয়েছিল?" বিমলে জানাল, "মিন্টে।" জানতে চাইলাম, "কোথায় থাকে, কী করে?" বিমলে বলল, "স্যার, মিন্টে থাকে কাঁকুড়গাছি। আর ছোটখাট কী ব্যবসা করে একটা, আমি জানি না।" চিৎকার করে বললাম, "জানিস।" আমার চিৎকারে বিমলে কেঁপে গিয়ে কেঁদে ফেলে বলল, "সত্যিই জানি না।"

এবারও চিৎকার করে বললাম, "ওর পকেটে অত টাকা থাকে কী করে?" বিমলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ও বলছিল, একটা কি কাজ করে পেয়েছে। আমাদেরও এবার সঙ্গে নেবে।" বললাম, 'কী কাজ?" বিমলে বলল, "জানি না আমি।" রাজকুমার বলল, "মিন্টে এখন কোথায়? বাড়িতে আছে?" বিমলে জানাল, "না স্যার, মিন্টে ওর শ্বশুরবাড়ি গেছে।" জানতে চাইলাম, "শ্বশুরবাড়িটা কোথায়?" বিমলে বলল, "কাকদ্বীপ।" বললাম, "কবে ফিরবে?" বিমলে বলল, "শুক্রবার।" রাজকুমার বলল, "তার মানে এখনও দুদিন।"

এরপর মিন্টের বাড়িতে কে কে আছে জেনে বিমলেকে আমাদের সেন্ট্রাল লক আপে পাঠিয়ে দিলাম। সবে তো মাটি খোঁড়া শুরু হয়েছে। খুঁড়তে খুঁড়তে কোথায় গিয়ে ইতিহাসের কোন অংশ উদ্ধার করব, কে জানে? তবে বিমলের কথায় পরিষ্কার, মিন্টের সোজা রাস্তায় কোনও উপার্জন নেই, যা আছে তা বাঁকা। কিন্তু সেই উপায়টা কী? ডাকাতি, রাহাজানি, চোরাচালান? যাই হোক, উপার্জনটা মোটা অঙ্কেরই। নয়ত একসঙ্গে অত টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরত না।

সব প্রশ্নের উত্তর মিন্টেই দিতে পারবে। মিন্টে শুক্রবার ফিরবে। ফেরার পথে ওকে গ্রেফতার করার কথা চিন্তা করলাম। বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় রাজকুমার পাঁচজন

কনস্টেবলের একটা দল নিয়ে কাকদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করল। সঙ্গে বিমলে। সেই মিন্টেকে চিনিয়ে দিতে পারবে। কাকদ্বীপের কোন গ্রামে মিন্টের শ্বশুরবাড়ি, সেটা বিমলে বলতে পারেনি। তবে নামখানা থেকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে, সেটা সে মিন্টের কাছ থেকে শুনেছে। মিন্টে যে ডায়মন্ড হারবার হয়ে নামখানা, তারপর কাকদ্বীপে যায়, তাও একদিন সে বিমলেকে বলেছিল।

রাজকুমার ডায়মন্ড হারবারের বাস টার্মিনাসে মিন্টেকে নিয়ে ঘাঁটি গাড়ল। নামখানার দিক থেকে যে কোনও বাস আসছে, রাজকুমার বিমলেকে নিয়ে সেইসব বাসের যাত্রীদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। সকাল গড়িয়ে সন্ধে, মিন্টে এল না। নামখানার ওদিক থেকে আর সে রাতে বাস আসবে না। বাস সার্ভিস শুরু হবে আবার আগামিকাল ভোর থেকে। আগামিকাল মানে শুক্রবার। মিন্টের আসার দিন। রাজকুমার কলকাতায় না ফিরে ডায়মন্ড হারবারের একটা হোটেলে রাত্রে সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরের প্রথম বাসের ওপর থেকে নজর রাখা শুরু করতে পারবে।

শুক্রবার ভোর। রাজকুমারের পাশে বিমলে, একজন কনস্টেবল, আরও তিনজন। প্রথম বাস হু হু করে এসে দাঁড়াল। যাত্রী কম। মালপত্তর অনেক। চালের বস্তা থেকে ডাব, কি নামল না? রাজকুমাররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বাস ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। রাজকুমাররা ঘুরে টার্মিনাসের চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেতে শুরু করল। পরবর্তী বাসের অপেক্ষা। আধঘণ্টা পার। বাস এল। একই দৃশ্য। মিন্টে নেই। চোলাইখোর জামাই শ্বশুরবাড়ির আদর খাচ্ছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামে চোলাই মদের আখড়া। মিন্টের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাজকুমার প্রায় দু'দিন বিমলেকে নিয়ে কাটানোর মধ্যে ওকে ওর একেবারে চেলা বানিয়ে ফেলেছে। ফলে কথায় কথায় বিমলের থেকে জেনে নিয়েছে যে মিন্টের গতিবিধি শুধু সন্দেহজনকই নয়, কোথায় কী ব্যবসা করে তাও কাউকে কোনওদিন জানায়নি। সে মাঝে মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায় এবং ফিরে আসার পর তার পকেটে থাকে মোটা টাকা। তখন বিমলেদের সঙ্গে দেখা হলে দেদার খরচ করে, খাওয়ায়।

দিন যায়। একটার পর একটা বাস পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণপ্রান্ত থেকে আসছে। রাজকুমাররা দেখছে। কিন্তু মিন্টের টিকিও দেখা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যে। রাজকুমার হতাশ। মিন্টে শেষ বাসেও এল না। তার মানে সে কবে ফিরবে ঠিক নেই। বা অন্যদিক দিয়ে ফিরেছে। রাজকুমার কলকাতার দিকে রওয়ানা দিল।

লালবাজারে ফিরে রাজকুমার বিষন্ন মুখে আমাদের দফতরে, আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি হাসলাম। বললাম, "পাস নি তো?" রাজকুমার মাথা নাড়ল। ওর মাথা নাড়ার মধ্যেও হতাশা ঝরে পড়ল। আসলে তখন আমরা ওই ডাকাতিগুলোর কিনারা করার জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম যে, হাতড়ে হাতড়ে যা কিছু তোলার চেষ্টা করছি, সেটা না পেলেই হতাশা গ্রাস করছিল।

রাজকুমারকে বললাম, "মিন্টের সম্পর্কে আরও খবর আমি জোগাড় করে রেখেছি। শোন, ওর আসল নাম মিন্টু দত্ত। পাড়ার লোকেরাও জানে না, ও কী করে। এবং মাঝেমধ্যেই বলে কাকদ্বীপের অক্ষয়নগরে ওর শ্বশুর সুবোধ বেরার বাড়িতে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে মিন্টে যায় না। অন্যখানে যায়। এবারও হয়ত তাই গিয়েছে। শোন, কাল রাতে ওর কাঁকুড়গাছির বাড়িতে রেড কর। ইতিমধ্যে মিন্টে, ফিরে আসতে পারে। একটা দিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

একটা দিন চলে গেল। শনিবার রাতে পাঁচটা ভ্যান, দুটো গাড়ি নিয়ে একটা বিরাট বাহিনীকে মিন্টের বাড়িতে হানা দিতে পাঠালাম। এত বড় বাহিনী পাঠানোর উদ্দেশ্যটা আমি আমার অফিসারদের বুঝিয়ে দিয়েছি।

রাত এগারটা। আমাদের বাহিনী আটচল্লিশ নম্বর কাঁকুড়গাছি রোডে মিন্টের বাড়ি ঘিরে

ফেলল। মিন্টে যথারীতি বাড়িতে নেই। একই উত্তর। "শ্বশুরবাড়ি গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই।" ওকথা বলে পার পাওয়া যে যাবে না তা মিন্টের বাড়ির লোক বোঝেনি। আমার নির্দেশ মতো আমাদের বাহিনী মিন্টের পরিবারের সব সদস্য ও ওর বাড়ির আশেপাশে থাকা ওদের আত্মীয়স্বজনকে ভ্যানে তুলে লালবাজারে নিয়ে এল। প্রায় পঞ্চাশ জন। এদের থেকে মিন্টের খবর বার করতে হবে। জানি, এরা প্রত্যেকেই যে মিন্টের খবর জানবে তা নয়। দু'একজন জানতে পারে। কিন্তু বাকিদেরও তুলে আনলাম যাতে মিন্টের কাছে কোনও আগাম খবর না যায় এবং মিন্টের জন্যই যে ওখানে আমরা হানা দিয়েছি, সেই বিষয়টা মিন্টে চট করে বুঝতে না পারে। ওটা অপরাধীর চিন্তা গুলিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি।

ধৃত প্রত্যেককেই সেন্ট্রাল লক আপে পাঠিয়ে দিলাম। পরে ছেড়ে দেব। কিন্তু ভয় পাইয়ে ওদের থেকে মিন্টের খবর বার করার জন্য এরকম একটা কৌশল নিলাম। সেদিন রাতে আমরা ওদের থেকে ক'জনকে নির্দিষ্ট করলাম, যাদের পরদিন সকালেই আলাদা আলাদা ঘরে জেরা করতে শুরু করব।

পরদিন সকাল। পঞ্চাশজন থেকে মাত্র পাঁচজনকে আমরা জেরা করতে শুরু করলাম। মিনিট দশেকের মধ্যেই পরিষ্কার, বাড়ির লোকজন এবং আত্মীয়স্বজন কেউ জানে না, মিন্টে কী করে, কোথা থেকে তার রোজগার হয়। তার গতিবিধি সম্পর্কেও কেউ ওয়াকিবহাল নয়। পাঁচজনের থেকে আমরা একজনকে বেছে নিলাম। সে মিন্টের ছোট ভাই। সে জানাল, "রতন নামে মিন্টের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে, বহুদিন রাতও কাটিয়েছে।"

জানতে চাইলাম, "ওই রতন কোথায় থাকে?" মিন্টের ভাই বলল, "মধ্যমগ্রামের চৌমাথা।" বললাম, "বাড়ি চিনিস?" মিন্টের ভাই বলল. "হ্যাঁ।"-

মিন্টের ভাইকে নিয়ে রাজকুমার, অনিল ও প্রতাপ ক'জন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে মধ্যমগ্রামের দিকে চলে গেল। আমি মিন্টের বাড়ির অন্য লোকজন ও আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে দিলাম। মিন্টের ভাইকে দিয়ে যা হবার হবে, বাকিদের অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ কী? .

ওরা লালবাজার থেকে চলে যেতেই আকাশ কালো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। দফতরে বসে আছি। রাজকুমারদের পাঠিয়েছি কাদা ঘেঁটে কোনও পাঁকাল মাছ পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধানে। সেই পাঁকাল মাছটা কোন গর্তের, তার ওপর নির্ভর করছে আমাদের পুরো পরিশ্রমের ফল। কিন্তু মনেপ্রাণে একটা গর্তেরই মাছ ধরতে চাইছি। সেটা ওই তিন ব্যাঙ্ক ডাকাতি। অন্য গর্তের পাঁকাল ধরা পড়লে কি ছেড়ে দেব? তা নয়। কিন্তু শিকারীরা তো তার একান্ত কাম্য শিকারটাই মারতে চায়। আমাদের অবস্থা ঠিক ওই রকমই। কারণ এই ডাকাতিগুলো নিয়ে আমরা এতই ব্যতিব্যস্ত যে ডাকাত দমনকারী হিসাবে আমাদের সুনামের সবটাই জলাঞ্জলি যেতে বসেছে। এর আগের ডাকাতিগুলোর কিনারা কোনটা করেছি ছ'মাসে, কোনটা বা তিন মাসে, এক মাসে, এমন কি একদিনে। আমরা কেবল কলকাতার ডাকাতির কিনারা নয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের এলাকার বহু ডাকাতির কিনারাও করে সেই সব ডাকাতদের গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। অথচ ওই তিনটে ডাকাতির অনুসন্ধানের ব্যাপারে কোনও অগ্রগতি করতে পারিনি।

এই সমস্যাটাই তখন আমাদের কাছে মূল। সেই মূলের সূত্র পেলেই আমরা সবচেয়ে খুশি হব। রাজকুমাররা সেই আশা নিয়েই মধ্যমগ্রাম গেছে। মধ্যমগ্রামের চৌমাথায় রতন দাসের বাড়িতে মিন্টের ভাই রাজকুমারদের নিয়ে গেল। সন্ধেবেলা রাজকুমাররা রতনকে পেয়ে গেল। রতনকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসে রাজকুমাররা প্রথমেই প্রশ্ন করল, "বল তোদের নেতার নাম কী?" রতন ওদের ধমকানিতে বলে ফেলল, "আমাদের নেতার নাম মামা। আসল নাম জানি না।"

প্রতাপ প্রশ্ন করল, "কোথায় থাকে?" রতন উত্তরে জানাল, "খড়দার বোসপাড়ায়।" "চিনিস?" প্রতাপের পাল্টা প্রশ্ন। রতন বলল, "হ।" "তবে চল।" রাজকুমারের নির্দেশে ওদের গাড়ি খড়দার দিকে ছুটল। গাড়িতেই আমাদের অফিসাররা জেনে নিয়েছে, রতনের সঙ্গে ওই

মামার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে মধ্যমগ্রামেই রতনের বাড়িতে। মামা রতনের কাছে এসেছিল।

অন্ধকারে গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে পারছে না ঝড়বৃষ্টির জন্য। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছগুলো ঝড়ের দাপটে এমনভাবে নাচছে যে গাড়ির ড্রাইভারকে সাবধানে চলতে হচ্ছে। ওইভাবে চলতে চলতে ওরা যখন মামার বোসপাড়ার বাড়িতে রতনকে নিয়ে পৌঁছল, তখনও বেশ রাত ঝড়বৃষ্টির জন্য রাজকুমাররা চাইছে কত তাড়াতাড়ি রাস্তাটা শেষ হয়। '

মামার বাড়িতে ছিল মামার বাবা নির্মল হালদার ও মামার ছোট ভাই। নিজেদের বাড়ি। রাজকুমারদের দরজা খুলে আপ্যায়ন করলেন নির্মলবাবুই। ঘরে ঢুকতেই প্রথমে রাজকুমারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সুন্দর ক'টা আঁকা ছবি। রাজকুমার ছবিগুলো দেখে নির্মলবাবুকে প্রশ্ন করল, "এগুলো কে এঁকেছে?" তিনি বললেন, "আমারা ছোট ছেলে।" সে পাশেই দাঁড়িয়েছিল। রাজকুমার জানতে চাইল, "আপনার বড় ছেলে অর্থাৎ মামা কি বাড়িতে নেই?" তিনি বললেন, "না।" "কোনটা ওর ঘর? আমরা তল্লাশি করব।" নির্মলবাবু মামার ঘরটি দেখিয়ে দিলেন। আমাদের অফিসাররা মামার ঘর তল্লাশি করতে শুরু করল। সঙ্গে মামার ভাই। তল্লাশি করতে করতে ওরা এমন কিছু পেল না যা আমাদের চোখে কোনও অপরাধের চিহ্ন হতে পারে। মামার একটা নিজস্ব আলমারি আছে। সেটা রাজকুমার খুলল। আলমারি তল্লাশি করতে করতে রাজকুমার পেল গর্ভনিরোধকের প্যাকেট। সেগুলো হাতে নিয়েই রাজকুমার মামার ভাইকে প্রশ্ন করল, "তোমার দাদা কি বিবাহিত?" সে বলল, "হ্যাঁ।" রাজকুমার জানতে চাইল, "তা তোমার বৌদি এখন কোথায়?" ভাই বলল, "তাঁর বাপের বাড়ি, আগরপাড়ার ইলিয়াস রোডে।" রাজকুমার এবার জানতে চাইল, "সেখানেই কি গেছে তোমার দাদা?" ভাই বলল, "খুব সম্ভবত।"

আমাদের অফিসাররা মামার ঘর ও বাড়ির অন্যান্য ঘর বারান্দা তল্লাশি করতে করতে ততক্ষণে জেনে গেছে, মামার আসল নাম তুষার হালদার। তার এখানে ওখানে ছড়ানো খাতাপত্র দেখে তারা অবাক। মুক্তোর মতো হাতের লেখা। লেখার বাঁধুনিও ভালই। সেই সব দেখে তার ভাইকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে, তুষার বি এসসি পাশ। তার বৌদিও শিক্ষিতা। কিন্তু দু'জনেই বেকার। তুষার বাড়িতে বিশেষ টাকাপয়সা দেয় না। তবে মাঝেমধ্যে দামি দামি জিনিস এটা ওটা কেনে। কোথা থেকে কেনে, ভাই বলতে পারল না।

আমাদের কনস্টেবলরা তুষারের বাড়ির বাইরে পাড়ার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে যে তুষার খুব ভদ্র ছেলে। পাড়ার লোকজন ওকে ভাল চোখেই দেখে। সে কোনও গণ্ডগোলের মধ্যে থাকে না। আরও জেনেছে, সেদিনই সকালবেলা সে একটা অপরিচিত ছেলের স্কুটারের পেছনে চড়ে আগরপাড়ার দিকে চলে গেছে। অর্থাৎ যেদিকে ওর শ্বশুরবাড়ি।

রাজকুমাররা আর দেরি করল না। তুষারের ভাই ও রতনকে নিয়ে কামারহাটির দিকে চলল। রাত শেষ হয়ে আসছে। বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু একদিকে পিছল রাস্তা ও রাস্তার বড় বড় গর্তে জমা জলের জন্য গাড়ির গতি স্বাভাবিকের চেয়ে মন্থর।

গাড়ি চলার পরই রাজকুমার তুষারের ভাইকে প্রশ্ন করল, "তোমার দাদার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে?" সে বলল, "ওর তো অনেক বন্ধু। তবে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মনে হয় অমিতদা।" রাজকুমার এবার জানতে চাইল, "অমিতের পুরো নাম কী? কোথায় থাকে?" ভাই বলল, "পুরো নাম অমিত ঘোষাল, বেলঘরিয়ায় থাকে, অনেকবার আমাদের বাড়িতে এসেছে।" রাজকুমার এবার রতনকে প্রশ্ন করল, "কি রে, তুই অমিতকে চিনিস?" রতন কোনওমতে ঢোক গিলে বলল, "নামটা শুনেছি, আমি চিনি না।" রাজকুমার বলল, "চিনিস কি না চিনিস সেটা পরে আমরা বুঝিয়ে দেব, ঢপ মারলে মারা পড়বি কিন্তু।" রতন কাতর গলায় বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি চিনি না, আমাকে কখনও মামা অমিতদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি।"

প্রতাপ তুষারের শিল্পী ভাইয়ের কাছে জানতে চাইল, "অমিত যে তুষারের সবচেয়ে কাছের বন্ধু সেটা বুঝলে কী করে?" ভাই একটু চিন্তা করে বলল, "মোটামুটি আন্দাজ করে, তাছাড়া অমিতদা আমাদের বাড়িতে এলেই দাদা খুব খুশি হয়ে যেত, তারপর দুজনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে গল্প করত। এসব দেখেই আমার মনে হয়েছে।"

গাড়ি এসে দাঁড়াল ইলিয়াস রোডে তুষারের শ্বশুরবাড়ির কাছে। গাড়িতে রতনকে দু'জন কনস্টেবলের কাছে রেখে তুষারের ভাইকে নিয়ে আমাদের অফিসাররা ওই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

প্রায় ভোর। অনেক ডাকাডাকি করে বাড়ির সদর দরজা খোলা হল। তুষারের ভাই সেদিকে এগিয়ে গেল, পেছনে রাজকুমার। ডাকাডাকিতে বেরিয়ে এল একটি অল্পবয়সী বিবাহিতা সুন্দরী মহিলা। ভাই তাকে বলল, "বৌদি, দাদা কই?" মহিলা বলল, "ঘরে, কেন?" ভাই উত্তর দেওয়ার আগেই বেরিয়ে এল বছর বত্রিশের এক যুবক। যুবকটি ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের দলটাকে দেখেই একটু ঘাবড়ে গেল। তবু সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে ভাইকে প্রশ্ন করল, "তুই এ সময়ে এখানে, কী ব্যাপার?"

ওই যুবক যে তুষার হালদার, তা আমাদের অফিসাররা বুঝে গেছে রাজকুমার বলল, "আমরা এসেছি লালবাজার থেকে, তোমায় নিয়ে যেতে।" তুষার বলল, "কেন? আমি কী করেছি?" খপ করে দশাসই রাজকুমার ওর ডান হাতের কব্জিটা ধরে টেনে বলল, "সে ওখানে গেলেই জানতে পারবে।" মহিলা বলে উঠলেন, "আরে, আমার স্বামীকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন, তা আমরা জানতে পারব না?" অনিল পেছন ফিরে চলতে চলতে বলল, "ভোর তো হয়েই এল, দুপুরে লালবাজারে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।" আর কোনও কথা নয়, তুষারকে নিয়ে ওরা গাড়িতে এসে বসল। গাড়িতে তুষারকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তার পাশে অনিল ও রাজকুমার বসল। পেছনে প্রতাপ রতনকে নিয়ে কনস্টেবলদের সঙ্গে বসেছে। গাড়ি ছেড়ে দিল। তুষারের ভাইকে রাজকুমাররা তার বৌদির জিম্মায় দিয়ে এসেছে, ওকে আর প্রয়োজন নেই।

গাড়ি আগরপাড়া ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা আসার পর রাজকুমার তুষারকে বলল, "কি তুষার, আমরা কি বেলঘরিয়ায় যাব?" তুষার বলল, "কেন?" রাজকুমার হেসে বলল, "অমিতকেও একসঙ্গে নিয়ে যেতাম।" অমিতের নামটা শুনেই তুষার একটু চমকে গেল, সে বলল, "ওর নামটা জানলেন কী করে?" অনিল বলল, "জানাই আমাদের কাজ।" তুষার বলল, "ওর কাছে কিন্তু কার্বাইন আছে।" রাজকুমার পাল্টা জানতে চাইল, "কার্বাইন থাক আর কামানই থাক, এখন ওখানে যাব কি না বল?" তুষার ঢোক গিলে বলল, "না, এখন থাক।"

রাজকুমাররা আর বেলঘড়িয়ার দিকে গেল না। লালবাজারের দিকে চলল। ভোর হয়ে গেছে। আমি সারাদিন সারারাত ভীষণ চিন্তায় আছি। ওরা ফিরছে না, কি করছে কে জানে? খালি ভাবছি, কোন গর্তের পাঁকাল মাছ ওরা ধরে আনবে? কোন গর্তের? যে মাছ আমরা চাইছি সেই মাছ পাবে তো?

লালবাজারের সদর গেটের কাছে ওদের গাড়ি পৌঁছাতেই রাজকুমার তুষারকে বলল, "আমি কে বলত? জানিস?" তুষার মাথা নেড়ে কোনও মতে বলল, "হ্যাঁ, চিনি, আপনার নাম তো রুনু গুহ নিয়োগী।" রাজকুমার ওর কথায় হো হো করে হেসে উঠে বলল, "না না, আমি রাজকুমার চ্যাটার্জি, রুনুবাবু তোর জন্য চেম্বারে বসে আছে।" রাজকুমারের হাসি আর উত্তর শুনে তুষার একেবারে কুঁকড়ে গেল। সবাই চুপ। গাড়ি লালবাজারের ভেতর ঢুকল। রাজকুমাররা তুষার ও রতনকে নিয়ে আমাদের গোয়েন্দা দফতরের ডাকাতি নিরোধক শাখায় নিয়ে এল। জানে, আমি ওদের ফেরার প্রতীক্ষায় গতকাল থেকে ছটফট করছি।

রাজকুমাররা ধৃত তুষার ও রতনকে আলাদা আলাদা ঘরে বসিয়ে আমাকে খবর দিল। রাজকুমার বলল, "স্যার, দুটো আসামি ধরেছি, তার মধ্যে একজন মনে হচ্ছে ওদের লিডার।

আমি আপনার নাম করে চমকে দিয়েছি।”

জিজ্ঞেস করলাম, “ওর নামটা কি?” রাজকুমার জানাল, “তুষার হালদার।” বললাম, “চল, দেখি।” রাজকুমার ও আমি তুষারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখেই মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে। কিন্তু কিছু জানতে গেলে নরম হলে চলবে না। প্রথম সাক্ষাতেই ধসিয়ে দিতে হবে। '

আমি তাই তুষারের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রাজকুমারকে বললাম, “একে বেনারসি সিংকে ডেকে সাতাশ নম্বরে নিয়ে যা। তারপর আমি যাচ্ছি।” আমি আর ওখানে না দাঁড়িয়ে আমার চেম্বারে ফিরে এলাম। বেনারসি সিংও আমাদের কেউ নেই, কোনও সাতাশ নম্বরও নেই। তুষারের সামনে ওকে শুনিয়ে রাজকুমারদের ওইভাবে নির্দেশ দিলাম শুধু তুষারকে প্রথমেই ধসিয়ে দেওয়ার পন্থা হিসাবে। সেটা রাজকুমাররাও ভালভাবে জানে। আমার ঘোষণায় পরের কাজটা এবার রাজকুমাররা শুরু করবে।

আমি ফিরে আসার পর রাজকুমার তুষারকে বলল, “কি সাতাশ নম্বরে, বেনারসি সিংয়ের সামনে পড়বি নাকি ভালোয় ভালোয় সব স্বীকার করবি। তুই না বললেও আমরা সব জানি। নয়ত ফালতু তো তোকে ধরে আনিনি। তুই যদি বলিস তবে তোর সঙ্গে আমরা ব্যবসা করতে রাজি আছি। না বললে রুণুবাবু খাল ছেঁচে দেবে তা জানিস তো?” তুষার সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে। সে রাজকুমারকে বলল, “আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন?” উপস্থিত সবাই তুষারের উত্তরে উল্লসিত, কারণ ওরা বুঝে গেছে, তুষারের ভেতরে ধস নেমেছে। ওর আর পালানোর পথ নেই। কিন্তু কেউ উল্লাসের কোনও রকম প্রকাশ করল না। তুষার মাথা নিচু করে মিনিট খানেক চিন্তা করে রাজকুমারকে বলল, “আমাকে এক কাপ চা দেবেন?” রাজকুমার বলল, “দিচ্ছি, কিন্তু সময় পাঁচ মিনিট!” তুষার কোনও উত্তর দিল না। রাজকুমার চা আনতে বলে দিয়েছে। চা এল। তুষার খেল। মুখ তুলে রাজকুমারদের বলল, “কটা চান?”

রাজকুমাররা ওর কথায় কিছুটা অবাক হলেও মুখে বলল, “কটা মানে, সব ক'টার ব্যাপারে পুরোপুরি বলবি।”

তুষার এবার ওদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, “আমরা প্রথম ডাকাতি করি দত্তপুকুরের ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে। তারপর একে একে নারায়ণপুরের ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে, নিমতার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, সোদপুরের ওই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে।”

রাজকুমার অধৈর্য্য হয়ে যাচ্ছিল। কারণ যে ক'টা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা বলল তা একটাও কলকাতার নয়, এবং আমরা যা খুঁজছি তা নয়। সে তাই আসামির স্বীকারোক্তির সময় কথা না বলার নিয়ম ভেঙ্গে বলল, “এ সব তো বহু আগে হয়েছে। তারপরেরগুলো বল।” তুষার হেসে বলল, “হ্যাঁ, ওই ডাকাতিগুলো সব উনআশি, আশি সালে হয়েছে। এরপর চুরাশি সালে সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিয়ুর ব্যাঙ্ক অফ বরোদাতে ডাকাতি করি।”

কেল্লা ফতে। প্রতাপ ছুটে এসে আমাকে বলল, “স্যার, পেয়ে গেছি।” আমি বললাম, “নিয়ে আয় আমার কাছে।” প্রতাপ পাশের ঘর থেকে তুষারকে নিয়ে এসে আমার সামনে বসাল।

তুষারকে বললাম, “বল।” তুষার আবার বলতে শুরু করল, “এরপর দক্ষিণেশ্বরের স্টেট ব্যাঙ্ক, বাগবাজারের ইলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, সল্টলেকের ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও একেবারে শেষে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের মে ফেয়ার রোডের ব্রাঞ্চে।” রেগে গিয়ে বললাম, “ভালই ছিলি তাহলে। বাপের পয়সা রয়েছে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে, পয়সা ফুরালেই গিয়ে নিয়ে আসতিস।” তুষার চুপ করে রইল। জিজ্ঞেস করলাম, “মোট ক'টা ডাকাতি করেছিস?” তুষার মিনমিনে গলায় বলল, “ন'টা।” বললাম, “যা, তবে এবার শালা বিশ বছর জেল খাট।” রাজকুমার বলল, “না স্যার, ও আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে রাজি আছে।”

মনে মনে রাজকুমারের কথায় খুশি হলেও মুখে রাগ ফুটিয়ে বললাম, “তবে আর কী, ওই ঘরে গিয়ে ওদের সব বল। তোর কথা শুনে ওরা যদি রাজি থাকে তবে ব্যবসা হবে।

ব্যবসার প্রথম শর্ত কি জানিস?” তুষার আমার রাগ দেখে ভয়ার্ত গলায় বলল, “হ্যাঁ, আমায় বলেছে। অন্য সবাইকে ধরিয়ে দিতে হবে।” বললাম, “হ্যাঁ। আগে সেই ব্যবস্থাটা কর।”

তুষারকে নিয়ে রাজকুমাররা আমার চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে আমি তুষারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, “সোদপুরের ব্যাঙ্কের ডাকাতির পর সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিয়ুর ব্যাঙ্কের ডাকাতির মাঝে তিন বছর তোরা কোনও ডাকাতি করিস নি?” তুষার বলল, “না।” ওর উত্তর শুনে আমার কেমন সন্দেহ হল, কারণ সাধারণত ডাকাতেরা একবার ডাকাতির স্বাদ পেয়ে পরপর ডাকাতি করার পর, চুপচাপ তিন বছর সাধু হয়ে বসে থাকবে এটা চট করে হয় না। খেঁকিয়ে উঠে বললাম, “কেন, তখন কি তোরা সব সাধু হয়ে গিয়েছিলি?” তুষার মাথা নিচু করে বলল, “না স্যার, ওই তিনবছরের মধ্যে শ্যামল মারা গেল, অমিতদার অ্যাকসিডেন্ট হল, তাই আমরা ডাকাতি করতে পারিনি।”

প্রশ্ন করলাম, "শ্যামল মানে, শ্যামল রায় চৌধুরী, যে দমদমের শেঠ বাগানের একটা খালি বাড়িতে খুন হয়েছিল?” তুষার মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, কিন্তু স্যার আমি খুন করিনি। অমিতদা করেছিল।” জিজ্ঞেস করলাম, “ওই অমিতই তোদের আসল মাথা?” তুষার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। চিৎকার করে বললাম, “কী হল চুপ করে রইলি কেন? এখনও মারিনি বলে?” আমার চিৎকারে থতমত খেয়ে বলল, “হ্যাঁ।” রাজকুমারদের বললাম, “যা একে নিয়ে গিয়ে পুরো বয়ান লিখে নে, কোনও রকম ফালতু কথা বললেই আমায় বলবি।”

রাজকুমাররা তুষারকে নিয়ে চলে গেল। আমি উর্ধ্বতন অফিসার সমেত সবাইকে তুষারের গ্রেফতারের খবর জানিয়ে দিলাম। সবাই খুব খুশি। বহুদিন ধরে যাদের খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান, একেবারে নাজেহাল, তাদের ধরতে পারলে তো স্বাভাবিকভাবেই খুশি হবেন সবাই। সফি সাহেবও একবার তুষারকে দেখে গেলেন।

হঠাৎ আমার শ্যামল রায় চৌধুরীর খুনের ঘটনার কথাটা মনে পড়ে গেল। শ্যামলকে আমরা গোলপার্কের স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডাকাতির ব্যাপারে খুঁজছিলাম। বিরাশি সালের সেপ্টেম্বরে যখন খুঁজতে খুঁজতে প্রায় জাল গুটিয়ে এনেছি, জেনে গেছি, সে দমদমের শেঠ বাগানে সুমন মুখোপাধ্যায় নামে একটা বাড়িতে থাকে, তখনই একদিন ভোরবেলা আমার দমদমের সোর্স এসে আমাকে বলল, শ্যামল খুনের ঘটনা।

আমরা ক'জন সেই খুনের জায়গাটা সেদিনই দেখতে গিয়েছিলাম। একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ি। বাড়ির চারপাশটা আগাছায় ভরা। দরজা জানালা বেশির ভাগ বেপাত্তা। বাড়িটায় ঢুকতে গেলে চারপাশের আগাছার মধ্যে একটা পায়ে চলা সরু পথ আছে। সেই পথটা শুধু পরিষ্কার। লোকজন যে ওই পথে বাড়িটার ভেতরে প্রতিদিনই যাতায়াত করে তা ওই ঝকঝকে পথটা দেখলেই বোঝা যায়। তবে যারা ওই বাড়িতে যায় আসে তারা নিশ্চয়ই কোনও সুকর্মে যায় না। লুকিয়ে নেশা করতে বা জুয়া খেলতেই সম্ভবত যায়।

শ্যামল খুন হওয়ার পরদিন সকালে আমরা গিয়েছিলাম। তার আগের রাতেই দমদম থানার লোকেরা শ্যামলের লাশের টুকরো টুকরো অংশ ওখান থেকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমরা ওই বাড়ির একটা ঘরে যেখানে শ্যামল খুন হয়েছিল সেখানে ঢুকে দেখলাম, ঘরের দেওয়ালগুলোতে কুচো কুচো মাংসের টুকরো তখনও লেগে আছে। মেঝে ও দেওয়ালগুলোতে রক্তের দাগ ছিটানো। যেন কেউ পিচকারি দিয়ে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছে। ওইভাবে মাংস ও রক্ত ছিটানো দেখে শ্যামল কি ভাবে খুন হল, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। একটা শক্তিশালী বিস্ফোরকের মাধ্যমে যে হয়েছে শুধু সেটাই আন্দাজ করতে পেরেছি। দমদম থানা থেকেও আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পেয়েছি। তবে বিস্ফোরকটা কী তারাও জানাতে পারেনি। তারা শুধু জানিয়েছে, “বিস্ফোরণের একটা বিকট আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।' এবং যে খুন হয়েছে তার শরীরের কোনও অংশই আস্ত ছিল না। মাংসের কিমার মতো ছোট ছোট টুকরো হয়ে সারা ঘরে চারপাশে ছত্রাকার হয়েছিল। লাশকে চিহ্নিত করতে

তাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। খালি তার মুখের বাঁ দিকের অংশটা অক্ষত ছিল বলে শ্যামলের পরিচিত লোকেরা তাকে চিনতে পেরেছে। অবশ্য ওকে চিনতে সাহায্য করেছে একটা প্লাস্টিকের বালতি ও জগ। যা শ্যামল বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু কিভাবে এবং কারা তাকে খুন করে গেল সে সম্পর্কে তারা কোনও সূত্র দিতে পারেনি। তবে খুন হওয়ার আগে ওই ঘরে জবরদোস্ত মদ্যপানের আসর বসেছিল। কারণ ওখানে দু'টো ফাঁকা মদের বোতল, ক'টা গ্লাস এবং মাংসের হাড় পাওয়া গিয়েছে। আর পাওয়া গিয়েছে দু'টো আধপোড়া মোমবাতি ও কটা ধূপকাঠির খালি প্যাকেট এবং সেই খালি জলের জগ ও একটা প্লাস্টিকের বালতি।

তুষারকে গ্রেফতারের পর শ্যামল হত্যার রহস্য উন্মোচন হল। তুষার যে সেই হত্যায় সামিল ছিল না বলে আমাদের কাছে সাফাই গেয়েছিল তা সর্বৈব মিথ্যা। সে আর অমিতই ছিল। তবে মূল ফন্দিটা এঁটেছিল অমিত আর তা সমর্থন করেছিল তুষার। অথচ শ্যামলই ছিল ওদের দলের নেতা। তার নেতৃত্বেই ওরা প্রথমে উনআশি সালের এগারই এপ্রিল বারাসাতের দত্তপুকুরের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ডাকাতি করে। ওই ডাকাতিতে বাকি যারা অংশ নিয়েছিল তারা হল বারাসাতের সাধন ঘোষ, তুষার, বারাসাতের সত্যনারায়ণ পল্লির রঞ্জিত পাল, ওই একই পাড়ার সুকান্ত দত্ত ও নব দাস। রঞ্জিত ও সুকান্ত আবার পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

দত্তপুকুরের ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর ওরা একই দল নিয়ে শ্যামলের নেতৃত্বে আশি সালের জানুয়ারির একুশ তারিখ দমদম বিমানবন্দরের লাগোয়া নারায়ণপুরের ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের শাখায় ছেষট্টি হাজার টাকার ওপর ডাকাতি করল।

ওই বছরেরই অক্টোবর মাসের চব্বিশ তারিখ ওরা নিমতা শাখার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ডাকাতি করল। এ পর্যন্ত ওদের সব ঠিকঠাক চলছিল। শ্যামল ইতিমধ্যে অন্য এক ডাকাত দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। এবং সেই সূত্র ধরেই আমরা ওর খোঁজ করছিলাম। এটা অমিত শ্যামলের মুখ থেকে শুনেছিল।

শ্যামলের কাছে অমিত যখন শুনল শ্যামলের পরিচয় আমরা পেয়ে গেছি, সে তখন অন্য ছক করল। সে তুষারকে বলল, "শ্যামলকে সরাতে হবে।" তুষার জানতে চাইল, "কেন?" অমিত জানাল, "ওকে পুলিশ আইডেনটিফাই করে ফেলেছে, একবার ওকে ধরতে পারলে ওরা শ্যামলের কাছ থেকে আমাদেরও কথা জেনে যাবে।" তুষার বলল, "কিভাবে সরাবি?" অমিত হেসে জানাল, "বিপদ যখন আমাদের, সেই সরানোর দায়িত্বটা আমিই নেব। তুই ভাবিস না। আমি সব তৈরি করে তোকে জানাব। পরশু সকালে আমার বাড়ি আসিস। আমি ইতিমধ্যে শ্যামলের সঙ্গে দেখা করব।"

দু'দিনের মাথায় সকালে তুষার অমিতের বেলঘড়িয়ার নীলকান্ত চ্যাটার্জি লেনের বাড়িতে হাজির। তুষারকে নিয়ে অমিত বেরিয়ে গেল। বাইরে হোটেলে দু'জন দুপুরের খাওয়া খেল। অমিত তুষারকে তার পুরো পরিকল্পনার কথা বলল। তুষারকে নিয়ে অমিত আবার বাড়ি ফিরে এল।

বিকেলে ওরা আবার বের হল। অমিতের হাতে একটা কিট ব্যাগ। ওরা সন্ধে নাগাদ দমদমে এল। একটা মদের দোকানে ঢুকে দুবোতল হুইস্কি কিনল। তারপর কটা মোমবাতি ও ধূপকাঠির দামি দুটো প্যাকেট। তারপর একটা পাঞ্জাবি হোটেল থেকে ভাঁড়ে করে কষা মাংস।

তারপর সোজা শ্যামলের শেঠ বাগানের আস্তানায়। শ্যামল ওদের দেখে একগাল হেসে অমিতকে বলল, "কিরে কাল তো বলে গেছিস, বিকেল বিকেল আসবি, এত দেরি করলি?" অমিত শ্যামলের প্রশ্নে পাল্টা হেসে বলল, "তোকে তো বলেই গেছি, আসবই আসব, তুই বের হবি না। আসলে তুষারটাই দেরি করে এল, তাই দেরি হয়ে গেল।" অমিত তুষারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শ্যামলকে আবার বলল, "ওই ঠেকটাতে আজ আর কেউ যাবে নাতো? ফালতু

ছেলেদের ভিড় আমার একদম ভাল লাগে না। কোনও কাজের কথা বলা যায় না। হাবিজাবি কথা বলতে হয়। আর মাল খেলেই সব শালা একেবারে শাজাহান আর সবজান্তা।" অমিতের কথার উত্তরে শ্যামল হেসে ফেলল, বলল, "না, আজ কেউ যাবে না। আমি সেটা ঠিক করে নিয়েছি। কোনও ভয় নেই গুরু। আর এখানে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ওখানেই জম্পেশ করে আড্ডা মারা যাবে।" তুষার বলল, "জল লাগবে তো।" শ্যামল এবার মুচকি হেসে বলল, "আমি কি শালা নতুন? সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, এখন চল।"

ওরা এবার সেই পরিত্যক্ত বাড়িটায় অন্ধকারের মধ্যে ঢুকল। অমিত কিট ব্যাগ খুলে দুটো মোমবাতি বের করে সেগুলো জ্বালিয়ে দিল। ওই ঘরের এক কোণে দুটো শতরঞ্চি থাকে। শ্যামল সেই দু'টোর ধূলো ঝেড়ে মেঝেতে বিছিয়ে দিল। তিনজনেই গুছিয়ে বসল। তুষার তার হাতের মাংসের দু'টো ভাঁড় মাঝখানে রাখল। অমিত কিট ব্যাগ থেকে একটা হুইস্কির বোতল বার করল। তারপর তিনটে কাঁচের গ্লাস। শ্যামল ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এসেছে জলভর্তি একটা প্লাস্টিকের বোতল ও জগ।

অমিত বোতল খুলে তিনটে গ্লাসেই মদ ঢাললো। শ্যামলের গ্লাসে একটু বেশি। শ্যামল সেটা দেখে অমিতকে বলল, "আরে আমার গ্লাসে বেশি দিলি কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল?" অমিত হেসে বলল, "আরে, তোকে তো আর মাল খেয়ে বাড়ি ফেরার জন্য ট্রামবাস চড়তে হবে না। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। তাই আমরা একটু কম খাব।" শ্যামল বলল, "তা ঠিক।"

চিয়ার্স। তিনজনেই একসঙ্গে হুইস্কি গলায় ঢাললো। তারপর পেগের পর পেগ। এবং আড্ডা। তারা তিনজনে পরবর্তী একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করতে শুরু করল। আড্ডা মারতে মারতে এক বোতল হুইস্কি শেষ। বেশির ভাগটা খেয়েছে শ্যামলই। অমিত ও তুষার শুধু ওকে সাহচর্য দিয়ে যাচ্ছে। বোতল শেষ হতেই শ্যামল অমিতকে বলল, "আজ চল।"

অমিত বলল, "দূর, আরও এক বোতল আছে। সেটা শেষ কর।" শ্যামল বলল, "তবে ঢাল। আমার কী? আমি তো এখানেই থাকব। তোদের অনেকদূর যেতে হবে।" অমিত দ্বিতীয় বোতলটা খুলে আবার হুইস্কি ঢালতে শুরু করল।

রাত সাড়ে দশটা। দু'বোতল হুইস্কি শেষ। এবারও বেশির ভাগটাই শ্যামলকে অমিত খাইয়েছে। সে নিজে ও তুষার অল্প। শ্যামল নেশার ঘোরে শতরঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ল। সে আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না। অমিত ও তুষার নিজেদের মধ্যে ইশারায় কথা বলে নিল। অমিত তুষারকে ইশারায় বোঝাল আর একটু অপেক্ষা করতে।

মিনিট পনেরো পর অমিত তার কিট ব্যাগ থেকে একটা ঠোঙা বার করল। তার থেকে একটা পুড়িয়ার মালা। পুড়িয়াগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধা। অমিত সেই মালাটা শ্যামলের চিৎ হওয়া ঘুমন্ত শরীরের ওপর আস্তে পরিয়ে দিল। এবার আরও ক'টা পুড়িয়া ঠোঙা থেকে বার করে শ্যামলের শরীরের দু'দিকে রাখল। তুষারকে বলল, "ধূপকাঠির প্যাকেট থেকে কাঠি বের করে নিচেরটুকু বাদ দিয়ে দে।" তুষার একটা প্যাকেট নিয়ে তাই করল।

অমিত ধূপকাঠিগুলো নিয়ে তিনটে করে কাঠির চেন বানাল। তারপর সেগুলোর এক একটা মাথা এক একটা পুড়িয়ার মধ্যে গুজে দিল। কিটব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তুষারের হাতে দিয়ে খুব সন্তপর্ণে দেশলাই জ্বালাল। তারপর ধূপকাঠির মাথাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। অমিত তুষারকে বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালা।"

শেঠ বাগান থেকে বাইরে এল। মিনিট পাঁচেক পর ওরা একটা প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ শুনল। অমিত আর তুষার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। শ্যামল শেষ, এ ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত। ওদের পথের কাঁটা উড়ে যেতে ওদের হাসি। ও আর মদও খাবে না, ডাকাতিও করবে না। এত বিকট আওয়াজ দমদমের লোকেরা এর আগে শোনেনি। শেঠ বাগানের লোকেরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর পুলিশে খবর।

অমিত বেলঘড়িয়ায় আর তুষার মধ্যমগ্রাম চলে গেল। অমিতের বাবা বিশ্বনাথ ঘোষাল

ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের উচ্চপদস্থ অফিসার। মা শিবানী ঘোষাল সাহাগঞ্জের ডানলপ স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা। বাবা পররাষ্ট্র দফতরের পদস্থ অফিসার হওয়ার সূত্রে অমিতের জীবনের প্রথম ক'বছর লন্ডনে অতিবাহিত হয়। অমিতের স্ত্রী অপর্ণা মেদিনীপুর জেলার দীঘার হিরাপুরের অনন্ত কুমার মিশ্রের মেয়েও শিক্ষিতা। অনন্তবাবু নিজেও কাঁথির সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে অমিত সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে কি করে ডাকাত হয়ে গেল অমিতকে গ্রেফতারের আগে সেটাই ছিল আমাদের কাছে বিস্ময়। অমিতকে গ্রেফতার করা হবে কি করে? তুষারই আমাদের জানাল। অমিত বহু ব্যাঙ্কের শাখায় ডাকাতির টাকা জমা রাখত। তার মধ্যে একটা ওর স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্টে কামারহাটির ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায়। তুষারের কথায় জানা গেল, সেখানে প্রায় লাখ খানেক টাকা আছে। আর বেশি টাকা আছে হাতিবাগানের একটা ব্যাঙ্কে। তুষার বলল, "স্যার, আমি যে ধরা পড়ে গেছি সেটা অমিত ঠিক শুনে যাবে। তখন ও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেই, আর সেই জন্য সে হাতিবাগানের কিংবা কামারহাটির ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে আসবেই।" অমিতের চেহারার পূর্ণ বিবরণ আমরা পেয়ে গেছি। মোটা, কালো, সাধারণ। তাছাড়া ওকে চেনার আর একটা সহজ উপায় হচ্ছে সে খুঁড়িয়ে হাটে আর বাঁ ওর হাতের তিনটে আঙুলের কিছুটা করে অংশ নেই, বিস্ফোরণে উড়ে গেছে।

কামারহাটি ও হাতিবাগানের ব্যাঙ্কের কাছে আমরা ফাঁদ পাতলাম। যদিও ফাঁদ না পেতে ওর বাড়িতে আমরা হানা দিতে পারতাম। কিন্তু দিলাম না। কারণ আমরা নিশ্চিত তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে অযথা পরিস্থিতিটা গুলিয়ে যাবে। তুষার যে আমাদের কাছে সব স্বীকার করেছে সেটা অমিত জেনে যাবে। আর যদি ওকে ধরবার আগে ওর বাড়িতে হানা দিই তবে ও নিশ্চিত হয়ে যাবে। এখন ও দোদুল্যমানতায় ভুগবে এবং অতিরিক্ত সাবধান হবে না। সেই সুযোগটাই আমরা কাজে লাগাব। বেলঘড়িয়ায় ওর বাড়িতেও আমরা নজরদারি বসিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে কোনও খবর নেই।

অমিত কামারহাটির ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় একা একটা মপেড চালিয়ে এল। এবং আমাদের ফাঁদে আটকে গেল। আমাদের অফিসার প্রদীপ ও সঞ্জীব ওর পকেট তল্লাশি করে একটা সেল্ফ চেক পেল। সে পচাত্তর হাজার টাকা ওই ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে এসেছিল। চেকের তলায় পরিষ্কার ভাবে অমিতের নিজের নামে পাশাপাশি দু'টো সই করাই ছিল। আর কী? সোজা লালবাজার। এবার আমরা সব জানতে পারলাম। বিজ্ঞানের খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল অমিত। বিশেষ করে রসায়ণবিদ্যায়। সে তার বেলঘড়িয়ার বাড়িতেই একটা রাসায়নিক গবেষণাগার তৈরি করে ফেলেছিল। সেখানে সে নিজের মতো করে বিভিন্ন বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালাত। সেখানেই সে বানায় 'লেড এজাইট' নামের একটা বিস্ফোরক পদার্থ। যে বিস্ফোরক দিয়ে সে শ্যামলকে খুন করে। সে গবেষণাগারে গান পাউডার, গান কটনও তৈরি করে। যা দিয়ে সে বুলেট বানায়। সে লাটবাগান ও পানাগড় থেকে বিভিন্ন ধরণের ব্যবহৃত বুলেটের মাথা ও নিচের অংশ নিলামে কিনে নিয়ে আসত। তারপর গান কটন দিয়ে সেগুলোকে আবার কার্যকরী করে তুলত।

অমিত শুধু বিস্ফোরক জিনিস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাত না। সে স্টেনগানও বানিয়ে ছিল। অস্ত্র বানানোর বইপত্তর সে ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ত। তা ছাড়া তার বাইবেল ছিল 'হিস্ট্রি অফ মেশিনগান' বইটা। মেশিনগানের বিভিন্ন অংশ বহু ছোটখাট কারখানা থেকে আলাদা আলাদা করে বানিয়ে আনত। তারপর সে সেগুলো জোড়া দিত। সেই অস্ত্রগুলো সে ডাকাতির সময় কাজে লাগাত। তার বাড়িটাই তার দলের হেড কোয়ার্টার বানিয়ে নিয়েছিল।

শ্যামল মারা যাওয়ার পর অমিতই হয়েছিল দলের অধিপতি। কিন্তু বিরাশি সালের সেপ্টেম্বরে শ্যামল খুন হওয়ার পর অক্টোবরে অমিত তার গবেষণাগারে বিস্ফোরক নিয়ে গবেষণা করতে করতে সামান্য অন্যমনস্কতায় বিস্ফোরণের কবলে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দে তার

গবেষণাগার সমেত সে নিজেও বিস্ফোরণে আছড়ে পড়ে।

তাকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করান হয়। শব্দের তীব্রতার রেশ বেলঘড়িয়ার থানার কানেও পৌঁছে যায়। থানা থেকে অনুসন্ধানে এসে তারা একটা বেআইনি গবেষণাগার আবিষ্কার করে। কিন্তু বিশ্বনাথবাবু টাকা পয়সা দিয়ে সেটা চাপা দেয়। ফলে বেলঘড়িয়া থানা ওই বিস্ফোরণের বদলে একটা বোমা নিক্ষেপের মামলা করে। অমিতের ডাকাতির গচ্ছিত সতের হাজার টাকা ছিল চুনাপুকুর লেনের ঢাকা স্বর্ণশিল্পী ভবনের গোবর্ধন বসাকের কাছে। অমিতের বাবা বিশ্বনাথবাবু অমিতের চিকিৎসার জন্য সেই টাকা নিয়ে এল, এবং তার বাড়ি সংলগ্ন নিজের এক বিঘা জমি বিক্রি করল।

অমিত বহুদিন চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরল। তার বাঁ হাতের তিনটে আঙুলের অংশ ছাড়াও ডান হাতেও বেশ কয়েক জায়গায় গভীর ক্ষতচিহ্ন এবং বাঁ পায়ে ও মেরুদণ্ডে আঘাতের জন্য সে কিছুটা প্রতিবন্ধি হয়ে গেল। কিন্তু শেষ ডাকাতি ওরা করেছিল সোদপুরের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায়। সেখানে তারা প্রায় ছ'লক্ষ টাকা পেয়েছিল। সেই টাকা তারা দু'আড়াই বছর ধরে খরচ করার ফলে তাদের হাত হয়ে গিয়েছিল শূন্য।

অমিত ও তুষার মিলে নতুন ডাকাতির পরিকল্পনা করতে শুরু করল। এবার তারা চুরাশি সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে বারটার সময় সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিয়ুর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার শাখাতে বাষট্টি হাজার টাকা ডাকাতি করল। এই প্রথম তারা কলকাতা পুলিশ এলাকায় ডাকাতি করল। সেই ডাকাতিতে নেতৃত্ব দিল তুষার। সঙ্গে ছিল মিন্টে, মেজকা, দমদমের দিলীপ, বেলঘড়িয়ার বান্ধবনগরের মন্টু সাহা। দূর থেকে প্রতি ডাকাতির সময় অমিত যেভাবে ডাকাতি পর্যবেক্ষণ করে এবারও তা করল। অমিতের বানানো মডেল স্টেনগান এখানেও তুষার ব্যবহার করল। মাত্র বাষট্টি হাজার টাকা পাওয়ায় তাদের মনপূতঃ হল না। ওদের কাছে আরও বহু টাকা পাওয়ার খবর ছিল। কিন্তু ক্যাশ কাউন্টারে এর বেশি টাকা ছিল না। অমিত আর তুষার দলের অন্য সদস্যদের পাঁচ হাজার করে দিয়ে বাকিটা দুজনে ভাগ করে নিল। কিন্তু এই অল্প টাকায় আর ওদের ক'দিন চলবে? সুতরাং আবার নতুন করে শুরু করল পরিকল্পনা।

কোন ব্যাঙ্কে ডাকাতি করবে তার জন্য অমিত ও তুষার তল্লাশি করতে শুরু করল। ওরা দু'জনই ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে বিভিন্ন অজুহাতে ঘুরে বেরিয়ে ঠিক করত কোন ব্যাঙ্কে ডাকাতিটা করবে। অমিত ও তুষার দু'জনেই শিক্ষিত হওয়ার জন্য এসব কাজ করতে তাদের কোনও অসুবিধা হত না।

এবার ওরা ঠিক করল দক্ষিণেশ্বরের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় ডাকাতি করবে। অমিত ও তুষার সেই ভিত্তিতে অমিতের বাড়িতে ব্যাঙ্কের ভেতরের প্ল্যান অনুযায়ী ছক এঁকে কী ভাবে ডাকাতি করবে তার পরিকল্পনা করল। তারপর ওরা মিন্টে, রতন, মন্টু ও দিলীপ ওরফে রঞ্জন দাসকে ডেকে পুরো পরিকল্পনার কথা বলল। দমদম ক্যান্টনমেন্টের দিলীপ ছিল ট্যাক্সিচালক। সে গাড়ি চালাবে এবং ডাকাতির সময় ভেতরে যাবে না। বাকিরা কে কি ভূমিকা নেবে তা সবাই বুঝে নিল। তারপর ওই বছরেরই জুলাই মাসের নয় তারিখ ডাকাতি করল। লুঠ করল প্রায় পাঁচ লাখ নব্বই হাজার টাকা।

এবার অমিত কিছুটা খুশি। অনেক টাকা পেয়েছে। সে আর তুষার চলে গেল পশ্চিমবঙের বাইরে। এর আগেও আশি সালের ডাকাতিগুলো করার পর তারা যা করত তাই করল। প্রথমে তারা গেল মাদ্রাজ, একটা ব্যাঙ্ক থেকে ড্রাফট বানিয়ে নিজেদের ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিল। তারপর হায়দরাবাদ ও বাঙ্গালোর, একই কাজ।

ফিরে এসে অমিত ও তুষার যথেচ্ছভাবে আগের মতো টাকা খরচ করতে লাগল। অমিত এবার তার গবেষণাগারে আফিং থেকে মরফিয়া বা ওই জাতীয় কোনও ড্রাগ বানানো যায় কি না তা নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল। সে বর্ধমানের ছোটনীলপুরের এক প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিক জি আর ধরের মাধ্যমে কানপুর থেকে আফিং আনাত। তুষারই এই যোগাযোগটা

করে দিয়েছিল। তাছাড়া গোবর্ধন বসাকের দোকান থেকে তারা সোনার চেন ও কয়েন কিনে রাখল।

তুষার প্রতিদিনই সোনাগাছি কিংবা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বিভিন্ন বারবণিতার ঘরে যেত। তার মধ্যে সোনাগাছির মাধবীর সঙ্গে সে ছিল বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। মাধবীর ঘরে সে সান্ধ্য আড্ডা বসাত। মদ্যপান করত। সেই মাধবীকে নিয়ে সে প্রথমে বেড়াতে গেল তারাপীঠ, সেখানে দিন তিনেক কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আবার মাধবীকে নিয়ে পুজোর সময় গেল দার্জিলিং। মাধবীকে সে কিনে দিল সোনার অলংকার, প্রসাধনের সামগ্রী।

তুষার নিজে দেখতে ছিল সুন্দর। বাড়িতে আছে সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী। আর সে সময় কাটাত একটা কালো, মোটা, কদর্য দেখতে বারবণিতার সঙ্গে। সে ডাকাতির লুঠ করা টাকা তার স্ত্রীর জন্য খরচ করত না, বেশির ভাগটাই খরচ করত মাধবীদের পেছনে।

আফিং থেকে ড্রাগ বানানোর পরিকল্পনাটা অমিতের কার্যকরী হল না।

এদিকে ওদের টাকা জলের মতো খরচ করার ফলে টাকাও শেষ হয়ে এল। সুতরাং আবার ডাকাতি। এবার কোথায়?

ওরা রাজ্য পুলিশের এলাকা ছেড়ে কলকাতার ব্যাঙ্কের শাখাগুলোর দিকে নজর দিল। তারা বাগবাজার এলাকার ইউনাইটেড কর্মাসিয়াল ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ও গ্রে স্ট্রিটের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখাগুলো ঘুরে দেখল। তারপর তারা ঠিক করল ইলাহাবাদ ব্যাঙ্কেই ডাকাতি করবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে তুষার ও অমিত সরেজমিনে ব্যাঙ্কের ভেতরটা তদন্ত করতে গেল। তুষার দেখা করল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে, অমিত অন্যদিকে।

আবার ব্যাঙ্কের ভেতরের চিত্রটা এঁকে ওরা পরিকল্পনা করল। ঠিক হল, তুষারের নেতৃত্বে ডাকাতিটা করবে মিন্টে, মন্টু, বেলঘড়িয়ার লক্ষণ পাইনের চেলা ভুলু, আর ড্রাইভার দিলীপ। ভুলু দলে এই প্রথম, অমিতের আনা সদস্য।

সব ঠিক। ওরা পঁচাশি সালের অক্টোবর মাসের সতের তারিখ সকালে অমিতের বাড়ি থেকে ডাকাতির জন্য বার হল। সঙ্গে নিল চারটে রিভলবার, চব্বিশটা কার্তুজ, অমিতের বানানো মডেল একটা স্টেনগান। একটা ঘিয়ে রঙের দুধের প্যাকেটে চারটে ফিউজ দেওয়া বোমা। ব্যাঙ্কে প্রথমে ঢুকল মিন্টে। সে একটা ক্যাশ কাউন্টারের সামনে গিয়ে ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়ার স্লিপ নিয়ে লিখতে শুরু করল। মিন্টের পর ঢুকল ভুলু। সে কাস্টমারদের বসার চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। এবার ঢুকল ওদের অ্যাকশানের নেতা তুষার। সে সোজা চলে গেল ম্যানেজারের চেম্বারের কাছে। মেজকা ব্যাঙ্কের সদর দরজার সামনে দাঁড়াল। তুষারই রিভলবার বার করে ম্যানেজারকে বলল, “চল, ভল্ট খুলে দে।” ম্যানেজার সাহেব হতচকিত হয়ে বলে উঠলেন, “আমার কাছে চাবি নেই।” তুষার চিৎকার করে বলে উঠল, “কার কাছে আছে?” তিনি তার একজন সহকারীকে দেখিয়ে দিলেন। তুষার ছুটে সেদিকে গেল। সহকারী ভদ্রলোক একটা টেবিলে বসে কাজ করছিলেন, তিনি ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও সেটা সামলে তুষারকে বলল, “ভল্টে টাকা নেই। অ্যাকাউন্টেন্টবাবু আনতে গেছেন, চাবি তার কাছে।” তুষার ওর কথায় বোকা বনে গেল।

অন্যদিকে মিন্টে মডেল স্টেনগানটা নিয়ে ব্যাঙ্কের অন্য কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে নিয়ে গেছে ব্যাঙ্কের ভেতরের বাথরুমের দিকে। কাস্টমারদের সামলাচ্ছে ভুলু। মেজকা পাহারা দিচ্ছে সদর দরজা। তুষার ম্যানেজার ও সহকারীকে মিন্টের দিকে নিয়ে গিয়ে তার জিম্মায় রেখে ব্যাঙ্কের ক্যাশ কাউন্টার থেকে পুরো টাকা একটা থলিতে ভর্তি করে নিল। তুষার আবার এল ম্যানেজারের কাছে। প্রশ্ন করল, “তোরা ঠিক বলছিস, ভল্টে টাকা নেই?” ম্যানেজার বলল, “বললাম তো, নেই।” তুষার রেগে গিয়ে বলল, “তোদের যে কি করতে ইচ্ছে করছে।” তারপর ওরা দু'জন দু'জন করে বেরিয়ে এল। বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল দিলীপ। ওরা গাড়িতে উঠে চলে গেল।

ইলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর পাওয়ার পর আমরা গেলাম। তদন্তে এমন কিছু নিখুঁত পরিকল্পনার ছাপ পেলাম না। এবং উল্টে যে সবসময় টাকা থাকত না, সেই খবরও তাদের ছিল না। বন্দুকধারী দারোয়ানকে নিয়ে যে অ্যাকাউন্টেট টাকা আনতে যান তাও তাদের জানা ছিল না। তাই মনে হল, এরা অনেকটা পেশাদার ভ্রাম্যমান ডাকাত দল। মানসিকতা অনেকটা এরকম, "টাকা চাই, তাই ঢুকে পর ব্যাঙ্কে। যা পাওয়া যায় তাই হাতিয়ে নে।' ঠিক এ রকম মোডাস অপারেন্ডির সঙ্গে পার্ক সার্কাসের সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিয়ুর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার ডাকাতির মিল আছে।

ইলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ডাকাতির টাকা একেবারে শেষ হওয়ার আগেই অমিত ও তুষার সল্টলেকের ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ছিয়াশি সালের তিরিশে সেপ্টেম্বর প্রায় একই কায়দায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ডাকাতি করে উধাও হয়ে গেল। সল্টলেক এলাকা যেহেতু আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে আমরা সেখানে সরেজমিনে তদন্ত করতে না গেলেও সেই ডাকাতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করলাম। তাতে ইলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ডাকাতির মোডাস অপারেন্ডির সঙ্গে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া গেল। এখানেও ডাকাতরা সংখ্যায় পাঁচ ছ'জন। প্রত্যেকেরই বয়স তিরিশের আশেপাশে। এবং বাংলায় কথাবার্তা বলে। এখানেও ডাকাতরা একটা স্টেনগান ও ক'টা রিভলবার নিয়ে ব্যাঙ্ক আক্রমণ করেছে।

অন্যদিকে সল্টলেকের ডাকাতির পর তুষার মাধবীকে একটা পুরনো গাড়ি কিনে দিল। অমিত অসম থেকে আফিং আনিয়ে নতুন করে আবার ড্রাগ তৈরি করার গবেষণা শুরু করল।

তুষাররা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের এলাকায় মোট পাঁচটা ডাকাতি ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। আমাদের কলকাতা পুলিশের এলাকায় দু'টো। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশও এই দলটাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। তুষারদের দলের একমাত্র মিন্টে ও রতন ছাড়া সবাই থাকত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের এলাকায়। কিন্তু একেবারে চুপচাপ। এমন কী তারা পরস্পরের সঙ্গে ঘন ঘন মিলত ও না। একমাত্র অমিত ও তুষার নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত।

ডাকাতির পরিকল্পনা করে তারা অন্য সদস্যদের খবর দিত। প্রতিবারই যে একই সদস্য থাকত তা নয়। মাঝেমধ্যে দু'একজনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাকাতি করতে যেত।

অমিত ও তুষার এবার ঠিক করল, আর একটা ডাকাতি করে চুপচাপ বসে যাওয়ার। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওরা আবার ব্যাঙ্ক খুঁজতে শুরু করল। ঠিক হল কড়েয়া থানার অধীন মে ফেয়ার রোডের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ওরা ডাকাতি করবে। দল ঠিক হল, তুষার, ভুলু, রতন, দিলীপ, মিন্টে ও মন্টু সাহা। একই ভাবে পরিকল্পনা হল এবং সাতাশি সালের ফেব্রুয়ারির আঠার তারিখ ওই ব্যাঙ্ক থেকে তারা ছ'লাখ আশি হাজার টাকা লুঠ করে পালাল।

আবার আমাদের এলাকা। তদন্তে গেলাম আমরা সবাই। একই ধরণ, সেই বছর পঁচিশ তিরিশের পাঁচ ছ'জনের দল। একজনের হাতে একটা স্টেনগান। বাকিদের হাতে রিভলবার ইত্যাদি। সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিয়ুর ব্যাঙ্ক ও বাগবাজারের ব্যাঙ্কের ডাকাতির কোনও হদিস পাওয়ার আগেই আবার একটা ডাকাতি হল। আমাদের মাথায় হাত। সেই দিশাহীন সময়ই কালা ডিডির খবরের ভিত্তিতে রতন গ্রেফতার।

তারপর তুষার ও অমিত। এরা দুজনই আসল মাথা। তবে তুষার আমাদের যেভাবে সাহায্য করল, অমিত নয়। তুষার গ্রেফতার হওয়ার পর কোনও মারধোর খাওয়ার আগেই আমাদের কাছে সব স্বীকার করে সাহায্য করতে শুরু করেছে, কিন্তু অমিত নয়। অমিত একটু গোঁয়াড় প্রকৃতির, যদিও বিস্ফোরণের ফলে সে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভদ্র পরিবারের অবাধ্য বখাটে ছেলে অত সহজে সব স্বীকার করল না। সে প্রথমে বলল, "ডাকাতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, আমি শুধু অস্ত্র ভাড়া দিতাম।"

এমনভাবে বলল যে, বেআইনি অস্ত্র রাখা ও সেগুলো ভাড়া দেওয়া কোনও খারাপ কাজ নয়, খুবই মহান কাজ!"

এরপর যা হওয়ার তাই হল। দু' চারটে বিরাশি সিক্কা। তারপর সব স্বীকার। বিরাশি সিক্কায় আরও বার হল। অমিত আমাদের দলকে নিয়ে গেল দক্ষিণেশ্বরে তার মাসীর বাড়ি। সেখানে সে একটা ঘরের ভেতর, বক্স খাটের থেকে বার করল ছোট ছোট কাঁচের বয়ামে বিভিন্ন ধরণের রাসায়ণিক জিনিস। সেগুলো আমাদের লোকেরা বায়েজাপ্ত করার পর সেই বাড়ি থেকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসার সময় কনস্টেবল অসিত তাকে পাশে নিয়ে ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল। যদি কোনও রকম বিস্ফোরণ হয় তবে অমিতও বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচবে না, তাই এই সতর্কতা নেওয়া হল। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই অমিত রাজকুমারকে বলল, "স্যার, এর মধ্যে অনেকগুলো নিজেই ফেটে যেতে পারে।" কায়দাটা কাজে লেগেছে। রাজকুমার হাসল। তারপর অমিতেরই পরামর্শ অনুযায়ী ওই বিস্ফোরকগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হল।

ওদের স্বীকারোক্তির সূত্র ধরেই গ্রেফতার করলাম বেলঘড়িয়ার পঙ্কজকে। তারপর মন্টু সাহা, মনোজ। গ্রেফতার হল বারাসাতের নব দাস। তার বেশ কিছু দিন পর কাঁকুড়গাছি থেকে মিন্টে।

কিন্তু বারাসাতের সুকান্ত পল্লির সাধন ঘোষকে গ্রেফতার করে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সাধন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ছিল। এবং সে ছেষট্টি সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এগ্রিকালচার স্ট্রিমে প্রথম হয়। তারপর সে ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দেয় কিন্তু একাত্তর সালে চাকরি ছেড়ে দেয়। চাকরি ছাড়ার পর সে ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা করে। তখন তার সঙ্গে আলাপ হয় শ্যামলের এবং সে ডাকাত দলে ভিড়ে যায় এবং দত্তপুকুরের নারায়ণপুর ও নিমতায় পরপর ডাকাতিতে অংশ নেয়। নারায়ণপুরে ওরা ডাকাতি করার পর সাইকেলে চড়ে পালায় এবং শ্যামলের সঙ্গে সাধনই ওই ব্যাঙ্কে ডাকাতিতে নেতৃত্ব দেয়। তুষার তখন ওদের কাছে শিক্ষার্থী। নিখিল সরকার, অশোক বালা, সুকান্ত ও বারাসাতের কে বি বোস রোডের নব দাস ছিল বাকি সহযোগী। ওই ডাকাতিগুলোর অন্য সদস্য সুকান্ত দত্ত বারাসাতের হরিতোলা মোড়ে একটা ওষুধের দোকান করে বসেছে আর তার শালা রঞ্জিত বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে।

পুরো দলকে গ্রেফতারের পর আমরা ওদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়ে মামলা শুরু করলাম। তুষারের সঙ্গে 'ব্যবসা' করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে ওকে করা হল রাজসাক্ষী। মামলায় ওদের কারও দশ, কারও আট বছর সশ্রম দণ্ড হল। সাধনের বিরুদ্ধে আমাদের এলাকায় ডাকাতির কোনও মামলা না থাকায় ওকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। ওই এলাকার এক্তিয়ারে ওরা যে পাঁচটা ডাকাতি করেছিল তাতেই সাজা হল।

এখনও ভেবেই পায় না, সাধনের মতো এত ভাল ছাত্র কেন ডাকাতি করবে? শুধু সাধনই নয়। অমিত ও তুষারও মেধাবী ছাত্র ছিল, এদেরও ডাকাত হয়ে যাওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। আসলে বেকারির জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, অপরাধ জগতের লোকের সংস্রবে এসে, আয়াসে কিছু টাকা কামিয়ে নেওয়ার আকর্ষণেই এরা সবাই ডাকাত হয়ে " গেল। এই সব ছেলেরা প্রথমে ভাবে, একটা দু'টো ডাকাতি করে, সেই ডাকাতির টাকা নিয়ে কোনও ব্যবসা শুরু করে চুপচাপ বসে যাবে। কেউ টের পাবে না। আসলে তা তো হয় না। একবার অন্ধকার গলিতে নাম লেখালে, অল্প পরিশ্রমে টাকা হাতে এলে যে তার প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ জন্মে যায় এরা বুঝতে পারে না। এর টান অনেকটা ড্রাগের নেশার মতো। একবার হাতেখড়ি দিয়েছো তো মৃত্যু সেই দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তাছাড়া এরা প্রথমে এটাও বুঝতে পারে না, একবার অপরাধ করলেই, তুমি নিজের কাছে নিজেই অপরাধী হয়ে গেলে, সেই মানসিক অবস্থান থেকে তুমি নিজেই মুক্তি পাবে না। দ্বিতীয়ত, তোমাকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজবে। ধরা পড়লেই তুমি হয়ে যাবে দাগী অপরাধী, যার ফল

তোমাকে মৃত্যু পর্যন্ত ভুগতে হবে।

আর একবার আয়াসে অনেক টাকা হাতে এসে গেলে তুমি ঘরে সুন্দরী স্ত্রী ফেলে ছুটবে মাধবীদের কাছে। সেখানে মদ্যপান সমেত তোমার চরিত্রের ভাল বাকি অংশটা পরিষ্কার করে দিয়ে আসবে।

যত ডাকাতির মামলার আসামি আমরা ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত ধরেছি, তার মধ্যে অনন্ত সিংয়ের দলের ছেলেদের ছাড়া বাকি আর অন্য দলগুলোর লোকেদের মধ্যে কারও কোনও চরিত্র বলে কিছু ছিল না। কারণ অনন্তবাবুর দলের ছেলেরা ছিল রাজনৈতিক ভাবে সচেতন। প্রচণ্ড চরিত্রবান। তারা বিশ্বাস করত ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবের। আর সেই বিপ্লবের প্রয়োজনেই ডাকাতি। তাই তাদের ডাকাতিগুলোতেও যে পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক ছাপ ছিল তা অন্য কোনও ডাকাতিগুলোতে আমরা পাইনি। সম্ভবও নয়। ওরা একটা ডাকাতি করার আগে, যে সময় নিয়ে বিভিন্নভাবে রিয়ার্সাল দিত, অন্য দলগুলো তা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। এখানেই অন্য সবার সঙ্গে ওদের পার্থক্য।

যদিও সব অপরাধই অপরাধ। কিন্তু সব অপরাধীকে ধরবার পদ্ধতি এক নয়। কারণ সব অপরাধীর চরিত্র তো এক নয়। তাই অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পর চিন্তার কূট কৌশলীর প্রসারতাই হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র, অপরাধীকে চিহ্নিত করে, গ্রেফতার করার। যে সেটা পারে সে সফল, যে পারে না সে হয় ব্যর্থ। সেই পদ্ধতি কখনও হয় সাদা কখনও বা হয় কালো!

প্রকাশক :
জিনিয়া পাবলিশার্স
৭৮, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : তড়িৎ চৌধুরী

লেজার টাইপ সেটিং :
ক্রেস্ট গ্রাফিক্স
২, চার্চ লেন
কলকাতা ৭০০০০১

মুদ্রক :
শীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, রেভারেণ্ড কালী ব্যানার্জি রো
কলকাতা ৭০০০০৬
প্রথম খন্ডের পাতা

দ্বিতীয় খন্ডের পাতা

প্রকাশক :
কালাচাঁদ দে
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :২৬ জানুয়ারি, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : তড়িৎ চৌধুরী

লেভার টাইপ সেটিং :
ক্রেস্ট গ্রাফিক্স
২, চার্চ লেন
কলকাতা ৭০০০০১

মুদ্রক :
অফসেট আর্ট প্রিন্টার্স
৭৩, ইলিয়ট রোড
কলকাতা-৭০০০১৬